ভারতীয় সাধন পরম্পরায় গুরুধারণার বিবর্তন এবং বঙ্গদেশীয় প্রতিগ্রহণ

(বজ্রযান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলা অনুষদ) পিএইচ. ডি উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা নিবন্ধ

অভিজিৎ ব্যানার্জি

রেজিস্ট্রেশন নং- AOOBE1100716

তারিখ- ২৬.০৭.২০১৬

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

Declaration

Certified that the thesis entitled **ভারতীয় সাধন পরম্পরায় গুরুধারণার বিবর্তন এবং বঙ্গদেশীয় প্রতিগ্রহণ (বজ্রযান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা)** submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts (Bengali) at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof. Gopa Datta, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

Neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Abhijit Banerjee

Registration No: AOOBE1100716

Date of Registration: 26.07.2016

Countersigned

Prof. Gopa Datta

Supervisor
Professor
Department of Bengali
Jadavpur University
Kolkata- 700032

প্রাক্-কথন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল স্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় মাধুকরী বিষয়ক গবেষণা নিবন্ধ প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রথম উপলব্ধি করি ভারতবর্ষের ধর্ম-সাধনার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ইষ্ট দেবতার থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন গুরু। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলার থেকে নিত্যানন্দ পরিবারে দীক্ষিত বা অদ্বৈত পরিবারের দীক্ষিত বলাই অনেক বেশি পরম্পরা স্বীকৃত। তাই আমার ধারণা গুরুকেন্দ্রিক ভাবনা এবং রীতি-নীতির বিশ্বাসকে ধর্ম সংস্কৃতিকে চেনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নক হিসাবে দেখানো সম্ভব। এই প্রকল্প থেকেই বর্তমান কাজের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে মধ্যযুগের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিশেষপত্র পড়তে গিয়ে আমরা বুঝেছিলাম বঙ্গদেশের সাহিত্য বা সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে তাকে আসলে দেখতে হবে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে। এভাবেই আমাদের পড়াশোনায় ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বা ধর্মের প্রেক্ষাপটে বঙ্গদেশের অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। বর্তমান কাজে প্রতিগ্রহণের (Reception) উপর আমরা বিশেষ নজর দিতে চেয়েছি। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্ম, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ যোগ সূত্রটি ক্রমে আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়েছে। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি, অহমিয়া এবং সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার জন্য আমরা অনেক সময়েই অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছি। গুরু ধারণার ক্রমবিকাশ বোঝার জন্য সাহিত্যিক এবং দার্শনিক রচনার তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরেই মূল জোর ছিল। পাশাপাশি এই বিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য সামাজিক অবস্থার দিকেও আমরা সব সময়ে মনোযোগ রাখতে চেয়েছি। বঙ্গদেশের মাত্র দু'টি সাধনাকে কেন্দ্র করেই আমাদের বর্তমান গবেষণা। তবে উপযুক্ত সময় পেলে এই কাজের বিস্তৃতি সম্ভব। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের গুরুকেন্দ্রিক সাধনার ধারায় বিবর্তন বোঝার জন্য বর্তমান গবেষণাকে একটি কেস স্টাডি (Case Study) হিসাবে উপস্থিত করাই ছিল বর্তমান গবেষণার মূল প্রকল্প। লেখার সর্বত্র বানানের সমতা বিধান করতে পারিনি, একাধিক ছাপার ভুলও থেকে গেছে। আশা করি পরে এই কাজ পূর্ণতর রূপ লাভ করবে।

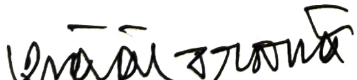

অভিজিৎ ব্যানার্জি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার প্রিয়তম শিক্ষক, আমার অভিভাবক অধ্যাপক দীপান্বিতা ঘোষ চলে গেছেন সাত বছর আগে। জীবনের প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তের মুহূর্তে যাঁর সঙ্গে কথা না বলতে পারার শূন্যতা রোজ বুঝতে পারি। 'ম্যাম' থাকলে এই গবেষণা কেন আমার জীবনটাই অন্যরকম হত। আমার যতটুকু লেখার ও ভাবনার ক্ষমতা তার সবটাই অধ্যাপক দীপান্বিতা ঘোষের থেকে শেখা (অবশ্যই ব্যর্থতার যাবতীয় দায় একান্তই আমার)। আমি জানি জীবনে যাই লিখি না কেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রথম নাম ওঁরই হবে।

আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক গোপা দত্ত আমায় কাজের বিষয়ে সব সময়ে উৎসাহিত করেছেন। আমায় হয়ত ভরসা করেই অনেকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। মাঝে মাঝেই আমায় নানা বই-পত্রের কথা বলেছেন। কাজের প্রত্যেকটি পর্যায়ে আমি তাঁর সাহায্য পেয়েছি। আমার লেখা পড়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন, অনেক ভুল শুধরে দিয়েছেন। একাধিক সংযোজন-বিয়োজনের পরামর্শ দিয়েছেন। সত্যি বলতে এমন তত্ত্বাবধায়ক প্রাপ্তি বোধহয় আমার প্রারব্ধ কর্মেরই ফল!

গুরুভাগ্য আমার বরাবরই ঈর্ষণীয়। তাঁর সঙ্গে কাজের সূত্রে অনেক গুণী এবং পণ্ডিত মানুষের সান্নিধ্য আমায় বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। বিশ্বভারতী-র প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক সুনীতি পাঠক আমায় বৌদ্ধদর্শনের কিছু বিশেষ দিক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কাজের একাধিক পর্যায়ে আমি তাঁর পরামর্শে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সীতানাথ আচার্যের থেকে আমি অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে বাধিত হয়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ঐশ্বর্য বিশ্বাসের থেকেই আমার বৌদ্ধ বিদ্যায় প্রথম হাতে খড়ি। আমার বর্তমান গবেষণাতেও আমি এঁদের প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষা শিখতে গিয়ে আমি অধ্যাপক অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শ লাভ করি। তাঁর থেকে তিব্বতী-বৌদ্ধ বিদ্যা বিষয়ক পরামর্শে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। বিশ্বভারতীর ইন্দো-তিব্বতী বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার দাস আমায় বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের পদ-সংকলনের হদিশ দিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। ড. অণিমা মুখোপাধ্যায় আমায় তাঁর গবেষণা কর্মের নির্বাচিত অংশ পড়ার জন্য প্রতিলিপি পাঠিয়ে ছিলেন। ভন্তে সুমনপাল ভিক্ষুর থেকে প্রত্যেক মুহূর্তে সৎ-পরামর্শ এবং বই-পত্রের সাহায্য পেয়েছি। দূরে থেকেও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ব্রততী চক্রবর্তী-র স্নেহাশিস আমি সবসময়ে উপলব্ধি করতে

পেরেছি। আমার এম.ফিল স্তরের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী-র সঙ্গে বর্তমান কাজের বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি বারবার। প্রত্যেকবারেই আমি শিখেছি, নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল স্তরে মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষপত্রে আমি অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং অধ্যাপক সত্যবতী গিরি-র কাছে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। মধ্যযুগের সাহিত্যকে কীভাবে পড়তে হয়, সেই প্রশিক্ষণে এঁদের অবদান বিশেষভাবে স্বীকার্য। অধ্যাপক মুক্তিপদ সিন্‌হা আমায় নতুন নতুন পড়ার বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার কর্মস্থল ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরাও আমায় গবেষণার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সুস্মিতা ভৌমিক এবং সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক রচনা রাস্তোগি, মানবীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ত্রয়ী সিন্‌হা আমায় কাজের বিষয়ে সরাসরি সাহায্য করেছেন। আমার কাজের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে আমায় উৎসাহিত করেছেন, কাজ শেষ করার জন্য সুপরামর্শ দিয়েছেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অনিন্দ্য ঘোষ-চৌধুরী, গণিতের অধ্যাপক সৌমি টিকাদার এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সঞ্চিতা বসু। এছাড়া আমার বিভাগের সকলেই আমায় সবসময়ে সহযোগিতা করেছেন। ফকিরচাঁদ কলেজের অধ্যাপক মহুয়া চক্রবর্তীর সূত্রে কলকাতার সেন্ট পলস্‌ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজের অধ্যাপক সরসিজ সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। গবেষণা বিষয়ক প্রকাশনায় আমি এঁদের সাহায্য পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিশেষজ্ঞ সমিতির সদস্য ঋত্বিক মল্লিক আমায় আরেকটি প্রকাশনা বিষয়ে সাহায্য করেছেন। সকলকেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার ছাত্র পল্লবী হালদার নিজে থেকে আমার কাজের জন্য দরকারি যখন যা দেখেছে আমায় জানিয়েছে। শিক্ষক হিসাবে ছাত্রের কাছে ঋণী হবার গর্ব আমার সারা জীবন থাকবে।

গবেষণার জন্য বেশ কিছু গ্রন্থাগারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার থেকে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকেও সবসময়ে সাহায্য পেয়েছি। বিশ্বভারতীর চীন ভবন এবং ইন্দো-তিব্বতী বিভাগের গ্রন্থাগার থেকেও আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। সারনাথের Central University of Higher Tibetan Studies এর শান্তরক্ষিত গ্রন্থাগারে বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ক অতুলনীয় সংগ্রহ আমায় এক সপ্তাহ ধরে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতী শাস্ত্র সংরক্ষণ বিভাগের কর্মীরা আমার প্রভূত উপকার করেছিলেন। লখনউ -এ Indian

Council for Philosophical Researches (ICPR) -এর গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছিলাম। এই দুটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়া অনলাইন তথ্য উৎস হিসাবে www.archive.org, www.wbpublibnet.gov.in এবং www.shodhganga.inflibnet.ac.in -এই তিনটি ওয়েবসাইট থেকে আমি অজস্র উপাদান সংগ্রহ করেছি। প্রত্যেকটি সংস্থার কর্মকর্তাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

জানি, বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না। তবু নিজের মানুষের কথা বলার লোভ সামলানোটা কঠিন। আসলে উপকৃত হতে হতে, বেছে বেছে মনে করে রাখার অভ্যাসটাই চলে যায়। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মালিনী সিদ্ধান্ত আমায় প্রথম থেকেই পড়াশোনায় উৎসাহিত করে আসছেন। মালিনীদির থেকে ইতিহাস বিদ্যাশৃঙ্খলের বিভিন্ন দিক আমি বুঝতে পেরেছি। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অঙ্কনা বেতালের কাছে স্নাতক স্তর থেকেই পড়াশোনা শিখেছি, আজও শিখছি। অসম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক অর্জুনদেব সেনশর্মা আমায় বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে আলোকিত করেছেন, আমার লেখা পড়ে মতামত দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কনিষ্ঠ দত্তাত্রেয়, তিয়াস কাজের নানা পর্যায়ে সাহায্য করেছেন, এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে কাজের বেশ কিছু জায়গা আমার নিজের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ পাণ্ডা আমায় গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণে সাহায্য করেছেন। সৌমী বসু আমায় কাজের উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছেন, লেখা শুরু করায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। অরুন্ধতী দাস লেখার প্রুফ দেখে দিয়েছেন, আমার বিভিন্ন অত্যাচার সহ্য করে বানান ঠিক করে দিয়েছেন। অরিজিতা মুখোপাধ্যায় আমায় রোজ নিয়ম করে লেখা নিয়ে বসার কথা মনে করাতেন। সকলেই সুস্থ এবং সুন্দর থাকুক এই প্রার্থনাই থাকবে। আমার লেখা মুদ্রণের অনেকটা কাজ করেছেন শুভেন্দুকৃষ্ণ তরফদার। তাঁর কাছে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল।

ঘরের মানুষের কথা বলে আপাতত শেষ করব। আমার বোন শ্রমণা এবং ভাই সব্যসাচী কাজের সময়ে আমায় প্রযুক্তিগতভাবে বিশেষ সাহায্য করেছিল। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ শাশ্বতী গত দশ বছর ধরে যুক্ত, তাই বর্তমান গবেষণাকর্মে ওঁর অবদানের কথা আলাদা করে বলা সম্ভব নয়। বন্ধু অভিজিত সাধুখাঁ-র সাহায্য পেয়েছি প্রত্যেক পদক্ষেপে। আমার যাবতীয় আগোছালো কাজ এবং ভাবনাসূত্র তাঁর হাতেই সংহত হয়েছে। লেখার কাজ শেষ করতে পেরেছি একমাত্র অভিজিতের প্রেরণাতেই। শুভ কামনা আর ভালোবাসা ছাড়া আমার আর কিছুই এঁদের দেবার নেই।

অধ্যায় সূচি

প্রাক্কথন		i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		ii
ভূমিকা		০১
প্রথম অধ্যায়	গুরু: শব্দার্থ এবং গবেষণা পদ্ধতি	২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	গৌতমবুদ্ধ পূর্ববর্তী ভারতীয় সাধনায় গুরু	৫৯
তৃতীয় অধ্যায়	বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী ভারতীয় ধর্মে গুরু ধারণার নির্মাণ ও বিবর্তন: থেরবাদ, মহাযান এবং প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম	১১২
চতুর্থ অধ্যায়	বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে গুরু প্রসঙ্গ	১৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের নির্বাচিত ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরু	২২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে গুরু	২৭৬
সিদ্ধান্ত		৩৬৪
গ্রন্থপঞ্জি		৩৮১

ভূমিকা

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ধর্ম-সংস্কৃতির বিশ্লেষণে কোন সামান্য সূত্রের কল্পনা সব সময়ই অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। এত বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য আদর্শ হিসাবে যতটা আকর্ষক, তাত্ত্বিক ভাবে ততটাই গোলমেলে। তবে ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের একটি প্রবণতা ১৯৬৫ সালে জে. এন. গন্ডা তাঁর *Change and Continuity in Indian Religion*-এ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মূল যুক্তিটিই বই-এর নামে উঠে এসেছে—পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা। ভারতে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, মূর্তি, সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিববর্তনের সঙ্গেও একটি ধারাবাহিকতা থাকে, অবশ্যই 'বহিরাগত' প্রভাবের কথা বাদ দিয়ে। সময়-সমাজের সঙ্গে ধর্মের ক্রমিক পরিবর্তন সামগ্রিকতায় নয়, বরং ধারাবাহিক বিবর্তনের সূত্রে পড়া সম্ভব। গন্ডা উদাহরণ দিচ্ছেন-মহাকাব্যিক যুগের পরে মানুষের কাছে তন্ত্র-ই ছিল বেদ স্থানীয়। তন্ত্র যোগ সাধনা, হিন্দু আচার, মরমিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক সিদ্ধান্তের সংমিশ্রণে বেদের বিকল্পরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। বেদ পরবর্তী সময়ে রামমোহন রায় এবং দয়ানন্দ সরস্বতী-র তত্ত্ব নির্মাণের অংশ হয়ে ওঠে।[১] বঙ্গদেশে গুরুকেন্দ্রিক বিশ্বাস বজ্রযানী বৌদ্ধ, নাথ সাধক, ধর্মপূজক গোষ্ঠী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব অথবা সহজিয়া বৈষ্ণবদের হাতে সময় ও সম্প্রদায়ভেদে প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব এবং অবশ্যই তৎকালীন সমাজ প্রতিবেশ। আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষীয় ধর্ম সাধনার প্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের গুরু সংক্রান্ত বিশ্বাস এবং সামগ্রিকভাবে বঙ্গদেশের ধর্মচর্যায় গুরুবাদের বিবর্তনের ইতিহাসটি বোঝার চেষ্টা করা। আমাদের বর্তমান আলোচনা ব্রিটিশ উপনিবেশ পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও

[১] Gonda, J. N. *Change and Continuity in Indian Religion*. London: Mouton & Co. 1965. 1st Edition. p- 10

গুরুবাদের অস্তিত্ব এবং গুরুকেন্দ্রিক ধর্মজীবন আজও ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। মধ্যযুগের গুরুকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত গুরুবাদের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। পরিবর্তনের সঙ্গে ধারাবাহিকতাই যেহেতু ভারতবর্ষের ধর্ম-সাধনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য— তাই আমরা বৃহত্তর ইতিহাসের অংশ হিসাবেই বর্তমান গবেষণাকে দেখতে চাইব।

সামগ্রিকভাবে দেখলে বাঙালির জীবনে গুরুবাদের হদিস বজ্রযানী চর্যাগীতির সময় থেকেই মিলবে। বজ্রযানে গুরু ছিলেন শিষ্যের সাধনার অভিভাবক, তিনি কেবল তত্ত্বদ্রষ্টা মাত্র ছিলেন না, শিষ্য তাঁর মাধ্যমেই নিজের অভীষ্টে গিয়ে পৌঁছত। তাত্ত্বিকভাবে গুরুতত্ত্ব শব্দব্রহ্মস্বরূপ, মন্ত্রই প্রকৃত গুরুরূপে গ্রাহ্য হয়। তন্ত্রের দৃষ্টিতে গুরু মন্ত্রবিদ্যেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর—এই তিনভাবে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় শিষ্যের শিবত্ব একান্তই গুরুর উপর নির্ভরশীল।[২] সাধনক্রমে গুরুর অপরিসীম অবদান নানা সম্প্রদায় স্বীকার করেছে। তবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কেবল সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। খুব স্বাভাবিক নিয়মে শিষ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক জীবনধারণের সঙ্গেই গুরুরা যুক্ত ছিলেন। গুরুর থেকে মন্ত্র গ্রহণের সূত্রে গুরু কীভাবে শিষ্যের জীবনের অংশ হয়ে উঠতেন তার একটি প্রমাণ পাচ্ছি ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ৭-ই বৈশাখ ইলামবাজার থেকে প্রেরিত নারাণ কৈবর্ত্ত (নিবাস গাজীপুর), শ্রীমান আচার্য্য (নিবাস গাজীপুর), শ্রীকেষব কামীল (নিবাস দক্ষিণপাড়া) এবং শ্রীমুক্তারাম আচার্য্য (নিবাস গাজীপুর) প্রেরিত পত্রে। পত্রে জানা যায় এরা চন্দ্রকোনা মৌজার রামগঞ্জ নিবাসী বৈষ্ণব গুরুর থেকে ভেক গ্রহণ করেছিলেন এবং তাই এদের বার্ষিক আয় থেকে এঁরা গুরুযাজন দিতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকছেন।[৩] গুরুকে বার্ষিক করের মতন করে শিষ্যদের সাম্মানিক অর্থ প্রদান করতে হত এবং গুরু পরম্পরা

---

[২] স্বামী, জগদীশ্বরানন্দ (অনুবাদ ও সম্পাদনা). *পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ.* কলকাতা: স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রকাশিত. ২০০৩. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৮৫-৮৭

[৩] মণ্ডল, পঞ্চানন. *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র* (দ্বিতীয় খন্ড). শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী. ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৩৮

ছিল বংশানুক্রমিক। বংশানুক্রমে দীক্ষা এবং সাম্মানিক প্রদানের প্রক্রিয়া কার্যকর থাকত।[৪] সাধারণভাবে গুরুদের দু'টি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়— তান্ত্রিক গুরু এবং বৈষ্ণব গুরু। এদের মধ্যে তান্ত্রিক গুরুর আচার গুহ্য এবং বৈষ্ণব গুরুর আচার প্রকাশ্য। গুহ্য নিয়ম এবং সাংকেতিক জটিলতার জন্য তান্ত্রিক গুরুদের তুলনায় বৈষ্ণব গুরুদের জনপ্রিয়তা বেশি ছিল। তবে উনিশ শতকে তান্ত্রিক গুরুদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনকালে টাকা করতে পেরেছেন এমন নিম্ন জাতির শিষ্যদের দীক্ষা প্রদান করার প্রবণতার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] সুতরাং উপনিবেশের অর্থনীতি প্রথাগত গুরুবাদে পরিবর্তন আনছিল, ধর্মীয় নিয়মের পরিবর্তন করতে হচ্ছিল যুগ-প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই। বঙ্গদেশে গুরু সম্প্রদায়ের একটি অংশ ছিল শাস্ত্রীয়— যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের একটি বড়ো অংশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পাটবাড়িতে *হরিভক্তিবিলাস* অনুসরণে দীক্ষাদানের এবং নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিধান ১০৪-টি বিধি-নিষেধ কার্যকর ছিল।[৬] এর বাইরেও সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতকে বঙ্গদেশে মূলত গুরুকেন্দ্রিক কয়েকটি ধর্ম সাধনার সূচনা হয়। এই সম্প্রদায়গুলি সহজিয়া বৈষ্ণব নামে পরিচিত। কর্তাভজা, বলরামী, সাঁই, সাহেবধনী প্রভৃতি শাখা সহজিয়া বৈষ্ণবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা সমাজের যে শ্রেণির কাছে যেতে পারতেন না, বা যেতে চাইতেন না সহজিয়ারা তাঁদের বৈষ্ণব দীক্ষা দান করতেন। ফলে কলকাতা শহরের অনেক বেশ্যারা বৈষ্ণব মন্ত্র নিলেন এবং তাঁদের বৈষ্ণব মন্দিরে দানের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[৭] সহজিয়া গুরুরা অবশ্যই ব্রাহ্মণ্য গুরুবাদের একটি বিকল্প নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহিলারাও এই বিকল্পের অংশ ছিলেন। সুতরাং উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে গুরু সংক্রান্ত ভাবনায় শাস্ত্রীয় এবং সহজিয়াদের একটা টানাপোড়েন কার্যকর ছিল। শাস্ত্রীয় ভাবধারা

---

[8] Bhattacharya, Jogendranath. *Hindu Castes and Sects*. Delhi: Kalpaz Publications. 2017. Indian Reprint. p- 28

[৫] তদেব, পৃ. ২৯

[৬] গোস্বামী, কাননবিহারী. *বাঘনাপাড়া- সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য.* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৮. দ্বিতীয় সং. পৃ. ৯৩

[৭] চক্রবর্তী, রমাকান্ত. *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম.* কলকাতা: আনন্দ. ২০০৯. তৃতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১৩৯-১৪০

অবশ্যই সময়ের বিচারে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব বাবাজী বিশ্বম্ভর *রসরাজ গৌরাঙ্গ-স্বভাব* নামে একটি বই লেখেন ১৯১৫ সালের কিছু পূর্বে। গদাধরের সঙ্গে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গতার বিবরণে সমলৈঙ্গিক 'লিপ্সা'-র বিবরণ ছিল এই গ্রন্থে। প্রণম্য বৈষ্ণব তাত্ত্বিক এবং গবেষক বিমানবিহারী মজুমদার-এর এই প্রসঙ্গে মন্তব্যটি ছিল—

> নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ আজও চলিতেছে।... আমি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ঐ পুস্তকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করি, এবং কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের ও তদানীন্তন পাব্লিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর সহায়তায় ঐ ছাপা বইয়ের সমস্ত খণ্ড নষ্ট করাইয়া দেওয়াই।"[৮]

বিমানবিহারী মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ছাত্র, উচ্চবর্ণের মানুষ। তাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি একজন জাতবৈষ্ণবের স্মৃতিচারণ রাখতে চাইছি। জাত বৈষ্ণবেরা নিম্ন জাতের, তাঁদের ধর্মজীবনে ব্রাহ্মণ্য বিধির কার্যকর হয় না। বাড়ির মেয়েরা সাধারণ পূজার কাজ করতেন। আখড়ার মহান্তরা জাত বৈষ্ণবদের সামাজিক অনুষ্ঠানের কাজকর্ম করতেন। ক্রমে শিক্ষিত জাত বৈষ্ণবেরা আখড়ার সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন, সামাজিক পুঁজির জন্য মহান্তরাও তাদের কিছু বলতে পারলেন না। এরপরে তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করছেন অদ্বৈত বংশের। অজিত দাস লিখছেন—

> বাবা বললেন আখড়ার হাত মুক্ত। বলতেও লজ্জা, ভাবতেও কেমন লাগত।
>
> — হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ গুরু হল। মানুষকে বলা যাবে।
> — অদ্বৈত বংশ গো। মহা বৈষ্ণব বংশ। পুণ্যশ্লোক।
>
> মা বললেন— এবার বাড়িতে ব্রাহ্মণ দিয়ে নারায়ণ পুজো দেবো। পাড়ায় লোকে কত রকম পুজো দেয়। বামুন পুরুত এসে পুজো করে। আমাদের নিজেদের পুজো করা! মেয়েমানুষের পুজো করা। ধেৎ![৯]

যদিও অজিত দাস বলছেন প্রথমেই ব্রাহ্মণেরা উঁচু জাতের ভয়ে জাত বৈষ্ণবদের ঘরে পৌরোহিত্য করতে রাজি হয়নি, সময় লেগেছিল। অজিত দাস-এর বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় এই প্রক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঘটছিল। কেনই বা একটি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ আরেকটি

---

[৮] মজুমদার, বিমানবিহারী. *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ২০০৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫৭৫

[৯] দাস, অজিত. *জাতবৈষ্ণব কথা.* কলকাতা: সময়: ২০০৬. দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ. পৃ. ১৭-১৮

মূল স্রোত নষ্ট করে অথবা কেনই বা আখড়ার কথা ভাবতে জাত বৈষ্ণবের লজ্জা হয়? ধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় হয়ে ওঠা বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ব্রত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আসলে ব্রাহ্মণ্যকরণের একটি পরিচিত স্তর।[১০] তবে একটি সমাজের প্রবণতা হিসাবে এই পরিবর্তন অকারণ হতে পারে না। গুরু সংক্রান্ত ধারণায় এই বিবর্তনের একটি অভিমুখ অবশ্যই শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের হাতে। গুরুর থেকে মন্ত্রগ্রহণ একসময়ে প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি কুলগুরুর থেকে মন্ত্রগ্রহণে ক্রমে অসম্মত হতে থাকে। এর একটি কারণ অবশ্যই কুলগুরুদের অত্যাচার, সমাজচ্যুত করার ভয় দেখানো এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব। বিশেষত কলকাতার নতুন বড়োলোক সুবর্ণবণিক, বসাক, তাঁতিদের বাড়িতে এসে কুলগুরুরা রীতিমত হুজ্জুতি চালাতেন। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগৃহে তাঁদের আচরণ ছিল কিছুদূর পর্যন্ত সংযত। বছরে দুই বার এই গুরুদের আগমন হত, যজমানি আদায়ের জন্য; এছাড়া শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদিতে প্রণামী তো ছিলই। এই বর্ণনার শেষে মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন—

> তারপর যখন ইংরাজ রাজত্ব সুরু হইল, কলিকাতা শহরে শিক্ষিত মন অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতে লাগিল, তখন কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়া হইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠিল। অর্থাৎ খৃষ্টান পাদ্রীদের চেষ্টায় ও রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুত্থানে শিক্ষিত লোকের মাঝে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমাদের শৈশবে অধিকাংশ লোকই কুলগুরুর কাছে মন্ত্র লইত এবং অল্প সংখ্যক লোক লইত না। তাহাতে সামান্য নির্যাতন পাইয়াই অব্যাহতি পাইত। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে মন্ত্র না লইলে সমাজচুত হইত।[১১]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ব্যাখ্যায় ইংরেজ শাসন এবং বাঙালির নতুন শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে কুলগুরুদের মতাদর্শগত পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা-দীক্ষার কারণে বাঙালির কাছে গুরুকরণ কেবল একটা শব্দমাত্র হয়ে যাচ্ছে এই কথা পাওয়া যায় রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১ খ্রি.- ১৮৯৯ খ্রি.)-র বক্তৃতায়। বিশেষভাবে রামচন্দ্র দত্ত বলছেন এখন অধিকাংশ শাস্ত্রের অনুবাদ হয়েছে, পাঠক নিজেরাই পড়ে বুঝতে পারছেন, ফলে গুরুর থেকে তাদের আর নতুন কিছু জানার থাকছে না।

---

[১০] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ. *বাংলার ব্রত.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৪০২ বঙ্গাব্দ. পৃ. ২৭-২৮

[১১] দত্ত, মহেন্দ্রনাথ. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা.* কলকাতা: মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি. ১৩৮২ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং. পৃ. ৭৯-৮১

রামচন্দ্র দত্ত আরও বলছেন— অধিকাংশ গুরুরাই শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, মহিলাদের একটি অংশ এখনো গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেও পরে তা আর থাকবে না।[১২] যে দুজনের বক্তব্য আমরা শুনলাম তাদের কেউই কিন্তু 'সেকুলার' ছিলেন না। দুজনেই রামকৃষ্ণ পরমহংস-এর মতাদর্শে বিশ্বাসী। সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি এদের বিরোধিতা ধর্মের প্রতি ছিল না; বরং এরা সকলেই একটি বিকল্প ধর্মপথ এবং গুরু ব্যবস্থার অনুসন্ধান করছিলেন। যদিও আমাদের মনে রাখতে হবে সমসময়ে বা তার আগে গুরুরাই সমাজব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। পারিবারিক সিদ্ধান্ত তাদের পরামর্শেই চালিত হত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী *আমার জীবনকথা*-য় বলছেন—

> একবার আমাদের গুরুঠাকুর এসেছিলেন। তাঁকে বাবামশায় জিজ্ঞেস করেছিলেন কীরকম কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। তিনি বললেন- সাতবছর বয়সে বিয়ে দিলে, অর্থাৎ গৌরীদানে। ঠিক সেই বয়সেই আমার বিয়ে হয়।[১৩]

সুতরাং উনিশ শতকে একটি অংশ যেমন তাদের প্রথাগত গুরু পরম্পরায় বিশ্বাস রাখছিলেন, আরেকটি অংশ নতুন কিছু চাইছিলেন।

গুরুবাদ কেবল ভারতবর্ষে সাধনার অংশমাত্র ছিল না। সামগ্রিক জীবনচর্যার উপর তার প্রভাব পড়ত। অনেক বৈষ্ণব বাড়িতে জেল ছিল, যেখানে শিষ্যদের বিচার করে শাস্তি দেওয়া হত।[১৪] সুতরাং একটি সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা গুরুরা চালাতেন। রাজশাহী জেলার বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে বৈষ্ণবরা গোঁসাইদের বিচার ব্যবস্থাকে স্বীকার করতেন, গোঁসাই-এর পদ পুরুষানুক্রমে চলে, যদি উত্তরাধিকারী না থাকে তবে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হয়। অখাদ্য ভক্ষণ, মদ্যপান, অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি অভিযোগের বিচার করা হয়। প্রথমে সাবধান করা

---

[১২] দত্ত, রামচন্দ্র. *মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ১৪২১ বঙ্গাব্দ. প্রথম পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ১৬৭-১৬৮

[১৩] দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী. *পুরাতনী.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১৭. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ১৫

[১৪] সেন, দীনেশচন্দ্র. *বৃহৎ বঙ্গ* (দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: দে'জ. ২০০৬. তৃতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৭৭০

হয়, তবে অভিযোগ গুরুতর হলে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা অবধি জরিমানা করা হয়।[১৫] গুরুরাই ছিলেন অনেকের কাছে যে কোন সমস্যার শেষ আশ্রয়। কঠিন রোগে আক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ নানা চিকিৎসায় বিফল হয়ে বৈদ্যনাথের থানে 'ধন্না' দিয়ে পাবনার উধুনীয়া গ্রামে কৃষ্ণসুন্দর রায় নামে এক বৈষ্ণব গুরুর সন্ধান পান, এবং তার নির্দেশেই আরোগ্য লাভ করেন।[১৬] বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব দুই ধর্মেই গুরু প্রথার প্রচলন থাকলেও কোন কেন্দ্রীয় নিয়মে এই গুরু পরম্পরাগুলি চালিত হত না। স্থানীয় স্তরে ন্যায় মন্ডলী পরিচালনার ভার সেই এলাকার গুরু বা মহান্তের উপর থাকত। এর ফলে নানা মতের সমাবেশ হয়েছে একই ধর্ম সম্প্রদায়ের অধীনে। নিজস্ব মত প্রচারের এবং সংঘ ভেদের সুযোগ ছিল। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের মধ্যে ছড়িদার প্রথার চল ছিল। প্রত্যেক গোস্বামীর অধীনে ছড়িদার থাকতেন এবং গুরুর হুকুমে শিষ্যদের ডেকে আনতেন।[১৭] চৈতন্যদেব নিজে জাতিবর্ণ প্রথার বিরোধিতা না করলেও পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবধর্ম একটি পৃথক জাতের জন্ম দেয় যাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য জাতিবর্ণ প্রথার নিয়ম কাজ করত না। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থরা এই সকল নিয়ম গ্রহণ করেন নি, তবে তারা বৈষ্ণব গুরুদের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং নিজদের বর্ণাশ্রমের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান মেনে চলতেন।[১৮] প্রসঙ্গত বলা দরকার গুরুস্থান গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে মূলত ব্রাহ্মণদেরই হাতে ছিল। আর রাঢ়ী এবং বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের অনেক সময়েই দীক্ষা দান করতেন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা।[১৯] উনিশ শতকের শেষ অবধি অধিকাংশ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা মূলত ব্রাহ্মণ বর্ণের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পেশা গুলির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন, ফলে এদের সামাজিক মর্যাদা

---

[১৫] O'Malley, L.S.S. *Bengal District Gazetteers: Rajshahi*. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. 1916. 1st Edition. p. 58

[১৬] হরিদাস, দাস. *শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪৯২

[১৭] দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ. *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব.* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৭ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৬৩-৬৪

[১৮] Pal, Bipin Chandra. *Bengal Vaishnavism*. Kolkata: Modern Book Agency. 1933. [ ]. p. 122-123

[১৯] Dutt, N. K. *Origin and Growth of caste in India*. Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1986. 1st Combined Reprint. pp. 232-233

অন্য ব্রাহ্মণদের থেকে বেশি ছিল। সামাজিক প্রক্রিয়ায় গুরুদের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জাতিবর্ণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত থেকে। অবশ্যই তথাকথিত মূল স্রোতের গুরুদের কেউই জাতিবর্ণ প্রথা উচ্ছেদ করার কথা ভাবতেন না, কিন্তু গুরুদের মাধ্যমেই জাতিকাঠামোয় সামাজিক সচলতার সূচনা হয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নিত্যানন্দের শিষ্য উদ্ধারণ দত্তের কথা, নিত্যানন্দের সময় থেকেই সুবর্ণবণিকরা নিত্যানন্দ পরিবারের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে জাতে ওঠে।[২০] অবশ্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উদ্ধারণ দত্ত-কে ভক্ত শ্রেষ্ঠদের মধ্যে স্বীকার করেছিলেন, তা সত্ত্বেও মূলত অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গেই এই দীক্ষাদানের বৃত্তান্তগুলি জড়িত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দির নির্মাণ ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতাদানের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক অবস্থানে উন্নতি করার চেষ্টা দেখা যায় চাষী কৈবর্ত এবং সদ্‌গোপদের মধ্যে।[২১] *ভক্তিরত্নাকর*-এর পঞ্চদশ তরঙ্গে শ্যামানন্দের গোপীবল্লভপুর এবং ধারেন্দা গ্রামে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের তথ্য পাওয়া যায়।[২২] গোপীবল্লভপুরের সদ্‌গোপেরা স্থানীয় পাটবাড়িতে ভূমিদান করতেন এবং বৈষ্ণব সমাজে সামাজিক মর্যাদা অর্জনে সাফল্য লাভ করেন।[২৩] সুতরাং ধনী যজমানের পক্ষে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং গুরুদের সূত্রে সামাজিক মর্যাদা লাভের একটি পদ্ধতি প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। এই অঞ্চলে শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ সম্প্রদায়ের পাটবাড়ি সপ্তদশ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতেন। নবাবী আমলে এবং পরে ব্রিটিশ রাজত্ব কালে এই পাটবাড়ির মহান্তরা শাসকদের থেকে বিশেষ সম্মান পেতেন। তাদের শিষ্যদের মধ্যে সমস্যার সূচনা হলে এই মহন্তরাই মধ্যস্থতার কাজ করতেন, রাজা বা জমিদার সকলেই

[২০] লালমোহন, ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি. *সম্বন্ধনির্ণয়.* কলকাতা: শশিভূষণ ভট্টাচার্য প্রকাশিত. ১৩৩০ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং. পৃ. ৩৪৮

[২১] Sanyal, Hiteshranjan. *Social Mobility in Bengal*. Calcutta: Papyrus. 1981. 1st Edition. p. 75

[২২] রাসবিহারী, সাংখ্যতীর্থ (সংশোধিত). *ভক্তিরত্নাকর.* মুর্শিদাবাদ: রামদেব মিশ্র প্রকাশিত. ৪২৬ চৈতন্যাব্দ. পৃ. ১০৫৭-৫৮

[২৩] Das, Bishnupada. *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South-Western Frontier Bengal since Introduction of Neo-Vaishnavism*. Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1996. pp. 108-109

তাদের ব্যবস্থা স্বীকার করতেন।[২৪] বিংশ শতাব্দীর শুরুতে (১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দ) নেপালে গোর্খারাজগুরুদের মাধ্যমেই বর্ণসম্বন্ধীয় বিবাদের সমাধান করার কথা পাচ্ছি।[২৫] খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে উনিশ শতকে কলকাতার শিক্ষিত, উচ্চবর্ণের মানুষের একাংশে যখন গুরুদের প্রসঙ্গে একটি নঞর্থক মনোভাবের জন্ম হছে তখনো অবধি ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে গুরুরা ছিলেন।

ব্রিটিশ শাসকেরা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ভারতবর্ষের ধর্মব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে উপনিবশের স্বার্থের সঙ্গে ভারতবর্ষের গুরুবাদের সংঘাত অনিবার্যই ছিল। এর মূল কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত, পাশাপাশি শাসন সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে বিরোধ। তাছাড়াও পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির নিরিখে ভারতের গুরুবাদ, পৌরোহিত্য এবং ধর্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা নিয়ে তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে সবসময় প্রসন্নতা ছিল না। টডের প্রসিদ্ধ রাজস্থান বিবরণে (প্রথম প্রকাশ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ) মেওয়ার রাজাদের গুরু ভক্তি-কে যথেষ্ট শ্লেষের চোখে দেখা হয়েছে। ইউরোপের 'অন্ধকার যুগ'-এ সন্ন্যাসীদের আচরণের সঙ্গে রাজগুরুদের তুলনা করা হচ্ছে।[২৬] বিপরীত উদাহরণ অবশ্যই রয়ছে। উনিশ শতকে যে সকল পাশ্চাত্যের প্রাচ্যধর্ম অনুরাগী ও ধর্ম অনুসারীদের নাম উল্লেখ্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্যার জন উডরফ (১৮৬৫-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে কুমারখালির বিখ্যাত তন্ত্রতাত্ত্বিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-এর সাক্ষাৎ হয়। জন উডরফ সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯১৩ সাল থেকে আর্থার আভলন নামে তাঁর তন্ত্র বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে।[২৭]

---

[২৪] তদেব, পৃ. ৮০

[২৫] মিশ্র, সুবিমল (সম্পা.). *নেপালে বঙ্গনারী ও তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর-* হেমলতা সরকার. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং. পৃ. ২৩

[২৬] James, Tod. *Annals and Antiquities of Rajas'than*. London: Routhledge & Kegan Paul Limited. 1960. Reprint. p. 407

[২৭] Taylor, Kathleen. *Sir John Woodroffe, Tantra and Bengal 'An Indian Soul in a European Body'?*. London: RoutledgeCurzon. 2006. Reprint. p. 15

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁর প্রখ্যাত *তন্ত্রতত্ত্ব*-এ ‘গুরুগিরি’ নামে একটি উপ-অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, তন্ত্রের নামে তৎকালে কীভাবে গুরুগিরি একটি লাভজনক পেশা হয়ে উঠেছিল, কীভাবে দিনে রাতে গুরুদের আবির্ভাব হচ্ছিল এবং নতুন নতুন গল্পকথার সূচনা হচ্ছিল। শিবচন্দ্র লিখছেন—

> ভারতের রাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-বিপ্লবের সৃষ্টি। গুরুগিরি শব্দের অর্থ গুরুত্ব ব্যবসায় বা গুরুত্ব-উপজীবিকা। অর্থ উপার্জ্জনের যে সকল পথ আছে তাহাদের মধ্যে গুরুগিরি ব্যবসায় আজকাল একটি প্রধান ও প্রশস্ত পথ।[২৮]

শিবচন্দ্রের আলোচনা থেকে আমাদের আছে স্পষ্ট প্রথানুগ ধর্মতাত্ত্বিকদের এক অংশের কাছে ভারতের মানচিত্রে গজিয়ে ওঠা নতুন গুরুদের প্রতি একটি ব্যঙ্গ ছিল। তবে কীভাবে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় গুরুগিরি একটি পেশা হয়ে উঠল তা সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনার বিষয়। আবার ‘বিদেশি’ এবং ‘আধা-বিদেশি’ উডরফ এবং আনন্দকুমারস্বামী-কে তন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের আরেক বিচারক এবং তন্ত্রসাধক সমরেন্দ্রনাথ বাগচী শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-কেও যথেষ্ট আক্রমণ করেছিলেন।[২৯] তবে এটুকু স্পষ্ট শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এই উঠতি গুরুদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে শিবচন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর কাছে তন্ত্রের ‘প্রকৃত’ অর্থের উন্মোচন। এই প্রকল্পে তাঁকে জন উডরফ সাহায্য করেন এবং *তন্ত্রতত্ত্ব* নামক গ্রন্থটির সারানুবাদ করেন। শিবচন্দ্রের প্রচেষ্টা থেকে আমরা বুঝতে পারি তৎকালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাধ্যমে শক্তিতত্ত্বের যে জনপ্রিয় রূপকল্পটি—মা ও তার সন্তান (আরাধ্য দেবতা এবং ভক্তের সম্পর্ক) নির্মিত হয়েছিল, তার বিপ্রতীপে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন তন্ত্রের অদ্বয় ভাবের ধারণাটি। সুতরাং শিবচন্দ্র এবং তাঁর শিষ্য জন উডরফ একটি পৃথক প্রকল্পের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-এর মত নির্দিষ্ট ধর্মীয়

---

[২৮] শিবচন্দ্র, বিদ্যার্ণব. *তন্ত্রতত্ত্ব*. কলকাতা: নবভারত পাবলিকেশন. ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

[২৯] Taylor, Kathleen. *Sir John Woodroffe, Tantra and Bengal ‘An Indian Soul in a European Body’?*. London: RoutledgeCurzon. 2006. Reprint. p. 100

প্রকল্পে চালিত নন এমন জনপরিসরেও গুরুদের নিয়ে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার নতুন শিক্ষা দীক্ষায় প্রাচীন নিয়ম-কানুন এবং রীতি-নীতির বিরুদ্ধে একধরনের মনোভাব উঠে আসছিল। ঈশ্বর গুপ্ত-এর *পারমার্থিক ও নৈতিক*-এ 'গুরু' শীর্ষক পদ্যাংশটি উদ্ধার করা যাক-

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়।।
গুণে গুরু লঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারিতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু।।
শিষ্যের সম্পদ ছলে, যে করে গ্রহণ।
গুরু ব'লে কিসে তারে, করিব বরণ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরু বোধে গুরু ব'লে পূজা করি তারে।।[৩০]

গুরুদের অর্থলোভের প্রতি শ্লেষ থাকলেও নিশ্চয় খেয়াল করতে হয় ধারণা হিসাবে গুরু-কে স্বীকার করতে কবির অসুবিধা হচ্ছে না। *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (প্রথম প্রকাশ সম্ভবত ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে, জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে)-'বুজরুকী' নামক অধ্যায়ে সিমলে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর কথা পাচ্ছি যিনি সোনা তৈরি করতে পারেন এবং গঙ্গাতীরে একটি পচা মরা-কে পারা ভস্ম খাইয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন, এঁনার বুজরুকি ধরেছিলেন কায়স্থ মুখুটী কুলীন হরিভদ্দর খুড়ো। হুতোম বলবেন—

> আজ্ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্‌কাতার সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই, না আসেন, এমন দেবতাই নাই, সুতরাং কখন কখন "সোণা করা" "নিরাহার" "ভূত নাবানো" "চণ্ডূ সিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক দ্যাখান্, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।[৩১]

---

[৩০] গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র. *ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী.* কলকাতা: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. [ ]. [ ]. পৃ. ০৭

[৩১] নাগ, অরুণ. *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা.* কলকাতা: আনন্দ. ২০০৮. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১১৪

কলকাতার নতুন সাংস্কৃতিক পরিসরে তাই পরম্পরাগত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। কেবলমাত্র হুতোমের মত সজাগ এবং অনুভূতিশীল লেখক নন, জনপ্রিয় লেখাপত্রেও গুরুদের প্রতি শ্লেষ ধরা পড়েছে। তারকেশ্বরের এলোকেশী-মহান্ত ঘটনা নিয়ে বটতলা থেকে রাশি রাশি বই ছাপা হয় এবং কালীঘাটের শিল্পীদের ছবিতেও এই ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি।[৩২] অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি গুরুবাদের একটি নির্দিষ্ট ধরনের প্রতি আপত্তি থাকলেও নব্যশিক্ষিত বাঙালি যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতির প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাসকে ত্যাগ করছে না। প্যারীচাঁদ মিত্র মেয়েদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিকা (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) নামে যে শিক্ষামূলক 'নভেল'-এর ভূমিকায় গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপ করেছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি ছিল—

Direction for the development of the soul by pure meditation and Yoga culture.[৩৩]

এবার দেখা যাক বঙ্কিমচন্দ্র-এর *ধর্ম্মতত্ত্ব* (পুস্তকাকারে প্রথম ভাগ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত)-এ গুরু-শিষ্যের কথোপকথন। বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম প্রকাশিত হচ্ছে গুরু-শিষ্যের সংলাপে। গুরু এখানে কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে পারঙ্গম নন, পাশ্চাত্য দর্শনও তার করায়ত্ত। এখানে গুরু নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নন, তাঁর শিক্ষা জীবনদর্শনের। মনে রাখতে হবে অনুশীলনধর্মের শিক্ষাকে বঙ্কিম নতুন শিক্ষা মনে করছন না—

> আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড়ো অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব?[৩৪]

গুরু প্রসঙ্গে বঙ্কিম *ধর্মতত্ত্ব*-এর 'শারীরিকী' বৃত্তি অধ্যায়ে বলছেন—

---

[৩২] শ্রীপান্থ. *বটতলা.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১০. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ২৬

[৩৩] রায়, অলোক (সম্পাদিত). *প্যারীচাঁদ মিত্র রচনাবলী.* কলকাতা: সোপান. ২০১৮. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৩৯৬

[৩৪] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বঙ্কিম রচনাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৫৯৫

কেবল শৈশব কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আজ গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না।[৩৫]

'মনুষ্যে ভক্তি' অধ্যায়ে বলছেন—

গুরু ভিন্ন মনুষের মনুষ্যত্বই অসম্ভব, ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনাকালে বুঝাইয়াছি।[৩৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুর ধারণায় কেবল ব্রাহ্মণ স্থান পায়নি। তিনি বলছেন ব্রাহ্মণেরা ছিলেন ভারতবর্ষের সমাজ শিক্ষক; তবে ব্রাহ্মণকে কে তিনি জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়, গুণগত অর্জন হিসাবেই তত্ত্বায়িত করছেন। শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট জানাচ্ছেন অর্থলোভী, স্বার্থপর ব্রাহ্মণ, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান যাদের কাছে ব্যবসা তাঁরা কখনো গুরু নন। তবে ধর্ম বিষয়ক বঙ্কিমের ধারণা ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে। মিলের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিম পরে পাশ্চাত্যের সাম্যের তত্ত্ব-কে খারিজ করছেন।[৩৭] বঙ্কিমের *ধর্মতত্ত্ব* হিন্দু ধর্মের একটি 'জঞ্জাল' বর্জিত আদর্শকে ধরতে চায়, যেখানে গুরুর একটি নতুনরূপের প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকের চিন্তা-চেতনায় বহুস্বরের অস্তিত্বই তাকে পূর্ববর্তী সময়ের থেকে বিশিষ্ট চারিত্র দিয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। ভূদেব তাঁর *বিবিধ প্রবন্ধ* (দ্বিতীয় ভাগ)-এর 'সমাজের কথা' অধ্যায়ে 'পারিবারিক নীতি' (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) শীর্ষক রচনায় বলছেন—

ইংরেজ সমাগমে আমাদের অত্যুচ্চ ধর্ম্মনীতির উপর আঘাত হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট অধিকারী কখনও অপকৃষ্ট অধিকারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে পারে না।[৩৮]

তন্ত্র এবং তান্ত্রিক গুরু বিষয়ে ভূদেব মুখোপাধায়-এর মন্তব্য প্রাচীন মতের অনুগ ছিল। পুরুষানুক্রমে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং পূর্ণাভিষেকে কৌল গুরুর

---

[৩৫] তদেব, পৃ. ৬০৭-৬০৮

[৩৬] তদেব, পৃ. ৬১৬

[৩৭] দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র.* কলকাতা: কনকেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশিত. ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২২-২৩

[৩৮] সান্যাল, মনস্বিতা (সম্পাদিত). *প্রবন্ধ সমগ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়.* কলকাতা: চর্চাপদ. ২০১০. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫৪২

উপস্থিতির প্রয়োজন স্বীকার করেছিলেন।[৩৯] ভূদেব-এর রাজা 'রামমোহন রায় এবং তন্ত্রশাস্ত্র' (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়নি[৪০], যদিও প্রবন্ধের মূল যুক্তিটি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায়ের *মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*-এ পাওয়া যাচ্ছে) প্রবন্ধের বক্তব্য ব্রাহ্মধর্মের মূল সিদ্ধান্তগুলি রামমোহন তন্ত্রের থেকেই নিয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার *মহানির্বাণ তন্ত্র*-এর পদ্ধতি নিয়েই রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি তৈরি করেছিলেন এই মতের মূল কারণ ভূদেব রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-কে স্বীকার করছেন, কিন্তু রামমোহন রায়-এর ধর্মকে তিনি ভারতের ধর্মবিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই দেখার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রসঙ্গত ব্রাহ্মধর্মের প্রেক্ষাপট বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। কলকাতা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মূলত উচ্চবর্ণ তথা পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত উচ্চ এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে রামমোহন রায়-এর ব্রাহ্ম ধর্ম বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজে বিভিন্ন ফাটলের জন্ম হলেও কলকাতায় নির্দিষ্ট বর্ণ ও বিত্ত পরিসরে ব্রাহ্মধর্ম তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছিল। রামমোহন রায়-এর গুরু সংক্রান্ত মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে *গোস্বামীর সহিত বিচার* পুস্তিকায়। মূল তর্ক ছিল বেদার্থ নিয়ে। পূর্বপক্ষের দাবি বেদের অর্থ মুনি তথা গুরুদের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে হয়, সাধারণ ভাবে বেদার্থ হয় না, একারণেই পুরাণ ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়। রামমোহন তখন প্রত্যুত্তরে বলবেন নানা মুনি ও ঋষি বচনে স্ববিরোধ থাকায় সরাসরি উপনিষদের অর্থগ্রহণই উপযুক্ত।[৪১] সুতরাং ধর্ম তথা শাস্ত্র ব্যাখ্যার যে ঘরানা গুরুদের মাধ্যমে প্রথার রূপ নিচ্ছে রামমোহন তাকে অস্বীকার করছেন। আমরা আগেই রামচন্দ্র দত্ত-এর বক্তৃতায় মুদ্রিত গ্রন্থ কীভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার স্থান গ্রহণ করে তা দেখেছিলাম। রামমোহনের ক্ষেত্রেও

---

[৩৯] তদেব, পৃ. ৫৯০

[৪০] তদেব, পৃ. ৬৩৮

[৪১] রায়, রামমোহন. *রামমোহন গ্রন্থাবলী.* কলকাতা: উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৯৩-৯৪

দেখছি তিনি উপনিষদের অনুবাদ ও সংকলন করছেন। অতএব শাস্ত্রার্থ ও সাধারণ শ্রোতার মধ্যস্থতাকারী গুরুদের প্রতি আপত্তিটা রামমোহনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দার্শনিক ভাবে রামমোহন মনে করছেন আত্মা এবং পরমাত্মা স্বরূপত অভেদ, তাই ব্যক্তি ও ঈশ্বরের মাঝে কোন গুরু অথবা অবতারের প্রয়োজন নেই।[৪২] মনে রাখতে হবে রামমোহনের ধর্মে শেষ অবধি উপনিষদের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করা হয়েছে। আঠারো বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশের জন্য একটি দীক্ষানুষ্ঠান হত, একজন আচার্যই দীক্ষা দিতেন। অর্থাৎ দীক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুস্থানীয় কোন একজনের প্রাধান্য স্বীকার করা হচ্ছে। ব্রাহ্মদের ধর্মীয় আদর্শ যে কখনই প্রথাসিদ্ধ গুরুর ধারণাকে স্বীকার করে না তার প্রমাণ মিলবে ব্রাহ্মদীক্ষার সময় পঠিত শপথের থেকে—

Worship God every day with reverence, have communion on him, consecrete your life to him and do his will. Seek his guidance in every concern of your life. In your reverence for the teachers and books of your own and other churches, be ever careful that they do not take the place of the direct revelation of truth in your sour by the inspiration of the Divine spirit.[৪৩]

অতএব ব্রাহ্ম আদর্শে গুরু তত্ত্বত গৌণ। তবে সাধারণের মধ্যে এই উচ্চ ভাবনার প্রবেশ নিশ্চয়ই সুদৃঢ় হয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে ব্রাহ্মধর্মেও গুরুর প্রয়োজন হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসু-র বক্তৃতায় জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলছেন

—

> এতদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রথম প্রচারকালে জ্ঞানের প্রতি অধিক ভর দেওয়া হইত। ক্রমে সমাজে প্রীতি ও ভক্তি-ভাবের সঞ্চার হতে লাগিল। এক্ষণে সেই প্রীতি ও ভক্তিভাব অসংবেগ ধারণ করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মকে গুরুপূজায় উত্তীর্ণ করাইবার সন্দেহ মনে উদ্রেক করিতেছে।[88]

---

[৪২] ত্রিপাঠী, অমলেশ. *ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালির সংস্কৃতি.* কলকাতা: আনন্দ. ২০০৯. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ৫৩

[৪৩] Sitanath, Tattvabhusan. *A Manual of the Brahma Rituals & Devotions*. Kolkata: Sadharan Brahmo Samaj. 2004. 3rd Edition. p. 36

[88] বসু, রাজনারায়ণ. *একমেবাদ্বিতীয়ম্.* কলকাতা: কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি প্রকাশিত. ১৭৯২ শকাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩৭

অতএব ব্রাহ্মদের মধ্যেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গুরুকেন্দ্রিক একটি চাপ তৈরি হচ্ছিল। পরে কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে নতুন মতাদর্শ তৈরি করার চেষ্টা করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত 'শিষ্য-প্রকৃতি' শীর্ষক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র সেন গুরু বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেন। নির্দিষ্ট কোন একজন কে নয়, কিন্তু সার্বিকভাবে তিনি গুরু-র ধারণাকে স্বীকার করছেন।[৪৫] পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে অবতারের ধারণাকেও কেশবচন্দ্র সেন স্বীকার করছেন। অবশ্যই তাঁর নিজস্ব অর্থে সক্রেটিস, খ্রিস্ট, মোহম্মদ, চৈতন্য সকলেই অবতার। 'চৈতন্য-সমাগম' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন—

> পৃথিবী প্রণাম করিয়া বলিল এবার আমার দুঃখভার মোচন করিবার জন্য তুমি আসিয়াছ।[৪৬]

কেশবচন্দ্র সেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতে এবং পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং গুরুবাদের দিকে একটি ঝোঁক তাঁর তৈরি হয়েছিল। তবে চৈতন্যদেবের ধর্মমত উনিশ শতকের কলকাতায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে শিশিরকুমার ঘোষ-এর নব গৌরাঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে (১৮৯০-১৯০১ খ্রিস্টাব্দ)। কেশবচন্দ্র সেন-এর মতই শিশিরকুমার ঘোষ প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নেন এবং ১৯০১ সালে 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করে সংগঠিত বৈষ্ণব ভাব আন্দোলনের সূচনা করেন।[৪৭] ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ এবং ধর্ম প্রচারের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ অবশ্যই প্রসিদ্ধ গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দান করতেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কুলগুরুদের থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের দীক্ষা দান করলেও পরে জানতে পেরে শিষ্যদের কুলগুরুর সাধনমতই গ্রহণ করার উপদেশ দিতেন। ১৮৯৩ খিষ্টাব্দে বর্ধমানের অন্তঃপাতী গ্রামের

---

[৪৫] সেন, কেশবচন্দ্র. *জীবনবেদ.* কলকাতা: নববিধান পাবলিকেশন্ কমিটি. [ ]. [ ]. পৃ. ১১৬-১২৪

[৪৬] সেন, কেশবচন্দ্র. *সাধু-সমাগম.* কলিকাতা: ব্রাহ্ম ট্রাস্ট সোসাইটি. ১৮০৯ শকাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৭৩

[৪৭] গিরি, সত্যবতী (সম্পাদিত). *বিভাগীয় পত্রিকা* (চতুর্থ সংখ্যা). বাংলা বিভাগ- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮৯-৯০. পৃ. ২৫-৩১

সামন্তদের দীক্ষা দানের পরে তাদের কুলগুরু আছেন শুনে তিনি দীক্ষা প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৮] সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দীক্ষা প্রসঙ্গে পরম্পরাগত মতকেই মেনে চলতেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে গিরিশ ঘোষের *চৈতন্যলীলা* নাটকটি কলকাতার দর্শকদের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবাদর্শের প্রসার করতে বিশেষভাবে সফল হয়েছিল। *নিত্যানন্দ বিলাস* নামেও গিরিশ ঘোষ একটি নাটক লিখেছিলেন। ১৯০১ সালে গিরিশ ঘোষ 'রঙ্গালয়' পত্রিকায় 'ধর্ম্ম-স্থাপক ও ধর্মযাজক' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ধর্মযাজক গুরুরা কীভাবে শিষ্যের বিত্ত-হরণ করে, গুরুপ্রসাদী প্রক্রিয়ায় ব্যভিচার করে এবং নতুন ধর্ম-স্থাপকের বিরোধিতা করে তার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে।[৪৯] কবীর এবং রুইদাসের কথা উল্লেখ করে জাতিবর্ণ যে প্রকৃতগুরুর ক্ষেত্রে কোন বাধা নয় তারও উল্লেখ করেন গিরিশ ঘোষ। সুতরাং আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট উনিশ শতকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-র মত ব্যতিক্রম বাদ দিলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিদের ভারতবর্ষের গুরুবাদ বিষয়ে বিভিন্ন আপত্তি ছিল। এদের মধ্যে ব্রাহ্মরা আচার্যকে স্বীকার করছেন, কিন্তু তিনি গুরু নন। এছাড়া সকলেই ভারতের গুরু পরম্পরাকে স্বীকার করলেও গুরুদের মধ্যে একধরণের পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। একটু খুঁটিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব এদের অধিকাংশেরই আপত্তি ছিল প্রথাগত গুরুসর্বস্বতার বিরুদ্ধে। আমরা দেখেছিলাম ব্রিটিশ উপনিবেশ পূর্ববর্তী ভারতীয় জীবনচর্যায় গুরুরা কেবল ধর্মের সঙ্গে নয়, সামগ্রিক জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। উনিশ শতকে শহুরে শিক্ষিত বাঙালির একাংশের কেবল 'তাপ-অপহারক' গুরুর ছত্রছায়াটুকুই দরকার ছিল, গুরুকেন্দ্রিক সামগ্রিক যাপনটা নয়।

গুরু ধারণায় এই পরিবর্তন একদিনে আসেনি। বলা ভালো ব্রিটিশ উপনিবেশের শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন সব কিছুরই ফলাফল এই ভাববিশ্বের পরিবর্তন। আমরা

---

[৪৮] কুলদানন্দ, ব্রহ্মচারী. *শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ.* পুরী: বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ. তৃতীয় সংস্করণ. পৃ. ১৩৭

[৪৯] ঘোষ, গিরিশচন্দ্র. *গিরিশ-গ্রন্থাবলী* (অষ্টম ভাগ). কলকাতা: সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রকাশিত. ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৯২

কয়েকটি সম্ভাব্য দিকের কথা আলোচনা করব। উপনিবেশের প্রথম যে পদক্ষেপ ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর গোড়া ধরে টান মেরেছিল তা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সূচিত হলেও ১৭৬৫ থেকেই তার গোড়াপত্তনের শুরু হয়। কোম্পানির হাতে ভারতের কৃষি-অর্থনীতির মৌল চরিত্রটি নষ্ট হয়। জীবিকার পরিবর্তন আসে, গ্রাম সমাজের নিচুতলার চাষি জমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়।[৫০] ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক তথাকথিত নিচুজাত সদ্‌গোপেরা যখন জমিদারির অধিকারী হলেন বা বসাকেরা ব্যবসার সূত্রে টাকা করলেন তখন তাঁদের মধ্যে গুরুভক্তির একটা প্রাবল্য এসেছিল স্বাভাবিক নিয়মেই। মহেন্দ্রনাথ দত্ত-এর বর্ণনায় আমরা আগেই তা দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ-এর *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে কলকাতার প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণবণিক পরিবারের সন্তান শচীশের পিতা হরিমোহনের বৃত্তান্তে দেব-দ্বিজে অতিভক্তির বর্ণনাও এই নতুন বড়োলোকদেরই নমুনা মাত্র।[৫১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে যেমন একশ্রেণির লোকের হাতে টাকা এসেছিল, তেমনই একটি শ্রেণি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বা পারিবারিক পেশা থেকে চ্যুত হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের একটি গ্রাম সমীক্ষা ভিত্তিক গবেষণায় দেখা যায় ৪১-টি ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে মাত্র তিনটি ব্রাহ্মণ পরিবার যজমানি এবং শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও গ্রামে অবৈতনিক সরকারী বিদ্যালয়ে নিম্ন জাতির শিক্ষকেরা পড়িয়ে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করায় ব্রাহ্মণদের কাছে পড়তে আসার সংখ্যাও কমে গেছে।[৫২]

এবার সরাসরি ব্রিটিশ মতাদর্শের সঙ্গে ভারতবর্ষের ধর্ম এবং গুরু সংক্রান্ত ধারণার বিরোধিতার প্রেক্ষিত এবং কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করা যাক। ভারতের ধর্ম সংস্কৃতিতে ‘গুরুমুখী’ সাধন

---

[৫০] গুহ, রণজিৎ. *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত.* কলকাতা: তালপাতা. ২০১৯. তৃতীয় মুদ্রণ. পৃ. ২৫

[৫১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *চতুরঙ্গ.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩১০ বঙ্গাব্দ. পুনর্‌মুদ্রণ. পৃ. ১২-১৩

[৫২] Wiser, W. H. *The Hindu Jajmani System*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. 1988. 3rd Edition. pp. 88-89

পরম্পরার মধ্যে অন্যতম হল তন্ত্র। সুতরাং উপনিবেশের শাসকদের গুরু সংক্রান্ত মানসিকতা বোঝার জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে তন্ত্র বিষয়ক উপনিবেশের ভাবনা।[৫৩] প্রথমেই মনে রাখতে হবে তন্ত্র বিষয়ে উপনিবেশের অবস্থানের মধ্যে নানা পরিবর্তন এসেছে। ভারতবর্ষের ধর্ম প্রথম থেকেই ইউরোপের ভাবনাবিশ্বে আকর্ষণের উপাদান। তবে ইউরোপীয়রা প্রথমেই তন্ত্রকে একটি আলাদা সাধন-পদ্ধতি হিসাবে চিনতে পারেনি। যদিও ব্রিটিশ উপনিবেশের পূর্বে যাঁরা পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন, যেমন মার্কো পোলো (ভ্রমণকাল ১২৭১-১২৯৫ খ্রিস্টাব্দ), তাঁদের বর্ণনায় যোগী এবং যোগীদের রসায়ন বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া গেলেও তন্ত্র বিষয়ে বিশেষ কোন মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোনস (প্রবন্ধ 'On the Literature of Hindus', ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ) এবং তাঁর সহকারী কোলব্রুক-এর লেখায় তন্ত্রের দেবতা ও শাস্ত্রের উল্লেখ মিললেও আলাদা কোন বিশেষ ঝোঁক ছিল না। যদিও ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কোলব্রুক ('On the Religious Ceremonies of the Hindus') মধ্যে তন্ত্র-কে 'worse source' বলছেন। ফরাসী মিশনারি আবে দুবোয়া-র আলোচনায় (*Hindu Manners, Customs, and Ceremonies*, ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ) তন্ত্র সম্বন্ধে নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। দুবোয়া-র মূল আপত্তি ছিল তান্ত্রিক অভিচারে নর-নারীর অবাধ যৌন মিলন এবং যৌথ যৌন সম্মিলন (orgy) নিয়ে। একটু পরে ব্যাপটিস্ট ব্রিটিশ মিশনারি রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড-এর লেখায় (*A view of the History, Literature, and Religion of the Hindoos*, Vol-2, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ) তন্ত্রকে সব থেকে অপরিণত, অশুচি, অপবিত্র বলতে দেখছি। বিশেষত চক্রসাধনায় অখাদ্য ভক্ষণ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যৌন মিলন ইত্যাদি ছিল মূল আপত্তির কারণ। এরপরে পেশায় চিকিৎসক এবং

[৫৩] ব্রিটিশ উপনিবেশের তন্ত্র বিষয়ক মনোভাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য Urban, Hugh B. *Tantra Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion*. London: University of California Press. 2003. 1st Edition. pp. 46-55 থেকে গৃহীত। ব্যতিক্রম হলে আলাদা তথ্য নির্দেশ করা হয়েছে।

ভারততত্ত্ব বিশারদ ব্রিটিশ গবেষক এইচ. এইচ. উইলসন (*Religious Sects of Hindus*, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) সব রকম তন্ত্র-কে একটিই সাধারণ শ্রেণিতে ফেলতে চান এবং তন্ত্রের সাধনাকে অর্থহীন বলে আখ্যা দেন। প্রখ্যাত ভারততাত্ত্বিক মনিয়র উইলিয়ামস (*Hinduism*, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) তন্ত্রকে শাক্ত সাধনার সঙ্গে এক করে দেখতেন এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যযুগীয় বিবর্তনের সবথেকে জঘন্য পর্যায় বলে মনে করতেন। স্কটিশ মিশনারি জে. মারে মিশেল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *The Great Religions of India*- গ্রন্থে বলছেন—

> So far as I know, none of these books (তন্ত্রশাস্ত্র) has been translated into a European language, and probably none ever will be. To a European mind the grossness is utterly disgusting, and to many Hindus it is the same.[৫৪]

জেমস হেস্টিংস-এর *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (প্রথম প্রকাশ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর দ্বিতীয় খন্ডে 'ভক্তি-মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় বৈষ্ণবদের গুরু সংক্রান্ত মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেস্টিংসের সংকলনে গুরুবাদ-কে হিন্দুধর্মের অবক্ষয়ের অংশ হিসাবেই দেখেছিলেন এবং গুরুভক্তিতে হিন্দুদের অতিরেক-ই ছিল তাঁর মূল আলোচ্য। প্রসঙ্গত তিনি কবীর মতের গুরু নির্বাচনের সাবধানতা এবং বল্লভাচার্য সম্প্রদায়-এর গুরুর প্রতি দেহ, মন সম্প্রদান ইত্যাদিকে গুরুভক্তির অতিরেক হিসাবেই দেখেছিলেন।[৫৫] অতএব তন্ত্র তথা গুরুবাদ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা অনেকদিন অবধি যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল। যদিও মনে রাখতে হবে এই সকল ভারততাত্ত্বিকেরা কিন্তু বেদ এবং উপনিষদের দর্শন এবং ভাবধারা নিয়ে যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। সুতরাং উপনিবেশের চোখে ভারতীয় ধর্মের একদিকে ছিল 'সংস্কৃত' ও 'শিষ্ট' বৈদিক পরম্পরা অন্যদিকে ছিল 'অসভ্য' এবং 'অশ্লীল' তন্ত্র সাধনা। এই দ্বিকোটিক অবস্থানটি সে সময়ের

---

[৫৪] Mitchell, John Murray. *The Great Religions of India*. London: Oliphant, Anderson & Ferrier. 1905. 1st Edition. pp. 93-94

[৫৫] Hastings, James. *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (Vol-II). Edinburg: T & T Clark. 1910. 1st Edition. pp. 546-547

বাঙালিদের একটি অংশকে যে প্রভাবিত করেছিল তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লিখিত গুরুবাদ বিষয়ক তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মন্তব্যগুলি থেকেই বুঝতে পারছি। অক্ষয়কুমার দত্ত-এর *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ)-এ আমরা গুরুকেন্দ্রিক সাধনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে একই ধরণের মানসিকতার পরিচয় পাচ্ছি। বিজ্ঞান এবং আধুনিক সংস্কারের পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত-র তন্ত্র এবং গুরুকেন্দ্রিক সাধনা সংক্রান্ত মন্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না ধর্মসাধনা বিষয়ে পাশ্চাত্যের পবিত্রতার তত্ত্ব ভারতীয়দের কতটা প্রভাবিত করেছিল। কৌল সাধনায় মদ, মাংস গ্রহণ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত শ্লেষ করে বলছেন—

> কৌল-শাস্ত্রকারেরা নিজে মদ্যাদি গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন নাই। অন্য অন্য সকল প্রকার উপাসককেই তাহা ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।[৫৬]

এবার উপনিবেশের শাসনপদ্ধতির সঙ্গে গুরুকেন্দ্রিক সাধকগোষ্ঠীর বিরোধিতার ইতিহাসটি বুঝতে হবে। উপনিবেশের শাসকদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জনজাতির (সাঁওতাল, মুন্ডা) সরাসরি সংঘাতের একটি ধারা তো ছিলই। ১৮৫৪ সালের মে থেকে জুন মাসের মধ্যে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু, কানু তাঁদের বিদ্রোহের জন্য আশীর্বাদ এবং আদেশ পেয়েছিলেন ঈশ্বরের থেকে।[৫৭] জনজাতিদের মধ্যে মিশনারিদের খ্রিস্টধর্মের প্রচারের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন হলেও জনজাতিগুলি তাদের গোষ্ঠীপতি এবং ধর্মীয় গুরুদের (সাঁওতালদের প্রধান পুরোহিত-কে ন্যাকে [Naeke] বলা হয়) দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হত। নগরের বাসিন্দাদের চিন্তা-চেতনায় ঔপনিবেশিকীকরণের প্রচেষ্টা যতটা সহজ, জনজাতির মধ্যে সেই প্রচেষ্টা ততটাই কঠিন। সুতরাং উপনিবেশের একটি চিন্তার অবশ্যই কারণ ছিল জনজাতিগুলি যাঁরা তাদের কৌম জীবন যাপন থেকে নগরের জীবনে তখনো বিশেষ অংশগ্রহণ করেননি। কোম্পানির বাণিজ্য নীতির কারণে

---

[৫৬] দত্ত, অক্ষয়কুমার. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দ্বিতীয় খন্ড). কলিকাতা: নুতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত. ১২৮৯ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৮৯

[৫৭] O'connell, Joseph T. *Organizational and Institutional Aspects of Indian Religious Movements*. Shimla: IIAS. 1999. 1st Edition. p. 161

শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, মণিপুর তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর সংঘ কেন্দ্রিক জীবন বিশেষভাবে ব্যহত হতে থাকে। এই সংঘগুলির মধ্যে বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব দুই ধর্মেরই লোকেরা ছিলেন; এছাড়াও সুফিদের প্রভাবও ছিল। কোম্পানির কর সংগ্রহ নীতির সঙ্গে এই সকল সংঘের মাথা অর্থাৎ মহান্তদের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এতদিন অবধি সাধারণ মানুষেরা তাদের যাবতীয় কর (ধর্মীয় পরিভাষায় দান) দিতেন এই সংঘের কাছেই। কোম্পানির হস্তক্ষেপে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে বিঘ্নিত হয়। **১৭৮৬** খ্রিস্টাব্দে প্রতাপগড়ের রাধারমণ নামে একজন বৈষ্ণব-সুফি ব্যবসায়ী এবং ধর্মীয় নেতা কাছাড়ে কোম্পানির আস্তানায় হামলা চালান। তারপর রাধারমণ এবং তাঁর বিভিন্ন সঙ্গীদের কোম্পানি গ্রেপ্তার করে। তবে এই গ্রেপ্তারে সমস্যার সমাধান হয়নি। মনে রাখতে হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগে ফরাসি ব্যবসায়ীরা কিন্তু এই সব ধর্মীয় নেতাদের সাহায্যেই তুলা, চুনা পাথর, কাঠ এবং হাতির ব্যবসা করতেন।[৫৮] সুতরাং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যনীতির সঙ্গে এদের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফকির এবং সন্ন্যাসীদের তরফেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-কে বিভিন্ন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাদারিয়া সুফিদের সঙ্গেও সামান্য সময়ের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ হয়েছিল। মাদারি ফকিরদের একটি সম্প্রদায়-কে শাহ শুজা **১৬৫৯** খ্রিস্টাব্দে একটি সনদের মাধ্যমে বালিয়া দীঘিতে (দিনাজপুর, বর্তমান বাংলাদেশ) বসবাস ও বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাতে বিনা শুল্কে ধর্মমত প্রচারের অনুমতি দান করেন। কিন্তু এই সনদের চুক্তি ভঙ্গ হয় উপনিবেশ কালে।[৫৯] যদিও সামগ্রিক বিচারে মাদারিরা প্রশাসনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সম্পর্কে যুক্ত থাকতেন

---

[৫৮] Chatterjee, Indrani. *Forgotten Friends Monks, Marriages, and Memories in Northeast India*. New Delhi: Oxford University Press. 2015. 1st Edition. pp. 94-98

[৫৯] Maulavi, Abdul Wali. 'Notes on the Fakirs of Baliya-Dighi in Dinajpur'. *Journal of the Asiatic Society Bengal*. 1903. Vol-2, pp. 61- 65

না।[৬০] তা সত্ত্বেও এই সনদ প্রত্যাহার থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে মাদারিদের সম্পর্ক সব সময় এক রকম ছিল না। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ওয়াহাবি নেতা তিতুমীরের কথা। ১৮৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, যদিও তীতুমীর সুফি মতালম্বী ছিলেন না এবং লৌকিক ইসলামের শরিয়তিকরণে আগ্রহী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তীতুমীর পরবর্তী সময়ে আদর্শের কারণে যশোহর, খুলনা, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলায় পীর হিসাবেই পূজিত হন।[৬১] তিতুমীরের এই পীর আখ্যা লাভ থেকে স্পষ্ট হয় ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজেও গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের ভূমিকা ছিল । নিজে মারফতি ইসলামের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা তিতুমীরের মতানুসারে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের কাছে তিতুমীর পীর স্থানীয় ছিলেন। অতএব ইসলাম ধর্মাবলম্বী পীর স্থানীয় নেতাদের থেকেও ইস্ট কোম্পানিকে যথেচ্ছ রাজ্য চালনায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেহেতু গুরুরা একজন ব্যক্তি হিসাবে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন, তাঁদের পিছনে একটা বড় জন সমর্থন ছিল এবং তাঁদের কার্যকলাপ সরাসরি অর্থনীতি ও সমাজনীতিকে প্রভাবিত করত তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে গুরুরা যথেষ্ট মাথা ব্যাথার কারণ ছিলেন। মনে রাখতে হবে কেবল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নয়; মধ্য এবং উচ্চবিত্ত বাঙালি জমিদারদের সঙ্গেও সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের স্বার্থের সংঘাত ছিল। ১৭৬৩-১৮০০ খিস্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশের একাধিক সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন ফকির এবং সন্ন্যাসীরাই।[৬২] সুতরাং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আদর্শই হোক অথবা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত— সব দিক থেকেই উপনিবেশে বাঙালির কাছে এতদিনের প্রচলিত গুরুকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল।

[৬০] Bhattacharya, Ananda. Madariya 'Sufi Silsila their distinctive characteristics and relations with the Indian Power'. *Proceedings of the History Congress*. Vol- 69 (2008). pp. 384-402

[৬১] দাস, গিরীন্দ্রনাথ. *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা.* চব্বিশ পরগণা: শেহিদ লাইব্রেরি. ১৯৭৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৭৬-১৮৯

[৬২] Ramaswamy, Vijaya. *Devotion and Dissent in Indian History*. New Delhi: Foundation Books. 2018. Reprint. pp. 257-259

তবে আমরা আগেই বলেছি এই বেরিয়ে আসার অর্থ কখনোই 'গুরুহীন' ধর্ম জীবন ছিল না, দরকার ছিল অন্য ধরনের ধর্মীয় পথ প্রদর্শকের। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষিত বাঙালির কলকাতা কেন্দ্রিক জীবন পরিসরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। কামারপুকুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে গদাধর চট্টোপাধ্যায় যে কলকাতার ভদ্রলোক বাঙালির কাছে গুরু হয়ে উঠলেন তা ঐতিহাসিকদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। খেয়াল করার মত, রামকৃষ্ণ দেব-এর মূল আকর্ষণ ছিল সারগর্ভ অথচ সহজ বাচনে ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা। এর বিপরীতে ছিলেন তারাপীঠের তন্ত্র সাধক বামা খ্যাপা যিনি কলকাতায় মত প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না এবং কলকাতার ভদ্রলোকের ভাষা ব্যবহারও করতেন না। রামকৃষ্ণ দেবের দীক্ষা দান কুল-গুরুদের থেকে অনেকটাই পৃথক ছিল। গুরু সম্পর্কে রামকৃষ্ণ দেবের নানা মন্তব্য *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*-এ পাওয়া যাবে। তন্ত্র সাধনায় পঞ্চ-মকার বা আয়ু বৃদ্ধির জন্য হঠযোগে রামকৃষ্ণদেবের সম্মতি ছিল না।[৬৩] আবার দীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল না, শিষ্যের থেকে অসীম আনুগত্যের আশা বা কুল গুরুদের মত বংশানুক্রমে দীক্ষাদানের আগ্রহ ছিল না।[৬৪] এখানেই রামকৃষ্ণদেব ক্রমে নগর কলকাতার ভদ্র বাঙালির গুরু হয়ে উঠলেন যিনি আবেগের মাধ্যমে, পরামর্শের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের পথ প্রদর্শন করবেন কিন্তু শিষ্যের ধর্মীয় বা নৈতিক জীবনের বাইরে গুরুর কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। সাধক বামক্ষ্যাপার ক্ষেত্রে বিষয়টি পৃথক ছিল। তিনি তন্ত্র সাধনার উপদেশ প্রদান করতেন এবং একাধিক সময়ে অলৌকিক শক্তিও প্রদর্শন করেন। এখানে শহরের গুরু রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বামাক্ষ্যাপার ফারাক। একারণেই বামাক্ষ্যাপার জনপ্রিয়তা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথমে কলকাতার শিক্ষিত বাঙালির কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ সালে বাংলায় 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' নামক চলচ্চিত্র প্রকাশের

---

[৬৩] শ্রীম. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত. কলকাতা: রিফ্লেক্ট. ১৯৯৩. অষ্টাদশ মুদ্রণ. পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

[৬৪] Sarkar, Sumit. *Writing Social History*. New Delhi: Oxford University Press. 1998. 1st Paper Back Edition. P. 329

পরেই তারাপীঠে ভক্ত সমাগমের ঢল নামে। এর আগে একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসের তারাপীঠের বার্ষিক উৎসবেই ভক্তের সমাগম হত।[৬৫] সুতরাং বামাক্ষ্যাপার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের প্রেক্ষিত রামকৃষ্ণদেবের থেকে পৃথক ছিল। রামকৃষ্ণদেবের প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন বা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর রামকৃষ্ণ পরমহংসের শরণ গ্রহণ থেকে স্পষ্ট হয় নগরের শিক্ষিত সংস্কৃতির গুরুকেন্দ্রিক চাহিদার একটি বিকল্প নির্মিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতিকে বোঝার কোন সাধারণ সূত্র কাজ করে না এই মন্তব্যের মাধ্যমেই আমরা শুরু করেছিলাম। উপনিবেশের গুরু কেন্দ্রিক ধারণার পরিবর্তনের প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে আমরা যে প্রবণতাগুলি এতক্ষণ আলোচনা করলাম তারও যথেষ্ট ব্যতিক্রম সমসময়েই ছিল। আমরা দেখেছি রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য গুরুকেন্দ্রিক সাধন কাঠামোর সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের একটি বিরোধ ছিল। এই বিরোধ সত্ত্বেও কর্ণাটকে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় পরিচালিত মঠে বিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেক গ্রামের ছেলেরা থেকে পড়াশোনা শিখেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে এদের অনেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়। লিঙ্গাতেৎ গুরুদের শিক্ষা সে সময়ে গুহ্য সাধনা কেন্দ্রিক ছিল না, অনেক বেশি ছিল যুক্তিবাদী নেতা নির্মাণের দিকে।[৬৬] আবার গুরুর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেও আধুনিক জীবনের সুরেই নিজেদের যুক্ত রাখার কথা বলেছিলাম রামকৃষ্ণের প্রেক্ষিতে। অবশ্যই এই সিদ্ধান্তটি বাঙালির একটি নির্দিষ্ট অংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। গুরুর থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজের জীবনের স্রোতটাকে বদলে ফেলার এবং মূলত ধর্মচর্যায় নিমগ্ন হওয়ার উদাহরণ সেই সময়েও ছিল, আজও আছে। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর স্মৃতিচারণায় বলছেন (সময় সম্ভবত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক, স্থান ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা)—

---

[৬৫] Banerjee, Sumanta. *Logic in a popular form*. Calcutta: Seagull Books. 2019. Reprint. pp. 205-207

[৬৬] Copeman Jacob. *The Guru in South Asia New Interdisciplinary perspectives*. London: Routledge. 2012. 1st Edition. pp. 48-49

> আমার ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর বাবা ও মা বৈষ্ণব দীক্ষা নেন। বাড়িতে গৌরগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপুজো বন্ধ। মাছ মাংস বারণ। তরবারি অদৃশ্য। কিন্তু শেকসপিয়র অদৃশ্য হননি।[৬৭]

সুতরাং 'আধুনিকতা'-র সূত্রে বঙ্গদেশে গুরুকেন্দ্রিক বিশ্বাসে কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও সামগ্রিক ভাবে গুরু ধারণাটি আগের মতই বজায় ছিল। মানুষের গুরুর প্রতি চাহিদার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য বদল এসেছিল, কাকে গুরু বলে মানা হবে, এই প্রশ্নের নতুন করে উত্তর খুঁজতে চেয়েছিলেন অনেকে। ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধর্মের প্রতি ঝোঁক— তা এই দেশে কখনোই কমেনি। সব সময়েই ধারণার বদল এসেছে, কিন্তু মূল প্রবণতার মধ্যে একটি প্রবহমানতা সবসময়েই দেখা যাবে। বর্তমান গবেষণায় আমরা গুরু ধারণার বিবর্তনের প্রেক্ষিতটি বোঝার চেষ্টা করেছি। মূলত দু'টি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান গবেষণা সীমাবদ্ধ থাকবে।

বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়। এই দুটি ধর্ম সম্প্রদায়কে আমরা সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে বিচার করার চেষ্টা করেছি। গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আমরা 'গুরু' শব্দটির আভিধানিক ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্মে গুরু বলতে কী বোঝানো হয় তা দেখিয়েছি। এই শব্দার্থের থেকেই আমরা গবেষণার একটি পদ্ধতি নির্মাণের চেষ্টা করেছি। আমাদের মূল গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার তথ্য উৎসের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়টিকে আমরা বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে রাখতে চেয়েছি। সিন্ধু এবং আবেস্তার সংস্কৃতি থেকে শুরু করে বৈদিক ধর্মে গুরু ধারণার বিকাশ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ভারতবর্ষের শ্রামণ্য মতে গুরু ধারণা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্রামণ্য মতের তুলনায় থেরবাদী বৌদ্ধরা কোথায় আলাদা সেবিষয়ে আলোচনা করে আমরা মহাযানে গুরু ধারণার বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করেছি। এরপর পৌরাণিক সংস্কৃতিতে গুরু

[৬৭] রায়, অন্নদাশঙ্কর. *জীবন যৌবন.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১৭. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ১৫

ধারণার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা দীক্ষাগুরু বলতে যা বুঝি, তাঁর সঙ্গে পৌরাণিক মতের সাদৃশ্যই বেশি। বজ্রযানে গুরুতত্ত্ব বোঝার জন্য আমরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিয়েছি, কারণ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের সঙ্গে তিব্বতের সরাসরি সম্পর্ক ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতির সম্পর্কেই যেহেতু ধর্মের তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয় তাই আমরা বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে বৌদ্ধদের যোগাযোগ বোঝার চেষ্টা করেছি। এরপর বজ্রযানে গুরুতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়টি আসলে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভূমিকা রচনা করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে গুরুতত্ত্বকে বোঝার জন্য আমরা চৈতন্য সমসাময়িক এবং তৎপূর্ববর্তী ভারতবর্ষের কয়েকটি ধর্ম সাধনায় গুরুর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এই অধ্যায়ে আমাদের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের দিকে নজর ছিল। আমরা লিঙ্গায়েৎ সাধনা, নাথ সাধনা এবং নির্গুণ ভক্তি ধারা, সুফি ধারা এবং অসমে শংকরদেবের সাধনায় গুরুতত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখিয়েছি সময় এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষে কীভাবে গুরু ধারণার বিবর্তন হয়েছিল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে ভক্তি ধারণার বিবর্তনের মাধ্যমে। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মূলত ভক্তি দর্শন। ভারতের ভক্তি সাধনার ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করে আমরা মূলত বঙ্গদেশে চৈতন্য-অনুসারী বৈষ্ণব ধারার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছি। এরপর তাত্ত্বিকভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে গৌরতত্ত্ব ও গুরু তত্ত্বের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। শেষে কয়েকজন বৈষ্ণব গুরুর হাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরু তত্ত্বের বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মিত হয়েছে। আমরা মূলত একটি ধারণার পারম্পর্য এবং বিকাশকেই এই গবেষণায় দেখাতে চেয়েছি। আমাদের গবেষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা হল, এখানে কেবল দু'টি সম্প্রদায় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য কয়েকটি ভাষার উপাদানই গবেষণায় ব্যবহার করেছি। তৃতীয়ত, সংস্কৃত বানানের ক্ষেত্রে আমরা মুদ্রণের সুবিধার জন্য হয় বাংলা নয় রোমান

হরফ ব্যবহার করেছি। আমরা Diacritical Sign ব্যবহার করিনি, উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখেছি। চতুর্থত, হিন্দি বা অন্য ভাষার তথ্য উৎসে আমরা হয় বাংলা নাহয় রোমান হরফ ব্যবহার করেছি। পঞ্চমত, আমাদের গবেষণা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বেই সীমিত। অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা স্মরণে রেখে বঙ্গদেশে মূলত দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রে ভারতবর্ষে গুরু ধারণার বিকাশের একটি পর্যালোচনাই আমাদের বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য।

প্রথম অধ্যায়

গুরু: শব্দার্থ এবং গবেষণা পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

গুরু: শব্দার্থ এবং গবেষণা পদ্ধতি

সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় 'গুরু' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্ত্র দীক্ষা দাতা, শিক্ষা দাতা, উপনয়ন এবং উপবীত প্রদানকারী, পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি অনেকেই নানা শাস্ত্রমতে গুরু পদবাচ্য। বর্তমান গবেষণায় 'গুরু' শব্দটিকে এত বড় অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। মুখ্যত যিনি শিষ্যকে মন্ত্র অথবা বীজ দান করেন, শিষ্যের দৈনন্দিন জীবন তথা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকনির্দেশ করেন তাঁকে কেন্দ্র করেই বর্তমান গবেষণা। পৌরাণিক সাহিত্য থেকেই আমরা বহু ক্ষেত্রে 'গুরু' শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। তান্ত্রিক নিবন্ধ, সিদ্ধাচার্য রচিত পদাবলি, সুফি সাহিত্য, দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ভক্তি আন্দোলনের অভিঘাতে রচিত সাহিত্য, বঙ্গদেশে রচিত মঙ্গলকাব্য, চরিত সাহিত্য সর্বত্রই 'গুরু' শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি হিন্দি এবং উত্তর এবং মধ্যভারতীয় অনেকগুলি ভাষাতেই 'গুরু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দের ব্যবহার এবং বিস্তৃত থেকে ভারতীয় প্রেক্ষিত 'গুরু' ধারণাটির প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট হয়। ভাষাজ্ঞান এবং সময়ের অভাবে আমরা মুখ্যত বাংলা, হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষার উদাহরণই বারংবার উদ্ধৃত করব, অপরাপর ভারতীয় ভাষার উল্লেখ বিশেষ করা সম্ভব হবে না। আমাদের গবেষণায় একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন রয়েছে—ধর্ম-দর্শন ভেদে, মুখ্যত সাধ্য-সাধনের নিরিখে 'গুরু'র ভূমিকায় কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি না? অর্থাৎ আমরা 'গুরু'র ধর্মক্ষেত্রে ভূমিকা এবং কর্ম পদ্ধতিকে একটি ধর্মের চিহ্নক হিসাবে ব্যবহার করতে পারি কি না? এই প্রশ্নটিকে মাথায় রেখেই আমরা বঙ্গদেশের কয়েকটি সাধন ধারার মাধ্যমে বিষয়টি বুঝতে চেয়েছি। গবেষণার শুরুতে আমরা অভিধানে 'গুরু' শব্দটির বিভিন্ন অর্থগুলি দেখতে চাইছি এবং অভিধানকারেরা যে সকল সূত্র থেকে শব্দার্থটি নির্ণয় করছেন তার একটি খতিয়ান নির্মাণ করতে চাইছি। এর ফলে আমরা

গবেষণাটিকে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব তারও একটি অভিমুখ স্থির করা সম্ভব বলে মনে করছি।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* উদ্ধার করে বলছেন—'যিনি গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার করিয়া বেদ শিক্ষা দেন'।[১] এক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্র বর্ণিত দশ সংস্কারের সঙ্গে 'গুরু'র সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এখানে গুরু সাবিত্রী দীক্ষা দান করলেও মন্ত্র তথা বীজ দীক্ষাদানের কথা আলাদা করে বলা হচ্ছে না। *মনুসংহিতা* উদ্ধার করে আরও দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে—১) ধর্মোপদেশ, বেদধ্যাপক এবং ২) গর্ভাধানাদি সংস্কারক ও অন্ন দ্বারা প্রতিপালক। এক্ষেত্রে দশ সংস্কার এবং বেদধ্যয়নের সঙ্গেই গুরুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মহীপতি, মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ এবং পিতৃব্য ইত্যাদিকেও গুরু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতা*-র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পূজ্যমাত্রেই গুরু এবং *হিতোপদেশ* থেকে উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে বর্ণের ভিত্তিতে দ্বিজ বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরু এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে পতি একমাত্র গুরু। আমরা আপাতত ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ চালিত সূত্রগুলিকেই উদ্ধার করেছি। দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিভাষায় 'গুরু' শব্দটি মুখ্যত মহৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি দশসংস্কারকারী হিসেবে গুরুর ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের একমাত্র সমন্ত্রক—দশ সংস্কারের অধিকার বর্তমান এবং বেদ পাঠের অধিকার উক্ত তিন বর্ণের পুরুষদের মধ্যেই সীমিত তাই গুরু একমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই কার্যকর। যদিও মনে রাখতে হবে দশ সংস্কার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্গত সকলেরই কর্তব্য, এখানে ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আলাদা করে আসছে না।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'গুরু' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলছেন[২] — যিনি দেবতাকে স্তব করতে শিক্ষা দেন এবং যিনি শিষ্যের মঙ্গলার্থ দেবতার স্তব করেন, উপদেশক, অধ্যাপক, শিক্ষাদাতা।

---

[১] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১ম). নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১. পৃ.৮০৬।

[২] দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১ম). এলাহাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড. ১৯৩৭. পৃ. ৬৮৬।

অর্থাৎ এখানে সাধনার শিক্ষা দানের কথাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুবলচন্দ্র মিত্র প্রায় একই অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন—ধর্মোপদেষ্টা, মন্ত্রোপদেষ্টা, আচার্য, অধ্যাপক, বৃহস্পতি, দ্রোণাচার্য, জনক প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তি।[৩] রাজশেখর বসু-র অভিধান অনুযায়ী[৪] দীক্ষাদাতা, সাধনার উপদেশক, আচার্য, শিক্ষাদাতা, গুরুজন, পূজনীয় ব্যক্তি। উক্ত অর্থগুলি থেকে সাধনার দিকনির্দেশের জন্য গুরুর ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস অথবা রাজশেখর বসু উৎসের তথ্য নির্দেশ করেন নি। *শব্দকল্পদ্রুম* অনুযায়ী নিষেক, গর্ভাধান থেকে শুরু করে বেদমন্ত্র শিক্ষাদান অবধি গুরুর কর্তব্য। এছাড়াও *কালিকা পুরাণ* এবং *কূর্ম পুরাণ*-এর থেকে গুরু নির্বাচনের কিছু নীতির কথাও বলা হয়েছে।[৫] নগেন্দ্রনাথ বসুর *বিশ্বকোষ*-এ বলা হচ্ছে যিনি ধর্ম উপদেশ দান করেন, শাস্ত্রোপদেশক, আচার্য। নগেন্দ্রনাথ বসুও *মনুসংহিতা* থেকেই অর্থ গ্রহণ করেছেন।[৬] গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*-এ বাংলা সাহিত্যে গুরু শব্দের বিবিধ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থে ‘গুরু’ শব্দটি ‘চর্যাগীতি’র সময় থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৭] Monier Williams বলছেন—
“A spiritual parent or preceptor (from whom a youth receives the initiatory *Mantra* or prayer, who instructs him in the *Sastras* and conducts the necessary ceremonies up to that of investiture which is performed by the *Acharya*)”[৮] অর্থাৎ এখানে উপাধ্যায়ের কথা বলা হচ্ছে যার হাতে নবাগত শিক্ষার্থী প্রথম পাঠ এবং অর্চনা শিখবে। এর পাশে দশসংস্কারের উল্লেখটিও অভিধানকার করেছেন। হেমচন্দ্র বড়ুয়া সম্পাদিত অহমিয়া

---

[৩] মিত্র, সুবলচন্দ্র. *সরল বাঙ্গালা অভিধান.* কলকাতা : নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ. ২০১১. পৃ. ৪৫২।

[৪] বসু, রাজশেখর. *চলন্তিকা.* কলকাতা : এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড. সপ্তম সং. []. পৃ. ১৫৪।

[৫] দেব, রাধাকান্ত. *শব্দকল্পদ্রুম* (প্রথম কাণ্ড). কলকাতা : []. ১৮২১. পৃ. ১০১৬।

[৬] বসু, নগেন্দ্রনাথ. *বিশ্বকোষ* (৫ম). কলিকাতা : ইউ.সি. বসু এণ্ড কোম্পানি. ১৩০৯ সাল।

[৭] মুরশিদ, গোলাম. *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* (প্রথম খণ্ড). ঢাকা : বাংলা একাডেমি. ২০১৩. পৃ. ৮১৯।

[৮] Williams, M. Monier. *A Sanskrit English Dictionary*. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. 2002. p. 359

ভাষার অভিধানে ‘গুরু’ শব্দের অর্থে ধর্ম-শিক্ষক, ধর্মোপদেশকের পাশাপাশি মালা-মন্ত্র দাতা শব্দটির উল্লেখ পাচ্ছি।[৯] শব্দার্থ থেকে আমরা কয়েকটি প্রবণতার দিকে যেতে পারি—প্রথমত, অনেক জায়গাতেই ব্রাহ্মণ্য পরিভাষায় গুরু-র সঙ্গে বেদ শিক্ষাদানকারী এবং অন্যান্য ব্যবহারিক শিক্ষা দানকারীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এর বাইরে ‘গুরু’ শব্দের যে অর্থগুলি পাচ্ছি তা তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তন্ত্রের পরিভাষায় ‘গুরু’ শব্দটির তাৎপর্য আমরা পরে আলোচনা করব। দ্বিতীয়ত, সাধনার ক্ষেত্রে যিনি নির্দেশ দান করেন অর্থাৎ পুরোহিতদের সঙ্গে ‘গুরু’ শব্দটির বিশেষ ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। তৃতীয়ত, প্রায় সব ক্ষেত্রেই যে কোনও পূজনীয় ব্যক্তিকে ‘গুরু’ নামে সম্বোধনের প্রবণতা ব্রাহ্মণ্য পরিভাষায় দেখা যায়। বৈদিক মন্ত্র যেহেতু কবির সৃষ্টি নয় তাই উক্ত মন্ত্র সরাসরি মুক্তি অথবা কাম্য বস্তুর দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে কেবল পড়তে পারলেই সরাসরি বেদপাঠ থেকে ইষ্ট লাভের একটি সম্ভাবনা কথা কল্পনা করা গেলেও বৈদিক সংস্কৃতিতে তা সম্ভব ছিল না। মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে উচ্চারণ সাপেক্ষ। যথাযথ উচ্চারণ ব্যতীত কোনও মন্ত্রই ফলপ্রদক নয়। উচ্চারণ শেখা সম্ভব গুরু-র সহায়তায়, গুরু-ই মন্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যাকারী। ফলত মন্ত্রদাতা শব্দটিকে ব্রাহ্মণ্য প্রেক্ষিতে মন্ত্র ব্যাখ্যাতা অর্থে বুঝতে হবে। এবার আমরা কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক অভিধান-বিশ্বকোষ থেকে ‘গুরু’ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ এবং প্রয়োগ বোঝার চেষ্টা করবো। একই সঙ্গে আমরা ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মেও ধর্মগুরু স্থানীয় পদের অর্থ এবং কার্যকারিতার দিকে নজর দেব। এর ফলে একটি তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্টতর হবে।

Historical Dictionary of Sikhism-এ ‘Gurudwara’ শব্দটির অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে—*গুরুগ্রন্থ সাহেব* যে গৃহে পূজ্য হিসাবে স্থাপিত হয়েছে তাকেই ‘গুরুদ্বার’ বলা হবে। *গ্রন্থসাহেব* সম্পর্কে বলা হয়েছে– “In the Adi Granth the term Guruduara refers to the

---

৯ বড়ুয়া, হেমচন্দ্র. *হেমকোষ* (নতুন সংস্করণ). গৌহাটি: হেমকোষ প্রকাশন. ২০১১. পৃ. ৪২৯।

grace of the Guru, understood the voice of Akal Purakh. Places associated with the Gurus acquired particular sanctity and as such imparted a special blessing.”[১০] শিখ ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের মূল আরাধ্য *গ্রন্থসাহেব*, এই অর্থে ধর্মগ্রন্থটিই তাদের কাছে গুরু হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই গ্রন্থই আদি পুরুষের বাণী ধারণ করে রেখেছে এবং তার থেকেই মুক্তির দিকে যাত্রা সম্ভব। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুরু নানক (১৪৬৯ খ্রি.)। নানকের পরে আরও নয় জন গুরুকে শিখ ধর্মে স্বীকার করা হয়েছে। এই নয় জন হলেন— গুরু অঙ্গদদেব, গুরু অমর দাস, গুরু রাম দাস, গুরু অর্জুন দেব, গুরু হরগোবিন্দ, গুরু হর রাই, গুরু হরকৃষ্ণ, গুরু তেজ বাহাদুর, গুরু গোবিন্দ সিংহ। গুরু গোবিন্দ সিংহের (গুরুপদের সময়ক্রম ১৬৭৫ খ্রি. থেকে ১৭০৮ খ্রি.) পরে *গুরুগ্রন্থ সাহেব*-কে শিখ ধর্মে গুরু বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের রচনাগুলিকে গুরুবাণী এবং কখনও ভগবদ্‌বানী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তবে কোনও ভাবেই আদিগ্রন্থ এবং দশম গ্রন্থে সংকলিত অংশের বাইরের কোনো রচনাকে গুরুবাণীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সুতরাং শিখ সংস্কৃতিতে ‘গুরু’ শব্দটি নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থের বাইরে প্রযুক্ত হয়নি।

Brill Dictionary of Religion (Vol-II) গুরু ধারণাটি প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করছে।[১১] প্রথমত, বৈদিক সংস্কৃতিতে গুরু বলতে দশ সংস্কারকারীদের বোঝানো হচ্ছে। এর মধ্যে গর্ভাধান কারী পিতা এবং উপনয়নকারী আচার্য অন্যতম। একই সঙ্গে গুরু মুখ্যত ব্রাহ্মণেরাই হতেন এবং তাঁরা কেবল বেদাধ্যয়ন করতেন না তাঁদের সামগ্রিকভাবে রাজনীতি এবং সমাজ প্রকল্পে গুরুত্ব প্রদানের অধিকার থাকত। দ্বিতীয়ত, চতুরাশ্রম ধর্মের প্রথম অংশ ব্রহ্মচর্য মুখ্যত গুরুর নির্দেশে চালিত হত, গুরুগৃহে বসবাস করে শিষ্যেরা সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতেন এবং গুরু পরম্পরা অনেক সময়ই বংশানুক্রমিক ভাবে চলত। তৃতীয়ত, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ শ্রামণ্য ধর্মগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য সন্ন্যাসী গুরু বলে এক

---

[১০] Mcleod, W.H. *Historical Dictionary of Sikhism*. Maryland : The Scarecrow Press Inc. 2005. p. 1991.

[১১] Stuckrad, Kocku von. *The Brill Dictionary of Religion* (Vol. II). Boston : Brill. 2006. p. 824.

নতুন ধারণার বিকাশ ঘটছে। এক্ষেত্রে উপনয়নকারী আচার্যগুরুর স্থান পূর্বের মত থাকছে এবং দৈনন্দিন জীবনে সন্ন্যাসী গুরুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ন্যাসী গুরুরা যে কোন জাতেরই হতে পারতেন। চতুর্থত, ভক্তি এবং তন্ত্র মার্গে গুরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখানে গুরুই পিতা, মাতা এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হিসাবে বিবেচিত হন। পঞ্চমত, ১৯৬০-এর দশক থেকে আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে গুরুবাদের প্রসার দেখা যায়। বিবেকানন্দ, আনন্দমার্গী, হরে কৃষ্ণ বিভিন্ন শাখা পাশ্চাত্যে একটি শিষ্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সামগ্রিক ভাবে বিভিন্ন দেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

Encyclopaedia of Religion and Ethics-এ 'গুরু' শব্দটির বর্ণানুক্রমিক উল্লেখ খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে গুরু শব্দটি 'ভক্তিমার্গ' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ এই বিশ্বকোষটি 'গুরু' শব্দটিকে ভারতীয় ভক্তিমার্গের অংশ হিসাবে বিবেচনা করছে। ভাগবত ধর্ম গুরুকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করেছে। কবীর পন্থা গুরু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানী তবে একবার কাউকে গুরুপদে বরণ করা হলে তাকে জীবনের সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়, মনে করা হয় স্বয়ং ভগবান গুরুর মাধ্যমে কথা বলে থাকেন। বল্লভচার্য সম্প্রদায়ে গুরুর প্রতি ভক্তি এতটাই প্রবল যে তাদের মধ্যে নিজের কন্যা এবং সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে গুরুপ্রসাদী করে গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। উক্ত বিশ্বকোষটির সংকলনে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় গুরুদের প্রতি ভারতীয় সাধনায় যে ক্রম বর্ধমান ভক্তির প্রবণতা তাকে কিছুটা হলেও কটাক্ষ করা হচ্ছে–"But in modern Hinduism this proper attitude is greatly exaggerated"[১২]।

Encyclopedia of Hinduism 'গুরু' শব্দটির শব্দার্থ উল্লেখ করে বিভিন্ন শাখা কীভাবে গুরুকে নিজেদের সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা করেছে। *উপনিষদ* এবং তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর বিবিধ ভূমিকার পাশাপাশি নাথ, শৈব সাধনায় গুরু পরম্পরার কথা

---

[১২] Hastings, James. *Encyclopaedia of Religion and Eghics* (Vol. II). New York : T. & T. Clark. 1981. p. 546.

উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত শিবের গুরু হিসাবে আবির্ভাবের সূত্রে দক্ষিণামূর্তি, দত্তাত্রেয় এবং নর-নারায়ণ অবতারের কথায় বোঝা যাচ্ছে দেবতা ধর্ম ব্যাখ্যা এবং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হতে পারেন—এই বিশ্বাস ভাগবত ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়েও কার্যকর। এই বিশ্বকোষটি গুরু পরম্পরার উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।[১৩] থেরবাদী বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে *সূত্র, বিনয়* এবং পর্বর্তী সময়ে *অভিধর্ম পিটক* সরাসরি বুদ্ধবচনকে ধারণ করে আছে। থেরবাদীরা সরাসরি বুদ্ধবচনকে মেনে চললেও তাদের সংঘ জীবন পরিচালনায় আচার্য এবং উপাধ্যায়ের প্রয়োজন আছে। বুদ্ধ বচনের যথাযথ ব্যাখ্যা কেবল অর্হৎ-রা করতে পারেন, সাধারণ ভিক্ষুদের সেই অধিকার নেই। অর্হৎ-রা থেরবাদী বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে ‘গুরু’ স্থানীয়। তবে অর্হৎ-এর বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণকে কেন্দ্র করে মহাসাঙ্ঘিক এবং স্থবিরবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। স্থবিরবাদীরা মনে করেন অর্হৎ একজন সাধারণ মানুষ, তিনি ধ্যানের মাধ্যমে অর্হত্ব লাভ করলেও তার যে কোনও দুর্বলতা তাকে অর্হৎ-মার্গ চ্যুত করতে পারে। অন্যদিকে মহাসাঙ্ঘিকদের মতানুযায়ী অর্হৎ-কে অতিমানবীয় ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হয়।[১৪] মহাযানী বৌদ্ধধর্মে ষোলো জন, কোথাও আঠেরো জন অর্হতের কথা পাওয়া যাচ্ছে যাদের বুদ্ধ অনুরোধ করেছিলেন আগামী বুদ্ধ মৈত্রেয় না আসা পর্যন্ত এই পৃথিবীতে অবস্থান করতে।[১৫] এই পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, তন্ত্র, শিখ, ভাগবত ধর্ম ইত্যাদি সম্প্রদায় ভেদে গুরুকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে গুরু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য পর্যায়বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে বিশেষত বৈদিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আচার্য শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবহারের দিক থেকে আচার্য শব্দটি গুরুর থেকে প্রাচীনতম। যদিও সংস্কৃতি অনেক সময় আচার্য এবং গুরু

---

[১৩] Rao, K.S Seshagiri. *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (Vol. IV). California : Mandale Publishing. p. 405.

[১৪] Johnston, William M. *Encyclopedia of Monasticism.* London : Fitzroy Dearborn Publishers. 2000. pp. 84-85.

[১৫] Buswell, Robert E. Jr. *Encyclopedia of Buddhism* (Vol-I), USA : Thomson Gale []. pp. 28-30.

শব্দদুটি সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন কুল্লুক ভট্ট *মনুস্মৃতি*-র টীকায় অথবা মল্লিনাথ ‘শিশুপালবধ’ নাটকের টীকায় আচার্য এবং গুরু শব্দ দুটিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[১৬] ‘আচার্য’ শব্দটির উল্লেখ শিক্ষক অর্থে পাচ্ছি *অথর্ব বেদ*-এ। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ শাণ্ডিল্য এবং সাপ্তার্থবাহিনী-কে আচার্য এবং অন্তোবাসী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আচার্য উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। *ছান্দোগ্য* এবং *তৈত্তিরীয়* উপনিষদেও আচার্যকে আমরা সাবিত্রী দীক্ষাদাতা এবং বেদজ্ঞান দাতা হিসেবেই পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আচার্যের উক্ত কার্যের সাপেক্ষেই *মনুস্মৃতি* এবং *অমরকোষ* মতে আচার্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়েছে। তবে ‘বেদ’ শব্দটি যেহেতু ‘বিদ্’ ধাতু সঞ্জাত সে কারণে আচার্য কেবল বেদ শিক্ষা দান করবেন এমন নয়, তিনি সর্বার্থেই যে-কোনও শিক্ষা তার শিষ্যকে প্রদান করতে পারেন। উপনিষদের বয়ানে আচার্য শিষ্যকে দর্শনের এবং অধিবিদ্যার শিক্ষাও দান করবেন। অর্থাৎ কেবল সমাজে বাঁচার উপযুক্ত শিক্ষাই নয় আচার্য দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষাও শিষ্যকে প্রদান করে থাকেন। শিষ্য তার জীবনের প্রথম আশ্রমটি আচার্যের গৃহেও অতিবাহিত করে। সংস্কৃত মহাকাব্য এবং অন্যান্য রচনায় আচার্যকে কেবল বেদশিক্ষাই নয়, এর পাশাপাশি নানাবিধ চারুকলার শিক্ষা প্রদান করতেও দেখা যাচ্ছে। ‘হর্ষচরিত’ এবং ‘প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ’ নাটকে আচার্য বীণায় পারদর্শী, *দশকুমার চরিত*-এর বর্ণনা অনুযায়ী আচার্য নৃত্য এবং শৃঙ্গার নৃত্যের শিক্ষা প্রদান করেন রাজপুত্রদের। এর পাশাপাশি আচার্য বিবিধ লিপিজ্ঞান, বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান, ধর্ম-শব্দ-জ্যোতিষ-তর্ক-মীমাংসা, কৌটিল্যের নীতি ইত্যাদি শিক্ষাও দান করছেন বলে দেখা যায়। *পালি* জাতকের গল্পে আচার্য শিল্প শিক্ষা প্রদান করছেন বলে দেখা যায়। তবে *পালি* জাতকে কখনো কখনো আচার্য শব্দটিকে পুরোহিত-এর সমার্থক হিসেবে দেখা যায়, কখনো আবার উপাধ্যায় অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যদিও বৌদ্ধ বিনয় অনুযায়ী আচার্য হলেন সূত্র ব্যাখ্যাতা এবং পাঠদাতা অন্যদিকে উপাধ্যায় মুখ্যত আচার তথা সংঘ নিয়মের নিয়ন্ত্রা। *বিনয়* পিটক-এর সমন্তপসাদিকা টীকায় বুদ্ধঘোষ পাঁচ প্রকার আচার্যের কথা বলছেন—

[১৬] Nagatomi, M. *Sanskrit and Indian Studies Essays in Honour of Daniel H.H. Ingalls*. London : D. Reidel Publishing Company. 1980. pp. 93-118.

পব্বজ্জাচারিয়, উপসম্পদাচারিয়, নিসসয়াচারিয়, উদ্দেসাচারিয় এবং অবাদাচারিয়। এর পাশাপাশি বুদ্ধঘোষ আবার আচার্যদের প্রাথমিক এবং গৌণ এই স্তরেও ভাগ করেছেন। একই ভাবে জৈন ধর্মের ক্ষেত্রেও বাচনাচার্য এবং উদ্দেশনাচার্য এই দুটি বিভাগ দেখা যাচ্ছে। কৌটিল্য-র *অর্থশাস্ত্র*-এ আচার্য শব্দটি পঞ্চাশেরও বেশি বার ব্যবহৃত হয়েছে। মনে রাখতে হবে আচার্য সম্বোধন থেকে কাউকে উক্ত আচার্য-র সরাসরি ছাত্র মনে করা যথাযথ হবে না। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো একটি বিদ্যায় প্রথিতযশা পণ্ডিতদের সরাসরি আচার্য বলে সম্বোধন করার রীতি প্রচলিত আছে। আবার কিছু সংস্কৃত প্রহসনে আচার্য শব্দটি কাউকে হেয় করার জন্যও ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। 'মত্তাভিলাস' প্রহসনে অপটু অভিনেতাকে 'আচার্' বলে আক্রমণ করা হয়েছে। সুতরাং আচার্য শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যে পাচ্ছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আচার্য শব্দটি শিক্ষক অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। তবে এর পর্যায় বাচক বেশ কিছু শব্দ-ও বৈদিক এবং পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

আচার্য শব্দটির আরও কয়েকটি নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন পি.ভি. কাণে।[১৭] কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ কৌটিল্য ঊনচল্লিশ বার তাঁর আচার্যদের প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন, কিন্তু আচার্যগণের নাম উচ্চারণ করেননি। আপস্তম্বের ধর্মসূত্র মতে—আচার্য ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান আরোহন করেন এবং তাঁর শিক্ষার্থীদের বেদ বিদ্যা দানের মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম দান করেন। গৌতম ধর্মসূত্র মতে যিনি শিক্ষার্থীদের উপনয়ন প্রদান করেন তাদেরই আচার্য বলা হয়। অর্থাৎ আচার্য শব্দটির প্রাথমিক অর্থ বেদ শিক্ষক এবং উপনয়ন প্রদানকারী। এখানে খেয়াল করতে হবে আচার্য ধারণাটি কিন্তু কেবল মাত্র দ্বিজবর্ণের পুরুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। শূদ্র এবং নারীদের বেদাধিকার যেহেতু ধর্মশাস্ত্রের যুগে আর নেই এবং বর্ণ একটি জন্মগত পরিচয়ে পরিণত হয়েছে (*ধর্মসূত্র*-এর সময়সীমা আনুমানিক খ্রি. পূ. সপ্তম থেকে খ্রি. পূ. তৃতীয় অবধি) তাই আচার্য লাভের প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমাতেই আটকে

---

[১৭] Kane, P.V. *The Meaning of Acharya.* Pune: Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol-23. No-1/24. 1942. pp. 206-213.

থাকবে। পতঞ্জলি-র *মহাভাষ্য*-এও একটি শাস্ত্র পরম্পরার প্রবর্তক রূপে আচার্যকে স্বীকার করা হয়েছে। *শবর ভাষ্য*-তে শাস্ত্র প্রবক্তা হিসেবে আচার্য শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ আচার্য শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে আচার্য সায়ণ সরাসরি শিক্ষককেই আচার্য মনে করছেন না। তাঁর মতে আচার্য-র গুণগুলি কারও মধ্যে সমবায়িত হলে তাঁকে আচার্য বলা যাবে। যাস্ক তাঁর *নিরুক্ত*-এ আচার্য বলতে তাঁর মতের পূর্বসূরীদের বুঝিয়েছেন। যাস্ক-এর রচনার ধরনে আমরা আত্মবিদ্‌গণ এবং নৈরুক্ত আচার্যগণ—এই দুই মতের মধ্য দিয়ে অর্থ নির্ণয়ের প্রবণতা পাচ্ছি।[১৮] পি.ভি. কাণে তাঁর আলোচনায় আরও কিছু উদাহরণ থেকে স্পষ্ট করেছেন যে প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষিতে অন্তত সংস্কৃত সাহিত্যে আচার্য শব্দটি কারও ব্যক্তিগত শিক্ষক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। অনেক সময়েই প্রাচীন রচয়িতা, শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা, নতুন মার্গ প্রতিষ্ঠাতা ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পূর্বে আমরা যে সকল অভিধান-এর থেকে গুরু শব্দটির অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই শব্দটির প্রয়োগ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পাশাপাশি তন্ত্র সংস্কৃতিতে কীভাবে হয়েছে তাও আলোচনা করেছেন। তন্ত্রের দিক থেকে 'গুরু' শব্দটিকে নিম্নোক্ত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়—'গু' শব্দটির অর্থ যিনি সিদ্ধিদান করেন, 'র' অর্থে পাপ নাশক এবং 'উ' অর্থ শম্ভু—অর্থাৎ যিনি সাধকগণের সিদ্ধি প্রদানের জন্য উপদেশ দ্বারা পাপরাশি নাশ করেন এবং নিজে স্বয়ং শম্ভুরূপে আত্মাকে দর্শন করেন তিনিই গুরু। তন্ত্রের পরিভাষায় গুরু সরাসরি ভক্তের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং আরাধ্য দেবতার পাশাপাশি গুরু নিজেও আরাধ্য রূপে বিবেচিত হচ্ছে। আচার্যগণ পূজনীয়, শ্রদ্ধেয় কিন্তু আচার্যের ক্ষেত্রে পূজা শব্দটি শ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যম, কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কিছু বৈদিক তথা পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠানের অংশ। গুরু সরাসরি আরাধ্য, তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের সঙ্গে তুলনীয় এবং গুরুর মাধ্যমেই ভক্ত চরাচর ব্যপ্ত ব্রহ্মকে দেখতে পান, উপলব্ধি করেন। ভারতবর্ষীয় ধর্মের ইতিহাসে 'গুরু' নামক ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারী অনেক সময়ই গুরুকে মধ্যস্থতাকারী বললে অব্যাপ্তি দোষ ঘটবে, ঈশ্বরের প্রকাশক সত্তার

---

[১৮] ঠাকুর, অমরেশ্বর. *নিরুক্তম্.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৬. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৯০৮

কল্পনা মুখ্যত তন্ত্রের মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা যায়। লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মধ্যেও গুরুর বিশেষ প্রাধান্য দেখতে পাচ্ছি। যোগ দর্শনের ক্ষেত্রেও আমরা গুরুর বিশেষ অবস্থানের কথা পাব। ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্মের তন্ত্র সম্পৃক্ত শাস্ত্রগুলিতে 'গুরু'র উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। *জ্ঞানসিদ্ধি* নামক তন্ত্র গ্রন্থে গুরু-র বিভিন্ন যোগ্যতার কথা বর্ণিত হয়েছে। *প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয় সিদ্ধি* নামক শাস্ত্রে গুরুকে বুদ্ধের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। উমানন্দ নাথ-এর 'নিত্যোৎসব' নামক রচনায় তিনি তাঁর দীক্ষাদাতা গুরু অসুরানন্দ নাথ-কে বিশ্বের সর্বজ্ঞ বলে সম্বোধন করেছেন। তবে *কুলার্ণব তন্ত্র* এবং *জ্ঞান সিদ্ধি* গুরুর বিভিন্ন যোগ্যতার কথা বর্ণনা করেছে এবং সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন থাকবার নির্দেশও দিয়েছে। *সারদাতিলক*-এ গুরুর যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি যেন আগম শাস্ত্র এবং বেদে পারদর্শী হন, তাঁর বাক্য যেন সত্য হয়, স্বভাব যেন শান্ত হয়। এরপাশে তিনি যেন গুহ্য শাস্ত্রে পারঙ্গম হন এবং তাঁর শিষ্যরাও গুরুর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে গুহ্য রাখতে সমর্থ হয়। তবে *কঠোপনিষদ, ছান্দগোপনিষদ*-এর মতো ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিও একথা মনে করে গুহ্য শিক্ষা গুরু ব্যতীত লাভ করা অসম্ভব, কেবল শাস্ত্রপাঠ কোনো অর্থ তৈরি করতে পারে না। আমাদের বর্তমান গবেষণা মূলত তন্ত্র যে অর্থে গুরুকে ব্যাখ্যা করে তার উপর-ই নির্ভরশীল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন আভিধানিক অর্থে গুরু এবং আচার্য সমার্থক, বাস্তব ক্ষেত্রেও একই মানুষের মধ্যে দুটি কাজের সমবায়ও দেখা যায়। সাধনার ক্ষেত্রে এবং তন্ত্র ও যোগ সাধনায় ধ্যান এবং অন্যান্য শরীরকেন্দ্রিক কার্যপদ্ধতিতে গুরু ব্যতীত কিছু সম্ভব নয় বলেই শাস্ত্রের নির্দেশ। তবে প্রাচীন শাস্ত্রের অভিপ্রায় সব সময় পরবর্তীকালের গবেষকরা অনুধাবন করছেন বলে মনে হয় না। যেমন Earnest Wood তাঁর *Yoga Dictionary*–তে গুরু শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলছেন—

> In the Old Books there is the frequent advise to the aspirant to Yoga that he (or she) should obtain information and instructions from the guru or teacher. The word 'Guru' means literally a weitghty person, one whose words are worthy of the most respectful consideration not a dictator but a consultant. In modern days books have large by taken the place of the gurus, and many people are getting much benefit by the practice

of selected portions of the Yoga techings, which they follow with discrimination and in moderation.[১৯]

এখানে মূল সমস্যাটি হল গুরুর অবস্থান কোনো সময়েই গ্রন্থ নিতে পারে না। এমনকী সাধনা অথবা গুহ্যসাধনার সঙ্গে যুক্ত না হলেও আচার্য-র স্থানও কখনোই শাস্ত্র নিতে পারবে না, মোট কথা নির্দেশমূলক গ্রন্থ (prescriptive Text) থাকা সত্ত্বেও সেগুলি স্বপ্রকাশিত নয় বলেই ভারতবর্ষীয় শাস্ত্র পরম্পরার নির্দেশ।

গুরু শব্দটি তন্ত্র শাস্ত্রে কীভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা দেখার পর এবার সংস্কৃত সাহিত্যে গুরু শব্দটির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। সংস্কৃতে গুরু শব্দটি অনেক সময়েই বয়সে বড় বা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। *মনুস্মৃতি* অনুযায়ী যিনি বিপ্র নিষেক ইত্যাদি সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত তিনিই গুরু। বাণভট্ট-র *কাদম্বরী* অথবা দণ্ডী-র *দশকুমারচরিত*-এ সৎ পরামর্শদাতাকে গুরু বলা হচ্ছে। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*-এ গুরুর সঙ্গে ভক্তির সরাসরি সম্পর্ক দেখা যায়। তবে খুব অল্প হলেও 'আচার্য' শব্দটির সঙ্গেও ভক্তির সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে *হর্ষচরিত* অথবা *সৌর পুরাণ*-এর মতো গ্রন্থে। ভক্তির পাশাপাশি আরও কয়েকটি শব্দ গুরুর সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন, 'সৌন্দরানন্দ' কাব্য অনুযায়ী 'নাম' আবার সেবার সঙ্গেও গুরু শব্দটির সংযোগ দেখা যায়। তবে গুরু শব্দটির সঙ্গে অধিকাংশ সময়েই স্নেহ, বাৎসল্য, লজ্জা প্রভৃতি আবেগের সংযোগ স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে। গুরু তাঁর শিষ্যের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নাতীত আরাধ্য। গুরুকে কখনোই অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়, তাঁকে কখনো পরিহাস করা যাবে না, তিনি নিন্দার অযোগ্য। আচার্যের সঙ্গে বিবাদে উপনীত হওয়া গেলেও গুরুর সঙ্গে কখনও বিবাদ করা যাবে না। সুতরাং আচার্য এবং গুরুর ধারণার মধ্যে কয়েকটি মূলগত পার্থক্য খেয়াল করা যেতে পারে। প্রথমত আচার্য অনেক সময় শিল্পের শিক্ষা দান করে থাকেন কিন্তু শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরু শব্দটির প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না। আচার্যদের পুরোহিত বলে সম্বোধন করার রীতি থাকলেও গুরুর ক্ষেত্রে এজাতীয় প্রয়োগ দেখা যায় না। আচার্য শব্দটি অনেক

---

[১৯] Wood, Earnest. *Yoga Dictionary*. New York: Philosophical Library. 1965. 1st Edition. pp. 57-58.

সময়ে উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন—বল্লভাচার্য, আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত। গুরু শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয় না। আবার ভক্তি, শুশ্রূষা, পূজন জাতীয় শব্দ মূলত গুরুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে, আচার্যদের ক্ষেত্রে নয়। পাশুপত শৈব ধর্মের একটি গ্রন্থ *রত্ন-টীকা* আচার্য এবং গুরুর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য নির্দেশ করে। প্রথমত, গুরুকে 'অনুগ্রহকারিন' বলা হয় অর্থাৎ যিনি ভক্তদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন আর আচার্য হলেন মুক্তিদাতা। দ্বিতীয়ত, গুরু সর্বদাই মান্য, তাঁর বাক্য কখনো কখনো শাস্ত্রবাক্যেরও উর্ধ্বে, কিন্তু আচার্যের প্রদত্ত নিদান শিষ্যেরা ঠিক অথবা ভুল এই বিচার করতে পারেন। গুরু ভক্তের মনের পাপ দূর করেন, ভক্ত তাঁর শরণাগত হতে বাধ্য। অপরদিকে আচার্য শিষ্যকে যথার্থ বেদোচ্চারণের শিক্ষা দান করেন, জ্ঞান প্রদান করেন, অজ্ঞানতা দূর করতে সাহায্য করেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অনেকটাই আবেগকেন্দ্রিক অন্যদিকে আচার্য এবং অন্তেবাসীর সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এবং বৌদ্ধিক। শেষত শাস্ত্র অনুযায়ী আচার্যকে হত্যা করা পিতা-মাতাকে হত্যা করার সঙ্গে তুলনীয় অথচ যিনি গুরুঘাতক তাঁর পাপ হল জগতের পাঁচটি প্রধান পাপেরও অধিক। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের *মহাভারত*-এর বাণ পর্বে পাঁচজন গুরুর কথা বলা হয়েছে—পিতা, মাতা, মন্ত্রদাতা গুরু, অগ্নি এবং আত্মন। আচার্য বেদব্যাসের বেদ বিভাজনের সূত্রে চার বেদ এবং পরবর্তী কালে পুরাণকে কেন্দ্র করে বেদপাঠ, অধ্যয়ন, ব্যাখ্যা এবং শিক্ষাদানের পরম্পরা গড়ে উঠেছে[২০]। তবে এখানে গুরু পরম্পরার কথা বলা হলেও তা যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আচার্য পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই বিবেচিত হবে।

এরপর আমরা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং তন্ত্র পরম্পরার বাইরে অন্য কয়েকটি ধর্ম সম্প্রদায়ে ধর্মগুরু অথবা তৎস্থানীয় ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব। ইহুদিদের মধ্যে ধর্মীয় পুরোহিতের ধারণা রয়েছে এবং তাদের মতানুযায়ী কোহনিম নামক শাখাই দৈব

[২০] Mani, Vettam. *Puranic Encyclopaedia*. Delhi : Motilal Banarsidass. 1975. 1st Edition. pp. 304-306.

সাধনার অধিকারী। ঐতিহাসিকরা ইজরায়েল এবং ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে পুরোহিত বৃত্তিকে দুটি সময়ের ইতিহাসে ভেঙে দেখেন—Biblical এবং Post Biblical সময়। Post Biblical সময়কে ইহুদি সংস্কৃতিতে Second Temple Era বলা হয়। ৫৮৬ খ্রি.পূ. থেকে শুরু করে খ্রি. ৭০ অবধি সময়কে Second Temple Era বলে চিহ্নিত করা হয়।[২১] এখানে *বাইবেল* বলতে মুখ্যত হিব্রু ভাষায় রচিত *Old Testament* জাতীয় রচনাকে বোঝানো হয়েছে। তবে ইহুদি সংস্কৃতিতে পুরোহিত তন্ত্র কেবল ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে নয় সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও অত্যন্ত জরুরি। প্রথম দিকে অর্থাৎ খ্রি.পূ. ৫৮৬-র আগে যখন ব্যবিলনীয়রা প্রথম মন্দির ধ্বংস করেনি তখন কোহনিমরা সিনাগগের যাবতীয় প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, সাধারণ মানুষকে আশীর্বাদ তথা ধর্মোপদেশ দিতেন। তবে পরবর্তী সময়ে কোহনিমদের সঙ্গে দৈনন্দিন প্রার্থনা এবং সিনাগগের দূরত্ব তৈরি হয়। ইহুদি পুরোহিতেরা একটি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বিষয়গুলি শিখতেন। তবে ইহুদি সংস্কৃতিতে পুরোহিতের পাশাপাশি নবীর ধারণাও ছিল।[২২] Second Temple Era অবধি ইহুদি সংস্কৃতিতে পুরোহিতদের অবস্থান ধর্মীয় নেতৃত্বের পাশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দেখা যায়। তবে পুরোহিতদের সংসদ তৈরি করে দেশ নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিক অস্বীকার করেন।

ইহুদি ধর্মের পরে আমরা দুটি ইব্রাহামিক ধর্মের কথা বলব। ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্ম। ইহুদি ধর্মের কথা ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে একটু আরোপিত বলে মনে হতে পারে। অথচ ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষ ভারতবর্ষে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে চলে এসেছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায়। কোচিন এবং মহারাষ্ট্রে অনেক আগেই ইহুদিরা বসবাস শুরু করেন; তবে ইংরেজ শাসন আমলে এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রচুর সংখ্যায় কলকাতার বাসস্থান ত্যাগ করে ইসরায়েল চলে

---

[২১] www.oxfordbibiography.com accessed on 20.04.19.

[২২] Terry, Michael. *Reader's Guide to Judaism.* London : Fitzaroy Dearborn Publishers. 2000. pp. 495-497.

যায়[২৩]। এর পরেও ভারতবর্ষের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ইহুদিদের অবদান আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। একত্র অবস্থান করার সুবাদে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই ধর্ম অপর সহবস্থানকারী ধর্ম এবং মূল্যবোধে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। মূলত দরবেশ-সুফিদের হাত ধরে এবং কিছুটা বাণিজ্যের সূত্রে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে মূলত পাঞ্জাব এবং পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তীর দরগা অত্যন্ত প্রাচীন।[২৪] পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সুফি-দরবেশদের যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক। তবে সুফি পরিভাষা এবং শরিয়তী ইসলামে ব্যবহৃত পরিভাষার মধ্যে যথেষ্ট ফারাক আছে।[২৫] বর্তমানে আমরা শরিয়তী ইসলামের পরিভাষাগুলিকে কেন্দ্র করে আলোচনা করব। যদিও ইসলাম নিরাকার-একেশ্বরের ধারণায় বিশ্বাসী, তা সত্ত্বেও ইসলামি রীতি-নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্থানীয় এবং উচ্চস্তরীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের কথা পাই। অনেক সময়েই স্থানীয় স্তরে মসজিদের সঙ্গে মাদ্রাসা এবং মখতবে শিক্ষা প্রদান করা হত। স্থানীয় স্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য কাজি এবং মৌলবীরা থাকতেন। তাঁদের উপর থাকতেন ইমাম। ইসলাম ধর্মে শিয়া-সুন্নির বিভাজন স্পষ্ট হলেও ধর্মটির একটি প্রাতিষ্ঠানিক গঠনতন্ত্র রয়েছে। একারণে সারা পৃথিবীর যাবতীয় ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের ধর্মীয় জীবনে খলিফার ধারণা অত্যন্ত জরুরি। খলিফা ইসলামে যুগপৎ ধর্ম এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। নবি হজরত মহম্মদ ইসলামের প্রথম খলিফা। কোরাণ এবং হাদিস-এর ব্যাখ্যা হোক অথবা কোনো একটি সময়কে স্থির করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন—যাবতীয় নির্দেশ ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে দেওয়া হয়।[২৬] রাজত্ব বলতে কোরাণের পরিভাষায় 'মুল্ক' (Mulk, বাংলায় মুলুক) এবং রাজাকে মালিক বলা হলেও তিনি মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য কাউকে সে ক্ষমতা প্রদান করেন। কোরাণ-

---

[২৩] তদেব, পৃ. ২৮৮-২৮৯

[২৪] সেন, ক্ষিতিমোহন. *ভারতীয় সাধনার ধারা.* কলকাতা: বঙ্গীয় কলা কেন্দ্র. ২০১০. প্রথম সং. পৃ. ০৪

[২৫] দত্ত, মিলন. *চলিত ইসলামী শব্দকোষ.* কলকাতা : দে'জ. ২০১১. প্রথম সং. পৃ. ১৩০

[২৬] Bosworth, C.E. & Others Edited. *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden : E.J. Brill. 1986. 1st Edition p. 781

এর মতে আল্লাহ-ই প্রকৃত মালিক, তবে তিনি মাঝে মাঝে খলিফাকে দায়িত্ব দেন। আরবি খলিফা শব্দটির মধ্যে ধাতুগত ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত এই ইঙ্গিতটি কাজ করে (Deputyship অর্থাৎ সহযোগী)।[২৭] অর্থাৎ এখানে খলিফা রাজত্ব তথা ধর্মীয় জীবন চালানোর দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ-র থেকে পেয়েছেন। তবে একথাও মনে রাখতে হবে শাসকের সঙ্গে ইসলামের ধর্মীয় শাসনের প্রসঙ্গটি তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উলেমা, কাজি এদের সঙ্গে অনেক সময়েই রাজশক্তির বিরোধ তৈরি হয়। প্রসঙ্গত আমাদের আকবর প্রবর্তিত মহজার নামক ফরমানটির কথা মনে পড়বে।[২৮] এই ঘোষণাপত্রে কয়েকজন উলেমার স্বাক্ষর ছিল এবং যার মূল বক্তব্য ছিল শাসক চাইলে হাদিসের একটি ব্যাখ্যা নির্বাচন করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে কোরাণ-এর কোনো সরাসরি নির্দেশের বিপরীতে যাওয়ার ক্ষমতা শাসকের থাকছে না। এই ফরমানটি তৎকালীন ধর্মীয় নেতৃবর্গের কাছে অত্যন্ত নিন্দিত হয়। তবে পরবর্তী সময়ে গবেষকদের আকবরের ফরমানটির একটি বিশেষ প্রেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে আকবর নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রকের স্থানটি অনেক সময়ই সরাসরি রাজনীতির অংশ হিসেবে উঠে এসেছে।[২৯] খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষেত্রেও রাজমুকুটের সঙ্গে ধর্মের সরাসরি সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে চৈতন্য সমকালেই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা চলে এসেছে বলে সুকুমার সেন-এর অনুমান।[৩০] আবার মোগল শাসকদের থেকেই প্রথম বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা। ভারত তথা বঙ্গদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তাই খ্রিস্টীয় ষোড়শ থেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বোঝা যাচ্ছে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে খ্রিস্টান

---

[২৭] McAuliffe. Jane Dammen. *Encyclopaedia of the Quar'an* (Vol-III). Leiden: Brill. 2003. Reprint. pp. 90-95

[২৮] Habib, Irfan. *Religion in Indian History*. New Delhi: Tulika Books. 2007. 1st Edition. pp. 160-161

[২৯] তদেব, পৃ. ১৬২

[৩০] সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: আনন্দ. ২০০৭. ৮ম মুদ্রণ. পৃ. ২৭৪

ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিশপকে পোপ বলে সম্বোধন করা শুরু হয়। পোপ শব্দটি ল্যাতিন 'Papa' থেকে উদ্ভূত। তবে পরবর্তী সময়ে পোপ শব্দটি কেবল বিশপ অর্থে নয় সাধারণ খ্রিস্টীয়পুরোহিত অর্থেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে।[৩১] তবে খ্রিস্টীয়সপ্তম শতক থেকে মুখ্যত রোমের খ্রিস্টীয়নেতৃত্বকে পোপ বলে সম্বোধন করা শুরু হয়।[৩২] ওপরের দিক থেকে প্রথমে পোপ, তারপর বিশপ এবং তারপর চার্চের উচ্চপদস্থ পুরোহিত—এই পর্যায়ক্রমে খ্রিস্টধর্ম রোমে (মূলত ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রে) চালিত হয়।[৩৩] অতএব রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরোহিত তন্ত্রের প্রত্যক্ষ যোগ ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে। ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্রের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক গবেষণা করেছিলেন আনন্দ কুমার স্বামী।[৩৪] *ঐতরেয় জাতক*-এর প্রসঙ্গ উদ্ধার করে কুমারস্বামী দেখান রাজা এবং পুরোহিতের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই বিধিসম্মত সংস্কার অনুযায়ী 'বৈবাহিক' সম্পর্ক স্থাপিত হত।[৩৫] এক্ষেত্রে 'বিবাহ' শব্দটিকে বর্তমান প্রয়োগে নারী-পুরুষের সম্পর্ক হিসেবে দেখা যাবে না। 'অমরকোষ টীকা' অনুযায়ী বিবাহ শব্দটির অর্থ বহন বা স্বীকার করা।[৩৬] বিষয়টিকে তুলনা করা হয়েছে 'দ্যাবা-পৃথিবী'র সম্পর্কের উপমায়। দ্যাবা অর্থাৎ আকাশ তুলনীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে, যিনি বিবাহে পুরুষরূপে তুলনীয় এবং পৃথিবী তুলনীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যিনি স্ত্রীরূপে তুলনীয়। 'ক্ষত্রিয়' শব্দটির মধ্যে 'ক্ষেত্র' শব্দটি রয়েছে, যাকে কর্ষণ করতে হয়। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের

---

[৩১] Levillain, Philippe. *The Papacy An Encyclopedia* (Vol – II). London : Routledge. 2002. 1st Edition. p. 1227

[৩২] Marthaler, Berard. L. *New Catholic Encyclopedia* (Vol – XI). USA : Thomson Gale. 2003. 1st Edition. pp. 495-496

[৩৩] Hedlund, Roger. *Oxford Encyclopaedia of South Asian Christianity* (Vol – II). Delhi : Oxford University Press. 2012. p. 447

[৩৪] Coomaraswamy, Ananda. K. *Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government*. Connecticut : American Oriental Society. 1942. 1st Edition

[৩৫] তদেব, পৃ. ১

[৩৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১). নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১. অষ্টম মুদ্রণ. পৃ. ১১৩৯

রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে সম্পর্কটি করয়িত্রী এবং কর্তৃ-র সম্পর্ক। ব্রাহ্মণ করয়িত্রী, তিনি মনস্থির করেন আর ক্ষত্রিয় সেই কর্মটি সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে আরেকটি উপমাও ব্যবহৃত হয়েছে— মিত্রবরুণ এই যুগ্ম দেবতা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের যুগ্মতাকে প্রমাণ করে।[৩৭] মিত্র এবং বরুণের বিবাহ হলে অর্থাৎ মিত্র এবং বরুণ একত্র হলে বর্ষণ হয়, পৃথিবী শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। বরুণ একার ক্ষমতায় বর্ষণের ক্ষমতা রাখেন না। ব্রাহ্মণের করা যাগ-যজ্ঞের পুণ্যেই বৃষ্টি হয়, ধরিত্রী ফসলে পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত রাজার ক্ষমতা সর্বনাশেরই সূচনা করে। রাজাকে পরামর্শ নিতে হয় ব্রাহ্মণের, ধর্মদণ্ড ব্রাহ্মণ ধরে রাখে। রাজার শক্তি নশ্বর, মূর্ত এবং ব্যক্ত, ব্রাহ্মণের ক্ষমতা অবিনশ্বর, বিমূর্ত এবং অব্যক্ত। রাজশক্তি এবং পুরোহিত তন্ত্রের সম্পর্কটিকে ভূতাত্মন্ বা দেহাত্মনের সঙ্গে পরমাত্মন বা বৈশ্বনরাত্মনের সম্পর্ক হিসাবে বৈদিক সাহিত্যে দেখানো হয়েছে। ক্ষত্রিয় লৌকিক বুদ্ধির অধিকারী, রাজ্য চালানোর জন্য তাকে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয়। অভ্যন্তরে রাজা হবেন ঋষি এবং প্রকাশে হবেন রাজা। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় প্রকৃতপক্ষে চালিত হবেন ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধি এবং মতাদর্শে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা রাজশক্তিকে সমাহিত হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ নিজেকে প্রকাশ করবে না, অথচ ভেতর থেকে রাজশক্তিকে চালনা করবে।[৩৮] অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকলেও ক্ষত্রিয় নিয়ন্ত্রিত হবে ব্রাহ্মণ্য শক্তির মাধ্যমে। ধর্মবুদ্ধি এবং অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ তার নিয়ন্ত্রণ অলক্ষে থেকে রাজশাসন বজায় রাখবে—এমনটাই বৈদিক সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেন আনন্দ কুমারস্বামী। ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা সরাসরি ক্ষমতা ভোগ করেন, ব্রাহ্মণ্য কাঠামোয় এই প্রক্রিয়া চলে ভিতর থেকে। ব্রাহ্মণের পরামর্শে রাজত্ব শাসন এটি কখনোই ভারতীয় রাজতন্ত্রের মূল অথবা প্রধান নীতি বলা না গেলেও এই প্রবণতাটি ভারতবর্ষীয় রাজতন্ত্রে ছিল। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্মও বারংবার রাজাদের শীল এবং চর্যা পালন করতে বলতেন। রাজাদের ধর্মজিজ্ঞাসা এবং তত্ত্বে আগ্রহের প্রমাণ রাজা মিলিন্দ এবং ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথনে। অতএব পুরোহিত বলতে

---

[৩৭] Coomaraswamy, Ananda. K. *Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government*. Connecticut : American Oriental Society. 1942. 1st Edition. p. 34

[৩৮] তদেব, পৃ. ৮৫

ভারতীয় ধর্মকাঠামোতে তাদের কথাই বোঝানো হচ্ছে যারা যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে প্রায়োগিক এবং ফলিত ধর্মজ্ঞানের প্রাধান্য প্রবল।

এবার আমরা উপজাতি (Tribal) সমাজে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। সাধারণভাবে মনে করা হয় তথাকথিত উপজাতি সমাজ-ই 'ক্রমোন্নতি'র মাধ্যমে 'মূল স্রোত'-এর সমাজে বিবর্তিত হয়। একারণে কয়েকটি উপজাতির উদাহরণ থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব মানুষের 'আদি' বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট। উপজাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে কাজ করার সূত্রে সকলেই স্বীকার করেন কোনও ক্ষেত্রেই মানুষের বিশ্বাস আদি এবং অবিমিশ্র রূপে থাকতে পারে না। তা সর্বত্রই পার্শ্ববর্তী ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে ত্রিপুরার অধিকাংশ উপজাতির মধ্যেই হিন্দু প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে। একারণে বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা পৃথক ভাবে নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাসের পাশাপাশি নতুন ধর্মের দেবতার উপাসনা করে।[৩৯] মানুষের বিশ্বাস এবং নীতি-র ভিত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে নৃতত্ত্ব ধর্মের ত্রিবিধ প্রকাশ নিয়ে কথা বলে[৪০]—১) Dogma, ২) Ritual, ৩) Ethics—এই তিনটি উপাদানের মধ্যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা পুরোহিতেরা মূলত যুক্ত নানারকম কর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে। প্রাচীন জনজাতির মধ্যে পুরোহিততন্ত্র প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন জেমস্ ফ্রেজার। জেমস্ ফ্রেজার তাঁর গবেষণায় ভারত এবং মিশরে পুরোহিতদের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন প্রাথমিক অবস্থায় এখানে পুরোহিততন্ত্র জাদু বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৪১] অর্থাৎ পুরোহিতেরা তাঁদের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতেন এবং সাধারণ মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার কারণেই তাঁদের সম্মান করতেন। ইউক্রেন এবং রাশিয়াতেও দেখা যাচ্ছে শস্য উৎপাদনের জন্য পুরোহিত শস্যকে আশীর্বাদ করেন অথবা

---

[৩৯] Bhowmik, Dwijendra Lal. *Tribal Religion of Tripura*. Calcutta : Accuracy. 1997. 1st Edition p. 19

[৪০] Brownislaw, Malinowski. *The Foundatio of Faith and Morals*. New York : Richard West. 1979. p. 28

[৪১] Frazer, James. *THe Golden Bough A Study in Magic and Religion*. England : Penguin Books. 1996. Reprint. pp. 61-63

শস্যক্ষেত্রে গড়াগড়ি দেন।[৪২] ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপজাতিদের উপর গবেষণাতেও দেখা যাচ্ছে পুরোহিত অথবা গুরুদের জাদুবিদ্যার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।[৪৩] মুণ্ডা সমাজে পুরোহিতদের পাশাপাশি ডাইনি বিদ্যার অধিকারী কিছু মানুষ সমাজে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বাস করে। অতএব পুরোহিত পরিবারের তথা কৌমের মঙ্গলের জন্য নানা অনুষ্ঠান পালন করতেন অন্যদিকে ডাইনি বিদ্যার অধিকারী মানুষেরা কৌমকে নানাবিধ বিপদ থেকে রক্ষা করতেন।[৪৪] উপজাতি সমাজে অতিপ্রাকৃত জগৎ এবং সাধারণ মানুষের লৌকিক জগতের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য পুরোহিতের কল্পনা করা হয়েছে। নারী অথবা পুরুষ, বৃদ্ধ অথবা জোয়ান যাদের মধ্যে অতিস্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক মানসিক ক্রিয়ার সমবায় দেখা যায় তারাই অনেক সময় পৌরোহিত্যের কাজ করেন। সমাজ এদের বিশ্বাস করে, এদের ক্ষমতাকে ভয় পায়, সমাজ-ই এদের ক্ষমতা দেয় আবার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নেয়। আবার যদি পুরোহিতেরা তাদের সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ সমাজের বিপরীতে করে সেক্ষেত্রে উপজাতির সমাজ এদের ধ্বংস করতেও পিছু পা হয় না।[৪৫] নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন জাদুবিদ্যা ক্রমশ যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ধর্মের চেহারা পায়।[৪৬] প্রসঙ্গত পূর্ব আইবেরিয়ার তুঞ্জুজ উপজাতি 'শামান'দের কথা বলা যেতে পারে। 'শামান' শব্দটি সংস্কৃত শ্রমণ এবং পালি 'সমন'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। শামানরা ঔষধবিদ্‌ এবং জাদুশক্তির অধিকারী। সাধারণের অসুখ সারানো, ভবিষ্যৎ বর্ণন, প্রকৃতিকে প্রভাবিত করা

---

[৪২] তদেব, পৃ. ১৬৫

[৪৩] Sinha, A.P. *Religious Life in Tribal India.* New Delhi : Classical Publishing Company. 1989. 1st Edition. p. 91

[৪৪] Mukhopadhyay, Sankarananda. *The Austrios of India (Their Religion and Tradition).* Kolkata : K.P. Bagchi & Company. 1975. 1st Edition. pp. 116-118

[৪৫] Hodson, T.C. *THe Primitive Culture of India*. London : The Royal Asiatic Society. 1992. 1st Edition. pp. 114-115

[৪৬] Golden Weiser, Alexander. *Anthropology : An Introduction to Primitive*. Bombay : George G Harrap & Co. Ltd. 1917. 1st Edition. p. 208

অথবা শত্রু দমন প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকার শামানদের রয়েছে।[৪৭] সাঁওতাল সমাজে কৌমের সাধনার পাশাপাশি পারিবারিক দেবতার কথা পাওয়া যায়। এই দেবতা-র নাম পরিবারে একমাত্র বাড়ির কর্তা জানেন, মৃত্যুর পুর্বে বাড়ির কর্তা তাদের দেবতার কথা বাড়ির বড় ছেলেকে বলে যান। পরিবারের এই গোপন আরাধ্যকে বলা হয় Aloge Bonga এবং পরিবারের সকল সদস্যের আরাধ্যকে বলা হয় Orak Bonga।[৪৮] পরিবারে গোপন দেবতার আরাধনার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। কৌমের সকলের সাধারণ মঙ্গল এবং বিভিন্ন রকম ধর্মীয় উপস্থাপনের জন্য সাঁওতাল গোষ্ঠীতে ন্যাকে (Naeke) অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত এবং কুড়ম ন্যাকে অর্থাৎ সহকারী পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। এসকল পুরোহিতের নির্বাচন হয় অতিপ্রাকৃত শক্তির মাধ্যমে। এদের প্রধান কাজ বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময়ে গ্রামের প্রধান আত্মার উপাসনা করা। সমাজের আইন, বিচার তথা অন্যান্য প্রশাসনিক ক্ষমতা মুখ্যত গ্রামের প্রধান পুরোহিতের উপরেই বর্তায়।[৪৯] ওঁরাও সমাজ চাষবাস সংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হচ্ছে।[৫০] ওঁরাও সমাজেও পুরোহিতেরা জাদু বিদ্যার অভ্যাস করেন, নিজেরা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করেন। তবে গ্রামের পুরোহিত সাধারণত কৌমের মঙ্গলের জন্যই নানা অনুষ্ঠান পালন করেন, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অথবা ধর্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য নয়। উপজাতীয় সমাজ ক্রমশই পরিবেশ-প্রকৃতির উপাসনার থেকে সরে আসছেন। ওঁরাও সমাজে অন্তত রাঁচি তথা ঝাড়খণ্ড কেন্দ্রিক গবেষণায় (১৯৮৯ সাল) দেখা যাচ্ছে হিন্দু

---

[৪৭] Risley, Herbert. *The People of India*. Calcutta & Shimla: Thacker, Spink & Co. 1915. 1st Edition. pp. 220-221

[৪৮] O'Malley, L.S.S. *Santal Parganas*. Calcutta: West Bengal District Gazetters, Department of Higher Education, Govt. of West Bengal. 1999. pp. 141-146

[৪৯] Troisi, J. *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices among the Santals*. New Delhi: Monohar. 1978. p. 61

[৫০] Roy, Sarat Chandra. *The Oraons of Chotonagpur (Their History, Economic Life and Social Organisation),* Ranchi: []. 1984. p.86

এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রভূত প্রসার লাভ করেছে।[৫১] উপজাতি সমাজে প্রকৃতি উপাসনা এবং চাষবাস সংক্রান্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে পুরোহিতদের যোগদানের কথা সাঁওতাল সমাজেও বিশেষ ভাবে দেখা যায়। আষাঢ় মাসে ধান বোনার সময় পুরোহিতরা চাষীদের হাতে ধান তুলে দেয়, ভাদ্র মাসে পুরোহিতেরা স্নান করে পবিত্র ফল সংগ্রহ করতে যান আবার কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে গ্রামের মঙ্গলের জন্য পুরোহিতরা পশুবলি দিয়ে থাকেন।[৫২] বিহার, বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের পালামৌ অঞ্চলে চেরো নামক উপজাতি বাস করে। এদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম একটি নতুন এলাকায় বসতি বসায়, গ্রামপত্তন করে তাকেই পুরোহিতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এদের পুরোহিতের পদ বংশানুক্রমিক। পুরোহিতের নিজের সন্তান না থাকলে স্বপ্নাদেশে তিনি পরবর্তী পুরোহিত নির্বাচন করে থাকেন। ১৯৬৩-৬৩-তে করা ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে চেরো উপজাতি অনার্য দেবতার পাশাপাশি কিছু পৌরাণিক দেবতারও উপাসনা করে থাকে। পৌরাণিক ক্রিয়াকর্মের জন্য এরা মূলত শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করে। এই ব্রাহ্মণেরা কেবল পৌরাণিক দেবতার সাধনার সঙ্গে যুক্ত, অন্য উপজাতীয় আরাধনা ব্রাহ্মণেরা করে না।[৫৩] নৃতত্ত্ব এবং ধর্মের সম্পর্ক বোঝার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পলিনেশিয়ার উপরে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে পলিনেশিয়া তথাকথিত মূল স্রোতে অনেক পরে সংযুক্ত হয়েছিল। একারণে এই অঞ্চলে আদিম ধর্ম বিশ্বাস অনেকটাই অবিকৃত রয়েছে বলে নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। এই গবেষণায় দেখান হয়েছে ধর্ম এবং তৎসংক্রান্ত তত্ত্ব কাঠামো তিনটি স্তরে গড়ে ওঠে। প্রথমে মানুষ নিজেদের অস্তিত্বের কারণ বোঝার জন্য দেবতার কল্পনা করে (Man creates his Gods)। দ্বিতীয় স্তরে মানুষ মনে করে দেবতার থেকেই তাদের জন্ম, দেবতা সংক্রান্ত নানা বিশ্বাস তাদের মনে তৈরি

---

[৫১] Kujur, SR A.A. *The Oraon Habitat : A Study in Cultural Geography.* Ranchi : The Daughters of S.T. Anne. 1989. 1st Edition. p. 170

[৫২] Bodding, P.O. *Traditions and Institutions of the Santals.* New Delhi : Gyan Publishing House. 2001. 1st Edition. pp. 135-136

[৫৩] Mohan, Hari. *The Chero: A Study in Aculturation.* Ranchi : Bihar Tribal Welfare Research Institute. 1973. 1st Edition. pp. 89-90

হয়। দেবতার সঙ্গে পবিত্র, অলৌকিক, ট্যাবু প্রভৃতি ধারণার জন্ম হতে থাকে। দেবতাকে অশ্রদ্ধা করলে মানুষের শরীর খারাপ হবে এধরনের বিশ্বাস তাদের মনে তৈরি হয়। পরিবারের মধ্যে যিনি পূর্বপুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন তার মধ্যেই দেবত্ব আরোপিত হতে থাকে (The God create Man)। শেষ পর্যায়ে সেই দৈব ক্ষমতার অধিকারী, লৌকিক এবং অলৌকিক জগতের মধ্যস্থতাকারী মানুষটিই পুরোহিত হয়ে ওঠে। এই পুরোহিত ক্রমে সম্মান এবং সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করে তাঁর বিভিন্ন জাদুবিদ্যার ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত করতে থাকেন। তাঁকে কেন্দ্র করে নানা গল্প তৈরি হয় যা থেকে পরে ধর্মীয় তত্ত্ব নির্মিত হয়। এই পুরোহিতরা নানা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করেন, দেবতা সংক্রান্ত বিবিধ ব্যাখ্যা নির্মাণ করেন। এভাবে দেবতার উপরে মানুষের নির্মিতি ক্রমে চেপে বসে (The Death of God)।[৫৪] নৃতত্ত্বের এই ব্যাখ্যায় জেমস্ ফ্রেজারের পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়নি, পরবর্তী কালের গবেষক জং হু (Jung Who)-র পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

ভারতীয় জনজাতির মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা কিরাতেরা। মূলত সংস্কৃত মহাকাব্য ধারা এবং তৎপূর্বে বেদব্যাসের *মহাভারত*-এর থেকেই কিরাতদের কথা পাওয়া যাচ্ছে। কিরাতরূপী শিব অর্জুনকে পরাস্ত করেন এবং তৎপরে যুদ্ধশিক্ষা এবং ব্রহ্মাস্ত্র দান করেন। কিরাত সংস্কৃতির প্রভূত প্রভাব আর্য সমাজে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে পৌরাণিক সংস্কৃতিতে প্রসার লাভ করে। শুক্ল যর্জুবেদের বাজসনেয়ী সংহিতা এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'কিরাত' শব্দটি প্রাথমিক ভাবে পাওয়া যায়। পরে অথর্ববেদেও 'কিরাত' শব্দটির উল্লেখ মেলে। প্রাথমিক ভাবে গুহাবাসীদের কিরাত বলা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে কিরাতদের ক্ষত্রিয় বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।[৫৫] পূর্ব ভারতে কিরাত শহর থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা সোমবৃক্ষ সংগ্রহ করতেন। পরবর্তীকালে মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য মতে সোমবৃক্ষের রস

---

[৫৪] Buck, Peter Henry. *Anthropology and Religion*. London : Yale University Press. 1939. 1st Edition pp. 14

[৫৫] Chatterji, Suniti Kumar. *Kirata Jana Kriti*. Kolkata : The Asiatic Society. 2018. Reprint. pp. 27-28

নিয়ে ব্যবসা অপরাধ বলে মনে করা হত।[৫৬] ধর্মসাধনার দিক থেকে কিরাত সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে শক্তি উপাসনা, লিঙ্গ কেন্দ্রিক শৈব উপাসনা, সর্প উপাসনার ধারাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। আবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কিরাত সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছিল পুরোহিত তন্ত্রের ধারণায়। কিরাত সংস্কৃতিতে প্রাথমিক স্তরে নির্দিষ্ট পুরোহিতের ব্যবস্থা ছিল না, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে কিরাত ধর্মব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পড়ায় পুরোহিত তন্ত্র পুরুষানুক্রমিক হয়ে ওঠে। অরুণাচল প্রদেশের গালং (Galong) উপজাতির কথা এখানে বলা প্রয়োজন।[৫৭] এই উপজাতির কোন লিখিত সাহিত্য পরম্পরা তৈরি হয়নি, এদের কোনো লিপির কথাও জানা যায় না। মৌখিক পরম্পরায় এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ কিছু মিথ নিয়ে একটি ধর্মসাহিত্য তৈরি হয়েছে। এই ধর্মসাহিত্য Nyibu Agom নামে পরিচিত। এদের বিশ্বাস অনুযায়ী পুরোহিতরা গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য নানা ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। অশুভ শক্তি থেকে গোষ্ঠীকে রক্ষা করেন।

বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর উদাহরণ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট পুরোহিত তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের জনজাতি সমাজে অনেক আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। একজন অথবা একাদিক দৈব ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের উপর নির্ভর করে একাধিক জনজাতি তাদের ধর্মীয় জীবন পরিচালিত করতেন। আমাদের মনে হয় বৈদিক, বৌদ্ধ এবং তৎপরবর্তী পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে গুরুর ধারণায় উপজাতি সমাজের পুরোহিত তন্ত্রের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তবে স্বাভাবিক নিয়মেই পরবর্তী ধর্ম সাধনায় গুরুর ভূমিকা আরও জটিল এবং বহুমাত্রিক। প্রথমত, সভ্যতার ক্রমোন্নতি, উৎপাদনের হাতিয়ারের পরিবর্তন, কৃষি এবং পশুপালনের বাইরে তৈরি হওয়া জীবিকা, নগর এবং জনপদের প্রতিষ্ঠা, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ধর্মসংস্কৃতিতে পুরোহিতদের কাজ কেবল জন্ম, মৃত্যু, উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধর্মীয়

[৫৬] Singh, G.P. *Kiratas in Ancient India.* New Delhi : Gian Publishing House. 1990. 1st Edition. p. 197

[৫৭] Ete, Tumpak. *Nyibu Agom* (Vol-I). Shilong : Singhania Printing Press. []. [] pp. 1-17

ক্রিয়া-কাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল না। সর্বোপরি জনজাতির ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তথাকথিত মূল স্রোতের ধর্ম বিশ্বাসের ফারাক হল ধর্মদর্শন এবং সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কাঠামোয়। একদাগে বললে জনজাতির বিশ্বাস এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সংহত ভাবে কোনও ধর্মদর্শন তৈরি হয় না, অন্তত ব্রাহ্মণ্য সমাজে যেভাবে শাস্ত্র কেন্দ্রিক ধর্ম দর্শনের পরম্পরা দেখা যায় জনজাতি সমাজে তা দেখা যায় না। বর্তমান গবেষণায় আমরা কেবল শাস্ত্রমূলক ধর্ম পরম্পরার ইতিহাসে মনোনিবেশ করব। সময়ের সঙ্গে ধর্মদর্শনে গুরু ধারণায় বিবর্তন কীভাবে এসেছে আমরা তা বোঝার চেষ্টা করব। যে কোন ধর্মদর্শনের ক্রমবিবর্তন বোঝার প্রধান উপায় হল সাধ্য-সাধন তত্ত্বের পরিবর্তন বোঝার চেষ্টা করা। সাধ্য-সাধন তত্ত্বের পরিবর্তন হলে গুরুর ধারণায় স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবর্তন দেখা যায়। অর্থাৎ আমরা মনে করি গুরুর ভূমিকা ও কার্যবিধি থেকে কোনও ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস বোঝা সম্ভব।

বর্তমান গবেষণা ধর্ম-দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাস বুঝতে চাইছে গুরু ধারণাটির মাধ্যমে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে ধর্ম-দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাস কেবল বাইরে সামাজিক প্রেক্ষিত, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অথবা রাজনৈতিক ইতিহাসের মাধ্যমে পড়লে সব সময়ই অসম্পূর্ণ থাকে। প্রকৃতপক্ষে সাধনার ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন কারণ সাধনা ব্যক্তির উপলব্ধির উপরে নির্ভর করে। অনেক সময়েই সাধকেরা তাদের সাধন উপলব্ধি প্রকাশ করেন না। আবার প্রকাশ করলেও তার সমস্তটা পড়ে ফেলা, সর্বোপরি অনধিকারী হিসাবে কেবল বাইরে থেকে পড়ে সাধনার ইতিহাস লেখা সব সময়েই একদেশদর্শিতা। আবার যারা সাধনার মধ্যে থাকেন তারাও অনেক সময়েই তাদের ইতিহাস লিখতে আগ্রহ বোধ করেন না। লিখলেও তাদের রচনায় ঘোষিতভাবেই একটি অধিকারী-অনধিকারীর সীমা থাকে। যেমন ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ বলেন—

> কৌলমার্গ অতিশয় গোপনীয়; ইহা সাধারণে প্রকাশ করা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ; এই জন্য এই প্রবন্ধে কৌলমার্গের বহু বিষয়ই আলোচনা করা যাইবে না। যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব

> এবং যতটুকু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার আলোচনা দ্বারাই পাঠকের মনে একটা স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।[৫৮]

ব্রাহ্মণ্য ভাবনার একটি পরম্পরা অনুযায়ী ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে তন্ত্র। তন্ত্রের ইতিহাস লেখা হয়েছে মূলত তন্ত্রশাস্ত্রের রচনাকাল, রচনাস্থান বা রচয়িতার ভিত্তিতে। কিন্তু তন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা ধারণার আগে-পরে প্রায়ই বিচার করলেও এই ধরনটি সাধনার দিক থেকে যথাযথ নয়। আমাদের ইতিহাস বোধে পৌর্বাপর্বের ধারণাটি সাধন পরম্পরার অনেক পণ্ডিতেরাই স্বীকার করবেন না। সুতরাং বর্তমান গবেষণার মূল কর্মপদ্ধতিটি অর্থাৎ একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবর্তনের ইতিহাস রচনার প্রকল্প অনেকটাই সাধন পরম্পরা অনুযায়ী শাস্ত্রার্থ বিরোধী।

তথাকথিত আধুনিকের বিজ্ঞান দৃষ্টি দিয়েও সাধনার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। সমাজ ইতিহাসের দৃষ্টিতে পড়া গেলেও মরমীয়া সাধকদের ইতিহাস এভাবে পড়া যায় না। বিষয়টি অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'সচ্চিদানন্দ সম্বোধি রামকৃষ্ণ' (১৯৯৪) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি একজন ঐতিহাসিক কীভাবে একজন ধর্মগুরুকে পড়বেন তার একটি পদ্ধতি আমরা প্রবন্ধটি থেকে পেতে পারে।[৫৯] ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর আলোচনার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেব কীভাবে পূর্বের ধর্মসাধনার থেকে আলাদা হয়েছেন তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় কীভাবে সমসময়ে রামকৃষ্ণদেব নিজস্ব সাধ্য-সাধনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করছেন, গুরুবাদের উপর জোর না দিয়ে সাধনার জগতে ভক্তের স্বাধীনতা স্বীকার করছেন, বিবেকানন্দকে বলছেন "গুরুকে যাচাই করে নিবি"। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর প্রবন্ধ থেকে আমরা বর্তমান গবেষণার পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে চাইছি। বিষয়টিকে সূত্রাকার নীচে লেখা হল—

---

[৫৮] সিদ্ধান্তভূষণ, সতীশচন্দ্র. *কৌলমার্গ সাধনরহস্য.* কলকাতা : প্রাচী. ২০১৮. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ২৫

[৫৯] ত্রিপাঠী, অমলেশ. *ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ.* কলকাতা : আনন্দ. ২০১৮. পৃ. ০৯-৩০ তদেব, পৃ. ২৩৮

প্রথমত, গুরু ধারণাটির বিবর্তনের ইতিহাসকে সাধ্য-সাধনের বিবর্তন এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ক্ষেত্রে দার্শনিক ভাবনার বিবর্তন আলাদা করে চেনার চেষ্টা করা হবে।

তৃতীয়ত, বিবর্তনের ইতিহাস বোঝার জন্য মূলত শাস্ত্র, সাহিত্যিক উপাদান এবং ঐতিহাসিক উপাদানের উপর জোর দেওয়া হবে।

চতুর্থত, গুরু কেবল শাস্ত্রের বিষয় নয়, গুরু একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার অংশ। আমাদের আলোচ্য সময়কালে গুরুরাই সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। ফলে শাস্ত্রের পাশাপাশি সামাজিক পরিমণ্ডলেও মনোনিবেশ করা হবে।

পঞ্চমত, ধর্মদর্শনের বিবর্তন বোঝার চেষ্টা করা হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের মাধ্যমে।

ষষ্ঠত, বর্তমান গবেষণা বঙ্গদেশে বজ্রযান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তথা শাস্ত্রীয় কাঠামোয় গুরু ধারণাটিকে বোঝার চেষ্টা করবে।

সপ্তমত, আমরা ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষিতে গুরু ধারণার বিবর্তনের সাপেক্ষে বঙ্গদেশীয় প্রতিগ্রহণকে বোঝার চেষ্টা করব।

উক্ত গবেষণা পদ্ধতির নিরিখে আমরা বর্তমান গবেষণাকে ভাবতে চাইছি। গবেষণায় মূলত দুটি ধর্মদর্শনের উপরে জোর দেওয়া হবে। আমাদের গবেষণা মূলত বঙ্গদেশের ধর্মদর্শনের ইতিহাসকে বুঝতে চাইছে। একারণে আমরা বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে নির্বাচন করেছি। বঙ্গদেশের গুরুবাদের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষিতের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা দক্ষিণ ভারতের লিঙ্গায়েৎ, নাথ সাধনা, নির্গুণ ভক্তির সাধক সন্ত কবীর, সুফি সাধনা এবং আসামে শংকরদেবের সাধনাকেও পঞ্চম অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করব। লিঙ্গায়েৎদের সাহিত্য কন্নড়ে, বাকিদের রচনা অনেকটাই হিন্দি অথবা অন্যান্য

নব্যভারতীয় আর্যভাষায় পাওয়া যায়। বজ্রযানী বৌদ্ধদের রচনা প্রত্নবাংলা, সংস্কৃত, তিব্বতি ভাষায় পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের ভাষা মূলত সংস্কৃত এবং মধ্যযুগীয় বাংলা। সুতরাং বর্তমানে আমরা বঙ্গদেশের ধর্ম বলতে যা বুঝি আমাদের আলোচ্য সময়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভাষিক প্রেক্ষিতটি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বজ্রযানী সিদ্ধদের অনেকেই ভারতের নানা প্রদেশের মানুষ ছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবনে। পারস্পরিক আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করেই বঙ্গদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতো বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের আখড়া ছিল বৃন্দাবনে। অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসে অবশ্যই অন্যান্য প্রদেশের, অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব কার্যকর ছিল। ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রটিকে বোঝার জন্য বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষিতে আমরা বৈদিক এবং থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে গুরু ধারণার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষিত আমাদের আলোচনায় উঠে আসবে। এরপর পৌরাণিক ধর্ম কীভাবে গুরুর ধারণাকে গ্রহণ করছে তার সঙ্গে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে গুরুর ধারণার তুলনামূলক আলোচনা প্রস্তুত করা হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আসবে লিঙ্গায়েৎ এবং নির্গুণ সাধকদের কথা। মুখ্যত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য কাঠামোর বিপ্রতীপে নির্গুণ পরম্পরা কীভাবে তাদের তত্ত্ব বিশ্ব প্রস্তুত করছেন তা বোঝার চেষ্টা করা হবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রেক্ষিতটি বোঝার জন্য আমরা একই সঙ্গে নাথ সাধনা, আসামে শংকরদেবের সাধনায় গুরু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কীভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গুরু ধারণা তৈরি করছে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনায় গুরুবাদ আমাদের আলোচনার মূল পরিসরের বাইরে থাকছে।

গবেষণাকর্মে আমরা দুটি ধর্মদর্শনকে গ্রহণ করেছি। গবেষণায় এক অথবা একাধিক গুরুকেও গ্রহণ করা যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত অসম্পূর্ণতার জন্যই আমরা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারিনি। প্রথমত, বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের আদি সিদ্ধাচার্য কে তা নিয়ে

গবেষকদের মধ্যে একাধিক সংশয় রয়েছে। এমনকি বৌদ্ধশাস্ত্র পরম্পরায় এ বিষয়ে বহু মত পাওয়া যায়। অতএব কোনও একজন গুরুকে নির্বাচন খুবই সমস্যাজনক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের দিক থেকে চৈতন্যদেব অথবা নিত্যানন্দ কেউই নিজের শাস্ত্র অথবা কাব্য প্রণেতা ছিলেন না যাদের থেকে আমরা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এজন্যই আমরা দুটি দর্শন সম্প্রদায়কে গ্রহণ করেছি এবং ভারতবর্ষের সাপেক্ষে বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতে প্রধান প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। কোনও একজন গুরুকে কেন্দ্রে রেখে আলোচনার আরেকটি অসুবিধা রয়েছে মধ্যযুগের ভারত তথা বাংলার প্রেক্ষিতে। নির্গুণ সাধনা গুরুকেন্দ্রিক সাধনার প্রয়োজন স্বীকার করলেও তথাকথিত শাস্ত্র পরম্পরা তৈরি করছে না। সন্তদের বাণী, পদ তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রে শাস্ত্র পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। বাকি ধর্মদর্শনগুলিতে শাস্ত্রমূলক গুরু পরম্পরা তৈরি হয়েছে। সুতরাং পরম্পরায় একজন পরম গুরু থাকছেন, যিনি পরম্পরার প্রতিষ্ঠাতা, তারপর শিষ্য যার থেকে দীক্ষা নিয়েছেন সেই ব্যক্তি হচ্ছেন গুরু। অতএব এক্ষেত্রে একজন গুরু কেন্দ্রিক সাধন পরম্পরা তৈরি হচ্ছে না। ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখিয়েছিলেন কীভাবে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিক্ষমতায় মহাপুরুষ হয়ে ওঠেন।[৬০] কেবল কোনও একটি বিষয়ে দখল থাকলেই মহাপুরুষ হওয়া যায় না, তাকে একটি সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে হয় অথবা সমষ্টির কাছে এক নতুন আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়। অতএব বিষয়টি কোনও একজনের উপর নির্ভর করে না, সমষ্টির উপর নির্ভর করে। মহারাষ্ট্রের বসবন্না, আসামের শংকরদেব অথবা বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আমরা আগেই বলেছি চৈতন্যদেবের থেকে সরাসরি কোনো শিষ্য পরম্পরা তৈরি হয় নি, তিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতিতে গুরু মাত্রেই

---

[৬০] Freud, Sigmund. *Moses and Monotheism*. Great Britain: The Hogarts Press and the Institute of Psycho-Analysis. 1939. pp. 173-74

ফ্রয়েডের পরিভাষায় ‘Great Man’ নন। অতএব নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাচনের অসুবিধার কারণে সামগ্রিক ভাবে ধর্মদর্শন সম্প্রদায় এবং তার কেন্দ্রীয় ধারণাকেই আমরা গবেষণায় গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় গৌতমবুদ্ধ পূর্ববর্তী ভারতীয় সাধনায় গুরু

২.১ সিন্ধু ও ইরানীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে ধর্মীয় উপদেশক

২.১.১ সিন্ধু সভ্যতা

২.১.২ আবেস্তার ধর্ম-সংস্কৃতি

২.২ বৈদিক সাহিত্যে ধর্মচর্যার বিবর্তন এবং ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারী

২.৩ বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী শ্রামণ্য ধর্মমত এবং গুরু প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ পূর্ববর্তী ভারতীয় সাধনায় গুরু

সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের ধর্মচেতনার ইতিহাসের একটি ক্রমবিবর্তনের সম্পর্ক খুঁজতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'Religion of Man' শীর্ষক বক্তৃতামালায়।[১] প্রথমে মানুষের লড়াই ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। সেখানে বাঁচার তাগিদটাই ছিল প্রবল। এই আকাঙ্ক্ষার পরবর্তী স্তরে ছিল প্রকৃতির রসদকে কাজে লাগিয়ে নিজের বাঁচাকে আরও যথাযথ করার চেষ্টা। অবশ্যই মানুষের সভ্যতা তখন একটি ধাপ এগিয়েছে। মানুষ কিছুদূর পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। এর পরের স্তরে মানুষের নজর গেছে নিজের 'আত্ম'র প্রতি। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থার প্রকৃতি-কেন্দ্রিক উপাসনা থেকে মানুষ অনেক বেশি করে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকে নজর দিতে চেয়েছে। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন নবী (Prophet)-র কথা। রবীন্দ্রনাথের মতে যিনি প্রথম মানুষের ধর্মের ইতিহাসের দিক পরিবর্তনের নির্দেশ দেন তিনি হলেন পারস্যের ধর্মগুরু জরথুস্ত্র (খ্রি.পূ. ৬৬০ – খ্রি.পূ. ৫৮৪)। জরথুস্ত্র একটি নৈতিক ধর্মের প্রবর্তন করেন এবং রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন জরথুস্ত্র গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের কোটি থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন।[২] ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসাবে নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক ধর্মের প্রথম প্রবক্তা বলা যেতে পারে গৌতম বুদ্ধকে। যদিও গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রামণ্য/ সম্প্রদায়ের কথা পাচ্ছি, বিভিন্ন দর্শনের প্রবক্তাদের কথাও পাচ্ছি—যেমন সাংখ্য প্রবর্তক মহর্ষি কপিল। এছাড়া সময়পর্বের দিক থেকে দেখলে অবশ্যই মহাবীর জৈন বুদ্ধদেবের পূর্বেই নিজের দর্শন পরম্পরার প্রতিষ্ঠা

---

১ Tagore, Rabindranath. *The Religion of Man.* London : George Allen & Unwin Ltd. 1922. 1st Edition. pp. 74-75

২ []. *দর্শন.* কলকাতা : বিশ্বভারতী. চৈত্র ১৪২২ : প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৭. ভূমিকা — শেফালী মৈত্র

করেছিলেন। আমাদের আলোচনায় বুদ্ধদেবকে একটি ভরকেন্দ্র বলে ধরা হয়েছে। এর কারণ বঙ্গদেশে মূলত বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিস্তার হয়েছিল। জৈন ধর্ম বঙ্গদেশে খ্রি. পূ. পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক অবধি যথেষ্ট প্রবল ছিল বলেই ঐতিহাসিক প্রমাণের সূত্রে জানা যায়। বঙ্গদেশে জৈন, আজীবিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় সমসময়েই বিস্তার লাভ করা শুরু করে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈন এবং আজীবিক ধর্ম প্রথমে বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করেছিল। তবে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক ভ্রমণ বিবরণে নির্গ্রন্থদের উল্লেখ থাকলেও আজীবিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বঙ্গদেশে আজীবিকরা জৈনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। এর অনেক পূর্বে রচিত ‘ভগবতী’ নামক জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে বঙ্গ এবং রাঢ় দেশের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মূল সমস্যা হল পাল রাজবংশের সময় থেকেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে এবং পরবর্তী সময়ের সাক্ষ্যপ্রমাণে জৈন ধর্মের উপস্থিতি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং বিলুপ্তির ইতিহাস আজও স্পষ্ট নয়।[৩] একারণে আমরা বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে বুদ্ধদেবকে রাখতে বাধ্য হয়েছি। বুদ্ধদেবের পূর্বে বঙ্গদেশের ইতিহাস স্পষ্ট নয় বলে বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে মূলত উত্তর এবং পশ্চিম ভারত। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী ভারতীয় ধর্ম সাধনায় গুরুর অবস্থান বোঝার চেষ্টা করব মূলত তিনটি ধর্মীয় পরম্পরার সূত্রে—প্রথমত, সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় ইতিহাস, দ্বিতীয়ত *আবেস্তা* তথা জরথুস্ত্রের ধর্মের ইতিহাস এবং তৃতীয়ত বৈদিক ধর্মের ইতিহাস। এর মধ্যে *আবেস্তা* এবং জরথুস্ত্র ধর্ম প্রাচীন ভারতে বিস্তার লাভ না করলেও আর্য উৎসের সঙ্গে এই ধর্মদর্শনের সরাসরি সম্পর্কটি ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তুলনামূলক আলোচনায় জরথুস্ত্রের ধর্ম নিয়ে আমরা কথা বলব। মূলত বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করাই বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

---

[৩] সেন, প্রবোধচন্দ্র. বাঙ্লার আদি ধর্ম্ম. তপন কুমার ঘোষ (সম্পা.). *বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম চর্চা.* কলকাতা : প্যাপিরাস. ২০১৮. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২১-৩৯

২.১ সিন্ধু ও ইরানীয় ধর্মসংস্কৃতিতে ধর্মীয় উপদেশক

২.১.১ সিন্ধু সভ্যতা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে একাধিক স্ববিরোধী মতামত পাওয়া যাবে। এর মূল কারণ সিন্ধু সভ্যতার লিপির সর্বজনগ্রাহ্য পাঠ তৈরি এখনও সম্ভব হয়নি। ফলত প্রত্যেক ঐতিহাসিক মূলত কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মতান্তরের সূচনা হয়েছে ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। বারংবার হরপ্পা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে হিন্দু ধর্মের পূর্বসূত্র হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।[৪] এছাড়াও সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তির সঙ্গে পরবর্তী সময়ের পৌরাণিক দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে–যেসমস্ত প্রমাণ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। সর্বোপরি সিন্ধু সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার সম্পর্ক দীর্ঘদিন অবধি বিশেষভাবে ভুল পড়া হয়েছে। বর্তমানে ঐতিহাসিকরা সিন্ধু সভ্যতার বিলোপ এবং আর্যদের হাতে সিন্ধু সভ্যতার বিনষ্টির বয়ান পরিত্যাগ করেছেন। একারণে আমরা ঐতিহাসিক ভাবে সমস্যাজনক হলেও সিন্ধু সংস্কৃতির কথা আলোচনা করব। সিন্ধু সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতা ঐতিহাসিকভাবে সহাবস্থান করেছিল, ফলত বৈদিক সংস্কৃতিতে সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী। কার্বন-নির্ণীত সময়সূচি অনুযায়ী সিন্ধুনদের উপত্যকায় আনুমানিক ৩২০০ খ্রি.পূর্বাব্দে তিনটি পৃথক সংস্কৃতির অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।[৫] প্রথমত, পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও উত্তর সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে স্পর্শ করে সর্ববৃহৎ কোট-দিজি সংস্কৃতি, দ্বিতীয়ত ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর-রাজস্থান লোকালয়ে অবস্থিত সোথি সিসওয়াল সংস্কৃতি এবং তৃতীয়ত বালুচিস্তান এবং মধ্য ও দক্ষিণ-বঙ্গে আবিষ্কৃত এবং গুজরাতের কিয়দংশে বিস্তৃত আম্রি-নাল সংস্কৃতি। উক্ত সংস্কৃতির পার্থক্য বোঝা যচ্ছে মৃৎ শিল্পের বিভিন্নতা থেকে। তবে এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক

---

৪ Piggott, Stuart. *Prehistoric India*. Harmonds Worth : Penguin Books. 1950. 3rd reprint. p. 203

৫ হাবিব, ইরফান. *সিন্ধু সভ্যতা.* কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড. সেপ্টেম্বর ২০০৯. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ১০

সামঞ্জস্য দেখা গেছে। এই সময়ের ধর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনার মূল ভিত্তি হল প্রাপ্ত মূর্তি এবং সিলগুলিতে উৎকীর্ণ বিভিন্ন প্রতিরূপ। এদের মধ্যে কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় পুরাকীর্তির কথা বলা যেতে পারে। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একটি সিলে তিন মাথাওয়ালা সমাসীন দেবমূর্তিকে ঘিরে রয়েছে গণ্ডার, জলহস্তি, বাঘ এবং হাতি। এই মূর্তিকে প্রত্ন-শিব বলে মনে করা হলেও একে পশুপতি মনে করার কোন প্রত্যক্ষ কারণ দেখা যায় না।[৬] কালিবঙ্গান থেকে প্রাপ্ত একটি সিলে বাঘের মত শরীর এবং মাথায় মহিষের শৃঙ্গযুক্ত একটি দেবীমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে যিনি যুদ্ধরত দুইজন সৈনিককে আলাদা করে রেখেছেন।[৭] এছাড়া অজস্র ক্ষুদ্রাকৃতির মাতৃমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের পূজা করা হত সন্তানের আকাঙ্ক্ষায়।[৮] এরপর উল্লেখ করা যায় শ্মশ্রুসমন্বিত ও কুণ্ডলীকৃত কেশযুক্ত একটি নগ্ন পুরুষমূর্তির। পা ঈষৎ ফাঁক এবং হাত দেহের সমান্তরালে রাখা। এই ভঙ্গিটি অনেকটা জৈনদের কায়োৎসর্গের মতন।[৯] সিন্ধু সভ্যতার অজস্র সিলে আমরা অশ্বত্থ গাছের ডাল, পাতার ছবি পাচ্ছি। অনুমান করা হয় অশ্বত্থ গাছ এই সভ্যতায় মঙ্গলজনক চিহ্ন হিসাবে গ্রাহ্য হত। এছাড়াও কিছু প্রত্ন উপাদানকে অনেকেই লিঙ্গ এবং যোনি উপাসনার পূর্বচিহ্ন হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তবে এই বিষয়ে কোনও সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল প্রত্ন উপাদানের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একটি মূর্তি যাকে পুরোহিত-রাজার মূর্তি বলে অনেকেই চিনতে চেয়েছেন। এই মূর্তির পোশাকটি বিশেষভাবে চেনা যাচ্ছে, গবেষকেরা মনে করছেন এটি তারকা খচিত বস্ত্র। মূর্তির দাড়ির ধরনটির সঙ্গে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পুরোহিত মূর্তির প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই মূর্তিটি আমাদের গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধু সভ্যতায় আদৌ কোনও স্থাপত্যকে মন্দির বলে মনে করা যাবে কিনা এই বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকজন মনে করছেন এমন কোনও স্থাপত্য নেই যাকে ধর্মীয় স্থাপত্য বলে মনে করা যেতে

[৬] তদেব. পৃ. ৫৯

[৭] তদেব. পৃ. ৫৯

[৮] তদেব. পৃ. ৬০

[৯] বাসাম, এ. এল. *অতীতের উজ্জ্বল ভারত.* কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. ২০১১. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৩০

পারে।[১০] আবার মহেঞ্জোদারো-র দুর্গ এবং নিম্ন শহরে একাধিক মন্দির পাচ্ছি যাদের সম্ভবত প্রত্ন-শিবের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল।[১১] এছাড়া সাতজন পুরুষ সারিবদ্ধভাবে একটি অশ্বত্থ গাছের উপাসনা করছে এমন একটি ছবি পাওয়া যাচ্ছে। এদেরকে তুলনা করা হয়েছে সপ্তর্ষির সঙ্গে।[১২] প্রসঙ্গত বলা দরকার বাঘের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধরত একটি ছবি পাওয়া যাচ্ছে যাকে *গিলগামেশ* মহাকাব্যের সঙ্গে যুক্ত করে অনেকে দেখতে চান।[১৩] প্রকৃতপক্ষে *গিলগামেশ* মহাকাব্যে আমরা সপ্তর্ষির কথা পাব। বলা হয়েছে দেবী ইশ্‌তা, যিনি একই সঙ্গে ভালোবাসা এবং যুদ্ধের দেবী, তার মন্দিরের ভিত গেঁথেছিলেন সপ্তর্ষিগণ।[১৪] তবে সুমের সভ্যতা প্রসঙ্গে বলা দরকার প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী জনগণ সরাসরি দেবতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন এমনটাই পাওয়া যাবে *গিলগামেশ* মহাকাব্যের প্রথম অধ্যায় 'এনকিপুর আগমন'-এ।[১৫] সুতরাং প্রাচীন সুমের সংস্কৃতিতে সপ্তর্ষির আশ্চর্য মাহাত্ম্যের কথা থাকলেও দেবতা এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য পুরোহিতের অবশ্যম্ভাবী অবস্থান প্রতিষ্ঠা পায়নি। তবে মনে রাখতে হবে পুরোহিত-রাজার মূর্তি বলে যে প্রত্ন উপাদানকে চিনতে চাওয়া হয়েছে তার ভিত্তি কিন্তু তুলনামূলক সংস্কৃতির উপরই মূলত নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কোনও পাথুরে প্রমাণ সরাসরি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা যেমন মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, ট্রান্সকাসপিয়া, এশিয়া মাইনর, মিশরীয় সভ্যতার বেশ কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। যেমন উক্ত প্রত্যেকটি সভ্যতাতেই মাতৃমূর্তির প্রতিকল্পরূপে উঠে এসেছে যোনি অথবা গর্ভবতী মহিলার প্রতিরূপ। এক্ষেত্রে মানবজাতির মনে একটি সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে বলে মনে করা

---

[১০] Macky, Earnest. *Early Indus Civilizations*. London : Luzac & Company. 1948. 1st Edition. p. 52

[১১] Alchin, Raymond & Bridget. *The Rise of Civilization in India and Pakistan*. New Delhi : Cambridge University Press. 2013. 6th Reprint. p. 213

[১২] তদেব. পৃ. ২১৪

[১৩] তদেব. পৃ. ২১৫

[১৪] মোহাম্মদ, জামান. *গিলগামেশ কাব্য.* ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ. ২০১৬. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ১৪

[১৫] তদেব. পৃ. ১৫

হয়।[১৬] হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একাধিক সিলে আমরা পশু সম্বলিত দেবমূর্তি পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে পশু সম্বলিত অধিকাংশ মূর্তিগুলিই পুরুষদেবতার মূর্তি। এই সিলগুলিতে পুরুষ মূর্তির সঙ্গে পশুদের সহাবস্থান কেবল সিন্ধু সভ্যতায় নয় সমসময়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও দেখতে পাওয়া যাবে। উক্ত সহাবস্থানটি মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার থেকে পিতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার দিকে সরণকে বুঝতে সাহায্য করে।[১৭] পশুপালন এবং পশুশিকার কেন্দ্রিক সভ্যতায় পুরুষের আধিপত্য নারীর থেকে অধিক। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত বৃষের প্রতিরূপ বিশেষভাবেই পুরুষের আধিপত্যকে প্রমাণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতাতেও বৃষ এবং সিংহ বিশেষভাবে পৌরুষের পরিচয় বহন করত। এমনকি গ্রিক দেবতা জিউসের পুত্র অসিরিস বৃষের মাথাযুক্ত ছিলেন।[১৮] পরবর্তী সময়ে ইন্দ্রকে বৈদিক সাহিত্যে বারংবার বৃষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রুদ্রকে তুলনা করা হয়েছে বৃষের সঙ্গে। *আবেস্তা*-য় আমরা বৃষের কথা পাচ্ছি আবেস্তীয় ইন্দ্রের অবতাররূপে।[১৯] সুতরাং সিন্ধু সভ্যতায় আদিম মাতৃদেবতার রূপকল্প থাকলেও এই সভ্যতাতেই পুরুষকেন্দ্রিক সভ্যতার দিকে যাত্রা শুরু হয়। সিন্ধু সভ্যতায় আমরা এমন কোন পুরাকীর্তি পাচ্ছি না যাকে নারী-পুরোহিত হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। অথচ মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন আর্কেটাইপের বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ঔষধ এবং বিষের সঙ্গে মূলত নারী-পুরোহিতেরাই যুক্ত ছিলেন।[২০] অধিকাংশ সময়েই দেখা যাচ্ছে আরাধ্য দেবীর পাশে তার নারী-পুরোহিত একই রকম দেহভঙ্গি নিয়ে অবস্থান করছে। সিন্ধু সভ্যতা থেকে আমরা নারী-পুরোহিতের কোন উল্লেখ পাচ্ছি না।[২১] তবে মিশরের প্রাচীন সভ্যতায় নারী পুরোহিতদের

---

[১৬] Naumann, Erich. *The Greatest Mother An Analysis of the Archetype*. Prenceton : Princeton University Press. 1983. Second Edition. p. 3

[১৭] Sen, Asis. *Animal Motifs in Ancient Indian Art*. Calcutta : Firma KLM. 1972. 1st Edition. pp. 55-66

[১৮] তদেব, পৃ. ৫৭

[১৯] তদেব. পৃ. ৬০

[২০] Neuman, Erich. Ebid. p. 60

[২১] তদেব. পৃ. ১১৭

অবস্থানই মাতৃদেবতার পাশে দেখা যায়, পুরুষ পুরোহিতের অবস্থান বিশেষ দেখা যায় না। পুরোহিত-রাজার যে মূর্তিটির কথা আমরা বলছিলাম প্রায় একই ধরনের বসা এবং দাঁড়ানো কিছু মূর্তি, যাদের মধ্যে দেহভঙ্গির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে এমন কিছু মূর্তি পৃথিবীর অন্য কয়েকটি সভ্যতাতেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।[২২] প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু সভ্যতার বেশ কিছু সিল মেসোপটেমিয়া এবং ইরাকে পাওয়া গেছে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে এই সব অঞ্চলের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। একারণেই মেসোপটেমিয়া তথা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন অঞ্চলের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সিন্ধু-সভ্যতার ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব হয়েছে। কেবল ধর্ম-সংস্কৃতি নয় সিন্ধু সভ্যতায় কৃষিকার্য সম্পর্কে অনুমান করার জন্যও ঐতিহাসিকেরা মিশর এবং মেসোপটেমিয়া সভ্যতার তুলনা উপস্থিত করে থাকেন।[২৩] সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত যে মূর্তিটিকে পুরোহিত-রাজার মূর্তি মনে করা হয়েছে তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মূর্তির পরনে ত্রিপত্র খচিত বস্ত্রটি। প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতদের মধ্যে এক বিশেষ প্রকার ‘গাউন’ পরার চল পৃথিবীর নানা দেশে দেখা যাচ্ছে। সিন্ধু সভ্যতায় একই ধরনের মূর্তি নানা এলাকায় পাওয়া যায়। ত্রিপত্র চিহ্নের ব্যবহারও হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে বহুল প্রচলিত। অধিকাংশ সময়ে দেখা যাচ্ছে মূর্তিগুলি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় যাদুঘরের ৫২.১৮৬০ ক্রমাঙ্কের মূর্তিটি দেখে অনুমান করা যাচ্ছে শিল্পীরা খুবই যত্নের সঙ্গে মূর্তিটি তৈরি করেছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রে ত্রিপত্র চিহ্ন তৈরি করার সময় লাল রঙের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। প্রায় একই রকমের ত্রিপত্র চিহ্নের ব্যবহার আমরা মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় খ্রি.পূ. ২১০০-২০০০ অব্দের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।[২৪] অধিকাংশ মূর্তিতে একজন দাড়িযুক্ত পুরুষের মাথা এবং দেহটি ষাঁড়ের এবং গায়ে ত্রিপত্র চিহ্ন খচিত

---

[২২] Gordon, D.H. *The Pre-Historic Background of Indian Culture*. Bombay : N.M. Tripathi Private Limited. 1958. First Edition. p. 69

[২৩] তদেব. পৃ. ৬১

[২৪] Parpla, Asko. *The Sky-Garment A Study of the Harappan Religion and its relation to the Mesopotamina and later Indian religions*. Helsinki : The finish Oriental Society. 1985. 1st Edition. p. 27

বস্ত্র। একই ধরনের বস্ত্রের ব্যবহার আমরা মিশরের প্রাচীন সভ্যতায় পাচ্ছি। সেখানে রাজা এবং দেবতার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একজন পুরোহিতের কথা পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে মধ্যস্থতাকারী পুরোহিত নিজেই আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। গবেষকরা দেখিয়েছেন সুমের-এ ত্রিপত্র চিহ্নটি প্রকৃতপক্ষে 'তারা'র চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হত। সুতরাং ত্রিপত্র চিহ্নটির একটি জ্যোতিষিক গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে ত্রিপত্র চিহ্নটি পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরে মাতৃদেবতার আরাধনায় ব্যবহৃত হত। মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত ত্রিপত্র অথবা তারকাখচিত বস্ত্র পরিহিত মূর্তিগুলির বিশেষ অর্থ রয়েছে। মেসোপটেমিয়ায় প্রত্যেকটি চিহ্নের আলাদা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। মূলত মেসোপটেমিয়ার মন্দিরগুলিতে একভাবে বিশ্বের ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়। যেমন মন্দিরটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, মূর্তিগুলি ব্রহ্মাণ্ডের নানা সৃষ্টির প্রতিরূপ। পুরোহিতের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে দেবতার পোশাক, তার বাহন, মাথার চুলের ধরন অনুযায়ী আলাদা আলাদা পুরোহিতের মূর্তি তৈরি করা হয়েছে দেবতাভেদে।[২৫] এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হচ্ছে পুরোহিতের মধ্য দিয়ে আসলে দেবতার শক্তির একটি প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বস্ত্রের মাধ্যমেই শিল্পীরা সাধারণ মূর্তির থেকে দেবতা এবং পুরোহিত তথা রাজার পার্থক্য বুঝিয়ে দিতেন। এক্ষেত্রে একটি মিথের কথা বলা যেতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র যে প্রকৃত পক্ষে দৈবীশক্তিরই প্রকাশ এমন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে মেসোপটেমিয়ায় দেবী ইনান্নার একটি আখ্যনে, যেখানে দেবী তাঁর দিব্য পোশাক একে একে ত্যাগ করে মর্ত্যে প্রবেশ করছেন। এই আখ্যানে দেবীকে বারংবার সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বারণ না শুনে বস্ত্রত্যাগ করেন এবং তাঁর দৈবীশক্তি লোপ পায়।[২৬] অতএব বস্ত্রের সঙ্গে দৈবী শক্তির যোগাযোগ মেসোপটেমিয়ার আখ্যানে স্পষ্ট। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে নব্য-ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে আমরা রাজা এবং দেবতাদের দিব্যবস্ত্রের প্রসঙ্গ পাচ্ছি। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার এই প্রভাব হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মূর্তিতে এসেছে না কি উল্টোটা তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছু বিতর্ক থাকলেও হরপ্পা তথা

[২৫] তদেব. পৃ. ২৯

[২৬] তদেব. পৃ. ৩০

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত মূর্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশেষ মতান্তর দেখা যাচ্ছে না। সকলেই মনে করছেন এই মূর্তিটির একটি ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে এবং মূর্তিটি দেবতার মূর্তি নয়, মানুষের মূর্তি। প্রসঙ্গত আরও বলা যেতে পারে জরাথুস্ত্র ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য অহুর মাজদার কল্পনাতেও আমরা এই ধরনের বস্ত্রের কথা পাব। একই ভাবে পাওয়া যাবে বৈদিক দেবতা বরুণের ক্ষেত্রেও।[২৭] মোট কথা সিন্ধু-সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত পুরোহিত-রাজার মূর্তি থেকে আমরা কয়েকটি প্রবণতাকে চেনার চেষ্টা করতে পারি যা আমাদের বর্তমান গুরুকেন্দ্রিক গবেষণায় বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়—

১) সিন্ধু সভ্যতায় আমরা দেবতার পাশাপাশি পুরোহিত-রাজার মূর্তি পাচ্ছি যাঁর বস্ত্র থেকে অনুমান করা হচ্ছে তিনিও কিছুদূর অবধি দৈবী শক্তির অধিকারী।

২) ঐতিহাসিকেরা মূর্তিটিকে পুরোহিত-রাজার মূর্তি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এখন যেহেতু সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং আমরা অন্য কোনও সাহিত্যিক উপাদান পাইনি, তাই এই সিদ্ধান্তে আসা সত্যিই মুশকিল যে মূর্তিটি কেবল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের না কি সেই ব্যক্তি একই সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন? মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজাদের সরাসরি যোগদানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা সিন্ধু সভ্যতায় ছিল কি না তা বলা সম্ভব নয়।

৩) মেসোপটেমিয়ার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উদাহরণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে তারকাখচিত বস্ত্র আসলে দৈবী ক্ষমতার প্রকাশক। সুতরাং, সিন্ধু সভ্যতায় এই বিশ্বাসটি ছিল যে দৈবী শক্তি এবং সাধারণ মানুষের মাঝামাঝি এমন একদল মানুষ আছেন যাঁরা এই দুটি স্তরের মধ্যস্ততা করতে পারেন।

৪) মধ্যস্থতা করার জন্য এই পুরোহিতদের পৃথক সামাজিক মর্যাদা ছিল, সিন্ধু সভ্যতায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরি করা মূর্তিগুলি আমাদের সেই প্রমাণ দিচ্ছে। তবে সিন্ধু সভ্যতায় এই মধ্যস্থতা ঠিক কীভাবে করা হত তা বোঝা সম্ভব নয়।

সিন্ধু সভ্যতার বিনষ্টি এবং ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে। মোটের ওপর আর্য আক্রমণকে সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ বলে মনে করা হত। পরবর্তী

[২৭] তদেব. পৃ. ৩৭

সময়ে ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আর্য আক্রমণ সিন্ধু সভ্যতার বিনষ্টির মূল কারণ-ই নয়। বৈদিক সাহিত্য থেকে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে প্রমাণিত হয় আর্য সভ্যতা এবং সিন্ধু সভ্যতা পরস্পরের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় সহাবস্থান করেছিল। আর্য সভ্যতার আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার তত্ত্ব মেনে নিলে আমরা আর্য এবং তৎপরবর্তী ভারতবর্ষীয় ধর্মভাবনায় সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বকেই আসলে অস্বীকার করে ফেলব। প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে আর্যদের প্রথমে আশ্রয় দিয়েছিলেন স্থানীয় শাসকেরা। অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার মানুষজন। এই দেশে থেকেই তাঁরা ধর্মাচরণ করতেন, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করতেন।[২৮] সিন্ধু সভ্যতার কিছু পুরাতাত্ত্বিক উপাদানে যজ্ঞরত মানুষের চিত্রার্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে বৈদিক মন্ত্রে অগ্নির কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে তিনি যেন নগর এবং দুর্গকে রক্ষা করেন।[২৯] প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সভ্যতা কখনোই নগরকেন্দ্রিক ছিল না, তা সত্ত্বেও বৈদিক ঋষিদের এই প্রার্থনা সিন্ধু এবং বৈদিক সভ্যতার সহাবস্থানেরই প্রমাণ। বাইরে থেকে আগত আর্যদের মূলত দুটি জীবিকার কথা পাওয়া যাচ্ছে– পুরোহিত এবং যোদ্ধা। ঋগ্বেদ-এর নবম মণ্ডলের **১১২** সংখ্যক মন্ত্রে আর্যদের নানা পেশার কথা বলা হলেও বাণিজ্যের কথা বলা হয়নি।[৩০] অন্যদিকে ঋগ্বেদে ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দাদের 'পণি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যাস্কের 'নিরুক্ত' মতে পণি-রা হলেন বণিক। সায়ণাচার্য বলছেন 'পণি' শব্দটি 'পণ' থেকে এসেছে যার অর্থ মূল্য অথবা দান। তবে যাস্ক-ই তাঁর 'নিরুক্ত'-এ পণিদের দৈত্য বলেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে পণিদের নিয়ে দুটি মন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। একটিতে বলা হল পণিরা যজ্ঞ সম্পাদন করেন না, অন্যটিতে বলা হল পণিরা যেহেতু যজ্ঞ করেন না, তাই এদের প্রাণ নষ্ট

---

[২৮] Chanda, Ramaprasad. 'Survival of Prehistoric Civilization of the Indus Valley'. Lahiri, Nayanjit Edited. *The Decline and Fall of the Indus Civilization*. Delhi : Permanent Black. 2000. 1st Edition. p. 04

[২৯] Chanda, Ramaprasad. *The Indus Valley in the Vedic Period.* Calcutta : Government of India Central Publication Branches. 1926. 1st Edition. p. 04

[৩০] তদেব. পৃ. ০৫

হোক।[৩১] সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার সম্পর্কে সংঘর্ষ এবং সহাবস্থান দুটি দিকই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনা থেকে এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে সিন্ধু সভ্যতায় পুরোহিত-রাজাদের ধর্মাচরণে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এবং আহুতি দানের কোনও প্রসঙ্গ ছিল না। উপরন্তু সিন্ধু সভ্যতায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আর্যদের থেকে এতটাই পৃথক ছিল আর্যরা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতেন। প্রসঙ্গত আরেকটি দিকের কথা বলে আমরা সিন্ধু সভ্যতা সংক্রান্ত আলোচনাটি শেষ করব। সিন্ধু সভ্যতায় আমরা যেকটি পুরোহিত-রাজার মূর্তি পেয়েছি তার সবকটি পুরুষমূর্তি। যদিও আমরা আগেই দেখেছি সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃ সাধনার প্রচলন খুব সম্ভবত ছিল। যদিও সাধনার ঝোঁকে একটি পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছিল। তবে মেসোপটেমিয়ায় কিন্তু পুরুষ পুরোহিতের পাশাপাশি আমরা মহিলা পুরোহিতেরও মূর্তি পেয়েছি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম মাতৃ উপাসনায় একটি সময়ে মহিলা পুরোহিতের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। এঁরা মূলত ঔষধ এবং বিষ প্রসঙ্গে পটু ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গা মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রজননের শক্তিরূপে মাতৃদেবতার আরাধনা, মাতৃমূর্তির নির্মাণ এসবই ক্যালপেলেথিক পর্বে সূচিত হয়, এবং এর উৎস সম্ভবত এক সূত্রেই গাঁথা। মিশরে, মেসোপটেমিয়ায় এই সময়ের মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। একই ভাবে পৃথিবীর যে কোনও নগর সভ্যতার সূচনা প্রাচীনকালে মাতৃপ্রধান সমাজের হাত ধরে হয়েছিল বলেই মনে করার কারণ আছে।[৩২] ভারতবর্ষের ইতিহাসে মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার আদিম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যানে যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও প্রাচীন মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের ছাপ কিছুদূর অবধি বহন করে চলেছে।[৩৩] তবে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো তথা সিন্ধু সভ্যতা মাতৃকেন্দ্রিক

---

[৩১] তদেব. পৃ. ০৫

[৩২] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. *মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সে-যুগে মায়েরা বড়ো.* ঢাকা: নালন্দা. ২০০৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৫

[৩৩] চৌধুরী, সুজিৎ. *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার.* কলকাতা : প্যাপিরাস. ২০১৬. তৃতীয় সংস্করণ. পৃ. ৪০

সভ্যতার চিহ্ন বহন করলেও সেই সময়ে পুরুষকেন্দ্রিক নগর জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল।[৩৪] সুতরাং ধর্মীয় ইতিহাসের দিক থেকে ভারতবর্ষে দেবলোক এবং মানবলোকের মধ্যস্থতায় প্রথম থেকেই পুরুষের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। অতএব পুরুষের হাত ধরেই যেমন প্রাচীন ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের বদল ঘটেছে একই ভাবে ধর্মীয় জীবনেও পুরুষ পুরোহিতের সূত্রে ক্ষমতার ও রাষ্ট্রের নীতি সরাসরি ধর্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছে।

২.১.২ *আবেস্তা*-র ধর্মে সংস্কৃতি

ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতিতে আর্য প্রভাব এবং বৈদিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয় আনুমানিক ১৭৫০ খ্রি.পূর্বাব্দে। ভারতে আর্য অভিযান মূলত তিনটি পর্যায়ে হয়েছিল। খ্রি. পূর্ব ১৫০০-১০০০'এ তৃতীয়বারের আর্য অভিযানের সঙ্গেই মূলত বৈদিক সংস্কৃতি যুক্ত বলে মনে করা হয়। ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা পামীর মালভূমি অঞ্চল থেকে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বর্তমানে আমরা *আবেস্তা*-র ধর্ম-সংস্কৃতিতে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব। যেহেতু *আবেস্তা*-র সংস্কৃতি এবং বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেকারণেই আমরা *আবেস্তা*-র ধর্ম-সংস্কৃতিকে বুঝে নিতে চাইছি। *আবেস্তা* ও প্রাচীন বৈদিক ভাষার ফারাক প্রকৃতপক্ষে দুটি 'উপভাষা'র ফারাকের মত প্রতিপন্ন হয়।[৩৫] পারসি এবং আর্যদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য তৈরি হয়েছে অনেক পরবর্তী সময়ে। এদের প্রাচীন বিশ্বাসগুলির অন্যতম ছিল সৃষ্টিকর্তার ধারণায় বিশ্বাস। ভাষাবিজ্ঞানের মতে ইরান শব্দটি এসেছে আর্যাণম্ পদটি থেকে। ধ্বনিগত, রূপগত এবং শব্দ সঞ্চয়নে এমনকী ছন্দ ব্যবহারে যেমন—গায়ত্রী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ ব্যবহারে *আবেস্তা* ও বৈদিক ভাষার

---

[৩৪] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. *মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ সে-যুগে মায়েরা বড়ো.* ঢাকা : নালন্দা. ২০০৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫৪

[৩৫] Taraporewala, I.J.S. *The Religion of Zarathustra.* Madras : Theosophical Publishing House. 1926. 1st Edition. p.3

সাদৃশ্য স্পষ্ট। ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ লক্ষণীয়, উভয় শাখাতেই ‘ল্’ ধ্বনির অভাব।[৩৬] পারসিদের ধর্মভাবনায় সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলেন জরথুস্ত্র। জরথুস্ত্রের সময়কাল খ্রি.পূ. ৬৬০-৫৮৪। অর্থাৎ সময়কালের দিক থেকে জরথুস্ত্র গৌতম বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। পারসিদের প্রাচীনতম গ্রন্থ *আবেস্তা* । *আবেস্তা*-র গাথা অংশটি জরথুস্ত্রের সমকালীন। বাকি অংশ ৫০০ থেকে ৩০০ খ্রি. পূ. লেখা হয়। *আবেস্তা*-র টীকা লেখা হয় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সাসনীয় বংশের রাজত্বকালে, পহ্লবী ভাষায়। আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে পারসি সংস্কৃতির মিথে বিশেষ সাদৃশ্য পাওয়া যাবে পৌরাণিক সংস্কৃতিতে বিবস্বানের পুত্র মনুকে প্রদত্ত উপদেশ যা মহাপ্রলয়ের সময়ে মনুকে দেওয়া হয়েছিল। *আবেস্তা*-র আখ্যানে একই বিবস্বানের পুত্র ইমা মজদা বিপর্যয়ের পূর্বাভাসে বলেন প্রচণ্ড বরফে সভ্যতা নষ্ট হবে। ফলে তাকে পাতালে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে নির্বাচিত মানুষ, প্রয়োজনীয় গাছ, প্রয়োজনীয় গবাদি পশুদের একটি করে জোড়া, সুগন্ধী ফুল, গাছের বীজ, শ্রেষ্ঠ ফল ইত্যাদি নিয়ে নিতে বলা হয়।[৩৭] পারসিরা অহুর মাজদার উপাসক। অহুর শব্দের অর্থ প্রাণের অধীশ্বর। সংস্কৃতে ‘অসুর’ শব্দটি চিরন্তন জীবন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এমনকী বেদের প্রাচীন অংশেও অসুর শব্দটি নঞর্থে ব্যবহৃত হয় নি, ধ্রুপদী সংস্কৃতিতে অসুরকে পূর্ব-দেব বলা হয়েছে।[৩৮] বেদের প্রাচীন অংশে অসুর বিশেষণটি বরুণের জন্য ব্যবহার করা হত। বরুণ ছিলেন ঠিক বা যথার্থের দেবতা, বিশ্বের শাসক। বৈদিক সংস্কৃতিতে বরুণ নৈতিকতার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। বায়ু দেবতা হিসাবে বেদ এবং *আবেস্তা* উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবেস্তীয় বায়ু আহুরের বার্তাবাহক।[৩৯] এই সাদৃশ্যের এলাকা বাদ দিলে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে *আবেস্তা*-র সংস্কৃতির রীতিমত বিরোধিতার এবং দৈব-ধারণার উল্লেখযোগ্য

---

[৩৬] মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশার্স. ১৪১৮ (ব.). ষষ্ঠ সংস্করণ. পৃ. ২৮

[৩৭] Taraporewala, I.J.S. *The Religion of Zarathustra.* Madras : Theosophical Publishing House. 1926. 1st Edition. pp. 6-7

[৩৮] তদেব. পৃ. ১০

[৩৯] তদেব. পৃ. ১৩

অনৈক্য দেখা যাবে। যেমন সংস্কৃতে দেবতা শব্দটি সদর্থে ব্যবহৃত হয়, *আবেস্তা*-য় ব্যবহৃত হয় অপদেবতা হিসাবে। *আবেস্তা*-য় অসুর অথবা অহুর দেবতা, মূল ধারার সংস্কৃতে অসুর দেব বিরোধী। সংস্কৃতে নাসত্য, ইন্দ্র দেবতা হিসাবে পূজিত, *আবেস্তা* য় এরা অপদেবতা। এই মিল এবং অমিল থেকে বোঝা যাচ্ছে মূলত একই উৎস থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে *আবেস্তা* এবং বৈদিক ধর্মের প্রত্নরূপে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। পরে এদের মধ্যে মতের অমিল বৈরিতায় পরিণত হয়। *আবেস্তা* য় সংকলিত হয়েছে জরথুস্ত্রের বাণী, *আবেস্তা* র সংকলন হয় জরথুস্ত্রের জামাতা যমস্‌পের হাতে। যদিও *আবেস্তা* কোন একজন ব্যক্তির রচনা নয়, নানা সময়ের নানা লেখকের রচনার সমষ্টি। এই গ্রন্থের মূল অংশটিকে গাথা বলা হয়, যেখানে মূলত জরথুস্ত্রের বাণী সংকলিত হয়েছে। বাকি অংশে জরথুস্ত্রের প্রধান প্রধান ভক্তদের বাণীও সংকলিত হয়েছে। পারসিদের আরাধনাস্থল অগ্নি মন্দির। তবে পার্সীদের অগ্নি উপাসক বলে মনে করা ভুল।[৪০] অগ্নি পারসিদের কাছে কেবল একটি প্রতীক। অগ্নির সহজলভ্যতা এবং অগ্নি যেহেতু সর্বপাবক সে কারণেই প্রতীকরূপে অগ্নিকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্মে নৈতিক শিক্ষার উপর জোর সব থেকে বেশি। মনে করা হয় জরথুস্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে ইরানে বহু দেবতা, বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান, মদ্যপান, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদির প্রাবল্য ছিল। জরথুস্ত্র ইরানে একটি নৈতিক ধর্মের প্রচার করেন। জরথুস্ত্র ধর্মের মূল বক্তব্য হল সৎচিন্তা, সৎবাক্য এবং সৎ আচরণ।[৪১] অর্থাৎ নৈতিক শুদ্ধির উপরেই জরথুস্ত্রের মূল ঝোঁক ছিল। পাশাপাশি তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা অহুর মাজদার উপাসনার কথাই বলতেন। পারসিদের ধর্মমতে আতশ্‌-ই-অদ্‌রিয়ান্‌ নামক অগ্নি মন্দিরে পুরোহিতরা সব সময়ে অগ্নিশিখাকে রক্ষা করেন, এই আগুন পুরোহিত ব্যতীত আর কারও স্পর্শ করার অধিকার নেই। প্রচণ্ড শ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্নি রক্ষা করা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের আচার নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পাদনা ছাড়া পারসি ধর্মমতে পুরোহিতের বিশেষ গুরুত্ব নেই। পারসিদের মধ্যে বিবাহ বাধ্যতামূলক কর্তব্য, সন্ন্যাস ধর্ম পারসিরা স্বীকার করেন না। অতএব

[৪০] বসু, যোগীরাজ. *জরথুশ্‌তধর্ম-দর্শন*. কলকাতা : বিশ্বভারতী. ১৪২২ (ব.). প্রথম সং. পৃ. ২০৬

[৪১] তদেব. পৃ. ২০২

ধর্মজীবনে পারসি সংস্কৃতি মূলত ব্যক্তির উপাসনার উপর নির্ভরশীল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল পারসিদের একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ *আবেস্তা* , অর্থাৎ ধর্মমতের মধ্যে ভেদ দেখা যাচ্ছে না। জরথুস্ত্র একজন নবী, তিনি অহুর মাজদার বাণী প্রচার করেছেন তবে আলাদা করে জরথুস্ত্রের উপাসনা করার প্রবণতা পারসিদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। অতএব একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ঈশ্বর এবং সাধারণের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছেন, ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন কিন্তু সেই নবীকে কেন্দ্র করে সাধনার বিভিন্ন মতামত তৈরি হয়নি। এই বিষয়টি ভারতবর্ষের ধর্মমতগুলিতে প্রায় দেখাই যায় না। তবে গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর জৈন প্রত্যেকেই নৈতিক জীবনের উপরেই মূল ঝোঁক দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সাধনায় যেমন সংসার বন্ধন এবং জন্মান্তর থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল, পারসিদের সাধন-বিশ্ব তার থেকে পৃথক।

জরথুস্ত্রের আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচারিত বাণী থেকে আমরা প্রারম্ভিক বৈদিক বিশ্বাস তথা ভারতবর্ষীয় ধর্ম সাধনার মূলগত পার্থক্যটি বোঝার চেষ্টা করব। পার্সীদের মধ্যে নওজোত্ সংস্কারের কথা পাচ্ছি যেখানে বালকদের কোমরে একটি মৌঞ্জি বেঁধে দেওয়া হয়, এতে তিনটি পাক এবং চারটি গ্রন্থি থাকে। পারসিতে মৌঞ্জীকে বলা হয় কশ্‌তী। এর তিনটি পাক পারসিদের মূলমন্ত্র সৎ বাক্য, সৎ চিন্তা এবং সৎ কর্মের চিহ্ন। কশ্‌তীর চারটি গ্রন্থির দুটি সামনের দিকে, পিছনের দিকে দুটি। চারটি গ্রন্থি প্রকৃতপক্ষে পারসিদের দীক্ষার মূল চারটি বাক্যকে বোঝায়—আমি একমাত্র মজদার উপাসক, আমি জরথুস্ত্রের শিষ্য, অসতের শত্রু এবং অহুর মাজদার পথই আমাদের একমাত্র পথ।[৪২] প্রথমত খেয়াল করার মত পারসিরা একমাত্র জরথুস্ত্রকেই গুরু অথবা ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করেন। অর্থাৎ আর কোনও ব্যক্তি তথা পুরোহিতের গুরুত্ব কেবল ধর্মীয় কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের একজন প্রবক্তা থাকলেও যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন তিনিও গুরু পদবাচ্য। অন্যদিকে পারসিদের নওজোত্ সংস্কারটি ব্রাহ্মণ্য উপনয়নের তুলনীয় হলেও পারসিদের সংস্কারের

[৪২] তদেব. পৃ. ২০৯

মূল মন্ত্র কেবল নৈতিক জীবনের সঙ্গেই যুক্ত। এর কোন পারমার্থিক অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত খেয়াল রাখতে হবে পারসিদের মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠান থেকে অনুমান করা যেতে পারে এঁরা মনে করেন মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। তাই পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব জরথুস্ত্র মতে নেই। সাধনার ইতিহাসে জরথুস্ত্র মতের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বৈদিক সাধনার মূল ফারাক হল জরথুস্ত্র মতাবলম্বীরা সোম-যাগকে পরিত্যাগ করে কেবল অগ্নি-যাগকে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের বৈদিক সাধনা এই দুটি যাগকেই স্বীকার করে। এই দ্বন্দ্বের প্রত্নকল্প বেদব্যাসের মহাভারত-এ দেখতে পাওয়া যায়।[৪৩] তাই জরথুস্ত্র মতের সঙ্গে তুলনা করা ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস বোঝার একটি অনিবার্য ধাপ।

২.১.৩ বৈদিক সাহিত্যে ধর্মচর্যায় বিবর্তন এবং ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারী

বৈদিক সাহিত্যে ধর্মচর্যার প্রসঙ্গে গুরুর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই বলা দরকার বর্তমানে আমাদের চেতনায় গুরু, মূলত দীক্ষাগুরু সংক্রান্ত যে ধারণাটি সাধারণভাবে বিদ্যমান তার সঙ্গে বৈদিক ধর্মচর্যায় ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারীর সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য বেশি। বৈদিক যুগের যজ্ঞকারী পুরোহিতের ভূমিকা একেবারেই পৃথক। আবার সামগ্রিকভাবে বৈদিক সাহিত্য অথবা বৈদিক যুগ শব্দগুলি ব্যবহারেরও বিশেষ সমস্যা রয়েছে। বৈদিক সাহিত্য বলতে *সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* এবং *উপনিষদ*—এই বিস্তৃত সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বোঝায়। এর মধ্যে অনেকগুলি বেদের আবার বিভিন্ন শাখা রয়েছে, যার মধ্যে বেশ কিছু শাখাই বর্তমানে লুপ্ত। এছাড়াও বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে লগ্ন হয়ে রয়েছে কল্পসূত্রের পরম্পরা যার মধ্যে ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং শ্রৌতসূত্র অন্তর্গত। অতএব বৈদিক সাহিত্য বলতে যে বিপুল সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং বিস্তৃত সময় ধরে রচিত সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বোঝায় তা নিয়ে আলোচনা করা বর্তমানে অসম্ভব। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে বৈদিক যুগের পরিধি

[৪৩] সেন, সুকুমার. প্রবন্ধ সংকলন (৩). কলকাতা: আনন্দ. ২০১৭. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪৪-৪৫

বলতে খ্রি. পূ. ২৫০০ থেকে খ্রি.পূ. সপ্তম শতাব্দী অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ পূর্ববর্তী দীর্ঘ সময়কে বোঝানো হয়। এই বিস্তৃত সময়পর্বে কোনও ধর্মেরই চরিত্র একরকম থাকতে পারে না। অতএব ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে কোনও একটি কালপর্বের যে সূক্ষ্মতর বিচারের দরকার তা আমাদের বর্তমান আলোচনায় থাকবে না। আমরা বৈদিক ধর্মচর্যায় ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারীকে কীভাবে দেখানো হয়েছে তার মূল প্রবণতাগুলি বোঝার চেষ্টাটুকু করব।

সংহিতা অংশের মন্ত্রগুলি থেকে জানা যায় বৈদিক মন্ত্রের ঋষিরা একাধিক গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। স্বাভাবিক নিয়মেই বৈদিক ঋষিদের ভাববিশ্ব একরকমের ছিল না। বেদের সংহিতা অংশের মন্ত্রগুলি লেখা হয়েছিল যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে। এই মন্ত্রগুলি যেমন বৈদিক মানুষের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সাহায্য করে তেমনই ঋষিদের এবং যজমানের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝা যায় মন্ত্রগুলি থেকে। বৈদিক সময়ে পুরোহিত বলতে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ বোঝালেও ঋগ্বেদ পরবর্তী সময়ে এই ধারণা দৃঢ়প্রতিষ্ঠা পায়।[৪৪] বৈদিক পুরোহিততন্ত্র বোঝার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কিছু যুক্তি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে প্রায় সবকটি যুক্তিই ভ্রান্ত অথবা অসম্পূর্ণ বলে বোঝা যায়। যেমন Otto Schrader (1855-1919) নামক একজন জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক মনে করতেন ‘ব্রাহ্মণ’ বলতে জাদু-বিদ্যার অধিকারীকে বোঝানো হয়।[৪৫] কিন্তু ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ শব্দটি কবি, ঋষি, যজ্ঞকারী পুরোহিত অথবা পরবর্তী সময়ে বিশেষ শ্রেণির পুরোহিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হলেও জাদু বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত করে কখনো ব্যবহার করা হয়নি। *Encyclopedia of Religion and Ethics*-এ পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—“Very generally the gods are believed to bear ill-will to men, and therefore it is the duty of the priests to give directions as to the proper

---

[৪৪] Kosambi, D.D. *The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline.* New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Limited. 2002. 2nd reprint. p. 82

[৪৫] Deshmukh, P.S. *The Origin and Development of Religion in Vedic Literature*. Bombay : Oxford University Press. 1st Edition. 1933. p. 153

offerings”[৪৬], পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারা দেবতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যস্থতাকারীরূপে পুরোহিতদের দেখতে চাইছেন যারা দেবতার প্রকোপ থেকে মানুষকে রক্ষা করবে। এই দৃষ্টিকোণের অন্যতম সমস্যা হল—এতে আধ্যাত্মিক বোধের তুলনায় প্রায়োজনিক সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ ভারতবর্ষের ধর্ম ব্যবস্থার সূচনাবিন্দু থেকেই প্রয়োজনের তুলনায় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের গুরুত্ব বেশি ছিল। দেবতার অশুভ প্রভাবের কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে ছিল, কিন্তু তার কারণ হিসাবে দেবতার কোপকে দেখা হয়েছে। দেবতারা স্বভাবতই অশুভ শক্তির অধিকারী এধরনের বিশ্বাস বৈদিক সাহিত্যে প্রাধান্য পায়নি। অন্যদিকে পুরোহিত এবং গুরুকে মধ্যস্থতাকারী মনে করার অর্থ কখনই এমন নয় যে পুরোহিত সাধারণ মানুষের থেকে কোনও পৃথক অথবা উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে বলে বৈদিক সমাজে মনে করা হত। বরং এর বিপরীত উদাহরণই বেশি। ‘তেজস্বিনাবধীতমস্তু’ বলে শব্দটি দিয়ে সেকালে আচার্য অন্তেবাসীকে নিয়ে বিদ্যাচর্চা শুরু করতেন বলে জানা যায়। শব্দটির অর্থ হল—উভয়েই অধ্যয়ন করে যেন সমৃদ্ধ হই।[৪৭] সুতরাং গুরু নিজেকে শিষ্যের তুলনায় উচ্চস্থানের অধিকারী মনে করতেন না। সুতরাং গুরু অথবা পুরোহিতের মধ্যে দৈবী শক্তির কল্পনা অথবা সাধারণের তুলনায় উচ্চকোটিতে অবস্থান সংক্রান্ত মনোভাবের প্রতিষ্ঠা বৈদিক সাহিত্যে হয়েছে বলে মনে করার কারণ নেই।

বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে একাধিক গোত্রের প্রতিনিধিত্বের কথা আমরা আগেই বলেছি। তবে সামগ্রিকভাবে বৈদিক ভাবনা স্রোতের দুটি ধারার কথা বর্তমানে আমরা আলোচনা করতে চাইছি। বেদের কবিতা অথবা শ্লোকগুলিকে পারিভাষিকভাবে মন্ত্র বলা হয়। মন্ত্র কবিরা রচনা করেন না, তাঁরা মন্ত্রের সাক্ষাৎলাভ করেছেন। লক্ষণীয় মন্ত্র হল দেবাবিষ্ট মনের বিচ্ছুরণ, তাকে বোঝার চেষ্টা করা সাধকের কাজ। অর্থাৎ যখন একজন মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেলেন তখনই সম্পূর্ণ মন্ত্রটির

---

৪৬ তদেব. পৃ. ১৫৪

৪৭ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়. *সাধনা ও সংস্কৃতি.* কলকাতা : সংস্কৃতি প্রকাশন. ১৩৭২ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ০৩

অর্থ তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে গেল এমন নয়। মন্ত্র সাক্ষাতের পরে তার কাজ হবে মন্ত্রের অর্থ বোঝার চেষ্টা করা। এবার মন্ত্র উপলব্ধির পথে কর্ম এবং জ্ঞান—দুটিই থাকছে। একারণে বেদের ব্রাহ্মণ অংশে কর্মমীমাংসা এবং জ্ঞানমীমাংসা দুটিই থাকছে।[৪৮] মন্ত্র উপলব্ধির জন্য বৈদিক ভাবনা স্রোতের দুটি ধারা রয়েছে—দেববাদী, যাদের মধ্যে আবেগ, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির প্রাধান্য রয়েছে। অপরটি হল আত্মবাদী এবং তর্কপরায়ণ ভাবনাস্রোত। প্রথম ধারার সাধকদের বলা হয় ঋষি এবং দ্বিতীয় ধারার সাধকেরা হলেন মুনি। ঋষিরাই বৈদিক সাহিত্যের মূল স্রোত আর মুনিরা বৈদিক স্রোতে কিছুদূর অবধি কোণঠাসা। ঋষিদের ভাবনাবিশ্বের ফলশ্রুতি হল বেদান্ত, অন্যদিকে যুক্তি পরায়ণ মুনি-ধারার ফলশ্রুতি হল সাংখ্য। আত্মবাদী মুনি ধারায় ক্রমশ যোগের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে। তাঁদের মতে পিণ্ডেই আধ্যাত্ম।[৪৯] মুনি ধারার প্রভাব পাওয়া যায় কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, এই দুটি উপনিষদ যোগোপনিষদ নামে পরিচিত। রুদ্র উপাসনায় মুনি ধারায় বিশেষ জোর দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত মুনিধারা কীভাবে বৈদিক মূলস্রোতের থেকে সরে যাচ্ছে তার একটা নমুনা আচার্য অনির্বাণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ‘ইন্দ্র মুনিনাং সখা’—অর্থাৎ ইন্দ্র যতিদের সালাবৃকে ফেলে দিচ্ছেন।[৫০] মুনিপন্থীদের মধ্যেও ইন্দ্রবিদ্বেষ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে ক্রমশ। বৈদিক সাহিত্যে ঋষি এবং মুনিধারার এই মতাদর্শ এবং সাধনার পদ্ধতিগত পার্থক্য পরবর্তী সময়েও ভারতবর্ষীয় ধর্মীয় পরম্পরায় কার্যকর হয়েছে। ঋষিধারার সূত্রে আমরা বৈদিক সাহিত্যে যে ধর্মচর্যার বিবরণ পাচ্ছি তা মূলত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত পুরুষকেন্দ্রিক পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পুরুষকেন্দ্রিক শব্দটি আমরা সচেতনে প্রয়োগ করেছি, এই পরিবার কাঠামোর অন্যতম অংশ হল নারীরা, বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য পুরুষকে অবশ্যই বিবাহিত হতে হত। এমনকী পুরুষ বিপত্নীক হলে সে যজ্ঞাধিকার হারাত। বিবাহিত মূল স্রোতের জীবনধারায় ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদন করতেন ঋষিধারার

[৪৮] অনির্বাণ. *বেদ-মীমাংসা* (১ম). কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ. ১৯৯১. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৭৬-৭৭

[৪৯] তদেব. পৃ. ১০২

[৫০] অনির্বাণ. *বেদ-মীমাংসা* (১ম). কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ. ১৯৯১. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৬৮৭

সাধকরা। অন্যদিকে মুনিধারার সঙ্গে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সরাসরি যোগাযোগ ছিল, এঁরা যজ্ঞ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের বিরোধিতা করতেন।

ঋষিরা জ্ঞানের দ্বারা সংসার পরাগত হতেন, অর্থাৎ সংসারে থাকতেন এবং জ্ঞানের মাধ্যমেই সংসারকে অতিক্রম করতে পারতেন। এঁরা শাস্ত্রপ্রণেতা, ঋষিরা সাত প্রকারের—মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, শ্রুতর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।[৫১] মুনিরা মৌনব্রতী, হর্ষের *নৈষধচরিত*-এ বলা হয়েছে যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, স্পৃহাহীন, অনুরাগ, ভয় কিংবা ক্রোধ যাকে আশ্রয় করে না তিনিই মুনি। বোঝাই যাচ্ছে ঋষি এবং মুনির মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র সাধনার ধরনেই নয়, ঋষিরা সরাসরি সমাজের অংশ; ফলত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ অনেক বেশি স্পষ্ট। অন্যদিকে বৈদিক যুগে ঋষিদের তুলনায় মুনিরা অনেকটাই সমাজের থেকে পৃথক থাকতে পছন্দ করতেন, ফলে যজমানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক অবশ্যই পৃথক ছিল।

বৈদিক ঋষিদের প্রাথমিক বাসস্থান ছিল বর্তমান পাঞ্জাব অঞ্চলে। ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ে পৌরোহিত্য একমাত্র ব্রাহ্মণদের অধীনে ছিল না একথা আমরা আগেই বলেছি। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ঋষি হিসেবে গৃহীত হয়েছেন। বশিষ্ঠের জন্ম হয় মিত্র এবং বরুণের বীর্যে তবে বশিষ্ঠের মায়ের নাম পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বলা হয়েছে বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছে অপ্সরা উর্বশীর থেকে। ডি.ডি. কোশাম্বী বলতে চেয়েছেন বশিষ্ঠের জন্ম সংক্রান্ত এই ধরনের মিথ থেকে বোঝা যায় বশিষ্ঠ আসলে প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। একই রকমভাবে মাতৃদেবতার গর্ভ, প্রতীকী জলপাত্রে জন্ম হয় আরেকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ঋষির—অগস্ত্য। সুতরাং ঋষিগোত্রের মধ্যে আর্য এবং প্রাগার্য দুটি ভাবধারার অবস্থান দেখা যাচ্ছে। ঋগ্বেদে দেখা যাবে পুরোহিতেরা যে কেবল আর্যদের অনুষ্ঠানেই পৌরোহিত্য করতেন এমনটা নয় প্রয়োজন হলে অনার্য যজমানের পৌরোহিত্য করতেও পুরোহিতদের

---

[৫১] Mookerji, Radha Kumud. *Ancient Indian Education*. Delhi : MLBD. 1969. Fourth Edition. p. 23

সমস্যা ছিল না। অনার্য যজমানের পৌরোহিত্য করে উট দান স্বরূপ পাওয়ার কথা ঋগ্বেদে পাওয়া যাচ্ছে। কোশাম্বীর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বৈদিক ঋষি তথা বৈদিক সভ্যতার অগ্রগতি ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের দিকে বিশেষ গতিপ্রাপ্ত হতে পারেনি—পূর্ব ভারতের দিকে যমুনার তীরে ঘনজঙ্গল যা লোহার অস্ত্র ব্যতীত কাটা সম্ভব ছিল না, দক্ষিণ দিকে ছিল মরুভূমি। ফলত আর্য জনজাতির পক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে বিস্তার লাভ করা সম্ভব ছিল না। একারণে বৈদিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হতে হয়েছে।[৫২] একারণেই যজুঃবেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে (খ্রি.পূ. ৬০০) আমরা অজস্র সামাজিক এবং জনজাতির কথা পাচ্ছি। যত ক্ষুদ্র অংশে একটি গোষ্ঠী ভাঙবে ততই তার মধ্যে ভাবনার বৈচিত্র্য তৈরি হবে।

এবার আমরা যজ্ঞকার্যে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে পুরোহিতদের অবস্থান বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। বৈদিক সাহিত্যে সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ অংশে যজ্ঞ সম্পাদনের পদ্ধতি বিস্তৃভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরণ্যক সাহিত্য আসলে সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডের ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানকাণ্ডের উপনিষদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করছে। আরণ্যকের পাঠ সম্পূর্ণ না হলে বেদের পাঠ অসম্পূর্ণ। আরণ্যক-এ বিবিধ কর্মানুষ্ঠানের কথা আছে, কিন্তু এগুলি বাহ্য উপাদানের সাহায্য ব্যতীত মানসিক প্রক্রিয়ার কথাই বলে। মনে রাখতে হবে গৃহাশ্রমের পর অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের পর বাণপ্রস্থে গিয়ে আরণ্যকের শিক্ষার প্রয়োগ করতে হয় কারণ যজ্ঞ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তখন থাকে না।[৫৩] অতএব বৈদিক সাধনায় যেমন পুরোহিতের মধ্যস্থতার প্রয়োজন একটি পর্যায় পর্যন্ত থাকছে তেমনি সম্পূর্ণ নিজে সাধনার সুযোগও থাকছে। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার মধ্যে অজস্র বৈচিত্র্য রয়েছে। যজ্ঞের ধরন অনুযায়ী পুরোহিতের সংখ্যা এবং কার্যক্রমে ফারাক দেখা যায়।[৫৪] বৈদিক যজ্ঞ দিন সংখ্যার ভিত্তিতে সাধারণভাবে তিন প্রকার—

---

[৫২] Kosambi, D. D. *The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline.* New Delhi : Vikas Publishing House Pvt Limited. 2002. 2nd Reprint. pp. 83-87

[৫৩] Law, Narendra Nath. *Age of the Rig Veda.* Calcutta : Firma KLM. 1965. 1st Edition. pp. 4-5

[৫৪] বসু, যোগীরাজ. *বেদের পরিচয়.* কলকাতা : ফার্মা কে এল এম. ১৯৫৭. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১২০-১২৩

একাহ অর্থাৎ একদিনের যজ্ঞ, অহীন যজ্ঞ অর্থাৎ একদিনের বেশি, আবার বারো দিনের কম সময়ের যজ্ঞ, সত্র অর্থাৎ বারোদিনের বেশি সময়কাল ধরে করা যজ্ঞ। অনুষ্ঠান ক্রিয়ার দিক থেকে যজ্ঞ পাঁচ রকমের—হোম অথবা অগ্নিহোত্র—এই যজ্ঞ রোজ সপত্নীক করতে হয়। এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজেই করবেন, পৌরোহিত্যের প্রয়োজন নেই অগ্নিহোত্রের। এই অগ্নি গৃহস্থ কখনোই নিভতে দেবেন না। দ্বিতীয় প্রকারটি হল ইষ্টি যজ্ঞ। পূর্ণিমা, অমাবস্যাতে এই যজ্ঞ করতে হয়। পশু যজ্ঞ বছরে এক, দুই অথবা ছয়বার করা হবে। এই যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হবে এবং এক্ষেত্রে যজমান পশুর সঙ্গে তুলনীয়। চতুর্থ প্রকারটি হল সোম অথবা অগ্নিষ্টোম, এক্ষেত্রে সোমলতার রস আহুতি দেওয়া হবে। যজমান সপত্নীক এই যজ্ঞ করবেন এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে অন্তত সতেরোজন পুরোহিতের প্রয়োজন হবে। শেষ প্রকারের নাম হল সত্র, অর্থাৎ এই যজ্ঞ হবে বারো বা তার বেশি দিন ধরে। এছাড়াও কিছু যজ্ঞের কথা পাচ্ছি, যা সরাসরি রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। রাজা হতে হলে রাজসূয়, সম্রাট হলে বাজপেয়, সার্বভৌম নৃপতি হতে হলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা দরকার রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রের সম্পর্কের কথা আমরা আগেই বলেছি, রাজার অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণ রাজাকে মনে করিয়ে দিতেন রাজা যদি ব্রাহ্মণের অনিষ্ট সাধন করে তবে রাজার আয়ু এবং সন্তান-সন্ততি ব্রাহ্মণ হরণ করবেন।[৫৫] শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পূর্বে অবস্থান করবেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যজমান হবেন। যজ্ঞ করলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের গুণ অর্জন করতে পারেন। ব্রাহ্মণ তথা পুরোহিত ছিলেন রাজার মন্ত্রী।[৫৬] *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ বলা হল—দেবতা কেবল ব্রাহ্মণের হাতের হর্ব্য গ্রহণ করেন, অন্য কারো হাতে নয়। সুতরাং যাবতীয় সংস্কারের জন্য মধ্যস্থতাকারীরূপে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল। রাজাদের পাশপাশি অসুরদেরও পুরোহিত রাখার কথা পাচ্ছি। যে কোনও পূর্ণায়তন যজ্ঞের জন্য চার প্রকার পুরোহিত থাকা ছিল বাধ্যতামূলক। হোতৃ অর্থাৎ ঋগ্বেদের পুরোহিত, যাঁরা

---

[৫৫] তদেব, পৃ. ১৩৫

[৫৬] Basu, Jogiraj. *India of the Age of Brahmanas*. Calcutta : Sanskrit Pustak Bhandar. 1969. First Edition. p. 172

মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। অধর্যু, যিনি যজ্ঞভূমি নির্মাণ করবেন, যজ্ঞের আহুতি, চরষ, পুরোজশ তৈরি করবেন, যজ্ঞের কাজ যথাযথ ক্রম এবং সময় অনুযায়ী হচ্ছে কিনা দেখবেন, উদগাতৃ অর্থাৎ সামবেদের ব্রাহ্মণ। এঁরা সামমন্ত্র গাইবেন। ব্রাহ্মণ, যাঁর পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে যজ্ঞ সম্পাদিত হবে এবং সামগ্রিক যজ্ঞের জন্যই তিনি দায়ী থাকবেন। হোতৃ, অধর্যু এবং অগ্নিধরের কথা আমরা ইরানীয় সংস্কৃতিতে পাব, ব্রাহ্মণের যুগে আমরা সামবেদের উদগাতৃ ও ব্রাহ্মণের কথা পাচ্ছি। এই সংযোজনটি নবতম, ইরানীয়দের থেকে পৃথক। একইভাবে পুরোহিততন্ত্র এবং পুরোহিতকেন্দ্রিক ধর্মচর্যাক্রমে আরও জটিল আকার পাচ্ছে। ঋগ্বেদে যজ্ঞে ছয়জন পুরোহিতের কথা পাব। পরবর্তী সময়ে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ আমরা পুরোহিতের সৃষ্টি সংক্রান্ত আখ্যান পাচ্ছি। আরও পরে দেখা যাচ্ছে চারজন পুরোহিতের প্রত্যেকের চারজন করে সহকারীর প্রয়োজন হচ্ছে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থার সঙ্গে দক্ষিণার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই পুরোহিত কেন্দ্রিক ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণের গুরুত্ব এতটাই যে তাকে ক্ষত্রিয়ের অর্ধেক অংশ বলে মনে করা হত। পুরুরবা, নহুষ, নিমি প্রভৃতি রাজাদের ব্রাহ্মণ্য অনুরাগ বিশেষ ভাবে খেয়াল করার মত। রাজা যুদ্ধযাত্রার পূর্বে ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণ করতেন। *মাধ্যন্দিন শতপথ-ব্রাহ্মণ* অনুযায়ী যজ্ঞই বিষ্ণু, যাঁরা যজ্ঞ করেন তাঁরাই বৈষ্ণব।[৫৭] গোপথ ব্রাহ্মণ-এ পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ, সোমযজ্ঞ প্রত্যেকটির সাতটি করে প্রকার ধরে মোট একুশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে।[৫৮] বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে জটিলতা বৃদ্ধির আরেকটি উদাহরণ হল যজুর্বেদে যজ্ঞের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল অগ্নিচয়ন। অগ্নিচয়নের বিস্তারিত কর্মপদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যাচ্ছে যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ অংশে। মনে রাখতে হবে ঋগ্বেদে অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানের উল্লেখমাত্র নেই।[৫৯] সুতরাং

---

[৫৭] ভট্টাচার্য, বিধূশেখর. *মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ.* কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৮৬. পৃ. ২১

[৫৮] অধিকারী, তারকনাথ. *গোপথ ব্রাহ্মণ.* কলকাতা : বেদবিদ্যাকেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৯৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫১-৫৬

[৫৯] Stall, Frits. *Agni The Vedic Ritual of the Fire Alter*. Delhi : MLBD. 1st Edition. 2001. p. 01

ক্রমান্বয়ে বৈদিক অনুষ্ঠানে জটিলতে বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে পুরোহিত তথা ঋষিধারার গুরুত্ব। প্রসঙ্গত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং পুরোহিতের অনিবার্য ভূমিকা কোথায় ছিল সেই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে। দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম হল যজ্ঞ। যজ্ঞের অগ্নি তিন প্রকারের—গার্হপত্য, আহবণীয় এবং দক্ষিণাগ্নি।[৬০] যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত ঘৃত, চরু, পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ, পশুমাংস এবং সোমলতার রস। সোমরসের দুর্মূল্যের জন্য সোমরসের বিকল্পরূপে ক্ষত্রিয়েরা বট, অশ্বত্থ প্রভৃতির রস পান করতেন। সোম সুরাস্থানীয় তবে বৈদিক যুগে একটি পর্যায়ের পরে যজ্ঞে সুরার আহুতি অপ্রচলিত হয়ে যায়, আপস্তম্বের নির্দেশ অনুযায়ী যজ্ঞে সুরার পরিবর্তে দুধ ঢালার রীতি প্রবর্তিত হয়। তন্ত্র পরম্পরায় সুরাপানের রীতি গৃহীত হলেও বৈদিক পরম্পরায় সোমরস পানের প্রসঙ্গ গৌণ হয়ে যায়। যাই হোক দেখা যাচ্ছে আহুতির দ্রব্যের মধ্যেও একধরনের পরিবর্তন বৈদিক ঐতিহ্যে দেখা যাচ্ছে। সোমের সঙ্গে আরেকটি দ্রব্য পুরোডাশ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত। যজ্ঞে পুরোডাশ আহুতি দেওয়ার পর যজমান এবং ঋত্বিকেরা একসঙ্গে খেয়ে থাকেন। এই অবশিষ্ট ভাগের নাম ইড়া। ইড়া ভক্ষণ বৈদিক অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইড়া ভক্ষণের সময়ে ইড়ার দেবতাকে ইড়ার উপর অধিষ্ঠানের অন্য ঋত্বিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এ বলা হচ্ছে এই পুরোডাশ-ই হল যজমান অর্থাৎ যজমান নিজেকেই যজ্ঞে আহুতি দেন। এক্ষেত্রে যজমান নিজের বিকল্পরূপে পশুকে আহুতি দিতে পারেন। একারণে বলা হয়েছে যজমান নিজেই পশু। আত্মাহুতির বিকল্প বস্তুটি যজ্ঞের শেষে যখন যজমান এবং ঋত্বিক ভক্ষণ করেন তখন তা হয়ে যায় ইড়াদেবী। অর্থাৎ দেবতাকে ভক্ষণ করে যজমান এবং ঋত্বিক নিজেই দেবতা হয়ে যাচ্ছেন। ইড়াদেবী হলেন স্বয়ংবাক্‌দেবী।[৬১] বলা হয়েছে মনু তার যজ্ঞজাত কন্য ইড়াকে যজ্ঞে আহুতি দেন এবং সেই থেকেই মানবের সৃষ্টি হয়।

---

[৬০] ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর. *যজ্ঞ-কথা,* কলকাতা : প্রাচী পাবলিকেশনস্. ২০০৯. নতুন সং. পৃ. ২৩

[৬১] তদেব. পৃ. ১১০-১২০

একারণেই প্রাচীন বিশ্বাসে যজ্ঞের পুরোডাশে ইড়াকে আহ্বান করা হয়েছে। ইড়াদেবী ভরতবংশের প্রতিষ্ঠাত্রী। দেখা যাচ্ছে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা যজমান এবং ঋত্বিকের দেবত্বলাভ। এখন দেবত্ব লাভকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করা চলবে না। ঐশী শক্তিলাভের পাশপাশি বৈদিক ঋষিদের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল সামর্থ্য লাভের। বৈদিক সূক্তগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে ঋষিরা দেবতার অনুগ্রহ আশা করতেন না। অর্থাৎ এমন প্রার্থনা করতেন না যে দেবতাই তাঁদের হয়ে কোনও কার্য সম্পাদন করে দেবেন। এদের আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই সামর্থ্য অর্জন করা যাতে এরা নিজেই কাঙ্খিত কাজ করতে পারেন। সুতরাং বৈদিক ধর্মদর্শনের সঙ্গে পুরোডাশ ভক্ষণ করে নিজে দেবতা হয়ে ওঠার কল্পনাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবার পুরোহিতদের ভূমিকা বুঝতে হবে। ঋষিরা ছিলেন আবেগকল্পে বিপ্র, কাব্য রচনায় এঁরা ছিলেন সুপটু। বৈদিক সাহিত্যে ঋষি তথা মন্ত্রদ্রষ্টাদের শ্লোকনির্মাণ দক্ষতার জন্য এদের অনেক সময় সূত্রধর অথবা ছুতোরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে দৈবী তাপের (Devotional Fervor)-এর কথা বারবার বলা হয়েছে।[৬২] তাপস বা তপিষ্ঠ আসলে তাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ব্রাহ্মণের তেজরূপে অভিব্যক্ত হতে দেখা যাচ্ছে নানা প্রসঙ্গে। এই ঋষিরা বৈদিক ক্রিয়াকার্যে ছিলেন অপরিহার্য। বৈদিক সাহিত্যে ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে এদের সাহায্য ব্যতীত কোন ভাবেই যজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে দেখলে পুরোহিত ক্রমে বংশানুক্রমিক পেশার স্থান পাচ্ছে। অর্থনৈতিক সুবিধা একচেটিয়া ভাবে পাওয়ার ইচ্ছায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বাহ্য উপাদানের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রৌতসূত্রগুলি রচনার সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রের সরাসরি যোগ রয়েছে। কল্পসূত্র অর্থাৎ গৃহ্য, ধর্ম এবং শ্রৌতসূত্রগুলি তাদের সমসাময়িক বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের একটি বর্ণনামূলক বিবরণ উপস্থাপন করে। ইতিপূর্বে রচিত ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বিচার করা, মানুষ কেন যজ্ঞ করবে সে বিষয়ে আলোচনা করা। ব্রাহ্মণে

[৬২] Blair, C.J. *Heat in the Rig Veda and Atharva Veda*. Anrocica : New Haven Connectient. 1961. 1st Edition. p. 115

মন্ত্রের অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের উৎস প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, তবে *ব্রাহ্মণ* গ্রন্থে যজ্ঞের খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।[৬৩] কল্পসূত্রগুলির অন্যতম কাজ ছিল এই বিবরণগুলির যথাযথ সংরক্ষণ। বৈদিক রাষ্ট্র কল্পনায় পুরোহিতের কথা সব সময়েই বলা হয়েছে, নানাভাবেই পুরোহিতরা রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রৌতসূত্রগুলির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করার অন্যতম কারণ ছিল পুরোহিতদের কর্মবিধিগুলির যথাযথ এবং সুশৃঙ্খল নথিভুক্তিকরণ। প্রথম দিকে সকলেরই নিজের যজ্ঞ নিজে সম্পাদনের অধিকার ছিল। পরে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ার জন্য এই দায়িত্ব ব্রাহ্মণেরই একচ্ছত্র হয়ে যায়। যজ্ঞের নীতি বৈদিক যুগে কেন্দ্রীয়ভাবে সঞ্চালিত হত না। কোনও একটি মন্দির বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করত না। তবে যজ্ঞাধিকার পেতে হলে পুরোহিতদের নিজেদের কোনও না কোনও বৈদিক ঋষিদের উত্তরাধিকারী প্রমাণ করতে হত।[৬৪] সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এই বিধানের পাশাপাশি পুরোহিতদের বিভিন্ন যোগ্যতার বিষয়েও আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে। একজন পুরোহিত অপরের যজমানের দায়িত্বগ্রহণ করতেন না।[৬৫] সুতরাং কল্পসূত্রের সময় থেকে পৌরোহিত্য পদ্ধতি সুশৃঙ্খল রূপ লাভ করে। পুরোহিতরা যজ্ঞকার্যে নিজেদের ভূমিকাকে অপরিহার্য করে তোলেন কল্পসূত্রের সময়েই।

পৌরোহিত্যের পাশাপাশি ঋষিধারার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা ছিল বৈদিক দশ সংস্কার সম্পাদনা করা। এর মধ্যে উপনয়ন সংস্কার আমাদের বর্তমান গবেষণায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদে 'ব্রহ্মচর্য' শব্দটির উল্লেখ দুবার মাত্র পাওয়া গেছে।[৬৬] সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আমরা উপনয়নের কথা পেলেও উপনয়ন তখন বাধ্যতামূলক ছিল না। দ্বিজ ধারণাটি মূলত যজ্ঞ এবং ধর্মীয়

---

[৬৩] Sharma, Rajendra Nath. *Culture and Civilizationas Revealed in the Srautasutras*. New Delhi : Nag Publishers. 1977. 1st Edition. pp. 1-19

[৬৪] তদেব, পৃ. ৬৩

[৬৫] তদেব। পৃ. ১৫৫

[৬৬] Pandey, Raj Bali. *Hindu Samskaras*. Banaras : Vikram Publications. 1949. 1st Edition. p. 190

কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে গৃহ্যসূত্রের সময় থেকে উপনয়ন বাধ্যতামূলক সংস্কাররূপে গৃহীত হয়। উপনয়ন সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল বেদশিক্ষা। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুযায়ী গুরু বেদ শিক্ষা দেবেন, পাশপাশি কর্তব্য-অকর্তব্যের শিক্ষাও দেবেন। উপনয়নের সময়ে গুরু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। শৌনক স্মৃতি অনুযায়ী—ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, ভালো পরিবার, ভালো চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত হওয়াই ছিল গুরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে ব্রাহ্মণের বিশেষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ বেদে নিবেদিত প্রাণ হবেন, বৈদিক যজ্ঞ হবে তার পেশা, বেদের শাখায় তার মনোযোগ থাকবে এবং স্বভাব হবে নিরবলম্ব।[৬৭] যাস্কের নিরুক্ত অনুযায়ী দুধরনের ঋষির কথা পাচ্ছি। প্রথমদল হলেন মন্ত্রর্ষি অর্থাৎ যাঁরা সরাসরি মন্ত্রের সাক্ষাৎলাভ করেছেন, সত্য উপলব্ধ হয়েছেন। আরেকদল হলেন শ্রুতর্ষি অর্থাৎ এঁরা মতগুলি শুনেছেন, পড়েছেন তবে নিজে উপলব্ধি করেননি। মন্ত্র সাক্ষাতের জন্য তপ এবং যোগবলের দরকার যা শ্রুতর্ষিগণের মধ্যে নেই।[৬৮] তবে আচার্যকেন্দ্রিক গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন আসলে শ্রুতর্ষি পরম্পরার বৈশিষ্ট্য। ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে সপ্তর্ষি এবং মুনিগণ যে শিক্ষা লাভ করেন তা তপস অর্থাৎ তপবলের থেকে প্রাপ্য। কিন্তু এই জ্ঞান সকলের আয়ত্তাধীন বিষয় নয়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঋষিদের পরিবার অনুযায়ী পৃথক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। পাণিনি বলছেন, শিষ্য শিক্ষালাভ করবেন আচার্য, গুরু, শিক্ষক এবং উপাধ্যায়ের থেকে। এরমধ্যে আচার্য সব থেকে বড়।[৬৯] আপস্তম্বের গৃহ্যসূত্র এবং গৌতমের ধর্মসূত্রের আনুমানিক সময়কাল খ্রি.পূ. ১১০০ থেকে খ্রি.পূ. ৩০০। এই সময়ে বৈদিক ধর্ম দক্ষিণ ভারতেও প্রসার লাভ করেছে এবং উক্ত গ্রন্থগুলি সম্ভবত দক্ষিণ ভারতেই লেখা হয়েছে। আপস্তম্বের মতে জীবনের অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের জন্য আচার্যের শরণাপন্ন হতে হবে। গুরুর বিরোধিতা করা যাবে না, গুরুর থেকে

---

[৬৭] তদেব, পৃ. ২১৩

[৬৮] Mookerji, Radha Kumud. *Ancient Indian Education*. Delhi : MLBD. 1969. Fourth Edition. p. 24

[৬৯] তদেব, পৃ. ২৩৮

নীচাসনে বসতে হবে। গুরু খাদ্যগ্রহণের পরে খাদ্য গ্রহণ করবে শিষ্য।[৭০] শিষ্য সাধারণত বারো থেকে কুড়ি বছর অবধি সময় গুরুগৃহে যাপন করবে। কখনও কখনও অধিক সময়েও শিষ্য গুরু গৃহে থাকতে পারেন। আবার কখনও কখনও নিজের পিতাই পুত্রের পঠন-পাঠনেরর দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। সামাজিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ছিল বৈদিক শিক্ষার অন্যতম অংশ। এই মূল্যবোধের শিক্ষাকে বলা হত ঋত।[৭১] বৈদিক শিক্ষাকার্যে এবং অন্যান্য সংস্কারে আমরা ঋষিধারার প্রাধান্য দেখতে পাচ্ছি। ঋষিধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূচকাকারে দেখলে বোঝা যাচ্ছে এই ধারায় জাতি-বর্ণ এবং বংশানুক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে; দ্বিতীয়ত, পেশার দিক থেকে যজ্ঞ এবং অধ্যাপনাই ছিল এঁদের মূল ভিত্তি। তৃতীয়ত, পেশায় একচ্ছত্র অধিকার বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষায় এঁরা শাস্ত্রপ্রণয়ন এবং শাস্ত্র অধ্যয়নের পরম্পরা নির্মাণ করেছিলেন; চতুর্থত, রাষ্ট্রের শাসন এবং অর্থনীতির সঙ্গে এঁদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল, এঁরা যেমন রাষ্ট্রকে ধর্মীয় এবং নৈতিক নিরাপত্তা দিতেন, রাষ্ট্রও এঁদের প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নিত।

বৈদিক ঋষিদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বংশতালিকা পাওয়া যাছে। এইক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সকল ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন তাঁদেরই বংশতালিকা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের মনে থাকবে পৌরোহিত্যে অংশগ্রহণ করার জন্য পুরোহিতদের প্রমাণ করতে হত যে তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ মন্ত্রর্ষি ধারা থেকে আগত। সুতরাং বৈদিক সংস্কৃতিতে বংশতালিকা নির্মাণ করা আসলে পৌরোহিত্যের অধিকার অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। বৈদিক সংস্কৃতিতে সাতটি মূল গোত্রের কথা পাওয়া যাচ্ছে— ভার্গব, আঙ্গিরস, আত্রেয়, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, আগস্ত এবং কৌশিক। শেষ পাঁচটি গোত্র বৈদিকযুগের শেষে গণ অথবা Exogamous Group বলে পরিচিত হয়। প্রথম দুটি গোত্র পরবর্তী সময়ে

---

[৭০] Olivelle, Patrick. *Dharmasutras The Law Codes of Apastamba, Gautama, Baudhayana and Vasistha*. New York : Oxford University Press. 1999. 1st Edition. p.24

[৭১] Pande, G.C. *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization (Vol. 1 Part 1)*. New Delhi : Centre for Studies in Civilization. 2004. Reprint. p. 569

ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের মধ্যে প্রাচীন হল ভার্গব, অঙ্গিরা, আত্রেয় এবং কাশ্যপ।[৭২] বৈদিক সাহিত্যে মূল গোত্রগুলির নাম পাওয়া যাচ্ছে, পরে মহাভারত, পৌরাণিক সাহিত্য এবং ধর্মসিন্ধু, নির্ণয়সিন্ধু জাতীয় গ্রন্থেও বংশলতিকার কথা পাচ্ছি। ভার্গব বংশের কথা পাচ্ছি বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে। ভার্গব ও আঙ্গিরস আদিতে একই শাখার অন্তর্গত ছিলেন। আঙ্গিরস শাখার অনেকেই ঋগ্বেদের একাধিক মন্ত্ররচনা করেছেন। অন্যদিকে বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের বংশলতিকা শুরু হয়েছে মিত্রা-বরুণের নাম দিয়ে। বংশলতিকার পাশাপাশি মনে রাখার প্রয়োজনে প্রত্যেকটি বেদেরই অনেকগুলি শাখার নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সবকটি শাখা সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। যেহেতু ঋষিরাই ছিলেন বেদের শাখাগুলির মূল ধারক এবং বাহক তাই কোন একটি শাখার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির সঙ্গে সেই শাখার প্রবর্তক এবং ধারক-বাহকদের একটি সম্পর্ক থাকবেই। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখা সারা দেশে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কইরা দ্বিতীয় দদ্দ অনুশাসনে ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখার ছয়জন ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যাচ্ছে। গুর্জর-প্রতিহার রাজ প্রথম ভোজদেবের দৌলতপুর অনুশাসনে আমরা আশ্বলায়ন শাখার ব্রাহ্মণের কথা পাচ্ছি। তবে অনুশাসনে অথর্ববেদের শাখার কথা বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হিসাবে বলা হয় অথর্ববেদের শাখা ক্রমে অন্য শাখার সঙ্গে মিশে গেছে।[৭৩] অথর্ববেদের থেকেই আমরা বৈদিক ঋষি ভার্গবাঙ্গিরসের মতামত পাচ্ছি যা মূলত স্রোতের বৈদিক ভাবনার থেকে পৃথক।

বৈদিক ভাবনা স্রোতের দ্বিতীয় শাখা ছিল মুনিধারা। আমরা আগেই বলেছি আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক যে ধর্মচর্যা ঋষিরা করতেন মুনিরা তার বিরোধী ছিলেন। মুনিরা অনেকেই ছিলেন সন্নাসী এবং সংসারত্যাগী। অথর্ববেদের ভার্গবাঙ্গিরস এবং ব্রাত্যরা ঋষি স্রোতের বিরোধী ছিলেন।

---

[৭২] Bharvaga, Purushottam Lal. *India in the Vedic Age.* Lucknow : The Upper India Publishing House Limited. 1956.1st Edition. pp. 100-120

[৭৩] Gupta, Chitralekha. *The Brahmanas of India. A Study Based on Inscriptions.* Delhi : Sandeep Prakashan. 1983. 1st Publication. pp. 2-13

অথর্ববেদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ঔষধবিদ্যা। অথর্ববেদ অনুযায়ী অথর্ববেদের পুরোহিতরা ভিষজ।[৭৪] তিনি অসুস্থ মানুষের সেবা করেন, মন্ত্র, যজ্ঞ, নানা লতা থেকে প্রস্তুত ঔষধ প্রদান করেন। অথর্ববেদের সংহিতা অংশের পঞ্চদশ কাণ্ডের নাম ব্রাত্য কাণ্ড। ব্রাত্যগণ বেদবিহিত যজ্ঞাদির অধিকারী নন।[৭৫] কিন্তু বেদবিহিত কর্ম না করলেও বলা হয়েছে যেখানে ব্রাত্য পুরুষ গমন করেন, সমগ্র জগৎ ও সকল দেবতাগণ তার অনুগমন করে, তাতে দেবগণ অবস্থান করে, যেমন রাজার অনুগমন করে প্রজারা। ব্রাত্যরা উপনয়ন নিতেন না, বৈদিক সংস্কার অস্বীকার করতেন। রুদ্র এবং শিবের উপাসনা করতেন। আরও পরে ব্রাত্যরা পৃথক ব্রত এবং ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন। মনে হয় ব্রাত্যদের থেকেই যোগী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। যদিও কল্পসূত্রের অন্তর্গত বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে সন্ন্যাসী কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু বেদ ত্যাগ করলে তাকে শূদ্র বলে গণ্য করা হবে।[৭৬] ব্রাত্যরা তাদের দর্শনের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ের অনেকগুলি ধর্মসম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে বৌদ্ধ এবং জৈনদের কথা বলতে হয়। ব্রাত্যদের প্রতিবাদী ধরনের পাশাপাশি মুনি ধারার অন্য দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। প্রথমত, মুনি ধারা পার্থিব জীবনের পরের অবস্থা বিষয়ে চিন্তা করতেন; দ্বিতীয়ত, মুনিধারার চিন্তা পদ্ধতিতে আবেগের তুলনায় যুক্তির বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে দুই ধরনের মানুষের কথা পাওয়া যাচ্ছে।[৭৭] ক্রমমুক্ত এবং জীবন্মুক্ত। যাঁরা জীবিতাবস্থায় মুক্তি লাভ করেন, যাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাঁরা কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই সময়ে এঁদের জীবন্মুক্ত বলা হয়। দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণবধর্ম মনে করে জীবন্মুক্তরা ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাযুজ্য শক্তি পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বড় বড় সন্ন্যাসী

---

[৭৪] Shende, N.J. *The Religion and Philosophy of the Atharva Veda*. Poona : Bhandar Oriental Research Institute. 1952. 1st Edition. p. 11

[৭৫] গোস্বামী, বিজনবিহারী. *অথর্ববেদ-সংহিতা.* কলকাতা : হরফ প্রকাশনী. ১৩৮৫. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩২৯

[৭৬] Max Muller, F. *The Secred Books of the East* (Vol-XIV). Delhi : MLBD. 1965. 1st Edition. p. 46

[৭৭] Aiyangar, Rangaswami K.V. *Some Aspects of Hindu View of Life According to Dharmasastra*. Baroda : Oriental Institute. 1952. 1st Edition. pp. 44-45

এবং মতপ্রবক্তাদের অবতার হিসাবে দেখানোর প্রবণতা ব্রহ্মসূত্র এবং শংকরাচার্যের ব্যাখ্যার মধ্যে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ করার মতো, মুনি ধারায় জীবন্মুক্ত কেবল ব্রাহ্মণই হবেন এর কোনও মানে ছিল না। মুনি ধারার কথা পাওয়া যাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, বলা হয়েছে শুধু গুরুতে ভক্তি করলেই চলবে।[৭৮] সাংখ্যের গুরু আত্মজ্ঞ, বৌদ্ধ এবং সাংখ্য ইত্যাদি মুনিপন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধ এবং শৈব মার্গে বুদ্ধ এবং শিবই পরম গুরু। উপনিষদের সাধন পদ্ধতিতে কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এখানে ধ্যানের উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।[৭৯] এই ধ্যান এবং যোগের গুরুত্ব ছিল মুনিধারায়, বাহ্যকর্মের উপরে বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। মুনিধারার সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন কেশী, যাঁর কথা ঋগ্বেদে পাওয়া যাচ্ছে। কেশীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর দীর্ঘ কেশ, পীত বস্ত্র, সোমরস পান করে অমরত্ব লাভ। ঋগ্বেদ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মুনিদের বিশেষ দৈব এবং অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।[৮০]

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত উপনিষদগুলিতে আত্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে গুরুর বিশেষ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এবং প্রসঙ্গত বলা দরকার উপনিষদের বেশ কিছু প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় রাজার করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না।[৮১] কৌষীতকি উপনিষদে গর্গ্যায়ণ বংশীয় চিত্র নামক রাজার প্রশ্নের উত্তর আরুণিপুত্র শ্বেতকেতু দিতে পারেন নি। ছান্দোগ্য উপনিষদে মহর্ষি উদ্দালক পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ক্ষত্রিয়দের থেকে লাভ করেন। এই বিদ্যা পূর্বে কেবল রাজর্ষিরাই জানতেন। মহর্ষি উদ্দালক ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথম এই বিদ্যা লাভ করেন। উক্ত আখ্যান দুটি থেকে বোঝা যাচ্ছে সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ অংশের তুলনায় উপনিষদে জ্ঞানের পরিধি আরও কিছুটা বাড়ছে,

---

[৭৮] অনির্বাণ. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ.* বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৫৫-১৫৬

[৭৯] Cekner, William. *A Tradition of Teachers*. Delhi : MLBD. 1983. First edition. p. 02

[৮০] Chakraborti, Haripada. *Asceticism in Ancient India*. Calcutta : Punthi Pustak. 1973. 1st Edition. p. 06

[৮১] স্বামী, মহাদেবানন্দ. *স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী* (২). কলকাতা : স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি. ১৯৭২. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৮৫-২৮৭.

অন্যান্য সামাজিক স্তরের জ্ঞান উপনিষদ গ্রহণ করছে। আত্মজিজ্ঞাসার পাশাপাশি উপনিষদে সন্ন্যাসধর্মের গুরুত্ব কিছুদূর অবধি স্বীকৃতি লাভ করেছে। নারদ-পরিব্রাজক নামক গোটা উপনিষদে সন্ন্যাসীদের চারটি প্রকারের কথা বলা হয়েছে—১. বৈরাগ্য সন্ন্যাসী, ২. জ্ঞান সন্ন্যাসী, ৩. জ্ঞান বৈরাগ্য সন্ন্যাসী এবং ৪. কর্ম সন্ন্যাসী। যজুর্বেদের অন্তর্গত ভিক্ষুক উপনিষদ-এ বলা হয়েছে সন্ন্যাসী প্রত্যেকে নিয়মিত আট গ্রাস অন্ন গ্রহণ করবেন এবং যোগের পথে মোক্ষলাভ করার চেষ্টা করবেন। এই ধরনের সন্ন্যাসীকে বলা হবে কুটীচক। এই উপনিষদে মোট চার প্রকার সন্ন্যাসীর কথা বলা হয়েছে—কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস।[৮২] বৌধায়ন ধর্মসূত্রে সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সন্ন্যাসীরা সকল জাতের থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবে, হাতই হতে তাঁদের ভিক্ষাপাত্র এবং তিনি অন্নগ্রহণ করবেন ঔষধ গ্রহণের মত অর্থাৎ যৎসামান্য এবং প্রাণধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমানে। সুতরাং জ্ঞান এবং মোক্ষের প্রতি বৈদিক সংস্কৃতির আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মুনিধারার ক্রমশ প্রসার ঘটেছিল। তবে সাধারণভাবে বৈদিক যুগে তত্ত্বত মুনি ধারা যেহেতু সমাজের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন তাই সরাসরি রাষ্ট্রের অর্থনীতির সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক বিশেষ ছিল না।

ঋষি এবং মুনি ধারার মাধ্যমে বৈদিক সংস্কৃতিতে গুরুর ধারণা মূলত দুটি প্রবণতাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছিল—ঋষিধারার ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারী যজমানের যজ্ঞ এবং বেদ শিক্ষার সহায়ক হতেন। এক্ষেত্রে গুরু কেবল ধর্মীয় মধ্যস্থতামাত্র করছেন। মুনিধারায় গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করছেন। তবে বৈদিক এবং উত্তর-বৈদিক সংস্কৃতিতে গুরু বলতে ঋষিধারার উপরেই সবসময় জোর দেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাব। বারবার বলা হয়েছে যিনি বেদশিক্ষক তিনিই গুরু। *মনুসংহিতা*-য় বলা হয়েছে যিনি আচারের নির্দেশ দেন তিনিই আচার্য। এখানে আচার বলতে কেবল নিয়ম-নীতি মনে করলে চলবে না। হিংসা, দ্বেষ, আবেশ বা অন্ধত্ব ত্যাগ করে বেদশিক্ষা করলেই আচারের অর্থ স্পষ্ট হবে। দেখা যাচ্ছে বৈদিক বিশ্বাসের থেকে ঋষিধারাই *মনুসংহিতা*-য় গৃহীত হয়েছে।

---

[৮২] Narayanasvami Aiyar, K. *Thirty Minor Upanisads*. Delhi : Parimal Publications. 1st Edition. 2003. p. 101

২.২ বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী শ্রামণ্য ধর্মমত এবং গুরু প্রসঙ্গ

বর্তমান আলোচনায় আমাদের সময়সীমা উত্তর-বৈদিক পর্ব তথা সূত্র সাহিত্য রচনাকাল থেকে গৌতম বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন অবধি। অর্থাৎ বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী শ্রামণ্যধর্মের মধ্যে আমরা বুদ্ধের সমকালীন শ্রামণ্য মতগুলিকেও বুঝতে চাইব। উত্তর-বৈদিক কালপর্বের ইতিহাস বোঝার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় বৌদ্ধ এবং জৈনদের রচিত সাহিত্যের উপরেই। মহাবীর জৈন বৈশালী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন খ্রি.পূ. ৫৪০ অব্দে এবং গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় নেপালের লুম্বিনীতে খ্রি. পূ. ৫৬৩ অব্দে।[৮৩] যদিও মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের বাণী সঙ্কলিত হয়েছে আরও বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধানে। সুতরাং আমরা বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী শ্রামণ্যধর্মের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য নির্ভর করছি বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবহৃত রচনার উপরে। এছাড়া আর কোনও বিকল্প আমাদের হাতে নেই। তবে যেহেতু ভারতবর্ষীয় দার্শনিক আলোচনার বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে জৈন এবং বৌদ্ধরা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মত উদ্ধার করতেন তাই স্বাভাবিক নিয়মে বিরুদ্ধপক্ষের মন্তব্য একরকম ‘বিকৃত’ হয়েই আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। মহাবীর এবং গৌতবম বুদ্ধের সমসময়ের একাধিক ধর্মদর্শনের কথা পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষত ধর্মাচরণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এই সময় পর্বে ঋগ্বেদের অন্যতম দুই দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি তাঁদের আগেকার গুরুত্ব হারিয়েছিলেন। দেবমণ্ডলীতে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির। এই সময়েই পৌত্তলিকতার সূত্রপাত ঘটে। পাশাপাশি যজ্ঞকর্মে গবাদি পশু দান ইত্যাদিও চলতে থাকে, তবে ভূমি দান নিয়ে বেশ কিছু সমস্যার কথা জানা যায়।[৮৪] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এজাতীয় বর্ণনা আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। মূলত বৈদিক ধারার বাইরে অন্যান্য যে সকল ভাবনা বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক যুগে প্রচলিত ছিল আমরা সেটাই বোঝবার চেষ্টা করব। বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী দর্শনের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায়ের নাম বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেলেও প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিস্তারিত

---

[৮৩] Jaggi, O.P. *Religion, Practice and Science of Non-Violence*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishars Pvt. Ltd. 1974. 1st Edition. pp. 07-12

[৮৪] শর্মা, রামশরণ. *ভারতের প্রাচীন অতীত.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান. ২০১১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৩২-১৩৩

তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান আলোচনায় আমরা যথাক্রমে পাঁচটি দিকে মনোনিবেশ করব— প্রথমত, বৈদিক সাহিত্যের মূল ঋষিধারার ভাবনা বিশ্বের বাইরের চিন্তাধারা; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পরিব্রাজক শাখা; তৃতীয়ত, চার্বাক অথবা লোকায়ত শাখা; চতুর্থত, সূত্রপিটক-এর অন্তর্গত দীঘনিকায়-এ বর্ণিত শ্রামণ্য মত এবং পঞ্চমত সাংখ্য দর্শনের শাখা।

বৈদিক সাহিত্যে ঋষিধারাই যে মূলত বৈদিক ভাবনাকে চালিত করত একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন হল ঋষিধারার যে বক্তব্য বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক অংশে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে দার্শনিক প্রস্থানের নির্মাণ কতটা সম্ভব এবিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। উত্তর বৈদিক যুগের সূচনা পর্বে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্যকে। যাজ্ঞবল্ক্যের বেশ কিছু উক্তি সরাসরি নাস্তিক্যের উক্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যেমন আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে পরিক্রমার কথা বলেছেন, তিনিই আবার বলছেন মৃত্যুর পরে কোনও চেতনাই থাকে না।[৮৫] আবার ঋগ্বেদেই আমরা নেম ভার্গবের উক্তিতে ইন্দ্রের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করতে দেখি।[৮৬] যাজ্ঞবল্ক্যের বিশেষণ হিসাবে 'ব্রহ্মিষ্ঠ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মা এবং ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা এবং বিতর্কসভার কথা আমরা উপনিষদের সমসময়ে পাচ্ছি, একে বলা হত ব্রহ্মোদ্য। সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যকে আমরা আত্মা এবং ব্রহ্মবিষয়ক বিশেষ আলোচনার কথা পাচ্ছি না। যদিও কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসা বিষয়ক আলোচনা সভার কথা পাওয়া যাচ্ছে। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন ব্রহ্মোদ্য আলোচনার উত্তরদাতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার কর্মকাণ্ডে অধর্যু বা হোতারা পারিশ্রমিক পেতেন ব্রহ্মোদ্য জ্ঞানের জন্যও দক্ষিণা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য প্রসঙ্গে অনেকগুলি ব্রহ্মোদ্যের আখ্যান পাওয়া যাচ্ছে যার বিষয় ছিল আত্মা এবং ব্রহ্মের স্বরূপ কেন্দ্রিক। এবিষয়ে যাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেন যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী গার্গী, আরুণি

---

[৮৫] ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. ২০০৯. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১৯

[৮৬] তদেব, পৃ. ৮০-৮১

এবং রাজা জনক। এর মধ্যে গার্গীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য দেন নি উপরন্তু আর প্রশ্ন করলে মাথা খসে পড়বে এমন অভিশাপ দিয়েছিলেন।[৮৭] ব্রহ্মোদ্য বিষয়ক আলোচনা থেকে একাধিক বিষয় আমরা বুঝতে পারছি—প্রথমত, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডে এমন একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব উপনিষদের সময়ে হয়েছিল যাদের পেশা ছিল ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা করা। দ্বিতীয়ত, নতুন ধারণা বলে ব্রহ্মবিষয়ে সাধারণের মধ্যে নানা প্রশ্ন ছিল, সংশয় ছিল, যেকারণে ব্রহ্মোদ্যগুলির আয়োজন হয়। তৃতীয়ত, ব্রহ্ম বিষয়ক সুশৃঙ্খল আলোচনা পদ্ধতি তখনও নির্মিত হয়নি একারণে কিছু কিছু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাজ্ঞবল্ক্যের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। চতুর্থত, যাজ্ঞবল্ক্যের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট ব্রাহ্মণ্য মতে গৃহাশ্রমে থেকেই ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনায় পারঙ্গামতা অর্জন সম্ভব ছিল। পঞ্চমত, উপনিষদে ব্রহ্মোদ্য আয়োজনের কথা থেকে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে জ্ঞানকাণ্ডে এসে বৈদিক ধর্মে মতবিরোধ, তর্ক এবং প্রস্থানভেদের সম্ভাবনা স্পষ্ট হচ্ছে। ঋষিধারার ভাবনা-বিশ্ব উপনিষদের সূত্রে বহুধা বিভক্ত হচ্ছে যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দর্শন প্রস্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যের প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগে উত্তর ভারতে বেশ কিছু পরিব্রাজক গোষ্ঠী ছিল যারা গৃহাশ্রমকে অস্বীকার করে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে এবং ধর্মপ্রচার করতেন। রিস ডেভিস অঙ্গুত্তর নিকায়-এর সূত্রে এজাতীয় দশটি পরিব্রাজক শাখা স্বীকার করেছেন—আজীবক, নিগন্থ, মুণ্ডসাবক, জটিলক, পরিব্বাজক, মগন্দিক, তেদন্দিক, অভিরুদ্ধক, গোতমক এবং দেবধম্মক।[৮৮] যদিও এই শাখাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমানে আলাদা করে বোঝা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে অনেকগুলি শাখার বৈশিষ্ট্য একই ধরনের। মিলিন্দ প্রশ্ন-এ পরিব্রাজক গোষ্ঠীর আরেকটি তালিকা পাওয়া যাচ্ছে—মল্ল, অতোন, পব্বত, ধম্মগিরিয়, ব্রহ্মগিরিয়, নটক, নচ্চক, লঙ্ঘক, পিশাচ, মনিবদ্দ,

---

[৮৭] তদেব, পৃ. ১৬০

[৮৮] Dutta, Sukumar. *Early Buddhist Monarchism* (600 B.C.-100B.C.). London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. 1924. 1st Edition. p. 44

পুন্নবদ্দ, চন্দিম-সূরিয়, সিরিদেবট, কলিদেবট, শিব, বাসুদেব, খনিক, অসিচাস, ভদ্দিপুও।[৮৯] এই তালিকায় পরিব্রাজক গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু গণের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'চুল্লবগ্‌গ'-এর পঞ্চম খণ্ডে আমরা পিশাচ সাধকদের কথা পাচ্ছি যারা মৃতের করোটি নির্মিত ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করতেন।[৯০] তবে এই পরিব্রাজক গোষ্ঠীর প্রায় অনেকেরই বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও জানা যাচ্ছে এই পরিব্রাজকদের অনেকেই নানা সময়ে তর্ক সভায় অংশগ্রহণ করতেন এবং এক গোষ্ঠীর নিয়ম অপর গোষ্ঠীকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবিত করত। দীঘনিকায়-এর অন্তর্গত কস্‌সপ সীহনাদ সূত্র-এ নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপের কথা পাচ্ছি। কাশ্যপের সঙ্গে গৌতমবুদ্ধের কথোপকথন বিষয় ছিল তপশ্চর্যায় কতটা কঠোরতা পালন করা উচিত? এই কথোপকথন থেকে তৎকালীন পরিব্রাজকদের বেশ কিছু নিয়মের কথা পাচ্ছি যেগুলি বুদ্ধদেব সঙ্ঘে গ্রহণ করেননি—নগ্ন অবস্থিতি, মুক্তাচারত্ব (ভোজন এবং শৌচ ক্রিয়াদি দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্পাদন), হস্তাবলেহন (খাবার পরে হাত না ধুয়ে চেটে নেওয়া), গর্ভিনীর কিংবা স্তনদানরতা স্ত্রীর কিংবা পুরুষ-সহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষা অস্বীকার ইত্যাদি।[৯১] বুদ্ধপূর্ববর্তী যে সকল শ্রমণ্যমতের কথা পাওয়া যাচ্ছে সেই বিষয়ে রিস ডেভিস, ম্যাক্সমুলার, দেউসান (Deussen) ওল্ডেনবার্গ কিছু তত্ত্বের উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এঁদের সকলেই বুদ্ধ পূর্ববর্তী শ্রমণ ধর্মকে পাশ্চাত্যের 'Priori'-তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছেন।[৯২] এঁদের সকলের তত্ত্বের মধ্যেই বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কথা গবেষকরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন। এতক্ষণ আমরা পরিব্রাজক গোষ্ঠীর মধ্যে মূল 'অবৈদিক' ধারার কথাই বলেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে উপনিষদের সময় থেকে আমরা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরিব্রাজক গোষ্ঠীর কিছু কিছু নমুনা পাব, তবে ব্রাহ্মণ্য

---

[৮৯] তদেব, পৃ. ৪৪

[৯০] চৌধুরী, সাধনকমল. *চুল্লবগ্গ.* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১৮ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৬৮

[৯১] শীলভদ্র, ভিক্ষু. *দীঘ নিকায়.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০০৬. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১১৪

[৯২] Dutt, Sukumar. *Early Buddhist Monarchism* (600 B.C.-100 B.C.). London : Kegan Paul Trench, Trubner & Co. Ltd. 1924. 1st Edition. p. 52

সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিব্রাজক পরম্পরা বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে আরও পরবর্তী সময়ে, শংকরাচার্যের হাত ধরে ভারতবর্ষের চার প্রান্তে মঠ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।[৯৩] আমরা যেসব পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের কথা বলেছি তারা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের বিরোধী ছিল এবং এদের মধ্যে কোনও সংগঠিত আন্দোলনের সম্ভাবনা ছিল না। এর অন্যতম প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যে অজস্র শ্রামণ্য মতের উল্লেখ পাওয়া গেলেও এদের কোনও রচনা বা তত্ত্ব প্রণয়নের কথা আমরা জানি না। দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতে অশোকের জারি করা নাগার্জুনি পর্বতের অভিলেখে আমরা তিনটি মাত্র শ্রামণ্য মতের কথা পাচ্ছি—বৌদ্ধ, জৈন এবং আজীবক। খ্রিস্টীয় নবম শতকে জৈন তীকাকার শীলানক-এর বিবৃতিতে পাঁচটি শ্রামণ্যমতের উল্লেখ পাচ্ছি—নির্গন্থ, শাক্য, তাপস, চরিক এবং আজীবক। সুতরাং আমাদের আলোচ্য শ্রামণ্যমতের অধিকাংশই অল্প সময়ের জন্য বিদ্যমান ছিল বলেই অনুমেয়। এই শ্রামণ্য মতগুলি ছাড়াও মনে রাখা দরকার জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম তাদের ধর্মীয় ইতিহাসে একটি পরম্পরার কথা স্বীকার করে। জৈনদের পরম্পরা তীর্থঙ্কর, তাদের পিতা-মাতা, জন্মস্থান, গাত্রবর্ণ, বিমান, বাহন, দীক্ষাবৃক্ষ, সহকারী যক্ষ-যক্ষিণীর কথা স্বীকার করে। যেমন আদিনাথ তথা ঋষভনাথের পিতা নাভিরাজ এবং মাতা মেরুদেবী, জন্মস্থান কোশল, গাত্রবর্ণ স্বর্ণ, বাহন বলদ বা বৃষ, দীক্ষাবৃক্ষ অশ্বত্থ, যক্ষ গোমুখ এবং যক্ষিনী চক্রেশ্বরীর কথা স্বীকার করছে।[৯৪] বৌদ্ধরাও গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী তেইশজন পূর্ববর্তী বুদ্ধের কথা স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম বুদ্ধের নাম দীপঙ্কর, দীপঙ্করের জন্মভূমি রমণবতী নগর, পিতার নাম সুদেব ক্ষত্রিয় এবং মাতার নাম ছিল সুমেধা। দীপঙ্কর বুদ্ধের আয়ু মনে করা হয়েছে দশ হাজার বছর।[৯৫] ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকলেও পরম্পরাগত এই পূর্ববর্তী ইতিহাস থেকে এটুকু স্বীকার করতে অসুবিধা নেই যে মহাবীর জৈন এবং গৌতম বুদ্ধের

---

[৯৩] Jash, Pranabananda. *Some Aspects of Jainism in Eastern India*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishes Pvt. Ltd. 1989. p. 02

[৯৪] তদেব. পৃ. ২২-২৩

[৯৫] শ্রীধর্ম্ম তিলক স্থবির. *বুদ্ধ-বংশ.* রেঙ্গুন : রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস. ১৯৩৪. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৭৮

পূর্বে তাঁদের মতামতের পূর্বসূত্র ছিল। প্রসঙ্গত বৌদ্ধধর্ম প্রত্যেক বুদ্ধের ধারণাতে বিশ্বাস করে। প্রত্যেক অথবা পচ্চেক বুদ্ধ বলতে বোঝায় যাঁরা নিজেরা বোধি লাভ করতে পারেন কিন্তু অন্য কাউকে বোধিজ্ঞান প্রদান করতে পারেন না। বৌদ্ধ পরম্প্রায় বলা হয়েছে গৌতম বুদ্ধ ঋষিপত্তন মৃগদাবে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। ঋষি বলতে এখানে প্রত্যেক বুদ্ধকে বুঝতে হবে। মনে করা হয় একসময়ে একজন মাত্র সম্যক সম্বুদ্ধ থাকতে পারেন এবং যখন পৃথিবীতে সম্যক সম্বুদ্ধ থাকেন তখন কোনও প্রত্যেক বুদ্ধ থাকেন না। বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থানটির নাম 'ঋষিপত্তন' একারণেই হয়েছিল। যখন বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন তখন প্রত্যেক বুদ্ধেরা পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছলেন, যেহেতু ঋষিদের পতন হয়েছিল সেই কারণেই স্থানের নাম ঋষিপত্তন।[৯৬] মহাবস্তুবদানের এই আখ্যান থেকে স্পষ্ট হচ্ছে বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগেও গৌতম বুদ্ধের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী শ্রামণ্য মতের অস্তিত্ব ছিল, বৌদ্ধ ধর্মে হঠাৎ কোনও ঘটনা বলে মনে করলে তা অনৈতিহাসিক হবে।

তথ্যের অভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অনেক এলাকাই আমাদের কাছে অস্পষ্ট। বুদ্ধ পূর্ববর্তী যুগের এমন একটি এলাকা হল চার্বাক অথবা লোকায়ত দর্শন। আমরা সকলেই জানি চার্বাকদের কোনও রচনা পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই বিরুদ্ধবাদীদের রচনায়। বুদ্ধদেবের ধর্মদর্শন বোঝার ক্ষেত্রে চার্বাক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মদর্শনের প্রতিষ্ঠা করছেন তখন তাঁর পূর্বপক্ষে যেমন ব্রাহ্মণ্য দর্শন ছিল তেমনই ছিল চার্বাক তথা অন্যান্য বেদবিরোধী গোষ্ঠী। চার্বাক প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার মীমাংসক গোষ্ঠীর সমালোচনা চার্বাকদের পাশাপাশি বাদরি নামের এক আচার্যকেও করতে দেখা যায়। বেদান্তসূত্র-এর অপশূদ্রাধিকরণ-এর প্রতিবাদ করে বাদরি বলেন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে অধিকার না থাকলেও ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে শূদ্রের অনধিকারের কথা বেদবাক্যে বলা হয় নি। তাই শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, উপবীত থাকা

[৯৬] Wiltshire, Margin G. *Ascetic Figures Before and in Early Buddhism The Emergence of Gautama as the Buddha*. New York : Mouton de Gruyter. 1990. 1st Edition. p. 200

না থাকার সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নেই।[৯৭] অর্থাৎ চার্বাকদের শাস্ত্রগ্রন্থ পাওয়া না গেলেও পণ্ডিত মানসে চার্বাকদের একটা প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এখন চার্বাক প্রসঙ্গে ফেরা যাক। 'বার্হস্পত্যসূত্রম্' নামে একটি পুথি চার্বাক গুরু বৃহস্পতির নামের সঙ্গে যুক্ত। এই পুথিটি এফ.ডব্লিউ. টমাস ১৯২১ সালে তর্জমা এবং সম্পাদনা করেন। তবে এই গ্রন্থের অনেক অংশই পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে ধরা হয়। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে চার্বাকগণ পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন অর্থকে এবং কাপালিকরা পুরুষার্থ মনে করে কামকে।[৯৮] লোকায়ত এবং কাপালিকদের সম্পর্ক বিষয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে লোকায়তরা ভারবতর্ষে অর্থবিজ্ঞানের এবং কাপালিকেরা কামবিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন।[৯৯] হরপ্রসাদ কাপালিক এবং লোকায়তের সম্পর্ক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জৈন টীকাকার হরিভদ্র সূরী-র *ষড়দর্শনসমুচ্চয়* এবং তার টীকাকার গুণরত্নের কথা উল্লেখ করেছেন। গুণরত্ন লোকায়তদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন এরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায় এবং এরা মিথুনাশক্ত ও যোগী।[১০০] গুণরত্ন আরো বলেন, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকায়তিকেরা একত্র সমবেত হয়। তারা একত্রে মিলিত হয় এবং প্রমত্ত হয় মৈথুনে। লোকায়তদের জীবনাদর্শ যে পুরুষকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের থেকে পৃথক ছিল তা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সাধারণভাবে মনে করে হয় চার্বাকেরা একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু চার্বাক বা লোকায়তদের মধ্যে আমরা দুটি সম্প্রদায়ের কথা পাব—প্রথমত, প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী এবং ভূতচতুষ্টয়বাদী চার্বাক যারা তার্কিক এবং সর্বপ্রমাণাপ্রামাণ্যবাদী অর্থাৎ যারা কোন প্রমাণকেই স্বীকার করেন না, এঁরা হলেন বৈতণ্ডিক অর্থাৎ

---

[৯৭] গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত. *প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ ও দর্শন.* কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৩. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩৫

[৯৮] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. *লোকায়ত দর্শন.* কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. ২০১৯. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৯৬

[৯৯] তদেব, পৃ. ১০০

[১০০] তদেব, পৃ. ৯৭

পরমতের খণ্ডন করাই এঁদের প্রধান কাজ, এঁরা নিজের কোনও মত স্থাপন করেন না।[১০১] জয়রাশি-র *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* এই বিতণ্ডাবাদী ধারার গ্রন্থ। প্রসঙ্গত বলা প্রয়জন চার্বাকদের মতের সঙ্গে অজিত কেশকম্বলীর মতের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার উদয়নাচার্যের রচনায় বৌদ্ধ দর্শনকে চার্বাক দর্শনের সমপর্যায়ে রাখা হয়েছে এবং বুদ্ধকে চার্বাক বলা হয়েছে।[১০২] চার্বাক মত থেকে বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগের বেদবিরোধী এবং যাবতীয় প্রামাণ্যে বিরোধী মতের কথা পাওয়া যাচ্ছে যা তৎকালীন দার্শনিক পরিমণ্ডল বোঝার সহায়ক।

বুদ্ধদেব তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি পূর্বপক্ষের কথা বলেছেন যা পরবর্তীকালে পালি সূত্রপিটক-এর অন্তর্গত *দীঘনিকায়* নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই গ্রন্থটির উল্লেখ প্রায় সকল ঐতিহাসিককে প্রাক্ বৌদ্ধ শ্রামণ্যমত বোঝার জন্য উল্লেখ করতে হয়। *ধম্মসঙ্গিনি* অনুসারে বুদ্ধদেব তার দর্শনের চিন্তাধারাকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করেছেন—সক্কায়দিট্ঠি, বিচিকিচ্ছ এবং সিলব্বাতম।[১০৩] এই শ্রেণিকরণের মূল ধরনটি হল তৎকালে প্রচলিত শ্রামণ্যমতের বিরোধিতা। *দীঘনিকায়*-এর ব্রহ্মজালসূত্র-এ বুদ্ধদেব বেশ কিছু শ্রামণ্যমতের উল্লেখ করেছেন। সবক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেব বলছেন ‘কোন কোন শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ আছেন’। এবারে এই পদটি থেকে অনুমেয় বুদ্ধদেব বর্ণিত মতগুলি হয়তো শ্রামণ্যদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য মতেও কিয়দংশ স্বীকৃত ছিল। যদিও মনে রাখতে হবে বুদ্ধবচনে ব্রাহ্মণ শব্দটি কখনও কখনও গুণবত্তা অর্থে ব্যবহৃত হত। তবে সেক্ষেত্রে ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটি সদর্থক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধ মনে করতেন যিনি ধ্যানশীল, আসক্তিরহিত, একাকী অবস্থিত, কর্তব্যানুষ্ঠামী, পাপবিমুক্ত এবং অর্হৎপদপ্রাপ্ত তিনিই ব্রাহ্মণ।[১০৪] তবে

---

[১০১] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন. *চার্বাক দর্শন.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০১৩. চতুর্থ সং. পৃ. ৫৩

[১০২] তদেব. পৃ. ১৬১

[১০৩] Barua, Benimadhab. *A History of Pre-Buddhisitic Indian Philosophy*. New Delhi : MLBD. 2016. 2nd Reprint. p. 196

[১০৪] বসু, চারুচন্দ্র. *ধম্মপদ.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০১০. সপ্তম পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ১৯১

দীঘ নিকায়-এর 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি এই সদর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বুদ্ধদেব 'ব্রহ্মজাল সূত্র'-এ যে সকল মতের কথা বলছেন তা যথাক্রমে নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।[১০৫]

১) শাশ্বতবাদী—অর্থাৎ এঁরা চতুর্বিধ কারণে আত্মা এবং জগতকে শাশ্বত ঘোষণা করেন। এরা মনে করে আত্মা ও জগত অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল, যদিও এরা জন্ম থেকে জন্মান্তরে যায়, চ্যুত হয়, পুনর্বার উৎপন্ন হয় তা সত্ত্বেও এদের অস্তিত্ব শাশ্বত। এরা অনেক জন্ম পূর্বের কথা স্মরণ করতে পারে।

২) আভাস্বরবাদী—এরা কোনও কোনও বিষয়কে শাশ্বত এবং কোনও কোনও বিষয়কে অশাশ্বত বলে মনে করে। সুতরাং এদের মতে জগৎ এবং আত্মা অংশত শাশ্বত এবং অংশত অশাশ্বত।

৩) ক্রীড়া—প্রাদোষিক এবং মনপ্রাদোষিক—এই দুটি আভাস্বরবাদীদের শাখা। যে সকল দেবতাহাস্য-ক্রীড়া-রতিতে মগ্ন থাকার জন্য পুর্বজন্মস্বিস্মৃত হন তাঁদের ক্রীড়া প্রাদোষিক বলা হয়। মন প্রাদোষিকেরাও অংশত শাশ্বতবাদ এবং অংশত অশাশ্বতবাদে বিশ্বাস করেন।

৪) অঞ্জনন্তিক—এরা জগৎকে অনন্ত এবং অসীম বলে মনে করে।

৫) অমরা-বিক্ষেপিক—এরা সরাসরি কোনও উত্তর দিতে আগ্রহী নয়। কুশল কী অথবা অকুশল কী এসকল প্রশ্নের কোনও উত্তর এরা দেয় না।

৬) অধীত্য-সমুৎপন্নিক—এরা অকারণবাদী। এরা আত্মা এবং জগৎকে অকারণ সম্ভূত বলে মনে করে।

৭) পূর্বান্ত-কল্পিক এবং অপরান্ত-কল্পিক—এরা মনে করে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নয় আবার অচৈতন্যও নয়। অন্যদিকে পূর্বান্ত কল্পিকেরা মনে করেন আত্মা মরণান্তে অরূপী, আরো এবং সচৈতন্য অবস্থায় থাকে।

---

[১০৫] ভিক্ষু, শীলভদ্র. *দীঘ নিকায়.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০০৬. দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ১১-৩১

৮) উচ্ছ্বাসবাদী—এরা মনে করে দেহাবসানে আত্মার উচ্ছেদ এবং বিনাশ ঘটে।

৯) দৃষ্ট-ধর্ম-নির্বাণবাদী—এদের মতে আত্মা পঞ্চ কামগুণ সমন্বিত হয়ে ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তি সাধন করে এবং এই জগতের নির্বাণ প্রাপ্তি হয় বলে স্বীকার করে।

ব্রহ্মজাল সূত্রের পরবর্তী সূত্রের নাম শ্রামণ্য ফল সূত্র। এই সূত্রে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন শ্রমণের কথা পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ণ কাশ্যপ, মক্ষলি গোসাল, অজিত কেশকম্বল, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌টিপুও এবং নিগণ নাতপুত্ত।[১০৬] রাজা অজাতশত্রুর জিজ্ঞাস্য ছিল শ্রামণ্য ফল কী? এই প্রশ্ন তিনি ভক্ত ছয়জন শ্রমণকে করেছিলেন। ছয়জনের উত্তর থেকে তাদের দার্শনিক অবস্থান বোঝা যায়।[১০৭] পূর্ণ কাশ্যপ হলেন অক্রিয়াবাদী। তার মতে কোনও ধরনের পাপ থেকেই কোন ফল উৎপন্ন হয় না। একই ভাবে দান, সংযম, সত্য বাক্য থেকেও কোনও পুণ্যের অর্জন হয় না। মোক্ষলি গোসাল নিয়তিবাদী। তার মতে সর্বজীব অবল, অবীর্য। তারা নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী নিয়তি নির্দিষ্ট পথে কাজ করে। অজিত কেশকম্বলী বলেন মানুষ চতুর্মহাভূত থেকে উৎপন্ন। মুর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই মৃত্যুর পরে দেহ ও আত্মা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাদের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। পকুধ কচ্চায়নের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং জীব—এই সাতটি বস্তু অকৃত, অকৃতবিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কুতস্থ, অচলস্তম্ভ সদৃশ। এরা গতিহীন, বিকারহীন। নিগণ নাতপুত্ত মনে করে তারা সব পাপ থেকে মুক্ত এবং পাপ দূরীকরণের চেষ্টায় নিমগ্ন। সঞ্চয় বেলট্‌চিপুত্ত-এর মত হল কোনও বিষয়েই নিঃসংশয় হওয়ার উপায় আমাদের নেই। এই বিষয়ে তার উত্তর জৈন স্যাদবাদের অনুরূপ। যেখানে সাত ভাবে দেখানো হয় কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব আসলে থাকা এবং না থাকার বিভিন্ন সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গির উপরে নির্ভরশীল।[১০৮] *দীঘ নিকায়*-এ বর্ণিত শ্রামণ্য

[১০৬] তদেব, পৃ. ২৮৯

[১০৭] তদেব, পৃ. ৩৮-৪৩

[১০৮] ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র. *ভারতদর্শনসার.* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ. ১৪১১ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৯৫

সম্প্রদায়ের মধ্যে মোক্ষলিপুত্র গোশাল-এর বিষয়ে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন। বৌদ্ধ এবং জৈন সূত্র সাহিত্যে মোক্ষলি গোশাল-এর একাধিক উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বারংবার উল্লেখ থেকে স্পষ্ট যে বৌদ্ধ এবং জৈনদের কাছে মোক্ষলি গোশাল প্রতিপক্ষে হিসাবে অনেকের তুলনায় বেশি শক্তিশালী ছিলেন। জৈন সূত্র সাহিত্য এবং বুদ্ধঘোষের টীকা অনুযায়ী মোক্ষলি গোশাল গোশালায় জন্মেছিলেন বলেই তাঁর এধরনের নাম। তবে 'মোক্ষলি' শব্দটির অর্থ বিষয়ে কিছু বিতর্ক আছে। জৈন ভগবতী সূত্র অনুযায়ী 'মোক্ষলি' শব্দতি 'মংখ' শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ ছবি, এইছবি দেখিয়ে এরা ভিক্ষা করত। অন্যদিকে পাণিনির সূত্রানুযায়ী 'মস্করণ' শব্দটির থেকে মোক্ষলি শব্দটি এসেছে। 'মস্করণ' বলতে বাঁশজাতীয় বস্তুকে বোঝায়। অর্থাৎ এরা বাঁশ বা তৎগোত্রীয় বিষয় নিয়ে পরিব্রাজন করত।[১০৯] মোক্ষলি গোশালকে আজীবিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। তবে কিছু গবেষক আবার আজীবিকদের বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরই একটি অংশ বলে মনে করতেন।[১১০] এদের অনেকেই নগ্ন অবস্থায় থাকত এবং গোবর খেত বলে জানা যায়। এরা নিজেদের শরীরকে কষ্ট দিত এবং গরম লৌহ গোলক দিয়ে গায়ে তিলকের ছাপ দিত।[১১১] এছাড়াও নন্দ বচ্চক এবং কিস সংকিচ্চ এই দুই আজীবিক ধর্মের শিক্ষকের কথাও পাওয়া যাচ্ছে। আজীবিক সম্প্রদায়ের কোনও তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে জৈন এবং বৌদ্ধদের বর্ণনা থেকে মোক্ষলিপুত্র গোশাল-এর ধর্মাভ্যাস এবং দর্শন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। গোশাল পরিণামবাদে বিশ্বাস করতেন অর্থাৎ জন্ম এবং মৃত্যু সবই নিজস্ব অভিরুচির দ্বারা চালিত হয়। দ্বিতীয়ত, গোশাল নিয়তি, সংগতি এবং স্বভাবের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, পরিণামের ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। গোশালের তত্ত্বে সময়ের বিভাজন স্বরূপ মহাকল্প, কল্প, অন্তঃকল্পের বিভাজন দেখা যায়। গোশালের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের জীবন আটটি পর্যায়ের মধ্য

---

[১০৯] Barua, B.M. *The Ajivikas*. Calcutta : University of Calcutta. 1920. 1st Edition. pp. 11-12

[১১০] Temple, Richard Carnac. *The Indian Historical Antiquary* (Vol. XLI). Bombay : The British India Press. 1912. p. 286

[১১১] তদেব, পৃ. ২৮৯

দিয়ে অতিবাহিত হয়।[১১২] জৈন *ভগবতী সূত্র*-এ গোশাল সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। গোশালের সঙ্গে তৎকালীন ছয়জন দিশাচার্যের তত্ত্বালোচনা হয়। এই দিশাচার্যেরা ছিলেন সাণ, কলন্দ, কণিয়ার, অখেদ, অজ্জিবেসায়ণ, অজ্জান সোমায়ুপুত্ত। এই দিশাচার্যেরা গোশালের তত্ত্বকে স্বীকার করেন। এরপর গোশালের সঙ্গে মহাবীর-এর সাক্ষাত হয় এবং তত্ত্ব আলোচনা চলে। একই সঙ্গে মহাবীর-এর সঙ্গে গোশালের ঋদ্ধি শক্তি প্রদর্শনের লড়াই হয়। অবশেষে গোশাল পরাভূত হন এবং গোশাল-এর নির্বাণ লাভ হয়।[১১৩] *দীঘ নিকায়* ছাড়াও বৌদ্ধ শাস্ত্রের একাধিক গ্রন্থে গোশালের কথা পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে আমরা মহানারদ কাশ্যপ এবং মহাবোধি জাতকের আখ্যান বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। মহানারদ কাশ্যপের আখ্যানে বিদেহ রাজ্যে মিথিলা নগরে অঙ্গতি নামে এক রাজার কথা পাওয়া যায় যিনি তত্ত্ব জিজ্ঞাসার জন্য অচেলক অর্থাৎ বৌদ্ধবিরোধী 'আজীবক' সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলেন। এই জাতকে আজীবিক সন্ন্যাসীকে কাশ্যপ গোত্রজ, শাস্ত্রবিৎ, গণশাস্তা অর্থাৎ বহু শিষ্যের গুরু, বাগ্মী এবং সুবিখ্যাত বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। যাই হোক তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় আজীবিক বলেন পাপ-পুণ্য বলে কিছুই নেই, সর্বজীব সমতুল্য, দানের কোনও ফল নেই, যারা মনে করে দানের ফল আছে তারা আসলে মূর্খ। এরপর আজীবিক রাজাকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা বলেন। পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন পিঙ্গল নামের একজন ব্যাধ, যিনি অজস্র শিকার করেছেন, প্রাণীহত্যা করেছেন। কিন্তু তার পরেও তাঁর সেনাপতি হিসাবে জন্ম হয়। সুতরাং পূর্ব জন্মের পাপ বা পুণ্যের দ্বারা কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় না। আজীবিক সন্ন্যাসীর তত্ত্বে প্রভাবিত হয়ে রাজা ইন্দ্রিয় সুখকেই নিজের জীবনের উপজীব্য বলে স্বীকার করে নিলেন। এরপর তাঁর কন্যার পরামর্শে ও বোধিসত্ত্ব মহানারদের অনুরোধে তথা পথ প্রদর্শনে এই ভোগসুখ থেকে মুক্তি লাভে সমর্থ হন।[১১৪] *মহাবোধী জাতক*-এর আখ্যানে বোধিসত্ত্ব

---

[১১২] Barua, B.M. *The Ajivikas*. Calcutta : University of Calcutta. 1920. 1st Edition. pp. 24-27

[১১৩] তদেব, পৃ. ৩৩

[১১৪] ঘোষ, ঈশান চন্দ্র. *জাতক* (ষষ্ঠ খণ্ড). কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১৯. ষষ্ঠ মুদ্রণ. পৃ. ১১৫-১৪১

কাশীরাজ্যে ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল বোধিকুমার। বোধিকুমার তাঁর প্রবজ্যাকালে কাশীর রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এই রাজার পাঁচজন অমাত্য ছিল। এরা পাঁচজন পাঁচ রকম দর্শন প্রস্থান অনুসরণ করত। প্রথম জন ছিল অহেতুবাদী, যার মতে জীবগণ পুনর্জন্ম লাভ করে শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়জন ঐশ্বরকারণবাদী, এর মতে জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি। তৃতীয় জন পূর্বকৃতবাদী, তার মতে মানুষ পূর্বজন্মের কথা পাপের ফল ভোগ করে। চতুর্থ উচ্ছেদবাদী বলে কেউই ইহলোক থেকে পরলোকে যায় না, ইহলোকে সব বিনষ্ট হয়। ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী বলে, মাতা-পিতাকেও প্রয়োজনে নিধন করা যেতে পারে। আখ্যানে সমবধানে বলা হয়—পুরাণ কাশ্যপ, মোক্ষলি গোশাল, ককুদকাত্যায়ন, অজিত কেশকম্বল এবং নির্গ্রন্থ্ নাটপুত্র ছিলেন এই পাঁচজন মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন অমাত্য যাদের অসদ্ অভিসন্ধি এবং চক্রান্ত বোধিসত্ত্বের মাধ্যমে রাজার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল।[১১৫] জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে মোক্ষলি গোশাল তথা আজীবিক দর্শন সম্পর্কে যে তথ্য পাচ্ছি তার মধ্যে সামঞ্জস্য থেকে বোঝা যাচ্ছে আজীবিকরা পাপ-পুণ্যের ধারণায় বিশেষ বিশ্বাসী ছিলেন না। এছাড়াও এঁরা নিয়তিবাদে বিশ্বাস করতেন। নিয়তিবাদের প্রসঙ্গটি তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার সাহায্যে বোঝা সম্ভব। সামাজিকভাবে নগর পত্তনের অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে নিয়তিবাদকে দেখার চেষ্টা করা হয়। নগরে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠানের একটি জটিল সংগঠন থাকে। নগরের শাসকের অন্যতম কাজ হল তার প্রজার মধ্যে একটা অঙ্গীকারের চাপ সৃষ্টি করা, এই কাজ রাজা এবং পুরোহিতরা করতেন।[১১৬] দার্শনিক নিয়তিবাদের প্রবক্তা হিসাবে মোক্ষলি গোশালকে স্বীকার করা যেতে পারে।[১১৭] নিয়তি মানুষের কল্পনাজাত, নিয়তির মধ্যে কোনও অমোঘ টানেই বরং খামখেয়ালিপনাই বেশি। মোক্ষলি গোশালের উদ্ভব এবং তার তত্ত্ব প্রচার খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকে

---

[১১৫] ঘোষ, ঈশান চন্দ্র. *জাতক* (পঞ্চম খণ্ড). কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১৪. পঞ্চম মুদ্রণ. পৃ. ৯৭-১০৬

[১১৬] ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *প্রবন্ধসংগ্রহ* (৩). কলকাতা : গাঙচিল. ২০১৩. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫৩

[১১৭] তদেব. পৃ. ৩৩

ভারতবর্ষের নগরায়ণের সাপেক্ষে দেখা সম্ভব। নগরায়ণ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভোগের উপাদান অনেক বেশি, নগরের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যও যথেষ্ট। এমতাবস্থায় নগরের মানুষের কাছে ভোগের দর্শন কার্যকর হবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। একই সঙ্গে নগরের মানুষ কর্মফলে যদি বেশি বিশ্বাস করে তবে তাদের স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত জীবনের পথে অনেক বাধা আসবে। অথচ নিয়তিবাদে মানুষের জীবন যেহেতু নিয়তি চালিত তাই তাকে নিজের কৃতকর্মের দায় নিতে হয় না। সুতরাং গোশালের আজীবিক তত্ত্ব একভাবে নগরের উপযুক্ত রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এখনও অবধি বুদ্ধপূর্ববর্তী শ্রামণ্য ধর্ম বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিশেষ প্রবণতার কথা বুঝতে পারছি যা বুদ্ধের পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কৃতিতে গুরুপ্রসঙ্গ বুঝতে আমাদের সাহায্য করছে। প্রথমত, বৈদিক শাখার মধ্যেও এক ধরনের দ্বিমতের কথা আমরা শুরুতেই বলেছি। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, বৈদিক পরম্পরায় আমরা ধর্মোপদেশকের বা যজ্ঞকারী পুরোহিতের পাশাপাশি একদল পণ্ডিতের কথা পাচ্ছি যারা তত্ত্ব প্রণয়ন এবং ব্যাখ্যা করছেন। তত্ত্ব প্রণয়নের সময়ে তাত্ত্বিকের স্বাধীনতা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং অপৌরুষের মন্ত্র সংস্কৃতির বিকাশের অন্যতম স্তর হল তত্ত্ব ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজস্ব মতামত নির্মাণ করার স্বাধীনতা। দ্বিতীয়ত, পরিব্রাজক গোষ্ঠীর থেকে অনুমেয় ধর্মসাধনার যাবতীয় অঙ্ক কেবল দান এবং লাভ-ক্ষতির সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ছিল না। ভিক্ষা গ্রহণ করে জীবন ধারণ, নির্দিষ্ট বাসস্থান, পরিবার-পরিজন ত্যাগের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাস এবং কৃচ্ছকেন্দ্রিক সাধনার ধারা যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বেই প্রচলিত ছিল তা বোঝা যাচ্ছে। পরিব্রাজকের এই ধারা একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণ্য মতের বাইরের ধর্মসংস্কৃতিতে স্বীকৃত ছিল।

ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের অন্যতম ঝোঁক হিসাবে উত্তর বৈদিক যুগে প্রতিষ্ঠা পায় ব্রহ্ম তথা আত্মতত্ত্ব। বৌদ্ধ এবং জৈন রচনার সমর্থনে আমরা ব্রাহ্মণ্যমতের বাইরে যে কটি শ্রামণ্যধর্মের কথা পাই তাঁরা প্রত্যেকেই দার্শনিক জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে রেখেছিলেন আত্ম, ব্রহ্ম এবং পরলোক সংক্রান্ত তত্ত্বকে। চার্বাক অথবা আজীবিকরা পরলোক এবং কর্মফলের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তৎকালীন

শ্রামণ্যমতের প্রায় অধিকাংশেরই জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে নেতিমূলক বিশ্বাস ছিল বলে ধরে নেওয়া চলে। পাশাপাশি এদের দৃষ্টিতে কোনও মোক্ষ বা নির্বাণতত্ত্বের কথাও পাওয়া যাচ্ছে না। যা পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশই সমস্যা যুক্ত, যেমন আজীবিকদের মধ্যে আত্মপীড়নের কথা পাচ্ছি। আত্মপীড়নের থেকে সহ্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, দেহের প্রতি অনাসক্তিও বোঝা যায়। তবে খেয়াল করার মতো এঁরা কেউই তত্ত্ব দৃষ্টি যখন সাধারণের কাছে প্রকাশ করছেন তা কিন্তু বিশেষভাবেই ভোগের আদর্শকে তুলে ধরে। অর্থাৎ এদের মধ্যে নিজ সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ ভেদে তত্ত্ব প্রণয়নে পার্থক্য ছিল। সাধারণের মুক্তির বা পারমার্থিক উন্নতির কথা এই শ্রামণ্যমতের কেউই বলছেন না। সুতরাং বুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে উত্তর ভারতের শ্রামণ্য মতগুলির মধ্যে মোক্ষতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের দর্শন এবং সাধারণের প্রতি দৃষ্টিকোণ একেবারেই অনন্য।

বুদ্ধদেব যখন গৃহত্যাগ করে নির্বাণের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তখন তিনি দুইজন গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবের এই গুরুদের কথা বেশ কিছু শাস্ত্রে এবং পরবর্তীকালে কিছু কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা বুদ্ধের আচার্য প্রসঙ্গ বোঝার জন্য মূলত চারটি গ্রন্থের সাহায্য নেব—*মধ্যম নিকায়, মিলিন্দ প্রশ্ন,* অশ্বঘোষ-এর *বুদ্ধচরিত* এবং *ললিতবিস্তর*। সূত্র পিটক-এর অন্তর্গত *মধ্যম নিকায়*-এর 'ঔপম্য বর্গ'-এর আর্যপর্য্যেষণ সূত্র-এ বুদ্ধদেবের আচার্যগণের কথা পাওয়া যাবে। বুদ্ধদেব প্রথমে যান গুরু অরাড় কালামের কাছে। অরাড় শব্দের অর্থ দীর্ঘ-পিঙ্গল, কালাম হল গোত্র নাম। মনে করা হয়রাড় কালাম ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মনে করা হয় অরাড় কলাম ধ্যানে এমনই মগ্ন থাকতেন যে পাঁচশ গরুর গাড়ি তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেলেও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হত না। অরাড় কালাম বুদ্ধদেবকে ধ্যানের শিক্ষা, অকিঞ্চন-আয়তন নামক অরূপ ধ্যানের শিক্ষা গৌতমকে প্রদান করেন এবং অত্যল্প সময়ে গৌতম তা শিখে নেন। কিন্তু অরাড়-কালামের শিক্ষা যেহেতু গৌতমের অভীষ্ট নির্বাণের পথ অবধি নিয়ে গেল না তাই তিনি অরাড় কালাম-এর

আশ্রম ত্যাগ করেন। এরপর গৌতম গেলের রুদ্র রামপুত্রের নিকটে। রামপুত্র গৌতমকে 'নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা' আয়তন অবধি শিক্ষাদান করেন। এই শিক্ষাও গৌতম অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করে নিলেন এবং নির্বাণপদ লাভ করা সম্ভব নয় বুঝে রামপুত্রের আশ্রম ত্যাগ করেন এবং উরুবেলা নগরে উপস্থিত হন। রামপুত্র রুদ্রকের এবং আরড় কালামের কাছে শিক্ষা শুরুর সময়ে দুই-জন গুরুই বলেছেন, "আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন"[১১৮]। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নিজেই নিজের গুরু হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এছাড়া আরও খেয়াল করার মত উক্ত দুইজন গুরু গৌতমকে ধ্যানের অভীষ্ট লক্ষ্যের কথা বলছেন, কিন্তু সেই পথে যাওয়ার কোনও দিগ্‌দর্শন দিতে দেখা যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত আমরা তাত্ত্বিকভাবে বুদ্ধের পূর্বাচার্যদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত সদ্ধর্মের অভীষ্টের পার্থক্য বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। আরাড় কালাম অকিঞ্চন আয়তন নামক তৃতীয় অরূপ ধ্যান বা সপ্তম সমাপতিতে এবং রামপুত্র নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন নামক চতুর্থ অরূপধ্যান বা অষ্টম সমাপত্তিতে সমারূঢ় হয়ে মোক্ষ অথবা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন। এই দুই ধ্যানকে পরিভাষাগত ভাবে রাজযোগ বলা হবে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে রামপুত্রের আশ্রম ত্যাগের পর উরুবেলায় বুদ্ধদেব প্রথম ছয় বছর হঠযোগ, কুম্ভক সমাধিরও অভ্যাস করেন। তত্ত্বগতভাবে সমাপত্তি মোট নয় রকমের। প্রথম চারটি রূপ সমাপত্তি, পরবর্তী চারটি অরূপ-সমাপত্তি এবং শেষটি লোকোত্তর সমাপত্তি। গৌতম বুদ্ধের মতে অভীষ্ট হল এই লোকোত্তর সমাপত্তি, যার পারিভাষিক নাম সংজ্ঞাবেদয়িত-সমাপত্তি। এই সমাপত্তি বুদ্ধের আচার্যদের প্রণালীর তুলনায় উচ্চস্তরের এবং এই স্তরের সাধক বিমোক্ষ অর্জন করেন, যা পূর্বকথিত মুক্তির থেকে আলাদা এবং উচ্চস্তরের।[১১৯]

---

[১১৮] বড়ুয়া, বেণীমাধব (অনু.). *মধ্যম-নিকায়* (প্রথম খণ্ড). ভিক্ষু সুমনপাল (সম্পা.). কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০১৮. প্রথম অখণ্ড সংস্করণ. পৃ. ১৭৮-১৮১

[১১৯] তদেব. পৃ. ৩৬৩-৩৬৬

অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত*-এ দ্বাদশ সর্গে গৌতম এবং তাঁর আচার্যদের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। আরড় কালাম গৌতমকে বিনা পরীক্ষায় নিজের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। আরড় কালাম স্তরে স্তরে গৌতমকে তাঁর মুক্তি তত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করেন। এরপর অবশেষে সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেন যে অধ্যাত্ম বিষয়ে যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়, যখন একথা বোঝা সম্ভব হয় যে 'কিছুই নাই', এই আকিঞ্চন্য সংজ্ঞার উপলব্ধি হয়। এরপর দেহ থেকে ক্ষেত্রজ্ঞ নির্গত হয়, নির্লিঙ্গ, ধ্রুব, অক্ষর, পরব্রহ্ম স্বরূপ মোক্ষের বোধকেই আরড় কালাম সাধনার অভীষ্ট বলেন। বুদ্ধদেব তখন আরড় কালামের তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দেন এই পদ্ধতিতে মোক্ষলাভ হলে পুনরায় সংসারে আবধ্য হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।[১২০] এর পর গৌতম রামপুত্রের কাছে তত্ত্ব শিক্ষা করতে গেলেন। রামপুত্রের তত্ত্বে সংজ্ঞা এবং অসংজ্ঞা দুটিকেই স্বীকার করে অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ এই দুটিতেই সূক্ষ্ম আলম্বন আছে। একারণে যোগীকে আবার জগতে ফিরে আসতে হয় জেনে বুদ্ধদেব রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করেন।

ললিতবিস্তর-এর ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা আরড় কালাম এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে রামপুত্র রুদ্রকের কথা পাচ্ছি। আরড় কালামের কাছে গৌতম খুব অল্প সময়েই ধর্মের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর আরড়কালাম গৌতমকে তাঁর সঙ্গে শিষ্যদের শিক্ষা প্রদান করার অনুরোধ করেন। কিন্তু গৌতমের সেই সময়ে মনে হয় আরড় কালামের শিক্ষায় সংসার পার হওয়া সম্ভব নয়, দুঃখের নিবৃত্তিও সম্ভব নয়। একথা বুঝে গৌতম আশ্রম ত্যাগ করেন।[১২১] গৌতমের সঙ্গে রামপুত্র রুদ্রক মুনির সাক্ষাৎ হয় রাজগৃহনগরে। রামপুত্রের শিষ্যদের মধ্যে গণধর, গণের আচার্য এবং নানা সম্মাননীয় ব্যক্তিরা ছিলেন। এদের মধ্যে গৌতম আত্মগোপন করেন এবং রামপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন তার গুরু কে? উত্তরে

---

[১২০] ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ. *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত.* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম অখণ্ড সংখ্যা. পৃ. ১৪৪-১৫৫

[১২১] গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, জয়দেব. *ললিতবিস্তর.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৯৯৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৯৮।

রামপুত্র জানান তাঁর কোনও গুরু নেই। তিনি নিজেই তপস্যার দ্বারা তত্ত্ব দৃষ্টি লাভ করেছেন। এরপর রামপুত্রের সঙ্গে কথোপকথনে গৌতমের মধ্যে উপলব্ধি হয় যে রুদ্রকের মধ্যে শ্রদ্ধা, বীর্য অর্থাৎ উদ্যোগ, সমাধি এবং প্রজ্ঞা নেই।[১২২] তাই নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন-এর জ্ঞান লাভ করার পর গৌতম রামপুত্রের আশ্রম ত্যাগ করেন। *মিলিন্দ প্রশ্ন*-এর ষষ্ঠ বর্গে রাজা মিলিন্দ ভন্তে নাগসেন-কে জিজ্ঞাসা করেন বুদ্ধ নিজে বলেছিলেন তাঁর কোনও আচার্য নেই। অথচ বুদ্ধ বচনেই আচার্য আরড়-কালাম এবং রামপুত্র রুদ্রকের কথা পাওয়া যাচ্ছে। এই বৈপরীত্যের সমাধান কীভাবে সম্ভব? উত্তরে নাগসেন বলেন বোধিসত্ত্ব দশায় গৌতমের পাঁচজন গুরু ছিলেন—জন্মের সময় আটজন ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের লক্ষণ বিচার করেন। এঁরা হলেন রাম, ধ্বজ, লক্ষণ, মন্ত্রী, যজ্ঞ, সুযাম, সুভোজ ও সুদত্ত। এঁরা ছিলেন বোধিসত্ত্বের প্রথম আচার্য।[১২৩] দ্বিতীয় আচার্য ছিলেন সর্বমিত্র নামক ব্রাহ্মণ যিনি বোধিসত্ত্বকে জ্ঞানান্বেষণে উৎসাহিত করেছিলেন। চতুর্থ এবং পঞ্চম গুরু আরড় কালাম এবং রামপুত্র রুদ্রক। এঁরা বোধিসত্ত্বকে লৌকিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। অথচ লোকোত্তর শিক্ষা বুদ্ধ নিজেই অর্জন করেন, এবিষয়ে তিনি স্বয়ম্ভুজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[১২৪] বুদ্ধদেবের আচার্য প্রসঙ্গ থেকে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ বর্তমানে আমরা করতে পারছি। প্রথমত, বুদ্ধদেব কেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই গল্পের যে ভিন্ন বয়ান পাওয়া যাচ্ছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। আমরা *মধ্যম নিকায়*-এর বর্ণনায় দেখেছি আচার্যদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে বুদ্ধদেব তাঁদের সঙ্গত্যাগ করলেন কিন্তু আচার্যদের সঙ্গে কোনও তর্কে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা আমরা পাচ্ছি না। অথচ অশ্বঘোষ-এর *বুদ্ধচরিত*-এ আচার্যদের দর্শনের সীমাবদ্ধতা সবিস্তারে বর্ণিত হল। তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেব আচার্যদের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হলেন। এই ধরনটি বৌদ্ধধর্মের মূলগত বৈশিষ্ট্যের থেকে পৃথক।

---

[১২২] তদেব. পৃ. ৩০৪

[১২৩] মহাস্থবির, ধর্মাধার. *মিলিন্দ প্রশ্ন.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০১৩. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ১৯৮-১৯৯

[১২৪] Keith, A.B. *A History of the Classical Samkhya Philosophy*. Delhi : Nag Publishers. 1975. 1st Edition. p. 24

অপরের দর্শনের সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করা হলেও অপরাপর আচার্যের পরম্পরাকে হীন প্রতিপন্ন করার মানসিকতা বৌদ্ধ ধর্মের ধরন নয়। দ্বিতীয়ত, *ললিতবিস্তর*-এ রামপুত্র রুদ্রকের গুরু প্রসঙ্গটি অত্যন্ত জরুরি। সবকটি বর্ণনাতেই আমরা দেখেছি নির্বাণ লাভ বুদ্ধদেব কারও প্রদর্শিত পথে করেননি। এই বিষয়টিকে মনে হতে পারে বৌদ্ধদের পক্ষপাত, নিজ সম্প্রদায় প্রবর্তকের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা বলেও অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু রামপুত্র রুদ্রক যখন বলছেন তিনি নিজেই ছিলেন নিজের গুরু তখন বোঝা যায় আত্মজ্ঞান অনুসন্ধানে নিজেই নিজের গুরু হওয়ার প্রসঙ্গটি ভারতীয় ধর্মসাধনায় বুদ্ধ পূর্ববর্তী যুগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসঙ্গত আমরা বৈদিক তথা উপনিষদের সাধনার সঙ্গে একটি বাহ্য পার্থক্য অনুমান করতে পারছি। মন্ত্র অপৌরুষের এবং মন্ত্রের প্রামাণ্য অত্যন্ত স্বীকার্য তাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে নিজেই নিজের গুরু হওয়ার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা কার্যত অসুবিধার। এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বলতে আমরা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসীদের কথাই বিশেষ ভাবে বলতে চাইছি। আরড় কালাম এবং রামপুত্র রুদ্রক-কে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না। অশ্বঘোষ-এর মতে আরড় কালাম ছিলেন সাংখ্য দর্শনে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী সময়ে সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একথা সকলেই স্বীকার করে। মনে করা হয় আস্তিক দর্শনের মধ্যে প্রথম সাংখ্য দর্শনই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাংখ্যরা আস্তিক হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়ত, সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যোগ দর্শন যা পরে পতঞ্জলির হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত বৌদ্ধরা ধ্যানের স্তর হিসাবে নয়টি পর্যায় স্বীকার করেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও নয়টি স্তর স্বীকৃত। সাংখ্য দর্শনের পূর্বসূত্ররূপে উপনিষদকেই স্বীকার করেন অনেকে। তাঁদের মতে উপনিষদের ভাবনার বিকাশ হয়েছে সাংখ্য এবং বৌদ্ধধর্মে।[১২৫] সাংখ্যদর্শনের নানা বিবর্তনের ক্ষেত্রে মনে করা হয় অশ্বঘোষ-এর *বুদ্ধচরিত*-এ যে

[১২৫] Larson, G.J. *Classical Samkhya An Interpretation of its History and Meaning*. Delhi : MLBD. 1969. 1st Edition. p. 156

সাংখ্য দর্শনের পরিচয় পাচ্ছি তা পঞ্চ শিখ-এর ধারার সাংখ্য ভাবনা বলে স্বীকার করা যায়। একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পঞ্চশিখ সম্ভবত কোনও একজন গুরুর নাম ছিল না, এই নামে একাধিক সাংখ্যতত্ত্ব প্রণেতার এবং একাধিক তত্ত্বগ্রন্থের কথা পাওয়া যাচ্ছে। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি এবং পুরুষের ধারণাকে স্বীকার করে, অশ্বঘোষ-এর *বুদ্ধচরিত*-এ প্রকৃতি এবং পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। *বুদ্ধচরিত*-এ সাংখ্যের তত্ত্বকে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণিবিভাগ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের *মহাভারত*-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১২৬] *বুদ্ধচরিত*-এ জীবের দুঃখোৎপত্তির আটটি কারণের কথা বলা হয়েছে—বিপ্রত্যয়, অহঙ্কার, সন্দেহ, অভিসংপ্লব, অবিশেষ, অনুপায়, সঙ্গ এবং ভাবপাত। *বুদ্ধচরিত* সংসারচক্রের আবর্তনের মূলে অজ্ঞান, কর্ম ও বিষয়তৃষ্ণাকে দায়ী করেছে। পাঁচ প্রকার অবিদ্যাকে স্বীকার করা হয়েছে যথা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধ তামিস্র।[১২৭] সাংখ্যদর্শনের এই ধারনাগুলি অশ্বঘোষের সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কাঠামোর দিক থেকে সাংখ্য দর্শনের অত্যন্ত সামঞ্জস্য থেকে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে এদের মধ্যে ঐতিহাসিক ভাবেই পারস্পরিক আদান প্রদান ছিল। এই সামঞ্জস্যগুলির মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য সাংখ্য দর্শন ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির আত্যন্তিক উপায় উদ্ভাবনে আগ্রহী। সাংখ্যমতে দুঃখের নিবৃত্তিই হল মুমুক্ষের একমাত্র কাম্য। এই ত্রিবিধ দুঃখ হল—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার—শারীর দুঃখ এবং মানস দুঃখ। সাংখ্যমতে দুঃখ যেহেতু ভাব পদার্থ তাই দুঃখের বিনাশ সম্ভব।[১২৮] সাংখ্য দর্শনের এই দুটি মত বুদ্ধদেব প্রবর্তিত প্রথম এবং চতুর্থ আর্যসত্যের সমার্থক। সাংখ্য দর্শনের থেকে বৌদ্ধদের পাশাপাশি বৈদিকশাস্ত্রও প্রভাবিত ছিল। এছাড়া সাংখ্যদর্শন অনাদিমুক্ত ঈশ্বর পদার্থকে স্বীকার করে

---

[১২৬] ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ. *সাংখ্যদর্শন.* কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ. ১৯৮৫. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ১৪৬

[১২৭] তদেব. পৃ. ৩৩৭-৩৪০

[১২৮] ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ. *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০০৮. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১৫৭

যা মহাযানী বৌদ্ধধর্মের আদি বুদ্ধ ধারণার সঙ্গে তুলনীয়। এছাড়া মহাযান এবং হীনযান উভয় বৌদ্ধেরা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে স্বীকার করে কিন্তু ব্রহ্মার অধীশ্বরতা স্বীকার করেন না। এসবই সাংখ্য দর্শনের প্রভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব স্বীকার করা কিন্তু অধীশ্বরতা অস্বীকার করা।[১২৯] সাংখ্য দর্শনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে মনু এবং ব্যাসাদি ঋষিগণের পরম্পরায় স্বীকৃত হয়েছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের *মহাভারত*-এর 'শান্তি' পর্বের মোক্ষ ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় সাংখ্য সিদ্ধান্তের বর্ণনা আছে।[১৩০] এছাড়া বারংবার বিভিন্ন তর্কে প্রায় প্রত্যেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ কোনোভাবেই নাস্তিক্যের অথবা বেদ বিরোধের কথা বলে না। আমাদের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট হচ্ছে যে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ লগ্ন যে ভাবনা বুদ্ধদেবের সমকালে মোক্ষতত্ত্ব এবং মোক্ষলাভের পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিল তা হল সাংখ্য দর্শন। বৌদ্ধরা সাংখ্যের থেকে কিছু ধারণা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে তার বিকাশ করেন। সাংখ্য যেহেতু তত্ত্বের পাশাপাশি অভ্যাসের উপর গুরুত্ব দেয় তাই সাংখ্যের গুরু কেবল তত্ত্বপ্রণেতা নন, পথপ্রদর্শকও বটে। মনে রাখতে হবে আরড় কালাম বা রামপুত্র রুদ্রক প্রত্যেকেই আশ্রমে শিষ্যদের যোগের শিক্ষা দিতেন। এই ধারণা পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রভাব ফেলেছিল, তবে বৌদ্ধ পরম্পরা ছিল আরও সংহত ও সুশৃঙ্খল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিষয়টি বিস্তারে বোঝার চেষ্টা করব।

[১২৯] স্বামী, হরিহরানন্দ. *পাতঞ্জল যোগদর্শন.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০০২. সপ্তম সংস্করণ. পৃ. ১৪

[১৩০] তর্ক সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ. *ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়.* কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৩. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী ভারতীয় ধর্মে গুরু ধারণার নির্মাণ ও বিবর্তন: থেরবাদ, মহাযান এবং প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম

৩.১ বৌদ্ধ সঙ্ঘের সূচনা, থেরবাদী শাস্ত্র এবং গুরুর ভূমিকা

৩.২ বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন এবং গুরু প্রসঙ্গ

৩.৩ প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম এবং গুরু ধারণার বিবর্তন

তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব পরবর্তী ভারতীয় ধর্মে গুরু ধারণার নির্মাণ ও বিবর্তন: থেরবাদ, মহাযান এবং প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম

বোধিলাভের পর গৌতম বুদ্ধের শঙ্কা ছিল তাঁর উপলব্ধি হয়তো মানুষকে বোঝানো সম্ভব হবে না। কিছু দিনের দোলাচলতার পর বুদ্ধদেব পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের কাছে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। এই ঘটনার কথা *অঙ্গুত্তর নিকয়* এবং *মহাবর্গ*-এ পাওয়া যাচ্ছে। সমস্যা হল উক্ত দুটি গ্রন্থই বুদ্ধদেবের বেশ কিছুটা সময়ের পরে সংকলিত হচ্ছে। তবে এই আখ্যান এবং বেশ কিছু বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্ভবত অশোকের পূর্বেই সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করা হয় কলকাতা বৈরাট অনুশাসনের সাক্ষ্যে।[১] *ত্রিপিটক*-এর যথাযথ সময়কাল অনুসন্ধান করা বেশ সমস্যার, বিশেষত *ত্রিপিটক*-এর অন্তর্গত গ্রন্থগুলির কালানুক্রম অনুসন্ধান স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। সাধারণভাবে মনে করা হয় অভিধর্ম সাহিত্য সূত্র পিটক এবং বিনয় পিটক-এর পরবর্তী। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্মাণ-এর সময় হিসাবে অনুমিত হয় খ্রি. পূ. ৫৪৪ বা খ্রি. পূ. ৪৮৬ অব্দ। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ-এর অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে ভিক্ষু মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে পাঁচশ জন ভিক্ষু মিলে বুদ্ধদেব কথিত 'ধর্ম' এবং বিনয় একত্র করেন। অর্হৎ আনন্দ সুত্ত সংকলনের এবং অর্হৎ উপালি বিনয় সংকলনের ক্ষেত্রে বক্তা ছিলেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুরা এই সংকলনে মৌন থেকে সম্মতি দান করেন।[২] থেরবাদী পরম্পরায় বৌদ্ধ শাস্ত্র সংকলনের এই আখ্যানটি প্রচলিত। তবে মনে রাখা দরকার বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি শাখাই নিজেদের ধর্ম, সূত্র এবং অভিধর্মের সংকলন করতেন। এই কারণে ধর্ম বা বিনয় আমরা চারটি ভাষায় পাচ্ছি—থেরবাদী বিনয় পালি ভাষায়,

---

১ মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ. *বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ভারতে এবং বহির্বিশ্বে.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. ২০০৯. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ০৯

২ চৌধুরী, সুকোমল. *চুল্লবগ্গ.* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪১৮. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১১২-১১৮

মূলসর্বাস্তিবাদীদের বিনয় সংস্কৃতে, সর্বাস্তিবাদী, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক-দের বিনয় পাওয়া যাচ্ছে তিব্বতী এবং চৈনিক ভাষায়, মহাসাঙ্ঘিকদের বিনয় পাচ্ছি চৈনিক ভাষায়। এর পরেও বেশ কিছু টুকরো টুকরো বিনয়ের কথা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'মহাবস্তু'-তে মহাসাঙ্ঘিকদের বিনয়ের বেশ কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। 'অভিধর্ম্মপিটক'-এর ক্ষেত্রে থেরবাদী এবং সর্বাস্তিবাদীদের গ্রন্থই পাওয়া যাচ্ছে। থেরবাদীদের সাতটি গ্রন্থ হল—ধম্মসঙ্গিণি, বিভঙ্গ, পুদ্গলপ্রজ্ঞপ্তি, ধাতুকথা, পট্টান, যমক এবং কথাবস্তুপ্রকরণ। সর্বাস্তিবাদীদের মতে 'অভিধর্মপিটক'-এর সাতটি গ্রন্থ যথাক্রমে—জ্ঞানপ্রস্থান এবং ছয়টি পাদশাস্ত্র—সংগীতি পর্যায় পাদ, ধর্মস্কন্ধ, প্রজ্ঞপ্তিপাদ, বিজ্ঞানকায়পাদ, ধাতুকায়পাদ, প্রকরণপাদ।[৩] তিব্বতী এবং চিনদের ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ শুরু হয় অশোকের পরবর্তীকালে। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে আমরা বৌদ্ধ ধর্মে গুরু প্রসঙ্গের সামগ্রিক চিত্র পেতে চাইলে আমাদের ত্রিপিটক-এর বিভিন্ন ভাষায় রক্ষিত, বিভিন্ন শাখার বয়ানগুলিকে ব্যবহার করতে হবে যা কার্যত অসম্ভব। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা মূলত পালিশাস্ত্রের ভিত্তিতে আলোচনাটি করতে চাইব থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মে গুরু ধারণাকে বোঝার জন্য। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অজস্র শাখা এবং একাধিক ভাষায় মহাযানী শাস্ত্র রক্ষিত থাকায় আমরা অল্প কয়েকটি সংস্কৃত শাস্ত্র এবং মূলত গৌণসূত্রের উপরে নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছি। গুরু প্রসঙ্গটি আমরা দুটি দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমত, বিনয় যেহেতু শিষ্য তথা শ্রমণদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের কথা বলে তাই এর থেকে আমরা আচার্যদের ভূমিকা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। দ্বিতীয়ত, সাধ্য-সাধনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যা একজন শ্রমণের অভীষ্ট তার দার্শনিক প্রেক্ষাপট বিচার করে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এক্ষেত্রে গুরুদের কী করণীয় থাকছে। আমরা আপাতত থেরবাদ এবং মহাযান নিয়েই আলোচনা করব। মহাযানের ক্ষেত্রে আমাদের মূল ঝোঁক থাকবে নাগার্জুনের দর্শনের উপর। প্রসঙ্গত বিজ্ঞানবাদ এবং অন্যান্য শাখার আলোচনা আসবে। ধর্মদর্শনের পরিবর্তনের সঙ্গে গুরুদের

---

[৩] Pande, Govind Chandra. *Studies in the Origins of Buddhism*. Allahabad : University of Allahabad. 1957. 1st Edition. pp. 01-17

ভূমিকার পরিবর্তন বোঝার জন্য আমরা এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে চাইছি। প্রসঙ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বৌদ্ধ কাহাকে বলে এবং গুরু কে?’ প্রবন্ধটির উল্লেখ প্রয়োজন। **১৩২১** বঙ্গাব্দের ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্মের শাখার পরিচয় বুঝতে চেয়েছিলেন বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে গুরুর ধারণাকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গত তিনি শ্রাবকযান অর্থাৎ থেরবাদ-এর উপাধ্যায়, মহাযান-এ কল্যাণমিত্র, মন্ত্রযানের গুরু এবং বজ্রযানে বজ্রধারী গুরুর কথা বললেন, এই সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মে গুরুর ক্ষমতার পরিবর্তনের একটি রূপরেখাও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৈরি করেছিলেন।[৪] বর্তমানে আমরা এই রূপরেখাটিকে বিস্তারিতভাবে বোঝার চেষ্টা করব। এই সঙ্গে সমকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনীতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টাও আমাদের থাকবে।

৩.১ বৌদ্ধ সঙ্ঘের সূচনা, থেরবাদী শাস্ত্র এবং গুরুর ভূমিকা

খ্রি. পূ. ষষ্ঠ-সপ্তম শতক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। মূলত পশুপালন কেন্দ্রিক অর্থনীতি থেকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল এই সময়ে হয়েছিল। আর্যদের সংস্কৃতি সেই সময়ে পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে ক্রমশ গঙ্গানদীর অববাহিকার দিকে সরে আসে। গঙ্গার দোয়াব অংশে বৃষ্টিপাতের কারণে ঘন জঙ্গল ছিল যা মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত। এই ঘন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার জন্য দরকার ছিল লোহার তৈরি কুঠারের। এর আগে ভারতবর্ষে তামা মেশানো আকরিক লোহা ব্যবহারের কথা পাওয়া গেলেও খ্রি. পূ. ১০০০ থেকে পাকিস্তানের বালুচিস্তান অঞ্চলে এবং খ্রি. পূ. ৮০০ থেকে উত্তরপ্রদেশে লোহার অস্ত্র, তীরের ফলা, বর্শা ইত্যাদির বিশেষ ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং লোহার ব্যবহারের সূত্র ধরে গাঙ্গেয় অববাহিকায় বসতি স্থাপন এবং লাঙলের সাহায্যে অধিক

[৪] চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পা.), *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০০১. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ২৩৯-২৫১।

ফসল উৎপাদন করা ক্রমশ সম্ভব হয়েছিল।[৫] মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে জড়িত ছিল ভারতবর্ষে নগরজীবনের পুনরাবির্ভাবের ইতিহাস। সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের ধারণার, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা সবই এই সময়েই শুরু হয়। এর আগে কোনও একজন ক্ষত্রিয় অথবা গোষ্ঠীপতিকে 'ভূপতি' বিশেষণে চেনা হত না। এর অর্থ খ্রি. পূ. ৬০০ থেকে খ্রি. পূ. ৩২৫ অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে অবধি সময়পর্বে ভূমিতে রাজার অধিকার স্বীকৃত হতে শুরু করে। বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যে আমরা বহুবার জনপদ শব্দটির ব্যবহার পাচ্ছি। প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বগ্রন্থগুলিতে জনপদ বলতে কৃষিপ্রধান এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে বোঝাত। এই জনপদ আয়তন এবং ক্ষমতায় বৃদ্ধি পেলে 'মহাজনপদ' নামে পরিচিত হত। আমরা জানি এই সময়েই ভারতে ষোলটি ক্ষমতাশালী মহাজনপদ-এর উদ্ভব ঘটেছিল। বোঝা যাচ্ছে এই জনপদগুলি উদ্বৃত্ত উৎপাদন সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট এলাকায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ক্রমশ সাফল্য অর্জন করেছিল।[৬] কৃষিকার্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে উৎপাদনের উপাদানের অর্থাৎ লাঙল, কোদাল ইত্যাদির ব্যবহারও এই সময়ে ক্রমশ বাড়তে থকে। কৃষির সঙ্গে কারিগরী শিল্প ও বিবিধ বৃত্তির অগ্রগতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে কেন্দ্র করে সেসময় বাণিজ্যেরও উন্নতি শুরু হয়। তবে স্থলবাণিজ্যের তুলনায় সমুদ্র বাণিজ্যের উল্লেখ কম পাওয়া যাচ্ছে পালি সাহিত্যে। কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গেই সেসময় মহাজনপদগুলি প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। মহাজনপদগুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে তৎকালীন কৌম গোষ্ঠীশাসিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব ও ক্ষমতা ক্রমশ কমছিল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে যুক্ত ধনোৎপাদক সম্প্রদায় খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকের আগে বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। বরং কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত বলে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত

---

[৫] শর্মা, রামশরণ. *ভারতের প্রাচীন অতীত.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান. ২০১১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১২৬

[৬] চক্রবর্তী, রণবীর. *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে.* কলকাতা : আনন্দ. ১৪১৭. দ্বিতীয় সংস্করণ. পঞ্চম মুদ্রণ. পৃ. ৬৮-৬৯

মানুষগুলির প্রতি একধরনের তাচ্ছিল্য দেখা যায়।[৭] বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের উদ্ভাবনের সঙ্গে ভারতের পরিবর্তিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্ক স্পষ্ট। বিশেষত, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই ছিলেন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। যেমন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধদেবকে শ্রমণদের সঙ্গে থাকবার জন্য একটি উদ্যান প্রদান করেন। বণিকদের এই দানের প্রতিদান বৌদ্ধধর্মও দিয়েছিল নানাভাবে। যেমন ঋণগ্রহণ অথবা দাসত্ব প্রথার কোনো সমালোচনা বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বজীবের মুক্তির কথা বৌদ্ধদের অন্যতম আদর্শ অথচ দাসপ্রথায় যারা ক্ষমতা ও অর্থের কাছে নিজেদের স্বাধীনতা বিক্রি করতে বাধ্য হত তাদের প্রতি বৌদ্ধ 'ত্রিপিটক'-এর কোনো ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।[৮] এই সমঝোতার মূল কারণ ছিল বৈশ্য অথবা শূদ্ররা পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, যে সামাজিক স্বাধিকার তাতে বর্ণগত পরিচয়ের তুলনায় পেশাগত পরিচয় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল।[৯] প্রসঙ্গক্রমে আমরা শঙ্খ জাতক-এর কথা বলতে পারি। এই জাতকের নায়ক শঙ্খ নামের একজন ব্রাহ্মণ বণিক। ব্রাহ্মণদের বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরুষানুক্রমিক পেশার ধারণাতেও পরিবর্তন এসেছিল। এরপর দেখা গেল প্রত্যেক বুদ্ধকে দান করার পুণ্যফলে সমুদ্রে জাহাজ ভেঙে গেলেও বণিক প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলেন।[১০] অর্থাৎ বৌদ্ধ আখ্যানে দান এবং বণিকের স্বার্থরক্ষার সম্পর্ক ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। মহাবাণিজ জাতক-এর গল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল আখ্যানের পূর্বে এক্ষেত্রে আরেকটি আখ্যান রয়েছে। এই আখ্যানে দেখা যায় শ্রাবস্তীবাসী বণিকেরা বুদ্ধের বন্দনা করে বাণিজ্য যাত্রা করেন এবং দিক্‌ভ্রষ্ট

---

৭ তদেব. পৃ. ৯৩

৮ Goyal, S.R. *A Religious History of Ancient India*. Meerut: Kusumanjali Prakashan. 1984. 1st edition. p.281

৯ Raj, Jaimal. *The Rural-Urban economy and Social Changes in Ancient India* (300 B.C. to 600 A.D). Delhi : Bharatiya Vidya Prakashan. 1974. 1st Edition. pp. 321-322

১০ ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনু.). *জাতক* (৪). কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪২০. পঞ্চম মুদ্রণ. পৃ. ২৫-২৮

হলেও তাঁরা বুদ্ধের কৃপায় ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেবতার থেকে পানীয় জল, খাদ্য, মণিরত্ন পেলেন এবং সুস্থভাবে ফিরে এলেন। এরপর বুদ্ধদেব তাঁদের বলেন মাত্রাজ্ঞান ছিল বলেই তাঁরা যাত্রায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এরপর মূল আখ্যানটির বিষয়বস্তু ছিল কীভাবে পূর্বের বণিকেরা মাত্রাজ্ঞান না থাকার কারণে সর্বশান্ত হয়েছিলেন।[১১] এই আখ্যানে দেখা যাচ্ছে শ্রাবস্তীর বণিকেরা বৃক্ষদেবতার থেকে সুন্দরী নারীদের লাভ করেন এবং তাদের সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হন। তা সত্ত্বেও তাঁদের মাত্রাজ্ঞান লুপ্ত হয়নি বা তাঁরা শান্তার দ্বারা তিরস্কৃতও হননি। আমরা বুঝতে পারছি সঙ্ঘ অথবা গৃহীর জন্য যে শীল পালনের কথা বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন, সমস্ত ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল না। বণিকদের আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা 'গহপতি' শব্দটির প্রভূত ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। 'গহপতি' শব্দটি পালি সাহিত্যে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আগে 'গহপতি' বলতে কেবল গৃহস্থকে বোঝালেও পালি সাহিত্যে 'গহপতি'-র অর্থ বণিক গৃহস্থ। যাঁরা বৌদ্ধ সঙ্ঘকে নিয়মিত বস্ত্র, খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি দিতেন। পরিবর্তে ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা গৃহস্থকে 'ধর্ম'-এর শিক্ষা দিতেন। ক্রমে এই গৃহস্থ এবং ভিক্ষুদের সম্পর্ক 'দানধম্ম-ধম্মাদান' নামে পরিচিত হয়।[১২] বণিকদের সঙ্গে বৌদ্ধদের এই সম্পর্কের কারণটা ছিল পারস্পরিক। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন বড়লোক শ্রেণির প্রয়োজন ছিল সামাজিক মর্যাদার, ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থায় যা পাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে শ্রামণ্য ধর্ম হলেও বুদ্ধদেবের অনেক কর্মকাণ্ড ছিল নগরকেন্দ্রিক। তাই এই নতুন ধর্মের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতারও দরকার ছিল। এই কারণেই বৌদ্ধ তথা জৈন ধর্মের সঙ্গে তৎকালীন বণিক সমাজের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিক্ষুদের প্রতি নির্দেশ দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের বারংবার সংযত হতে বলেছেন। এই সংযম কেবল ধর্মীয় নীতির কথা বলে না। সেসময়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ছিল না, এমনটাও না যে ভিক্ষুদের

---

[১১] তদেব. পৃ. ২২৫-২২৭

[১২] Findly, Ellison Banks. *Dana giving and Getting in the Pak Buddhism*. Delhi : MLBD. 2003. 1st Edition. p. 281

বন-অরণ্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হত অথবা ভিক্ষার নিরতিশয় অভাব ছিল। বরং বণিকদের এত দানের কাছে নিজের লোভ সামলে রাখাই ছিল ভিক্ষুদের অন্যতম কাজ। কোনোরকম অতিরেকের সুযোগ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে ছিল না। অন্তর্বাস, বহির্বাস, একটি লাঠিজাতীয় বস্তু, দাঁতের মাজন এবং ভিক্ষাপাত্র রাখবার কেবল অনুমতি ছিল, সঙ্গে রাখা যেত দরকারী ঔষধ। মাসে একবার মস্তক মুণ্ডন করা যেত, আয়নায় মুখ দেখার অনুমতি ছিল না, একমাত্র অসুস্থতার সময়ে ভিক্ষাপাত্রে জল নিয়ে মুখ দেখার অনুমতি ছিল।[১৩] এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার কথাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। জনপদ স্থাপন এবং শাসনব্যবস্থায় ক্ষত্রিয়দের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেই সময়ে পুরোহিতদেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এই সময় থেকে পুরোহিতরা রাজার পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের ভূমিকা নিচ্ছেন। পুরোহিততন্ত্র বংশানুক্রমিক তো ছিলই, দেখা যাচ্ছে সাত পুরুষ ধরে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এই সম্পর্কটি কার্যকর হত।[১৪] হস্তিপাল জাতক-এ দেখা যাচ্ছে বারাণসীর রাজা ত্রসুকারী এবং তাঁর পুরোহিত দুজনেই নিঃসন্তান হওয়ার কারণে একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, রাজার সন্তান হলে সে পুরোহিতের সম্পদ পাবে আর পুরোহিতের সন্তান হলে তারা রাজ্যের অধিকার পাবে।[১৫] সহ্য জাতক-এ বলা হয়েছে বোধিসত্ত্ব অজস্র প্রলোভন সত্ত্বেও বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন।[১৬] এই বয়ানের অন্যতম কারণ তৎকালে পুরোহিতের পদত্যাগ করা প্রকৃতপক্ষেই বৃহৎ ত্যাগের পরিচয় ছিল। অন্ধভূত জাতক-এ দেখা যাবে রাজা এবং তার পুরোহিত প্রত্যহ পাশা খেলত এবং রাজার মন্ত্র বলে প্রত্যেক দিন পুরোহিত

[১৩] Auboyer, Jeannie. *Daily Life in Ancient India.* London : Asia Publishing House. 1961. 1st Edition. pp. 218-219

[১৪] Fick, Richard. *The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time*. Kolkata : University of Calcutta. 1920. p. 170

[১৫] ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনু.). *জাতক* (৪). কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪২০. পঞ্চম মুদ্রণ. পৃ. ২৯০

[১৬] ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনু.). জাতক (৩). কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১৪. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ২০

পরাজিত হত এবং রাজাকে হেরে যাওয়ার কারণে টাকা দিতে বাধ্য হত।[১৭] অর্থাৎ ক্ষমতার সম্পর্কে ক্ষত্রিয় উচ্চতর স্থান অর্জন করলেও ব্রাহ্মণের স্থান তার থেকে বিশেষ নীচে ছিল বলার কোনও যুক্তি নেই। রাজার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজীবনেও রাজার গুরুত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল খ্রি. পূ. অষ্টম থেকে খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকের মধ্যে। এর পরিচয়স্বরূপ বলা যায় রাজার সঙ্গে প্রযুক্ত বিশেষণগুলিতে রাজাকে কেবল রাজ্যের অধিকারী বলে মনে করা হচ্ছিল না। রাজাকে ঋত তথা ধর্মের রক্ষক বলেও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে 'ঋত' শব্দটির মাধ্যমে দ্বন্দ্বের নিরসনকে বোঝানো হত। ক্রমশ ঋতের বদলে 'ধর্ম' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। এক্ষেত্রে 'ধর্ম' বলতে সামাজিক নিয়ম; যজ্ঞ করার অধিকার ও ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা; জমি, উৎপাদনশীল প্রাণী এবং নারীর সুরক্ষাকে বোঝাতো। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্রের এই পারস্পরিক সমঝোতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কারা কারা মধুপর্কের অধিকারী ছিলেন তার বর্ণনা থেকে। মধুপর্ক হল দহি, ঘি, শর্করা এবং মধুর একটি মিশ্রণ যা নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত। পুত্রের অন্নপ্রাশনেও মধুপর্কের ব্যবহার ছিল। মধুপর্কের অধিকারী হলেন—যজ্ঞকারী পুরোহিত, গুরু তথা বেদাধ্যাপক, রাজা এবং পূর্বপুরুষেরা।[১৮] ব্রাহ্মণ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই সম্পর্ক থেকেই বোঝা যাচ্ছে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে কেবল ক্ষত্রিয়ের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে ধর্মচালনার সুযোগ ছিল না।

বুদ্ধদেব কথিত ধর্মপথ যাঁরা হুবহু অনুসরণ করে চলার তাত্ত্বিকভাবে চেষ্টা করেন তাঁদের বলা হয় থেরবাদী। এঁরা অনুজ্ঞার আক্ষরিক অনুসরণে বিশ্বাসী ছিলেন। গৌতম গণরাজ্যের রাজবংশের সন্তান ছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি গণরাজ্যগুলি কখনোই ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলত না। সুতরাং বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হল ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। একই সঙ্গে খেয়াল করার মতো গৌতম ছাড়াও তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রথম পর্যায়ের নেতাদের অনেকেই ছিলেন ক্ষত্রিয়।

---

[১৭] ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনু.). *জাতক* (১). কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১৯. ষষ্ঠ মুদ্রণ. পৃ. ১১৩

[১৮] Roy, Kumkum. *The Emergence of Monarchy in North India Eighth-Fourth Centuries B.C. As Reflected in the Brahmanical Tradition.* Delhi : Oxford University Press. 1994. 1st Edition. pp. 170-173

এঁদের মধ্যে প্রথমেই আনন্দের নাম করতে হয়, যিনি বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ছিলেন এবং যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই একরকম তর্কে পরাজিত হয়ে বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপরেই আসবে বুদ্ধ শিষ্য অনিরুদ্ধের কথা। *অঙ্গুত্তর নিকায়*-এর মতে অনিরুদ্ধ ছিলেন সব চাইতে বেশি অলোকদৃষ্টি সম্পন্ন ভিক্ষু। তাঁর মুখে আমরা বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ-এর পর সব থেকে যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনতে পাচ্ছি। এছাড়াও সঙ্গে ক্ষত্রিয় ছিলেন রাহুল এবং দেবদত্ত। আনন্দ, অনিরুদ্ধ, রাহুল এবং দেবদত্ত—এঁরা সকলেই শাক্যবংশের সন্তান। এছাড়া সঙ্ঘে ব্রাহ্মণ ছিলেন—সারিপুত্ত, তার ছোট ভাই মহাচুন্দ, মহা কচ্চ, মহাকটতিত। শাক্যবংশের নাপিত উপালি ছিলেন সঙ্ঘের বিনয়ধর ভিক্ষু। এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের সরাসরি যোগাযোগ ছিল।[১৯] তবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধদেব বেশ কিছু ব্রাহ্মণের সহায়তা পেয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের সমকালে তাঁকে যে কোনোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা তথা সহায়তা করেছেন এমন ১৭৫ জনের নাম পাওয়া যাচ্ছে যাঁর মধ্যে ৭৬ জন ব্রাহ্মণ, ৩৩ জন বৈশ্য, ২৬ জন উচ্চকুল জাত, ২২ জন ক্ষত্রিয় এবং ১১ জন নীচকুলের মানুষ ছিলেন। এছাড়াও ৭ জন পরিব্রাজক ছিলেন যাঁরা বৌদ্ধ সঙ্ঘে সরাসরি প্রবেশ না করলেও বৌদ্ধমত গৃহী তথা উপাসকদের মধ্যে প্রচার করতে সহায়তা করেছিলেন।[২০] এই হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আধুনিক অর্থে প্রতিবাদী ধর্ম বলতে যা বোঝাচ্ছে, বিশেষত নীচুতলার সমর্থন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদের কল্পনা করা হয় বৌদ্ধধর্ম সেভাবে শুরুই হয়নি। 'সঙ্ঘ' শব্দটি বলতে বোঝায় সমূহ অর্থাৎ গণ বা ট্রাইব। অনেকে মনে করেন সঙ্ঘ নির্মাণ আসলে পরিবর্তিত নগরকেন্দ্রিক জীবনচর্যায় প্রাক্-বিভক্ত সমাজচর্যার আদর্শমূলক বিকল্প। গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর দুজনেই এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে অস্বীকার এবং গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার সূত্রে নয়

---

[১৯] Chakravarti, Uma. *The Social Dimensions of Early Buddhism*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1996. 1st Edition. p. 145

[২০] তদেব, পৃ. ১৩১-১৩২

গণভোটের মাধ্যমে সঙ্ঘ প্রধান নির্বাচন এসবই গণ সমাজের চিহ্ন।[২১] বৌদ্ধধর্ম মূলত শীল এবং চর্যার উপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা রূপেই দেওয়া হয়েছিল। সঙ্ঘে এই নীতি শিক্ষা দিতেন আচার্য এবং উপাধ্যায়েরা। গৃহীদের মধ্যে এই শিক্ষা দিতেন ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা। গৃহীদের কাছে ভিক্ষা সংগ্রহ করার সময় এবং পূর্ণিমার দিন আয়োজিত উপসথ দিবসে সমাগত গৃহীদের এই শিক্ষা প্রদান করার চল ছিল। বর্তমানে আমরা কেবল সঙ্ঘ নিয়ম নিয়েই আলোচনা করব কারণ বৌদ্ধ ধর্মের মূল কেন্দ্রে ছিল সঙ্ঘ। বুদ্ধদেব শীলচর্যার কথা বলেছেন বারবার। এর মধ্যে শীল তিন রকমের হতে পারে—কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। মনে রাখতে হবে থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে শাস্ত্রই শেষ কথা, শাস্ত্র ব্যাখ্যার কোনো গুরুত্ব এঁরা স্বীকার করেন না। এমতাবস্থায় যিনি আচার্য তাঁর মূল কাজ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের ঠিক পথে চালিত করার পথনির্দেশটুকু প্রদান করা। থেরবাদীদের মূল লক্ষ্য অর্হত্ব প্রাপ্তি, একারণে তাঁরা নৈতিক অভ্যাস এবং ধ্যানচর্যার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চাইতেন। উপসম্পদা অর্থাৎ বৌদ্ধমতে সন্ন্যাসলাভের পূর্বে গৃহী অর্থাৎ উপাসক এবং উপাসিকারা ত্রিরত্নে বিশ্বাস করতেন; আগ্রহ থাকলে গৃহীদের জন্য প্রযুক্ত পঞ্চশীল অনুসরণের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের ধর্মে নিজেদের বিশ্বাস প্রদর্শন করতেন।[২২] শ্রমণদের মধ্যে প্রচলিত শীলের কথা বিস্তারিত ভাবে পাচ্ছি *দীঘ-নিকায়*-এ। এখানে শীলকে তিন ভাগে ভেঙে বলা হয়েছে—চুলশীল, মধ্যমশীল এবং মহাশীল। প্রত্যেকটি শীলের বর্ণনার শুরুতে ধ্রুবপদের মত একটি কথা বলা হয়েছে—"কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা এবং মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন।"[২৩] অর্থাৎ শীলের আচরণই বৌদ্ধ ধর্মকে আর পাঁচটা ধর্মমত এবং অন্য শ্রামণ্যধর্মের থেকে পৃথক করেছে। শীলের পরেই ভিক্ষু

---

[২১] ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ. *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস.* কলকাতা : জেনারেল. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ১৫৯-১৬১

[২২] Akira, Hirakawa. *A History of Buddhism From Sakyamuni to Early Mahayana*. Delhi : MLBD. 1998. Reprint. p. 61

[২৩] ভিক্ষু, শীলভদ্র. *দীঘ নিকায়.* কলকাতা : মহাবোধ বুক এজেন্সী. ১৪১৪. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৪-১০

এবং ভিক্ষুণী প্রসঙ্গে এসেছে ধুতাঙ্গের কথা। যদিও *বিনয় পিটক*-এ ধুতাঙ্গের কোনো পরিপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না। এর থেকে অনুমান করা যায় ধুতাঙ্গের ধারণা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে পরবর্তী সময়ে গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী বলার কারণ *মিলিন্দ প্রশ্ন*-এ প্রথম ধুতাঙ্গের পরিপূর্ণ তালিকা পাচ্ছি—১. পরিত্যক্ত বস্ত্র থেকে ভিক্ষুরা নিজেদের বস্ত্র তৈরি করবে, ২. তিনটির বেশি বস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, ৩. গৃহে গৃহে গিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে হবে, সঙ্ঘে এসে দান করলে তা গ্রহণ না করার চেষ্টা, ৪. পরপর বাড়িতে ভিক্ষা করতে হবে, ভিক্ষা বেশি পাওয়ার আশায় বাড়ি নির্বাচন করা চলবে না, ৫. একেবারে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, উঠে অন্য কাজ সেরে আবার খাবার গ্রহণ করা চলবে না, ৬. এক ভিক্ষা পাত্রে যতটুকু খাবার ধরে তাই খেতে হবে, ৭. খাওয়ার একবার শেষ হলে পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না, ৮. অরণ্যেই বাধ্যতামূলকভাবে বাস করতে হবে, নগর বা জনবসতিতে বাস করা চলবে না, ৯. মাথার উপর ছাউনি যুক্ত কোথাও থাকা চলবে না, সঙ্ঘ অথবা গাছের নীচে থাকার সুযোগ থাকছে না, ১০. খোলা জায়গায় থাকতে হবে, ১১. অন্তত বারো বছর আগে পরিত্যক্ত হয়েছে এমন শ্মশানে থাকা যেতে পারে, ১২. যে কোনও বিছানা অথবা আসন গ্রহণ করতে হবে কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়াই, ১৩. রাত্রে এক প্রহরের বেশি ঘুমোনো যাবে না, দরকার হলে পায়চারি করতে হবে।[২৪] এই ধুতাঙ্গের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে এই নিয়মগুলির প্রায় কোনোটাই সরাসরি বুদ্ধবচন থেকে প্রাপ্ত নয়। এখানে সঙ্ঘের নিয়ম অনেক বেশি জটিল এবং দৃঢ়রূপ ধারণ করেছে। সঙ্ঘের নিয়ম ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে এবং থেরবাদীরাও তা গ্রহণ করেছে দেখে বোঝা যাচ্ছে থেরবাদীরা সম্পূর্ণ অবিচল থেকে সঙ্ঘ দীর্ঘ সময় চালনা করতে পারেননি। প্রাথমিক অবস্থায় মনে রাখতে হবে থেরবাদীরা দেহ এবং পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর তুলনায় ভিক্ষুদের মনকেই সংহত করার অভ্যাসে বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্ঘে বুদ্ধদেব প্রত্যেক শিষ্যকে ধ্যানের একটি করে বিষয় দিতেন, পরবর্তী সময়ে আচার্যেরা এই কাজটি করতেন। তারপর শিষ্যদের কাজ

[২৪] Dutt, Nalinaksha. *Early Monastic Buddhism*. Calcutta : Calcutta Oriental Book Agency. 1960. 1st Edition. pp. 156-158.

ছিল ধ্যানের মাধ্যমে সেই বিষয়টির ছবি নিজের চোখের সামনে আনা, চোখ খুলেও সেই বিষয়টি দেখতে পাওয়া জরুরি ছিল, ছবিটি চলে গেলে আবার চোখ বন্ধ করে ধ্যানের মাধ্যমে ছবিটি ফিরিয়ে আনতে হত।[২৫] এছাড়াও আচার্যের ভূমিকা ছিল পাতিমোক্ষ সূত্র অনুশীলনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও মনে করা হয় পাতিমোক্ষ সম্পূর্ণত বুদ্ধদেব-এর শিক্ষাপদ থেকেই গৃহীত।[২৬] সুতরাং ভিক্ষুদের আবৃত্তি করানো এবং বুদ্ধদেব কথিত নিয়মের যথাযথ অনুশীলন হচ্ছে কি না দেখাই এক্ষেত্রে আচার্যদের একমাত্র করণীয় ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। অর্হত্ব লাভের পর কিছু ভিক্ষুরা 'ধ্যান'-এর পাশাপাশি সঙ্ঘের পরিচালন কার্যে নিয়োজিত হতেন এমন দেখা যাচ্ছে। এই সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব তাঁদের অনুরোধ রাখতেন এবং ধ্যানের পরিবর্তে সঙ্ঘ চালনার দায়িত্ব দিতেন এই প্রমাণ 'চুল্লবগ্গ'-তে পাওয়া যায়।[২৭] বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন তখন তিনি সঙ্ঘের প্রধান হলেও বিভিন্ন বিষয়ে সঙ্ঘের অন্যান্য ভিক্ষুদের অভিমত শুনতেন। সুতরাং সঙ্ঘের অধ্যক্ষের একনায়কতন্ত্র থেরবাদে স্বীকৃত হয়নি। এমনকী সঙ্ঘের অনুমতি না নিয়ে ভিক্ষুণীদের উপদেশ প্রদান করলেও পাচিত্তিয় অপরাধ হত।[২৮] 'পাচিত্তিয়' অনুসরণে বোঝা যায় কোনোরকম ভোগ বিলাসের সুযোগ ভিক্ষুদের ছিল না, উপরন্তু নিরোগ অবস্থায় ভিক্ষুগণ যদি উৎকৃষ্ট খাদ্য ভিক্ষা রূপে প্রার্থনা করতেন সেক্ষেত্রেও তাঁদের পাচিত্তিয় অপরাধ হবে—এমন বিধানই বুদ্ধদেব দিয়েছিলেন।[২৯] *বিনয় পিটক*-এর *মহাবর্গ* গ্রন্থের অন্তর্গত 'সহবিহারী ও উপাধ্যায়ব্রত' নামক অধ্যায়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘে উপাধ্যায় এবং আচার্যের ভূমিকার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে। এই অধ্যায়ে দেখা

---

[২৫] Thomas, Edward J. *The History of Buddhist Thought*. London : Rautledges & Kegan Paul Ltd. 1953. 2nd Edition Reprint. pp. 45-46

[২৬] Dutt, Sukumar. *Buddhist Monks and Monasteries of India Their History and Their Contribution to Indian Culture*. Delhi : MLBD. 2015. 3rd Reprint. p. 68

[২৭] চৌধুরী, সাধনকমল. *চুল্লবগ্গ.* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১৮ বঙ্গবাদ. প্রথম সং. পৃ. ৪৯

[২৮] ভিক্ষু, করুণাবংশ (অনু.). *বিনপিটকে পাচিত্তিয়.* রাঙামাটি : অনোমদর্শী মহাথের-র শিষ্যবৃন্দ. ২০১৩. পরিমার্জিত সংস্করণ. পৃ. ১২৪

[২৯] তদেব, পৃ. ১৮১

যাবে সঙ্ঘে প্রথমে উপাধ্যায় প্রথা ছিল না। কিন্তু ভিক্ষুদের অশোভন আচরণে বিরক্ত হয়ে বুদ্ধদেব উপাধ্যায় প্রথা আরম্ভ করলেন। নিয়ম হল সহবিহারী অর্থাৎ ভিক্ষুরা কোনো একজন বরিষ্ঠ ভিক্ষুকে অনুরোধ করবেন উপাধ্যায় হওয়ার। তিনি সম্মতি দান করলে সহবিহারী উপাধ্যায়ের সেবা যত্ন করবেন আবার উপাধ্যায় অন্যায় আচরণ করলে সহবিহারী তাঁকে বাধা দেবেন। এখানে সহবিহারী শব্দটির ব্যবহার থেকে বোঝা যাচ্ছে এই সম্পর্কে সমানাবস্থার কথা বলা হয়েছে, উঁচু এবং নীচুর ধারণা এক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না। একই সঙ্গে বুদ্ধদেব কথিত নিয়ম অনুযায়ী সহবিহারী যেমন অন্যায় করলে উপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হতেন একইভাবে ক্ষমা চাইলে উপাধ্যায়ও সহবিহারীকে ক্ষমা করতে বাধ্য থাকতেন। উপাধ্যায়কে উপসম্পদা দানের অধিকার দেওয়া হয় এবং উপসম্পদা অবশ্যই সঙ্ঘের অনুমতিক্রমে দিতে হবে এমন সিদ্ধান্তের কথা পাওয়া যাচ্ছে *মহাবর্গ*-এ। উপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সহবিহারীগণ আচার্যের নির্দেশে সঙ্ঘজীবন যাপন করবেন। আচার্য হওয়ার জন্যও সহবিহারী কোনও একজন অভিজ্ঞ ভিক্ষুকে অনুরোধ করবেন এবং তিনি তাতে সম্মতি দান করলে আচার্য পদে তাঁকে স্বীকার করা হবে। যে কোনও ভিক্ষু দশ বছর কোনও একজন উপাধ্যায় এবং আচার্যের অধীনে থাকবেন। বয়স্ক আচার্যকে অন্তত দশ বছর কোনও একজন ভিক্ষুকে শিক্ষাপদ প্রদান করতে হবে। আচার্য এবং উপাধ্যায়ের প্রতি যেমন শিষ্যের কর্তব্য রয়েছে তেমনই শিষ্য অর্থাৎ সহবিহারী যদি অসুস্থ হয় তার যাবতীয় পরিচর্যার দায়িত্ব অবশ্যই আচার্য এবং সহবিহারীর। পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্য কাউকে উপসম্পদা দান করতে পারবেন না। এই পঞ্চাঙ্গ হল অশৈক্ষ্যশীলের অপূর্ণতা অর্থাৎ যিনি অর্হত্ব লাভ করে গেছেন, যাঁর করণীয় নেই আবার কৃতকার্যের বৃদ্ধি নেই, সমাধির অপূর্ণতা, প্রজ্ঞার অপুর্ণতা, বিমুক্তির অপূর্ণতা, বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনের অপূর্ণতা—এই পাঁচটি অপূর্ণতা থাকলে উপসম্পদা দান করা যাবে না, শ্রমণের উপাধ্যায় হওয়া যাবে না। পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষু উপসম্পদা দানের অধিকারী—যিনি আপত্তি জানেন, অনাপত্তি জানেন, লঘু আপত্তি জানেন, গুরুতর আপত্তি জানেন এবং সঙ্ঘে যাঁর বয়স দশ অথবা

তার বেশি তিনি উপসম্পদা দানের যোগ্য ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হন।[৩০] উক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে উপাধ্যায় এবং আচার্যের ভূমিকা ছিল সহবিহারীকে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে রেখে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা প্রদান করা। এক্ষেত্রে আচার্যদের নৈতিক এবং মানসিক দুই ধরনের শিক্ষাই প্রদান করতে হত। তবে শিক্ষাপদ দানের আদর্শ, নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি সবই ছিল বুদ্ধদেব কথিত। অর্থাৎ আচার্য এবং উপাধ্যায়েরা শাস্ত্রমূলক শিক্ষাই দিতেন সহবিহারীদের। শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা সংযোজনের উপায় থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মে দেখা যাচ্ছে না। ভিক্ষুরা কী বিষয়ে ধ্যান করবেন এবং ধ্যানের পদ্ধতি কী হবে এ বিষয়ে আমরা থেরবাদীর আদর্শ বুঝতে পারছি *সূত্র পিটক*-এর অন্তর্গত *সংযুক্ত নিকায়*-এর 'সমাধি সূত্র' থেকে। এই সূত্র-এ বলা হল ধ্যানে সমাহিত হয়ে ভিক্ষুগণ যথার্থকে জানতে পারেন। এই যথার্থ জ্ঞান হল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই পাঁচ স্কন্ধের প্রকৃতি এবং তাদের অন্তগমন। এই পাঁচ স্কন্ধ থেকে কীভাবে দ্বাদশ শৃঙ্খলের জন্ম তাও ধ্যানের মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব।[৩১] বর্তমান সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে শিষ্যদের কাছে পঞ্চস্কন্ধ অথবা দ্বাদশ শৃঙ্খল কেবল তত্ত্বালোচনার বিষয়বস্তু নয়, তা ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধি করার বিষয়ও। আচার্য বা উপাধ্যায় থেকে শুরু করে যে কোনও ভিক্ষুর অলৌকিক শক্তি অথবা ঋদ্ধি শক্তি প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন বুদ্ধদেব। তবে সূত্র পিটক-এর অন্তর্গত 'খুদ্দক-নিকায়'-এর *সুত্তনিপাত* গ্রন্থের 'রতন সূত্র'-এ দেখা যাচ্ছে বৈশালী নগরের দুর্ভিক্ষ, প্রেত ও মহামারী ত্রিবিধ বিপদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য থের আনন্দ 'রতন-সূত্র' পাঠ করেন এবং যাবতীয় অসুবিধার সমাপ্তি ঘটে।[৩২] অতএব তত্ত্বগতভাবে ঋদ্ধি শক্তির প্রদর্শন নিষেধ হলেও সাধারণ মানুষের

---

[৩০] স্থবির, প্রজ্ঞানানন্দ (অনু.). *মহাবর্গ.* কলকাতা : যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট. ১৯৩৭. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৪-৯৯

[৩১] চৌধুরী, সুকোমল (অনু.). *সংযুক্ত নিকায়* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী. ২০১৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১০

[৩২] ভিক্ষু, শীলভদ্র (অনু.). *সুত্ত নিপাত.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী. ২০১৫. তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ. পৃ. ২৫

আকাঙ্ক্ষা প্রথম থেকেই অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানের দিকে ছিল, বৌদ্ধ ধর্মকে তা কখনও কখনও পূর্ণও করতে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের সূচনাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি উপাধ্যায় অথবা আচার্যের ভূমিকা ছিল মূলত সহবিহারীকে শীল ও চর্যার শিক্ষা প্রদান করা এবং তাকে ধ্যানের বিষয়টুকু বলে দিয়ে সাহায্য করা। অবশ্যই উপাধ্যায় বা আচার্যগণ শিষ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই বিষয় বলতেন, কিন্তু এর বাইরে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে গুরুর বিশেষ কোনো ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শে গুরুদের বেদানুগ শাস্ত্র ব্যাখ্যার যে অধিকার ছিল তাও থেরবাদে নেই কারণ এক্ষেত্রে বুদ্ধকথিত এবং *ত্রিপিটক*-এ সংকলিত শিক্ষাপদের বাইরে যাওয়ায়র কোনো সুযোগ নেই। ধম্মপদ-এ ভিক্ষুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যিনি বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বুদ্ধশাসনের মাধ্যমে যাঁর সংস্কার সমূহের ক্ষয় হয়েছে এবং যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন তিনিই ভিক্ষু।[৩৩] অতএব থেরবাদে গুরুর ভূমিকা পথ নির্দেশকের, বুদ্ধদেব কথিত পথের নির্দেশ করাই তাঁর মূল কাজ। এক্ষেত্রে খেয়াল করার মতো, মহাবর্গ-এ বলা হয়েছে যে ভিক্ষু নিজে অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি উপসম্পদা দান করতে পারবেন না। এর প্রথম কারণ অর্হত্ব লাভ করার পর তাঁর মনে বৃদ্ধি এবং লয় নষ্ট হয়েছে, দ্বিতীয়ত অর্হত্ব লাভের পর ধর্মোপদেশ দান একমাত্র সম্যক সম্বুদ্ধরাই করতে পারেন। একমাত্র গৌতম-ই সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, বাকিরা কেউ নন। ধ্যানের মাধ্যমে ভিক্ষু নিজেই অর্হত্ব লাভ করবেন। এক্ষেত্রে গুরুর কিছু করণীয় নেই। তবে ধ্যানের ক্ষেত্রে কোন কোন স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেই স্তরের কী জাতীয় বৈশিষ্ট্য এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে *অভিধর্ম্ম পিটক*-এ। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি-তে অভিধর্ম পিটক সংকলিত হয়নি। অনেক পরে অভিধর্ম সংকলিত হয় এবং থেরবাদীরা তা গ্রহণ করেন কারণ বিনয় এবং সূত্র পিটকে যে সকল নিয়মের কথা আছে অভিধর্ম-এ আমরা তার দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাচ্ছি। বৌদ্ধদর্শনে চেতনাই কর্ম হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে। একারণে হত্যার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেউ যদি দড়িকেও সাপ বলে মনে

[৩৩] বসু, চারুচন্দ্র (অনু.). *ধম্মপদ.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী. ২০১৫. তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ. পৃ. ২৫

করে আঘাত করেন তাও অকুশল কর্ম বলেই গৃহীত হবে। অভিধর্ম মতে লোকোত্তর চার মার্গের জ্ঞান থেকেই নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়।[৩৪] আচার্য যে বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন তার সবটাই লোক-জীবনের সঙ্গে যুক্ত। একারণে লোকোত্তর নির্বাণের ক্ষেত্রে আচার্যদের কোনও ভূমিকা থাকছে না। ধ্যানাঙ্গ চৈতসিকে সাধক একাই আত্মদীপের প্রজ্জ্বলন করতে পারেন, অন্য কারও সাহায্যে নয়। নির্বাণের ক্ষেত্রে নিজের মধ্যেই যে পরিবর্তন আসে তার উপলব্ধি নিজেকেই করতে হবে, কোনও বাহ্যলক্ষণের মাধ্যমে একে চেনার উপায় নেই। নির্বাণ লাভের পথে কখনও কখনও ভিক্ষুকে কিছুটা স্বার্থপর বলেও মনে হতে পারে। *অঙ্গুত্তর নিকায়*-এ আমরা তিন প্রকার মানুষের কথা পাই—একদল যারা নিজের বা অন্যের কারও ভালো করে না; দ্বিতীয় দল যারা নিজের ভালো করে না তবে অন্যের ভালো করে; তৃতীয় দল কেবল নিজের ভালো করে। বৌদ্ধরা এই তৃতীয় দলকেই সমর্থন করছেন, কারণ নির্বাণের ক্ষেত্রে কেবল নিজের নির্বাণের কথাই ভাবা প্রয়োজন, অন্যের নয়।[৩৫] যদিও নির্বানের স্তরে এই আত্ম এবং অপরের ভেদ কার্যকর হয় না।

এবারে আমরা বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বিকাশের প্রসঙ্গে যাব। মনে রাখতে হবে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের মতো থেরবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধধর্মেরও অনেকগুলি শাখা তৈরি হয়েছিল। মূলত উপলব্ধির ফারাক থেকেই থেরবাদে এই শাখাগুলির জন্ম হয়েছিল বলে মনে করা হয়। থেরবাদী বৌদ্ধদের শাখার মধ্যে বারোটি নিকায়ের সৃষ্টি হয়, মহাসাংঘিক তথা মহাযানীদের মধ্যে ছয়টি শাখার জন্ম হয়। এই আঠারোটি ভাগের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পিটক ছিল বলে জানা যাচ্ছে। সূত্র এবং বিনয় পিটকের মধ্যে অনেকটা মিল থাকলেও অভিধর্ম্ম পিটকে এদের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক দেখা যাচ্ছে। অভিধর্ম-এর এই পার্থক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধকথিত শীল-চর্যায় বিশ্বাস থাকলেও শীলের দর্শন বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি। স্থবিরবাদীদের অভিধর্ম গ্রন্থ *কথাবত্থু*-

---

[৩৪] মুৎসুদ্দি, বীরেন্দ্রলাল. *অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ.* চট্টগ্রাম : ইউ.আর. মুৎসুদ্দি এণ্ড সন্স. ১৯৪০. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৮৫

[৩৫] Hoffman, Frank J & Deegalle Mahinda (Ed.). *Pali Buddhism*. New Youk : Routledge. 2016. Special Indian Edition. pp. 115-116

তে অনেকগুলি দর্শনের মত খণ্ডন করা হয়েছে। এই শাখাগুলির মধ্যে ছিল মহাসাংঘিক, গোফুলিক, কাশ্যপীয়, ভদ্রায়নিক, মহীশাসক, বাৎসীপুত্রীয়, সর্বাস্তিবাদ ও সম্মিতীয়।[৩৬] আমরা স্থবিরবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা আর প্রলম্বিত করব না। তবে যাঁরা বুদ্ধ কথিত পথ সরাসরি মেনে চলতে আগ্রহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে এতগুলি শাখার উৎপত্তি আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে। অভিধর্ম পিটক-এ ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল এবং তাকে কেন্দ্র করেই শাখাগুলির উৎপত্তি হচ্ছে। আমরা দেখেছিলাম উপাধ্যায় এবং আচার্যরা সহবিহারীকে বুদ্ধকথিত শীলচর্যার শিক্ষা দিতেন, তাঁদের নিজস্ব মতদানের সুযোগ ছিল না। অভিধর্ম সাহিত্য ভিক্ষুদের নিজস্ব দর্শন প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিচ্ছে। শীল এবং চর্যায় অবিচল থাকার অন্যতম কারণ ছিল বৌদ্ধধর্ম মূলত বিনয় নির্ভর, তাই বিনয় নিয়মে হস্তক্ষেপের আগে অনেকটা দার্শনিক দ্বিমতের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং অভিধর্ম-এর পার্থক্য আসলে পৃথক পৃথক তত্ত্বদ্রষ্টার তত্ত্বদৃষ্টির পার্থক্য। এই প্রসঙ্গে আমরা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের সিংহলনিবাসী বিভজ্জবাদী শাখার ভিক্ষু বুদ্ধঘোষের কথা বলা দরকার। বিভজ্জবাদ স্থবিরবাদীদের একটি শাখা। বুদ্ধদেব নিজেকে একাধিকবার বিভজ্জবাদী উল্লেখ করেছিলেন। খ্রি. পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা খ্রি. ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সিংহলে রচিত *মহাবংশ* নামক গ্রন্থেও বুদ্ধদেবকে বিভজ্জবাদী বলা হয়েছে।[৩৭] বুদ্ধঘোষের কথা বলছি একারণেই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের টীকাকার হিসাবে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধঘোষের কথা ব্যাখ্যাই স্থবিরবাদের অন্যতম সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বলে গৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে অনেক গবেষক মতামত প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধ নিকায় সাহিত্যে নির্বাণ, ব্রহ্ম এবং আত্মকেন্দ্রিক ধারণার মধ্যে অনেকটাই সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন অধ্যাপক কমলেশ্বর ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত তিনি দেখিয়েছেন বুদ্ধঘোষ কীভাবে তাঁর টীকার মধ্যে দিয়ে উপনিষদ এবং বৌদ্ধভাবনার মধ্যে সরাসরি পার্থক্য তৈরি করছেন। কারণ সূত্র সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম 'আত্ম' এবং 'ব্রহ্ম'-এর ধারাকে স্বীকার করছেন। বারংবার

---

৩৬ সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *বৌদ্ধদর্শন.* কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৬. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ৫৭

৩৭ বড়ুয়া, শুভ্রা. *মহাবংস.* কলকাতা : গোবিন্দপ্রসাদ বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত. ২০০৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪৫

‘ধর্ম’ শব্দটিকে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে।[৩৮] *দীঘ নিকায়*-এর ব্রহ্মজাল সূত্রের অপর নাম ধর্মজাল সূত্র। ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি বৌদ্ধ ধর্মে উপনিষদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এমন প্রমাণ অনেক পাওয়া যাচ্ছে। এখন কথা হল স্থবিরবাদীর ক্রমবিবর্তনের মধ্যে উপনিষদের ভাবনার থেকে ক্রমশ দূরত্ব বৃদ্ধির ইতিহাস স্পষ্ট হয়। কেবল বুদ্ধঘোষ নয়, এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চয় আরও টীকাকারদের অবদান ছিল। সুতরাং থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে গুরুর ভূমিকার দুটি দিক আমরা স্বীকার করছি—প্রথমত শীল-চর্যার নির্দেশক, দ্বিতীয়ত, অভিধর্ম ব্যাখ্যাকার।

৩.২ বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন এবং গুরু প্রসঙ্গ

বর্তমান উপঅধ্যায়ের প্রথম সমস্যা হল অতিব্যাপ্তি। এই অতিব্যাপ্তি সময়কাল এবং ভৌগোলিক সীমা দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল মূলত উত্তর এবং কিয়দংশ পূর্ব ভারত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়টি ভৌগোলিক সীমারেখার দিক থেকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে এমনকী ভারতবর্ষের বাইরের অনেকগুলি দেশের সীমানাকে অতিক্রম করেছে। বৌদ্ধধর্মের বিকাশের সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির অনিবার্য সম্পর্ক বিষয়েও আমরা বর্তমানে আলোচনা করতে পারছি না। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের সূত্রে মূলত মহাযানী বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করব। যদিও মহাযানী বৌদ্ধদের সাহিত্য অত্যন্ত বিস্তৃত, দার্শনিক চিন্তাভাবনার প্রসারও প্রভূত, এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েকটি মহাযানী ধারণার আলোচনা করতে হবে। কারণ মহাযানী বৌদ্ধধর্মেরই একটি পরিবর্ধিত রূপ বঙ্গদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। বর্তমান আলোচনার সময় আমরা সব সময়ে মনে রাখতে চাইছি বৌদ্ধভাবনার বিকাশের পাশাপাশি সে সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং অন্যান্য শ্রামণ্য ধর্মের বিকাশও ক্রিয়াশীল ছিল, সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং ধর্মদর্শনের দিক থেকে এরা প্রতিনিয়ত

[৩৮] Bhattacharya, Kamaleswar. *The Ātman – Brahman in Ancient Buddhism*. Delhi :` MLBD. 2017. 1st Indian Edition. p. 128

একে অপরকে প্রভাবিত করছিল। এই পারস্পরিক মিথোজীবিতার সম্পর্ক আমাদের আলোচনায় প্রধান স্থান না পেলেও বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল থাকতে চেষ্টা করব। বৌদ্ধধর্মে সঙ্ঘভেদের বিবরণ থেরবাদীদের ভাবনায় এসেছে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি প্রসঙ্গে। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের একশ বছর পর বৈশালীর বজ্জিপুত্তিয় ভিক্ষুগণের প্রচলিত দশবস্তুকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি আয়োজিত হয় রেবত স্থবিরের সভাপতিত্বে। রেবত স্থবির ভিক্ষু সব্বকামকে বজ্জিপুত্তিয়দের প্রচলিত দশবস্তু বৌদ্ধ বিনয় অনুযায়ী অনুমোদন যোগ্য কিনা জিজ্ঞাসা করলে সব্বকাম জানান প্রত্যেকটি নিয়ম বুদ্ধদেব প্রচলিত শীলচর্যার বিরোধী। এই সভায় সাতশ জন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই এই বিষয়ে সম্মতি দান করলে বজ্জিপুত্তিয়রা সঙ্ঘ ত্যাগ করেন। এই থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধ ধর্মে সঙ্ঘভেদের সূচনা হয়।[৩৯] যে সকল ভিক্ষুরা দশবস্তুকে বিনয় বিরোধী বলে মনে করলেন তাঁদের বলা হত স্থবিরবাদী অথবা থেরবাদী। যাঁরা দশবস্তুকে গ্রহণ করলেন তাঁদের বলা হল আচরীয় বা আচার্যবাদী অথবা মহাসাংঘিক। মহাসাংঘিকেরা আচার্যকৃত বিনয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতেন, ফলে এঁদের ধর্মগুরুর ভূমিকা অনেক স্পষ্টরূপে দেখা গেল। সিংহলে রচিত *দ্বীপবংশ*-এ দ্বিতীয় মহাসংগীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে স্থবির যশ, যিনি প্রথম বজ্জিপুত্তিয়দের আচরণের প্রতিবাদ করেন তিনি ছিলেন থের আনন্দের সহবিহারীক এবং তিনি তথাগতকে দেখেছিলেন।[৪০] এরপর *দ্বীপবংশ*-এর পঞ্চম অধ্যায়ে সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত 'অধর্মবাদী' ভিক্ষুদের পুনরায় মহাসংগীতির আয়োজন করে পিটক সংকলনের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে।[৪১] সিংহলে রচিত আরেকটি গ্রন্থ *মহাবংস*-র চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় মহাসংগীতির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। *মহাবংশ*-এ প্রথমে বলা হল পিতৃঘাতক নাগবংশের কথা। এরপর বারো লক্ষ ভিক্ষুর থেকে সাতশ জন ভিক্ষুকে নির্বাচন করে কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় কালুকারামে রেবত স্থবির আটমাস করে সংগীতি পরিচালনা করেন এবং ধর্মসংকলন করতে সমর্থ

---

[৩৯] চৌধুরী, সাধনকমল. *চুল্লবগ্গ.* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ১১৯-১৩৫

[৪০] দাশ, আশা (অনু.). *দ্বীপবংশ.* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১০ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ৩৮-৩৯

[৪১] তদেব, পৃ. ৪২

হন। যে সাতশ জন স্থবির এই সংগীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের দোষক্ষয় হয় এবং সকলেই পরিনির্বাণ লাভ করেন কালের নিয়মে।[৪২] ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে স্থবির প্রজ্ঞাস্বামী পালিভাষায় ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে সিংহলের 'বংশ' সাহিত্যের পরম্পরা অনুযায়ী *শাসন বংশ* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের বর্ণনা অনুসরণে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে অংশগ্রহণকারী থেরদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এঁরা ঋদ্ধিমান হয়েও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন।[৪৩] অতএব সাধারণের পক্ষে মৃত্যু যে কতটা অনিবার্য তা বোঝাই যাচ্ছে। সঙ্ঘভেদ প্রসঙ্গে আমরা 'বংশ' সাহিত্যের কথা উল্লেখ করলাম মূলত দুটি কারণে—প্রথমত, সকলের আখ্যানে সঙ্ঘভেদের কাহিনি সংযোজিত হওয়ার অর্থ হল এই ঘটনাটির গুরুত্ব বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য; দ্বিতীয়ত, 'বংশ' সাহিত্য মুখ্যত স্থবিরবাদীদের সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রত্যেকটি আখ্যানে সে কারণে বজ্জিপুত্তিয় ভিক্ষুদের অধর্মী এবং কূট রাজনীতির অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি একারণে স্থবিরবাদী ভিক্ষুদের কাছে লজ্জার ইতিহাস। সঙ্ঘভেদের ফলে যে আচরীয়বাদী বা মহাসাংঘিকদের সৃষ্টি তাঁদের মধ্যে পুনরায় মতবিরোধ হলে গোকুলিক এবং একব্যবহারিক নামে দুটি শাখার জন্ম হয়। এরপর খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে গোকুলিক শাখার থেকে সম্মিতীয় বা চৈত্যবাদীদের উৎপত্তি। এদের কেন্দ্র ছিল অন্ধ্র সাম্রাজ্যের ধান্যকট্য মহাচৈত্য। এই চৈত্যবাদীদের থেকে খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দীতে অভিধর্মের অন্তর্গত *কথাবত্থু*-র নিকায় ভেদে মহাসাংঘিক, অন্ধক, বৈপুল্য, পূর্বশৈলিক, অপরিশৈলীয়, রাজগিরিক এবং সিদ্ধার্থক এই সাতটি প্রকার দেখা যায়। এদের থেকেই খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান দর্শনের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[৪৪] সুতরাং দর্শন হিসাবে মহাযান প্রতিষ্ঠা পায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির বেশ কিছুটা পরবর্তীকালে। অশোক পরবর্তীকালে খরোষ্ঠী লিপিতে খোদিত অনুশাসনে

---

[৪২] বড়ুয়া, শুভ্রা (অনু.). *মহাবংস.* কলকাতা : গোবিন্দপ্রসাদ বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত. ২০০৪. প্রথম সং. পৃ. ২২

[৪৩] মহাস্থবির, ধর্মাধার. *শাসন বংশ.* কলকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী. ২০০৭. পুনঃপ্রকাশ. পৃ. ১১

[৪৪] সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী.* []. পৃ. ১২১-১৩৪

একই সঙ্গে মহাসাঙ্ঘিক এবং সর্বাস্তিবাদীদের কথা পাওয়া যাচ্ছে। অনুশাসনটি পাওয়া গেছে আফগানিস্তান সংলগ্ন এলাকায়, অনুশাসনের সময়কাল খ্রি. পূ. প্রথম থেকে খ্রি. ২০০ অব্দের মাঝামাঝি। এই অনুশাসনে (Mathura Lion Capital Inscription) দেখা যাচ্ছে সর্বাস্তিবাদীরাই অধিক সম্মানিত। আবার কাবুল অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত একটি অনুশাসন অনুযায়ী (The Waidak Vase Inscription, খ্রি. দ্বিতীয় শতক) মহাসাঙ্ঘিকদের জন্য বিহার নির্মাণ করা হচ্ছে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায়। তবে উত্তর ভারত থেকে প্রাপ্ত খরোষ্ঠী অনুশাসনের ভিত্তিতে মনে করা হয় সর্বাস্তিবাদীরাই সেই সময়ে উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল। মনে রাখতে হবে সর্বাস্তিবাদীরা থেরবাদী শাখার অন্তর্গত। তবে অনুশাসনে অনেক শাখার নাম পাওয়া যাচ্ছে যাদের বর্তমান সময়ে আর চেনার কোনো উপায় নেই। কিন্তু অনেকগুলি অনুশাসন থেকে দেখা যায় একই দাতা একসঙ্গে একাধিক শাখাকে দান করছেন।[৪৫] তবে সঙ্ঘভেদের প্রতিফলন অনুশাসনে পড়ার ফলে এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে এই ভেদ কেবল শাস্ত্রীয় ফারাক ছিল না। এবার আমরা 'হীনযান' এবং 'মহাযান' শব্দদুটির ব্যবহার নিয়ে কিছু কথা বলব। 'মহাযান' এবং 'হীনযান' শব্দদুটির ব্যবহার উত্তর ভারতে রচিত সাহিত্যে প্রায়ই ব্যবহার হতে দেখা যাচ্ছে, যদিও দক্ষিণ ভারতীয় পালি শাস্ত্রে এই শব্দ দুটির ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। আমরা দেখেছি অশোকের সময়কাল অর্থাৎ খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে মহাযান দর্শন ক্রমশ সংহত রূপ পাচ্ছে। অনেকে মনে করেন আচার্য নাগার্জুন ছিলেন মহাযানের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ নাগার্জুনের লেখা *মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্র* এবং *দশভূমি বিভাষা শাস্ত্র*-র দিকে মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় নাগার্জুন অনেকগুলি মহাযানী সূত্র উদ্ধৃত করেছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে নাগার্জুনের পূর্বেই মহাযানী সূত্রগুলি রচিত হয়েছিল। চৈনিক অনুবাদে রক্ষিত বসুবন্ধুর *নিকায় অবলম্বন শাস্ত্র*-এ দেখা যাচ্ছে মহাসাঙ্ঘিকেরা মহাযানী সূত্র তাঁদের আরাধনায় ব্যবহার

[৪৫] Banerjea, J.N. *Schools of Buddhism in Early Indian Inscriptions. The Indian Historical Quarterly* (Vol. XXIV, No. 4). December, 1948. pp. 251-258

করতেন।[৪৬] আসলে মহাযানের উৎপত্তি এবং বিকাশ মহাসাঙ্ঘিকদের মাধ্যমেই হয়েছিল তা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'মহাযান'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'একযান', 'বুদ্ধযান' এবং 'বোধিসত্ত্বযান' শব্দের প্রভূত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দুটি পর্যায় ছিল—প্রথমটি হল মহাযানী সূত্র সাহিত্যের পর্যায়, দ্বিতীয়টি মহাযানী ধর্মদর্শনের পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের সময়কাল দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি থেকে শুরু করে নাগার্জুন অবধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল নাগার্জুন, মৈত্রেয়নাথ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতির শাস্ত্র রচনার পর্ব। এই দুটি পর্বে 'মহাযান' শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে অর্থগত কিছু ফারাক রয়েছে। মহাযানী সূত্র সাহিত্যের পর্যায়ে 'মহাযান' শব্দটি মূলত সত্তা এবং ধারণার বিষয়ক পার্থক্য (Ontological and Phenomenological perception) অর্থে ব্যবহৃত হত। নাগার্জুন এবং বসুবন্ধুদের সময় থেকে 'মহাযান' শব্দটি কেবল আচারের পার্থক্য হিসাবে ব্যবহৃত হত না একটি পৃথক ভাবনা ধারা অর্থে ব্যবহৃত হত। মহাযানের অপর একটি প্রতিশব্দ গুহ্যযান। নাগার্জুন *প্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র*-এ বুদ্ধ প্রবচিত দুই প্রকার শিক্ষাপদের কথা বলছেন—গুহ্য এবং ব্যক্ত। হীনযানীরা ব্যক্ত শিক্ষাপদ নিয়ে আলোচনা করেন এবং মহাযানীরা আলোচনা করেন গুহ্য শিক্ষাপদ নিয়ে যা কেবল তথাগত স্থানীয়দের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। দেখা যাবে ব্যক্ত শিক্ষাপদের জন্য ভিক্ষুরা গৌতম বুদ্ধের উপাসনা করেন এবং গুহ্য শিক্ষাপদের জন্য আরাধনা করেন বৈরচন বুদ্ধের, যিনি বুদ্ধের ধর্মকায়।[৪৭] মহাযান-এর অপর একটি প্রতিশব্দ হল 'সহজযান'। এই 'সহজযান' শব্দটি নাগার্জুন ব্যবহার করেছেন। 'কঠিনযান' অর্থাৎ যাঁরা অত্যন্ত কঠির ধর্মসাধনার মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করেন, এই কঠিনযানের মধ্যে স্থবিরবাদীদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শকেও নাগার্জুন বুঝিয়েছেন। এদের তুলনায় মহাযানের পথ অনেকটাই সহজ, যেমন স্থলপথের তুলনায় জলপথ অনেক কম কষ্টসাধ্য; *দশভূমি বিভাষণ শাস্ত্র*-য় এই তুলনাই ব্যবহার করেছেন নাগার্জুন। প্রসঙ্গত *প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্র*-র

---

[৪৬] Kimura, Ryukan. *A Historical Study of the Terms Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana Buddhism*. Kolkata : University of Calcutta. 1927. 1st Edition. p. 11

[৪৭] তদেব, পৃ. ১৮

একটি পদের কথা মনে পড়বে যেখানে নাগার্জুন বলছেন অমিতাভ বুদ্ধ-র নাম মাত্র শুনলেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়।[৪৮] বোঝাই যাচ্ছে নাগার্জুনের হাতে মহাযান অনেক তাত্ত্বিক রূপ অর্জন করেছিল যা পূর্বের পর্যায়ে অর্থাৎ মহাযানী সূত্র সাহিত্যের পর্বে সম্ভব ছিল না। আমরা এবারে মহাযানী দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাইছি।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হীনযানের সঙ্গে মহাযানের পার্থক্য সাধ্য সাধনের দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। হীনযানীরা অর্হত্ব অর্জন করতে আগ্রহী, এঁরা সাধনার মাধ্যমে পুদ্‌গলনৈরাত্মমায়া অনুভব করতে আগ্রহী, পুদ্‌গল বলতে যে কোনো প্রাণযুক্ত সত্তাকে বোঝানো হয়। মহাযানীরা পুদ্‌গল মায়ার পাশাপাশি ধর্মনৈরাত্ম্যমায়াকে অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর মায়াকেও অনুভব করতে আগ্রহী। হীনযানীদের সাহিত্য মূলত পালিভাষায় রচিত হয়েচিল, মহাযানীদের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত। হীনযানীরা নির্বাণপদ অর্জনে আগ্রহী, মহাযানীদের আগ্রহ প্রজ্ঞাপারমিতা সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব অর্জনের। হীনযানীদের শ্রাবক বলা হয়, মহাযানিদের বলা হয় বোধিসত্ত্ব। ‘বোধিপ্রণিবি চিত্ত’ এবং ‘বোধি প্রস্থান চিত্ত’ অর্জন করাই মহাযানীদের লক্ষ্য, এঁরা পরমার্থসত্য অর্জন করতে আগ্রহী, ষড়পারমিতা এবং দশভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পরমার্থসত্য লাভ করা সম্ভব হয়। হীনযানীরা মনে করেন কল্পে একজন করে বুদ্ধের জন্ম হয়। মহাযানীরা কিন্তু বিশ্বাস করেন সকলেই তথাগত গর্ভ অর্থাৎ বুদ্ধত্বের সম্ভাবনা সকলের মধ্যেই রয়েছে। একারণে মহাযানে সাধারণ ভক্তদেরও বোধিসত্ত্ব বলে মনে করা হয়েছে।[৪৯] মহাযানী বোধিসত্ত্ব ধারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এরা অর্হত্ব লাভ করে ব্যক্তিগত মুক্তির কথা ভাবতে আগ্রহী নয়, বরং সর্বজীবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি মহাযানীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধদেব এঁদের কাছে আরাধ্য দেবতার স্থান অর্জন করেছেন। হীনযানীদের কাছে বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, সদ্ধর্মের প্রবক্তা।

---

[৪৮] তদেব, পৃ. ১৮

[৪৯] Dutt, Nalinaksha. *Mahayana Buddhism*. Calcutta : firma KLM Pvt. Ltd. 1976. Corrected Reprint. pp. 81-86

মহাযানীদের কাছে বুদ্ধদেব অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতা। মহাসাংঘিকদের বিনয় রূপে পরিচিত *মহাবস্তু অবদান*-এ আমরা 'অবলোকিত সূত্র'-এ বুদ্ধপূজার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাচ্ছি। বুদ্ধপূজার বর্ণনায় বুদ্ধমূর্তিতে বস্ত্র এবং ফুল নিবেদন করা, যন্ত্রবাদ্য পরিবেশন, নৈবেদ্য নিবেদন করার কথা পাচ্ছি।[৫০] ক্ষেমেন্দ্র রচিত *বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা*-য় আমরা বুদ্ধদেবের ঐশীশক্তি এবং দেবত্বের অনেক প্রমাণ পাচ্ছি। এই গ্রন্থের চতুর্থ পল্লবে 'মান্ধাত্রাবদান'-এ দেখা যাচ্ছে রাজা মান্ধাতার ভগবান বুদ্ধকে দান করার পুণ্যফলে স্বর্গসুখ লাভ করলেন এবং দানে অন্যমনস্কতার জন্য তাঁর স্বর্গ থেকে পতন হল।[৫১] অতএব বুদ্ধদেবের আশীর্বাদের মহত্ব এবং অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করাই ছিল ক্ষেমেন্দ্রের লক্ষ্য। ক্ষেমেন্দ্র খ্রিস্টীয় দশম শতকে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। বোঝা যাচ্ছে বোধিসত্ত্বের করুণা এবং অতিলৌকিক ক্ষমতাই বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান ধারা রূপে দীর্ঘকাল টিকে ছিল।

মহাযানী সাহিত্য অত্যন্ত বিস্তৃত। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাত্ত্বিক গ্রন্থ, সূত্র সাহিত্য ছাড়াও মহাযানীদের বেশ কিছু সাহিত্য রচনার পরম্পরা ছিল দীর্ঘ সময় ধরে। মহাযানীদের ব্যবহৃত সংস্কৃতকে বৌদ্ধ সংস্কৃত অথবা মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃত বলা হয়েছে (Hybrid Buddhist Sanskrit)। তবে সংস্কৃতের বিশেষণ হিসেবে সংকর বা মিশ্র (Hybrid) বিশেষণটি ব্যবহারের অনেকেই বিরোধী। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম কৃতিত্ব বুদ্ধদেবকে নিয়ে চরিত সাহিত্য রচনা। বুদ্ধদেব কেন্দ্রিক চরিতসাহিত্য পালিতে রচিত হয়নি। প্রাচীনতম বুদ্ধদেব কেন্দ্রিক চরিত সাহিত্যের উদাহরণ *মহাবস্তু অবদান*। *মহাবস্তু অবদান*-এর সময়কাল খ্রি. চতুর্থ শতক হলেও এর বেশ কিছু অংশ

---

[৫০] Basak, Radhagobinda (Ed.). *Mahavastu Avadāna*. Calcutta : Sanskrit College. 1963. 1st Edition. p. 43 (Introduction).

[৫১] দাশ, শরৎচন্দ্র (অনু). *বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা.* কলিকাতা : লিপিকা. ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ ২৯-৩৬

সম্ভবত খ্রি.পূ. ২য় অথবা ৩য় শতকেই রচিত হয়েছিল।[৫২] বুদ্ধদেবের জীবন কেন্দ্রিক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অশ্বঘোষ রচিত *বুদ্ধচরিত*। এছাড়াও অশ্বঘোষের তিনটি রচনার কথা পাওয়া যাচ্ছে—'সৌন্দরানন্দ কাব্য', শারিপুত্র প্রকরণ', 'রাষ্ট্রপাল নাতক'। অশ্বঘোষের রচনায় সংস্কৃতের পাশাপাশি অর্ধ-মাগধী, প্রাচীন মাগধী এবং প্রাচীন শৌরসেনী প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অশ্বঘোষের সময়কাল খ্রি. দ্বিতীয় শতক নাগাদ কারণ অশ্বঘোষের জীবন নিয়ে রচিত চরিত গ্রন্থ *কুমারজীব* চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন খ্রিস্টীয় ৪০৯-এর মাঝামাঝি সময়ে।[৫৩] অশ্বঘোষ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করেছেন দেবতা হিসাবে, অশ্বঘোষের রচনায় বুদ্ধভক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।[৫৪] অশ্বঘোষ মহাযানী বৌদ্ধ পরম্পরায় একজন অত্যন্ত সম্মানিত ভিক্ষুর স্থান করে আছেন। অশ্বঘোষ নিজে সম্ভবত হীনযানী বৌদ্ধ শাখার ভিক্ষু ছিলেন, তবে তাঁর রচনায় বুদ্ধকেন্দ্রিক ভক্তির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় মহাযানী বৌদ্ধধর্মের সূচনা সম্ভবত এই শাখাগুলি থেকেই হয়েছিল।[৫৫] মহাযান এবং হীনযান উভয় শাখাতেই *বুদ্ধচরিত*-কার অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন। এরপরেই বলা দরকার *ললিতবিস্তর*-এর কথা। *ললিতবিস্তর* মহাযান বৌদ্ধদের 'বৈপূল্যসূত্র' বলে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও এই গ্রন্থ 'মহানিদান' বা প্রাচীন গাথা রূপেও পরিচিত। গ্রন্থে বুদ্ধদেব দেবতা রূপেই চিত্রিত হয়েছেন, পাশাপাশি অজস্র অলৌকিক ঘটনারও বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে আমরা দশম অধ্যায় লিপিশালা সন্দর্শন পরিবর্ত্ত-এর কথা বলতে পারি। প্রাচীন পালি শাস্ত্রের আখ্যানে এই অংশটি নেই। এই অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের শিক্ষাগ্রহণ এবং চৌষট্টি প্রকার লিপি জ্ঞানে গুরু

---

[৫২] Bhattacharji, Sukumari. *Buddhist Hybrid Sanskrit Literature*. Kolkata : The Asiatic Society. 2011. Reprint. p. 02

[৫৩] Bhattacharya, Biswanath. *Asvaghosa : A Critical Study*. Santiniketan : Visva-Bharati Research Publication. 1976. 1st Edition. p. 05

[৫৪] তদেব, পৃ. ১২-১৩

[৫৫] Chaudhuri, Roma. *Asvaghosa*. Kolkata : Sahitya Akademi. 2017. Reprint. p. 11

বিশ্বামিত্রকে অভিভূত করার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে।[৫৬] চরিত সাহিত্য বাদ দিলে মহাযানী সূত্র সাহিত্যের কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। মনে করা হয় কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত বৌদ্ধ মহাধর্মসংগীতির আয়োজন হয় এবং এখানে মহাযানী সূত্র গ্রন্থে *হাবিভাষা শাস্ত্র* সংকলিত হয়। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে (তিব্বতি গণনা অনুযায়ী) আনন্দগর্ভ তথা লামা তারানাথের বর্ণনায় তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির কথা পাচ্ছি। অনেকের মতে এই সংগীতি কাশ্মীরে আবার কারও মতানুযায়ী জলন্ধর প্রদেশে আয়োজিত হয়।[৫৭] এই সূত্র সাহিত্যের মধ্যে আমরা বর্তমানে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র এবং সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র'গুলির রচনা শুরু হয় খ্রি.পূ. প্রথম শতক নাগাদ। চীনা ভাষায় প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র-র প্রথম অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে খ্রিস্টীয় ২৮৬-তে। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের উপর টীকা রচনার ধারা বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় অবধি প্রচলিত ছিল। তারানাথের বিবরণ অনুযায়ী আচার্য অসঙ্গের প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র অধ্যয়নের কথা জানা যায়। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র এবং এই সূত্রের উপর রচিত কারিকা এবং টীকা সংস্কৃতের পাশাপাশি চীনা এবং তিব্বতী ভাষাতেও হয়েছিল। পাশাপাশি আমরা পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার কথা পাচ্ছি যার সংকলক ছিলেন সিংহভদ্র। সিংহভদ্রের সময়কাল খ্রি. ৭৮৩ থেকে খ্রি. ৪১৫-র মাঝামাঝি। তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায় সিংহভদ্র শান্তরক্ষিতের কাছে মহাযানী শাস্ত্র এবং পণ্ডিত বৈরোচন ভদ্রের কাছে প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। সিংহভদ্র অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-র উপরেও একটি টীকা রচনা করেছিলেন। সিংহভদ্র সংকলিত *পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা*-য় দেখা যাচ্ছে বোধিসত্ত্ব কীভাবে ক্রমিক পর্যায়ে ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বলা হয়েছে বোধিসত্ত্ব যখন বুদ্ধত্ব অর্জনের চেষ্টা করছেন তখন তাঁকে প্রণিধিচিত্ত এবং প্রস্থানচিত্ত নামক দুটি চিত্তপদ অতিক্রম

---

[৫৬] গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, জয়দেব. *ললিত বিস্তর.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৯৯৯. প্রথম সংস্করণ. []

[৫৭] Lama. Chimpa & Alaka Chattopadhayaya (Trans.). *Taranath's History of Buddhism in India.* Calcutta : K.P. Bagchi & Company. 1980. Reprint. pp. 92-93

করতে হয়েছিল। প্রস্থানচিত্তে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব অর্জনের জন্য আবশ্যক শিক্ষাগুলি অর্জন করলেন। এর মধ্যে তাঁকে হীনযানীদের জন্য প্রযোজ্য শিক্ষাপদের পাশাপাশি পারমিতা, শূন্যতা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হল।[৫৮] অতএব মহাযানীদের শিক্ষাপদে হীনযানীদের ব্যবহৃত শীল, চর্যা গৃহীত হয়েছিল। মূল ফারাকের দিকটা ছিল জ্ঞানতত্ত্বের। 'ত্রিখণ্ড পুণ্ডরীক সূত্র'-এর মধ্যে অমিতার্থ সূত্র, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র এবং বুদ্ধভাষিত সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্বের তপস্যা বিধি সূত্র—এই তিনটি গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র-র প্রথম পর্যায়ের সূত্রগুলি খ্রি. ৫০-১৫০ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র অনুবাদ করেন কুমারজীব, ৪০৬ খ্রিস্টাব্দে, চীনা ভাষায়। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এই সূত্র গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধ বুলছেন বোধি অর্জনের পরে তিনি শ্রাবকযানের জন্য চারটি আর্যসত্যের, মধ্যকালে স্থানে স্থানে প্রত্যেক বুদ্ধযান প্রত্যাশীদের জন্য নিগূঢ় অর্থ সম্পন্ন বারোটি হেতু-প্রত্যয়ের এবং শেষে তিনি মহাযানের বারোটি ভাগে বিভক্ত ধর্ম, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র এবং গণ্ডব্যূহ সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন।[৫৯] সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র-র পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে বলা হয়েছে কেউ যদি কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে বা আহত হওয়ার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে অবলোকিতশ্বরের নাম স্মরণ করেন তবে তিনি রক্ষা পাবেন। আবারও বলা হয়েছে শ্রদ্ধা ভরে অবলোকিতশ্বরের পূজা করেন তবে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সন্তান অর্জন করতে পারবেন।[৬০] 'বুদ্ধভাষিত সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্বের তপস্যা-বিধি সূত্র'-এ দেখা যাচ্ছে সমন্তভদ্রের উদ্দেশ্যে তপস্যা করতে করতে বুদ্ধদেবের জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করা সম্ভব।[৬১] সূত্র সাহিত্যের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহাযানে ভক্তিমার্গ গৃহীত হয়েছিল এবং বুদ্ধ তথা

---

[৫৮] Dutt, Nalinaksha. *The Panchavimsatisahasrika Prajnaparamita*. London : Luzac & Co. 1934. 1st Edition. p. xx

[৫৯] চৌধুরী, সরোজকুমার. *ত্রিখণ্ড পুণ্ডরীক সূত্র.* কলকাতা : আনন্দ. ২০১৪. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ১৩

[৬০] তদেব, পৃ. ২৩৮-২৩৯

[৬১] তদেব, পৃ. ২৬১-২৬৩

অবলোকিতেশ্বরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার সূচনা হয়েছিল মহাযান পন্থায়। এই প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে বৌদ্ধধর্মে গুরু ধারণার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মহাযানে বুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বরেরা ছিলেন আরাধ্য। হীনযানে উপাধ্যায় এবং আচার্যরা নিজে তত্ত্ব ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছু করতে পারতেন না, প্রকৃতপক্ষে হীনযানে গৌতম বুদ্ধ-ই সকলের ধর্ম শিক্ষক। হীনযানে ত্রিপিটক-এর মধ্যে বিনয় এবং অভিধর্মে সাধ্য এবং সাধন সম্পর্কে স্পষ্ট উত্তর ছিল, অতএব হীনযান অনেক বেশি শাস্ত্রমূলক সাধন ধারা বলে বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে মহাযানে বুদ্ধদেব আরাধ্য, যিনি আরাধ্য তিনিই গুরু হতে পারেন না। তাই মহাযানে সাধনপথ ব্যাখ্যার জন্য গুরুর প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকৃত হল। আমরা আগেই দেখেছি মহাযানী বৌদ্ধধর্মে কিছু কিছু নতুন ধারণার সংযোজন হলেও হীনযানী ধারণাগুলিকে বাদ দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে মহাযানের কিছু প্রভাব হীনযান-ও স্বীকার করেছিল। ইয়াং-চুয়াংয়ের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বিশেষ বিশেষ দিনে আভিধার্মিকেরা সারিপুত্রের, বিনয়ধর ভিক্ষুরা উপালির, সূত্রধর ভিক্ষুগণ পূর্ণমৈত্রায়নীপুত্রের, ভিক্ষুণীগণ আনন্দের এবং মহাযানীগণ মঞ্জুশ্রী এবং অপরাপর বোধিসত্ত্বগণের উপাসনা করেন।[৬২] ইয়াং চুয়াং খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর বর্ণনায় আমরা বুদ্ধমূর্তির উপাসনা এবং বুদ্ধমূর্তিকেন্দ্রিক নানা প্রকার কিংবদন্তী দেখতে পাই।[৬৩] ইৎ-সিংয়ের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেবের মূর্তি এবং প্রবীণ ভিক্ষুদের সামনে নবীন ভিক্ষুদের জুতা পায়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। ইৎ সিং-এর বর্ণনায় বিহারবাসী ভিক্ষুদের দিন এবং রাত মিলিয়ে মোট ছয় বার উপাসনা করার এবং তেরোটি ধুতাঙ্গ অনুসরণ করে চলার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইৎ সিং-এর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে সে সময়ে ভিক্ষুগণ রীতিমত বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। এছাড়া উপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা অর্জনের বর্ণনাও পাচ্ছি যা মোটের ওপর হীনযানীদের সঙ্গে একই। তবে

---

[৬২] Dutt, Nalinaksha. *Buddhist Sects in India*. Clacutta : Firma KLM. 1976. 1st Edition. p. 47

[৬৩] সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ (অনু.). *বৌদ্ধযুগের ভারত হিউএন সাঙ.* কলকাতা : পত্রলেখা. ২০১৭. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৩৯

মহাযানীদের ক্ষেত্রে উপাধ্যায়রা পাতিমোক্ষ-সূত্রের পাশাপাশি সূত্র এবং শাস্ত্রের শিক্ষাও দান করতেন। তবে সাধারণভাবে শিক্ষাদানের জন্য বিনয়, সূত্র অথবা অভিধর্ম পিটকের কোনো একটি অংশই উপাধ্যায়েরা নির্বাচন করতেন।[৬৪] মহাযানীদের শাস্ত্ররচনার পাশাপাশি হীনযানী অর্থাৎ স্থবিরবাদী শাখারও বেশ কিছু সাহিত্য এই পর্যায়ে রচিত হয়েছিল। মনে করা হয় কণিষ্কের সময় আয়োজিত তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতিতেই স্থবিরবাদের অন্তর্গত সর্বাস্তিবাদী শাখার সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সর্বাস্তিবাদীরাও তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছিলেন মিশ্র সংস্কৃতে। এঁরা মূল ত্রিপিটকের দীর্ঘ ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যরচনা করেছিলেন। সর্বাস্তিবাদীদের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দিব্যাবদান', 'অবদানশতক', 'অভিধর্মকোশব্যাখ্যা'।[৬৫] সর্বাস্তিবাদীরা তাঁদের বিনয়, অভিধর্ম এবং সূত্র সাহিত্য সংকলন করেন। সর্বাস্তিবাদীদের সংগৃহীত বিনয়ের সঙ্গে পালি বিনয়ের বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। যেমন পালি 'সংঘাবশেষ' অংশে পালি বিনয়ে আমরা ১৭টি নিয়মের কথা পাচ্ছি, সর্বাস্তিবাদী বিনয়ের তিব্বতী অনুবাদে পাচ্ছি ২০টি নিয়মের কথা।[৬৬] সর্বাস্তিবাদীদের কথা একারণেই বলা দরকার, কারণ সাধারণ ভাবে মনে করা হয় স্থবিরবাদীরা কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি তথা অর্হত্বলাভের কথা ভাবেন। কিন্তু সর্বাস্তিবাদীদের সাহিত্য 'অবদানশতক'-এর মধ্যে অন্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে, এই পদ্ধতির নাম ছিল 'ছন্দকভিক্ষণ' অর্থাৎ অন্যের মুক্তির সঙ্গে নিজের মুক্তির কামনায় সঙ্ঘে দান করা।[৬৭] সুতরাং মহাযান এবং হীনযান শাখার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল যা তাদের সাহিত্য, সাধ্য-সাধন এবং দার্শনিক তত্ত্ববিশ্বকেও প্রভাবিত করত।

---

[৬৪] Hazra, Kanailal. *Buddhism in India as Described by the Chinese Pilgrims AD 399-689*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2011. Second Reprint. p. 48

[৬৫] Banerjee, Anukul Chandra. *Sarvastivada Literature*. Calcutta : Published by D. Banerjee. 1957. 1st Edition. p. 17

[৬৬] তদেব, পৃ. ৮৬-৮৭

[৬৭] Sastri, K.A. Nilakantha. *Gleanings on Social Life From the Avadanas*. Calcutta : The Indian Research Institute. 1945. 1st Ed. p.44

এবার আমরা মহাযানী বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক প্রস্থানগুলি থেকে গুরুর অবস্থান প্রসঙ্গে বোঝার চেষ্টা করব। নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধুর হাত ধরে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক বিস্তার ঘটেছিল। মাধ্যমিক শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ এবং যোগাচার—এই তিনটি শাখায় মহাযানী বৌদ্ধদর্শন বিস্তার লাভ করে। দার্শনিক নাগার্জুনের শূন্যবাদ অত্যন্ত জটিল এবং সুবিস্তৃত। শূন্যতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নাগার্জুনকে পূর্বপক্ষে নানা বক্তব্যকে খণ্ডন করতে হয়েছে। এছাড়াও জগৎকে বোঝার জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টির সমান্তরালে পারমার্থিক দৃষ্টির কথাও নাগার্জুন তাঁর তত্ত্বে বলেছেন। নাগার্জুনের নামে অজস্র গুরুগ্রন্থ প্রচলিত, ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন নাগার্জুন নামে সম্ভবত একাধিক গ্রন্থকার নানা সময়ে বর্তমান ছিলেন। নাগার্জুনের নামে প্রায় একশ ঊনত্রিশটি গ্রন্থের কথা পাওয়া যাচ্ছে।[৬৮] তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নাগার্জুন বুদ্ধ বচনের সাহায্য গ্রহণ করছেন, তবে তাঁর যুক্তিতে লৌকিক দৃষ্টির উপদেশ এবং পারমার্থিক দৃষ্টির উপদেশ পৃথক। *সর্বশূন্যতাসপ্ততি*-তে নাগার্জুন প্রথমেই বলবেন—"লৌকিক ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ, অস্তিত্বনাস্তি, হীন, সম এবং উত্তম ইত্যাদি সম্পর্কে বুদ্ধদেশনা রয়েছে। কিন্তু তত্ত্বতঃ নয়।"[৬৯] *মহাযানবিংশক*-এ নাগার্জুন বলছেন—"যে ব্যক্তি প্রতীত্যসমূৎপাদ জানিয়া পরমার্থ দর্শন করে, সে আদি, মধ্য ও অন্ত-বিবর্জিত জগৎকে শূন্য বলিয়া জানিতে পারে।"[৭০] সুতরাং নাগার্জুন তাঁর দর্শনে বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাখ্যা করছেন তা পারমার্থিক সৎ-এর ব্যাখ্যার সঙ্গে জাগতিক নৈতিকতার কোনো বিরোধ নেই। নৈতিকতার প্রশ্ন আসছে কারণ নাগার্জুন যেহেতু শূন্যবাদের কথা বলেন তাই মনে হতে পারে তাঁর কাছে জাগতিক ভালো-মন্দের কোনো গুরুত্ব ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে নাগার্জুনের

---

[৬৮] মোহান্ত, দিলীপকুমার. *মধ্যমকদর্শনের রূপরেখা ও নাগার্জুনকৃত সবৃত্তিবিগ্রহব্যাবর্তনী.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০০৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২১-২৬

[৬৯] মোহান্ত, দিলীপকুমার. *নাগার্জুনকৃত সবৃত্তিশূন্যতাসপ্ততি.* কলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৯০

[৭০] শাস্ত্রী, বিধুশেখর (অনু.). *মহাযান বিংশক.* হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা. নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.). পৃ. ২০৩

মতে শূন্যতার অর্থ পারিভাষিক। জগতে যে সকল বস্তু আমরা দেখতে পাই তাদের কারোরই নিজস্ব কোনো স্বভাব নেই, সমস্তটাই কিছু না কিছুর উপর নির্ভরশীল। তাই সাধকের চরম বোধ হবে এই নিঃস্বভাব শূন্যতার বোধকে বুঝতে পারা। এর সঙ্গে সামাজিক নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। নাগার্জুন-এর নৈতিকতা এবং জাগতিক ভাবনার পরিচয় মিলবে 'রত্নাবলী' ও 'সুহৃল্লেখ' নামক দুটি রচনায়। নাগার্জুনের মতে শীলের যথাযথ চর্চার মাধ্যমেই প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমেই নির্বাণ লাভ সম্ভব হবে।[৭১] *মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্র*-য় নাগার্জুন বোধিসত্ত্ব বিষয়ক কিছু কথা বলবেন, যা থেকে আমরা মধ্যমিকদর্শনের সাধ্যবস্তু বিষয়ে অনুমান করতে পারি। বোধিসত্ত্ব দশার অন্যতম উপলব্ধি হল প্রত্যুৎপন্ন সমাধি অর্থাৎ যেখানে সাধক সব সময়ই বুদ্ধের অনুভূতি বুঝতে পারবেন। বোধিসত্ত্বদশার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল অনুৎপাত্তিক-ধর্ম-ক্ষান্তি যা জগতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য যে শূন্যতা তা বোঝার থেকে উৎপন্ন হয়।[৭২] প্রসঙ্গত নাগার্জুনের দর্শন অনুযায়ী আমরা বোধিসত্ত্ব দশার বিভিন্ন স্তরগুলি বুঝে নিতে চাইব। যখন কেউ বুদ্ধত্ব অর্জন করার চেষ্টা করছেন প্রথমে তাঁকে দৃঢ় সংকল্প হতে হবে, বুদ্ধের কথা চিন্তা করতে হবে এবং দান পারমিতার অভ্যাস করতে হবে। পরের স্তরে অভ্যাস করতে হবে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক সংযমের অর্থাৎ শীল পারমিতা। তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে শাস্ত্রে মনোনিবেশ করতে হবে, বুদ্ধ বচন আত্মস্থ করতে হবে। এরপর ত্যাগ করতে হবে যাবতীয় দ্বৈতভাবনাকে। এরপর তাঁকে ভিক্ষুদের কৃত্য ধুতাঙ্গের অভ্যাস করতে হবে। ধুতাঙ্গের অভ্যাস থেকে তিনি অনুৎপাত্তিক-ধর্ম-ক্ষান্তি অর্জন করবেন। পঞ্চম স্তরে ভিক্ষু উপাসক এবং ভিক্ষুণীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন, দ্বেষ, অপ্রয়োজনীয় কথা, ক্রোধ ত্যাগ করবেন। এর পরবর্তী স্তরে ভিক্ষু যাবতীয় গর্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবেন এবং শ্রাবক তথা প্রত্যেক বুদ্ধদের ভাবনা পথ ত্যাগ করবেন। এই

---

[৭১] চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা. *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা.* কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৫. প্রথম সং. পৃ. ১৪১

[৭২] Ramana, K. Venkata. *Nagarjunas Philosophy as Presented in the Maha-Pajnaparamita-Sastra.* Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2016. 8th Reprint. p. 303

ছয়টি স্তর হল প্রাথমিক দশা। সপ্তম স্তরে তিনি যাবতীয় অর্জনের বোধ থেকে মুক্ত হবেন, ত্রিশরণ, আত্মবোধ ত্যাগ করবেন। দ্বিতীয়ত, অনুৎপত্তিক-ধর্ম-ক্ষান্তি তাঁর জ্ঞানকে পূর্ণতা দান করবে। তিনি তখন ধর্মকায় অর্জন করতে সক্ষম হবেন। অষ্টম স্তরে প্রথমত বোধিসত্ত্বরা অন্যের মনের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। জগতে সকলের উন্নতরি জন্য অপরের মনের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই স্তরে তিনি সকলের সীমাবদ্ধতা এবং সংকীর্ণতাকে বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, আরও পরিশীলনের মাধ্যমে বোধিসত্ত্বরা পশু-পাখির ভাষাও বুঝতে সমর্থ হবেন। শেষ পর্যায়ে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভে সমর্থ হবেন। তখন বুদ্ধত্ব লাভের ফলে বোধিসত্ত্বরাও বুদ্ধ বলেই পরিচিত হতে পারেন কিন্তু বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধের মধ্যে ফারাক আছে। এই ফারাক শুক্লপক্ষে চতুর্দশী এবং পূর্ণিমার চাঁদের ফারাকের মতো। আপাতভাবে দুজনেই এক কিন্তু পারমিতার পরিপূর্ণতায় বুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদের মতোই সব থেকে বেশি উজ্জ্বল।[৭৩] বোধিসত্ত্বরাই মধ্যমিক দর্শনে গুরু, যাঁরা শিষ্যের উন্নতিকল্পে শ্রাবক তথা প্রত্যেক বুদ্ধযানের পথে যাননি। আমরা দেখলাম শিষ্যের মনে প্রবেশ করার ক্ষমতা বোধিসত্ত্বদের রয়েছে এবং বোধিসত্ত্বদের হাতেই সাধারণ মানুষের মুক্তি সম্ভব। মহাযানে বুদ্ধ এবং শিষ্যের মাঝে বোধিসত্ত্বদের কল্পনা বিশেষভাবেই আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। মহাযানে বোধিসত্ত্ব হওয়ার পথ ব্যাখ্যা করা হল অর্থাৎ মনে করা হচ্ছে সাধারণের পক্ষে এই পথ অবলম্বন করা সম্ভব। তবে আমরা দেখছি বোধিসত্ত্বদের কেন্দ্র করে লোকোত্তর তত্ত্ব তৈরি হয়েছে, যার প্রমাণ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের কল্পনায় স্পষ্ট। লোকোত্তর কল্পনায় বোধিসত্ত্বগণ আর সাধারণ মানুষ অথবা গুরু নন।

মহাযানের তত্ত্বকাঠামোর পাশপাশি হীনযানেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বৌদ্ধ ন্যায়ের সৃষ্টি এবং বিকাশ ভারতীয় যুক্তিপদ্ধতির উৎকর্ষ প্রমাণ করে। আমাদের আলোচনায় মূলত ধর্ম দর্শনের গুরুত্ব থাকায় আমরা এই আলোচনায় যাচ্ছি না। কেবল বৈভাষিক দর্শনের সূত্রে উত্থাপিত একটি জরুরি দার্শনিক প্রশ্ন বিষয়ে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মতের কথা বলে নিচ্ছি। বৌদ্ধরা প্রত্যক্ষ এবং

---

[৭৩] তদেব, পৃ. ৩০৫-৩১১

অনুমান—এই দুটি প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। যেহেতু বৌদ্ধদর্শনের মূল ভিত্তি বুদ্ধবচন তাই অত্যন্ত সংগতভাবে প্রশ্ন ওঠে বৌদ্ধরা যদি শব্দ প্রমাণ স্বীকার না করেন তাহলে তো দর্শনের মূল ভিত্তি নিয়েই প্রশ্নের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা বৌদ্ধমতে নির্বাণ পদ লাভ করার কথা বলছেন, শাস্ত্র প্রণয়ন করছেন তারই বা অর্থ কোথায়? বৈভাষিকেরা বলবেন—বৌদ্ধরা বৈশেষিক দর্শনের মতো শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন না ঠিকই কিন্তু বৌদ্ধজ্ঞানতত্ত্বে শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত বলেই বিবেচিত হয়। তাঁদের মতে যে সকল শব্দ পরার্থানুমানে পর্যবসিত হয় তাকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করা হবে, অপরাপর বিষয়কে প্রমাণ মনে করা হবে না।[৭৪]

এবারে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদের কথা বলে বর্তমান উপঅধ্যায়টি আমরা শেষ করব। বিজ্ঞানবাদ মূলত জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়। নাগার্জুনের তত্ত্ব ভাবনা থেকেই বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তি। নাগার্জুনের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গ্রাহকের উপরেই গ্রাহ্যের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এবারে প্রশ্ন হল, গ্রাহ্যবস্তুর অভাবে গ্রাহকের অস্তিত্ব কি প্রমাণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানবাদ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়। গ্রাহকের প্রমাণ দিতে গিয়ে বিজ্ঞানবাদ আলয়বিজ্ঞানের কথা বলেছে। লঙ্কাবতার সূত্র-এ বলা হয়েছে জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে আলয়বিজ্ঞানের স্রোত বয়ে আসছে, জন্মান্তর আসলে এই আলয় বিজ্ঞানেরই ফলশ্রুতি। তবে এখানে বিজ্ঞান স্রোত না বলে বিজ্ঞান পরম্পরার কথা বলবেন বিজ্ঞানবাদীরা। কারণ বৌদ্ধদর্শন ক্ষণিকত্বে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানবাদের মতে প্রতিষ্ঠিত হয় যে গ্রাহ্য নেই, গ্রাহক নেই এবং গ্রাহ্য-গ্রাহক সম্বন্ধও নেই।[৭৫] বৌদ্ধ দর্শনের বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা থেকে গুরু প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত তৈরি করতে পারছি। প্রথমত, সাধ্য-সাধনের পার্থক্যের কারণে মহাযানে গৌতম বুদ্ধ ব্যতীত সরাসরি পথ প্রদর্শক রূপে গুরুধারণার বিকাশ হচ্ছে। এক্ষেত্রে সাধন মার্গ গুরুরা সরাসরি নির্দেশ করছেন না, শীল-চর্যাকেই মেনে চলতে হচ্ছে। তবে

[৭৪] ভট্টাচার্য, অনন্তকুমার. *বৈভাষিক দর্শন.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি. ১৯৫৫. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

[৭৫] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.). *বিজ্ঞানবাদ-বটকৃষ্ণ ঘোষ.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৪. নূতন সংস্করণ. পৃ. ১৩-১৪

সাধ্যতত্ত্ব নির্মাণে মহাযানে তত্ত্ব প্রণেতা গুরুরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব প্রণয়ন করছেন এবং মহাযানে দেবতার ধারণা নির্মিত হয়েছে বলে আমরা তত্ত্ববেত্তা গুরুদের উপাসনা করার ধারা দেখতে পাচ্ছি। যে কারণে দেখা যাচ্ছে তিব্বতি থাঙ্কায় নাগার্জুনের ছবি আঁকা হচ্ছে। তৃতীয়ত, মহাযানের সাধ্যের সঙ্গে যেহেতু সকলের মুক্তির কথা যুক্ত তাই এখানে শিষ্য এবং গুরুর সম্পর্ক অনেক বেশি প্রসার পাচ্ছে, সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সীমাই অনেক বেশি উন্মুক্ত হচ্ছে। চতুর্থত, মহাযানে ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সাধন মার্গে স্বীকৃত হয়েছে তাই পালি ত্রিপিটকের সঙ্গে এর গুণগত পার্থক্য তৈরি হয়েছে। পঞ্চমত, বিজ্ঞানবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারছি বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য 'আত্ম' সংক্রান্ত ভাবনার প্রভাব ক্রমে স্বীকৃত হচ্ছে, স্থায়ী আত্মার কথা না হলেও বিজ্ঞান পরম্পরার স্বীকৃতিই এই প্রভাবের প্রমাণ। সুতরাং পূর্বপক্ষীয়দের সঙ্গে তর্ক এবং প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি কেবল তত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অবশ্যম্ভাবীরূপে সাধনাতেও তার প্রভাব আসতে বাধ্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করব।

৩.৩ প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম এবং গুরু ধারণার পুনর্নির্মাণ

ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুরাণ গোত্রীয় রচনাকে 'ইতিহাস' বলে চিনতে চেয়েছে। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে 'ইতিহাস' বলতে পাশ্চাত্য ধারণায় 'তথ্য' এবং 'সত্য'-র দাবীদার 'History'-কে বোঝানো হয়নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত *মহাভারত*-কেও পারিভাষিক ভাবে 'ইতিহাস' বলা হয়। তবে পুরাণ-কেন্দ্রিক ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে আদৌ বর্তমান অর্থে ইতিহাস (History) লেখা সম্ভব কি না তা নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। ধর্মচিন্তার বিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনার প্রবণতা এবং প্রস্তাবের পক্ষেও অনেকে সওয়াল করেছেন।[৭৬] এই বিতর্কে আমরা আপাতত প্রবেশ করব না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যিক পরম্পরায় সপ্তম শতাব্দীর পুর্বে তথাকথিত

---

[৭৬] ভট্টাচার্য, অনন্তকুমার. *হিস্ট্রীর ভাবধারা.* J.N. Banerjee Volume. Calcutta : The Alumni Association. Department of Ancient Indian History and Culture, University of Calcutta. 1960. 1st Edition. pp. 93-96

ঐতিহাসিক বিবরণ রচিত না হলেও নানা লেখাতেই ইতিহাস চেতনার প্রভাব দেখতে পাওয়া সম্ভব। পুরাণ জাতীয় রচনাকে আমরা ইতিহাস চেতনাযুক্ত সাহিত্যিক রচনার নমুনা হিসাবে পড়তে আগ্রহী। খ্রি. পূ. চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে অবধি ভারতবর্ষে ইতিহাস চেতনাযুক্ত সাহিত্যিক রচনার নমুনা হিসাবে পড়তে আগ্রহী। খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে অবধি ভারতবর্ষে ইতিহাস চেতনা যুক্ত ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার সাহিত্যিক নমুনা বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। গুপ্ত সাম্রাজ্যে মহাপুরাণগুলি সংকলিত হচ্ছে যার মধ্যে আমরা পূর্বতন সময়ের কথা পাচ্ছি। ফলত পুরাণগুলি রচনার উর্দ্ধসীমা হিসাবে আমরা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতককে ধরতে পারি।[৭৭] যদিও পুরাণ রচনার দুটি সময়ের কথা বলা হয়। বর্তমানে আমরা যে রূপে পুরাণগুলি পাচ্ছি তার আগে পুরাণগুলির অন্যরকম পাঠ ছিল যার রচনাকাল মনে করা হয় খ্রিস্ট পূর্ব নবম শতক।[৭৮] বর্তমান রূপে পুরাণগুলি আসতে শুরু করে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে। আঠারোটি পুরাণের মধ্যে সময়ানুক্রমের অনুমান করা সমস্যার। কারণ নানা সময়ের উপাদান পুরাণগুলির মধ্যে সংকলিত হয়েছে। যেমন—ব্রহ্মপুরাণের বংশতালিকার উপাদান প্রাচীন হলেও অন্যান্য উপাদানগুলি অর্বাচীন সময়ের আবার মার্কণ্ডেয়পুরাণের বংশতালিকা প্রাচীন হলেও অন্যান্য উপাদানগুলি যথেষ্ট প্রাচীন। আপাতভাবে দেখলে পুরাণগুলির সমায়নুক্রম হল—বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণ—এদের প্রত্যেকটিই রচিত হয়েছিল চতুর্থ শতকের মধ্যে।[৭৯] পুরাণকে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুযায়ী পুরাণগুলিও বেদের মতোই পবিত্র উৎস থেকে সঞ্চারিত। এরপর খেয়াল রাখার মতো সাংখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র এবং গৌতম

---

[৭৭] Thapar, Romila. *Ancient Indian Social History Some Interpretations*. New Delhi : Orient Longman Limited. 1978. 1st Edition. pp. 271-272

[৭৮] Bhargava, P.L. 'The Origin and Development of Puranans and their Relation with Vedic Literature'. Annals of the Bhankar Oriental research Institute. Vol. 58/59, Diamond Jubilee Volume. 1977-1978. pp. 489-498

[৭৯] তদেব, পৃ. ৪৯২

ধর্মসূত্র-এও পুরাণকে 'ইতিহাস' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরাণ তাই ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃত বয়ান। পুরাণে অনেকগুলি ধারনার তাত্ত্বিক বিস্তার দেখতে পাচ্ছি যাদের তাত্ত্বিক কাঠামো বৈদিক সময়ে স্বীকৃত হয়নি। যেমন ধরা যাক, ভক্তি বৈদিক এবং ঔপনেষদিক সাহিত্যে সাধনার মার্গ হিসাবে স্বীকৃত হলেও অনেক পরে পৌরাণিক সাহিত্যে ভক্তি একধরনের মোক্ষ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। সুতরং বলা যায় পুরাণ এবং বাল্মিকী রামায়ণ তথা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মহাভারত বেদের ধারণার সংযোজন রূপে গৃহীত হয়েছে—"ইতিহাস পুরাণাভ্যাস বেদন সমুপবৃচ্ছ্হয়েত।"[৮০] এছাড়াও পুরাণ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তন্ত্রের প্রভাবকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে আত্তীকৃত করে নেওয়ার চেষ্টা। পুরাণের পাশাপাশি মনে রাখতে হবে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই বৈষ্ণব এবং শৈব সংস্কৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব আসা শুরু হয়েছিল। জয়াখ্য সংহিতা-র নবম পটলে তান্ত্রিক স্নানের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে।[৮১] ফলত তন্ত্রের প্রভাব পৌরাণিক সাহিত্যেও অনিবার্যত এসেছে পূজা, হোম, ব্রত, সন্ধ্যা, উৎসর্গ কেন্দ্রিক অধ্যায় রচনার মধ্য দিয়ে।[৮২] এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের সূত্র রচিত স্মৃতি-নিবন্ধ অর্থাৎ 'মনুসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' এবং অন্যান্য সংহিতার মধ্যে অংশত অনেক অনিবার্য প্রভাব এসেছে। তবে দেখা যাচ্ছে বিশ্বরূপাচার্য (খ্রিস্টীয় নবম সতকের লোক) যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির ভাষ্যে পুরাণ থেকে একটিও শ্লোক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। পুরাণকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা থেকে অনুমান করা যায় নিবন্ধ সাহিত্য তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার করছে কি না? এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরবর্তী সময়ে রচিত স্মৃতি-নিবন্ধগুলি তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার করছে, পুরাণের থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করছে। জীমূতবাহন-এর কালবিবেক-এ দুর্গাপূজার বর্ণনায় বোধন, পত্রিকা পূজা, বলিদানের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে জীমূতবাহন তন্ত্রের এই প্রভাবকে

---

[৮০] Rukmani, T.S. *The Epics and the Puranas Supplement the Vedas*. Annals of the Bhandarkar oriental Institute. Vol-82, No. ¼. Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute. 2001. p. 140

[৮১] Hazra, R.C. *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs.* Delhi : MLBD. 1975. 2nd Ed. p. 219

[৮২] তদেব, পৃ. ২২৫

স্বীকার করছেন। এরপরে একাদশ শতকে অপরার্ক-র রচিত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ভাষ্যে পুরাণের প্রভাব বোঝা যাচ্ছে মৎস্যপুরাণের শ্লোক উদ্ধার করার মাধ্যমে।[৮৩] তন্ত্রের পাশাপাশি মহাপুরাণে যোগ এবং যোগাঙ্গের সরাসরি প্রভাব দেখতে পাব। *স্কন্দপুরাণ*-এ যোগীদের করণীয় অষ্টাঙ্গ যোগের ধারণাও স্বীকৃত হয়েছে।[৮৪] নৈতিক দিক থেকে পুরাণ সমকালীন প্রবণতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। অনেকগুলি পুরাণই অহিংসা, ক্ষমা, ক্ষান্তি, শম, দম, দান ইত্যাদির কথা স্বীকার করেছে। পুরাণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য আচারকেন্দ্রিক নীতি এবং বৌদ্ধ জৈন নৈতিক জীবনাদর্শের এক ধরনের পুনর্মিলন হয়েছে।[৮৫] প্রসঙ্গত অতি সংক্ষেপে বলা দরকার ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় প্রধানত পরম্পরাগত ভাবে শ্রৌত এবং স্মার্ত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে স্মার্তরা পুরাণকে স্বীকার করেন। স্মার্তরা তন্ত্রকে স্বীকার করেন এবং তান্ত্রিক দীক্ষাই গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে পঞ্চায়তন পূজা প্রতীক ব্যবহার, পঞ্চায়তন মন্দির নির্মাণ এবং পঞ্চ দেবতার উপাসনার রীতি প্রচলিত ছিল। বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য এবং গণপতির একত্র উপাসনাকে পঞ্চোপাসনা বলা হয়। এই দেবতার মধ্যে একজন প্রধান ইষ্ট থাকেন, বাকিদের রাখা হয় মূল দেবতার দুই পাশে।[৮৬] প্রধান ইষ্ট কে হবেন তা নির্ধারিত হয় গুরুর থেকে প্রাপ্ত বীজের উপর। তন্ত্রের সঙ্গে পুরাণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরাণ যেমন তন্ত্রের একাধিক উপাদান গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন তন্ত্রেও অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—নির্বাণতন্ত্রের নবম পটলে অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ পাচ্ছি।[৮৭]

---

[৮৩] Hazra, R.C. *Influence of Tantra on Smriti-Nibandhas*. Annals of the Bhankar Oriental Research Institute. Vol-15, No. ¾. Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute. 1933-34. p. 227

[৮৪] Joshi, Ritesh Umashankar. 'Exposition of Yoga Tenets in the Puranas — A Critical and comparative Study' (Unpublished Ph.D. Thesis). Under the Supervision of Prof. M.L. Wadekar. M.S. University of Baroda. 2011. p. 79

[৮৫] Venkateswaran, C.S. *The Ethics of the Puranas. The Cultural Heritage of India* (Vol-II). Calcutta : The Ramkrishna Mission Institute of Culture. 2005. Reprint. p. 297

[৮৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ. *পঞ্চোপাসনা.* কলকাতা : ফার্মা কে এল এম. ১৯৬০. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩২৭

[৮৭] Chakravarti, Chintaharan. *Tantras Studies on Their Religion and Culture*. Calcutta : Punthi Pustak. 1972. Reprint. p. 19

লিখিত আকারে প্রাচীনতম তন্ত্রের পুথি পাওয়া যায় গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে, তবে তন্ত্রের অস্তিত্ব এর অনেক আগে থেকেই ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।[৮৮]

উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈদিক সমাজ পরবর্তী মূল স্রোতের বয়ান হিসাবে পুরাণকে গ্রহণ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সর্বোপরি পুরাণে নানা ধরনের মতামতের সমাবেশ থেকে বোঝা যায় পুরাণের মধ্য দিয়ে আমরা কোনো একটি ধর্মের নির্দিষ্ট সময়কেন্দ্রিক ধর্মীয় প্রক্রিয়াকে বুঝতে পারি। এছাড়াও পুরাণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য সমাজের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল পরিসরে প্রচলিত ধর্মাচরণ, ধর্মীয় রীতি-নীতিকে বোঝা যায়, পুরাণ নানা স্তরে স্মৃতিশাস্ত্রের করণীয় দায়িত্বও পালন করে। স্মৃতি নিবন্ধ যদি একটি স্থান এবং কালের তাত্ত্বিক পরিসরের প্রকাশক হয় তাহলে বলতে হবে পুরাণ অনেক বেশি করে তুলে ধরে জনপ্রিয় ব্যাখ্যানকে।[৮৯] একারণেই আমরা আগেই বলেছিলাম বর্তমানে আমরা গুরু বলতে যে ধারণাটি বুঝি তা পৌরাণিক সাহিত্যের হাতেই হয়েছিল। বরাহপুরাণ-এ ব্রত-দীক্ষা দানের গুরুকে বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনা করা হল, বৃহন্নারদীয় পুরাণ-এ বলা হয়েছে গুরু থেকে বৃহৎ কোন তত্ত্ব নেই।[৯০] পুরাণে গুরুর ভূমিকা আরও কার্যকর হচ্ছে, এর অন্যতম কারণ হল গুরুর করণীয় কর্তব্যকে পুরাণ অনেক বেশি স্বীকার করেছে। পুরাণের মধ্যে গুরুর ভূমিকা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তন্ত্রের পাশপাশি বিভিন্ন জনজাতি সমাজের বিশ্বাসকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়ার সম্পর্ক আছে বলে অনেকেই মনে করেন, এই প্রক্রিয়াকে নৃতত্ত্বের পরিভাষায় সাংস্কৃতিক অভিযোজন বা Acculturation বলা হয়।[৯১] পুরাণে গুরুর ভূমিকা যে কতট আবেড়েছে

---

[৮৮] রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. 'তন্ত্রের প্রাচীনতা'. প্রবাসী — কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.). কলকাতা. ৪৭শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড. ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৪৪৫-৪৫০

[৮৯] Chakraborti, Kunal. *Religious Process The Puranas and The Making of a Regional Tradition.* New Delhi : Oxford University Press. 2018. Paperback Ed. P. 52

[৯০] Hazra. R.C. *Studies in the PUranic Records on Hindu Rites and Customs*. Delhi : MLBD. 1975. 2nd Ed. p. 262

[৯১] Nath, Vijay. *Puranas and Acculturation A Historico-Anthropological Perspective*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2001. 1st Ed. pp. 168-173

তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে দান সংক্রান্ত বিধি থেকে। মৎস্যপুরাণ-এ গুরুকে মহাদানের অধিকারী বলা হল, পাশাপাশি গুরুকেই বিভিন্ন ধর্মীয় কৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মৎস্যপুরাণ-এ আরও বলা হল অগ্নিহোত্রের মতো যজ্ঞের সম্পাদনাও গুরু একাই করতে পারবেন এবং যাবতীয় দানের তিনি একাই অধিকারী।[৯২] দেখা যাচ্ছে ধর্মশাস্ত্রে আচার্য, উপাধ্যায়ের গুরুত্ব পুরাণে বেশ কিছুটা খর্ব হচ্ছে এবং গুরু একাই যাবতীয় দানের অধিকারী হয়ে উঠলেন। গুরুর দান সংক্রান্ত প্রেক্ষিতে অনিবার্য হয়ে ওঠার পিছনে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্ক রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বোঝার দরকার আছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্যেই ভারতে গুরু-শিষ্যের যজমানি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আপতিক নয়। দান সংক্রান্ত ধারণার বিবর্তনের সঙ্গে গুরু-শিষ্য কেন্দ্রিক সম্পর্কের ইতিহাসকে মিলিয়ে পড়া যাক। দান এবং দক্ষিণা দুটি শব্দই কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে পারিভাষিক তফাত রয়েছে। দান বলতে কোন কিছু দেওয়াকে বোঝাচ্ছে, দক্ষিণার অর্থ হল কোনও একটি কাজের পরিবর্তে কোনও কিছু দেওয়া। দান প্রায়োজনিক না হলেও দক্ষিণা অবশ্যই প্রায়োজনিক। বৈদিক যজ্ঞের শেষে দক্ষিণা প্রদানের রীতি সুপরিচিত। যর্জুবেদের বর্ণনায় রাজসূয় যজ্ঞের শেষে যজ্ঞের নানা কাজে নিযুক্ত পুরোহিতদের দক্ষিণা স্বরূপ গবাদি পশু এবং সোনার উপাদান প্রদান করার কথা পাচ্ছি। এই বর্ণনা পাওয়া যাবে তৈত্তিরীয় সংহিতায়।[৯৩] দক্ষিণার সঙ্গে একটি প্রায়োজনিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করা হলেও দান প্রসঙ্গে সে কথা তাত্ত্বিকভাবে বলা কঠিন। দানের প্রশংসাসূচক একাধিক রচনা ঋগ্বেদে পাচ্ছি, যেমন ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৩ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষিগণ অশ্বিদ্বয়ের দেবতার কাছে রাজার দান স্তুতি করছেন

---

[৯২] তদেব, পৃ. ১৬৯

[৯৩] Heesterman, J.C. *The Ancient Indian Royal Consecratin.* The Hague, Netherlands; Mouton & Co. Publishers. 1957. 1st Ed. p. 184

এবং রাজার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করছে।[৯৪] সুতরাং দানের ক্ষেত্রে পরিবর্ত সম্পর্ক সরাসরি থাকছে না। যদিও নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও দানকেই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দান বলে মনে করা হয়নি। অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের সঙ্গে ধর্মীয় দানের সম্পর্ক সরাসরি, প্রাচুর্যের সময়ে দান অনেকটাই নৈতিক কারণে করা হচ্ছে, এর সঙ্গে সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই। গোষ্ঠীগত জীবনের সঙ্গে দানের যে সম্পর্ক, নগর জীবনের সঙ্গে সেই সম্পর্ক নয়। গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমিকভাবে যে দানের সম্পর্ক ছিল নগর জীবনে তা পৃথক রূপ পেতে বাধ্য হয়। একারণে দেখা যাচ্ছে নগর জীবনে বাজারের সঙ্গে নানা ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের সম্পর্ক প্রাচীন কাল থেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।[৯৫] গুরুর প্রতি করণীয় মহাদানের কথা আমরা অনেক পরবর্তী সময়ে দেখতে পাব। বৈদিক সংস্কৃতিতে দানের উপাদান ছিল মূলত গবাদি পশু। মহাদানের ক্ষেত্রে আমরা সোনার নির্মিত গোদানের কথা পাচ্ছি, এই গো কেবল স্বর্ণনির্মিত মাত্র নয় সঙ্গে রত্নখচিত। এছাড়াও মহাদানে গাছ, ঘোড়া, রথ, পাত্র ইত্যাদি ষোলটি উপকরণ দানের কথা পাচ্ছি এবং এই সবগুলিই সোনার। প্রধানত কোনও ভূস্বামী যখন নিজেকে ক্ষত্রিয় সম্মানে ভূষিত করতে চাইছেন তখনই মহাদান করতে হত গুরুকে।[৯৬] মহাদান ছাড়াও খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম থেকে আমরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের কথা পাচ্ছি, সারা ভারতে ব্রাহ্মণদের জমি দান করার বিভিন্ন অনুশাসনের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রামে, মূলত আবাদি জমি দান করা হচ্ছে। নগর-জনপদে দানের পরিমান কমছে এই সময়ে। নগর এবং গ্রামের মধ্যে কোনও জায়গায় বসবাস করা প্রয়োজন এবিষয়ে ধর্মশাস্ত্র এবং

---

[৯৪] বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় (ভূমিকা সম্বলিত). *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (২য়). কলকাতা : হরফ প্রকাশনী. ২০১৬. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৭৭

[৯৫] Mauss, Marcel. *The Gift the form and reason for Exchange in Archaic Society*. London : Routledge. 2002. Taylor and Francis e-Library ed. pp. 72-73

[৯৬] Thapar, Romila. *Ancient Indian Social History Some Interpretations*. New Delhi : Orient Longman Ltd. 1978. 1st Ed. p. 119

অর্থশাস্ত্র-কামশাস্ত্রের মধ্যে একধরনের দ্বিচারিতা রয়েছে। এই দ্বিচারিতা অবশ্যই বৌদ্ধদের মধ্যেও দেখা যাবে। নৈতিক ভাবে গ্রামই যে ধর্মজীবনের জন্য যথাযথ এই মত সব ধর্মশাস্ত্রই স্বীকার করবে। বৌদ্ধজাতকের আখ্যানেও শহরে বসবাসকারী মানুষদের প্রতি নঞর্থক মনোভাব পোষণ করতে দেখা যাচ্ছে।[৯৭] এর পাশাপাশি আমরা দেখব বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক সূচনায় নগরের প্রতি একটি ঝোঁক ছিল। আর কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-র মূল ঝোঁক ছিল নগর জীবনের প্রতি, বাৎসায়নের *কামসূত্র*-এ আমরা অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন নগর জীবনের কথাই পাচ্ছি।[৯৮] এই দুটি গ্রন্থই রচিত হয়েছে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে। এবারে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে গ্রাম-নগর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে বিপ্রতীপতা প্রায়োগিক দিক থেকে নগরের প্রতি আকর্ষণই উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ে বেশি ছিল বলে দেখা যাচ্ছে। তবে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ব্রাহ্মণদের গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপনের একটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়।[৯৯] ব্রাহ্মণদের নগর অঞ্চল ছেড়ে গ্রামে বসবাসের প্রতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আকর্ষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। নগরের অর্থনীতিতে ব্রাহ্মণদের উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও ব্রাহ্মণেরা দান স্বরূপ যে অর্থ পেতেন তাতেই তাদের রোজকার জীবন তো চলতই, পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে হস্তক্ষেপের সুযোগ-ও থাকত, যা অবশ্যই নগর জীবনের সুফল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে আমরা ষোড়শ মহাজনপদের ক্রমিক ক্ষয়ের বর্ণনা পাচ্ছি। এমনকী ফা-হিয়েনের বর্ণনাতেও নগর জীবনের বিশেষ কোন বর্ণনা নেই।[১০০] নগরের পতন এবং ব্রাহ্মণদের নগর ত্যাগ করে গ্রামে বসবাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অভিব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত, যে সকল ব্রাহ্মণেরা

---

[৯৭] Ray, Niharranjan. 'Rural-Urban Dicnotomy in Indian Tradition and History'. Annals of the Bhandar Oriental Research Institute (Vol : 58/59). Poona : Bori. 1977-78. p. 865

[৯৮] তদেব, পৃ. ২১

[৯৯] Nandi, Ramendranath. *Social Roots of Religion in Ancient India*. Calcutta : KP Bagchi & Company. 1986. 1st Ed. p. 27

[১০০] তদেব, পৃ. ২১

অবক্ষয়িত নগরগুলিতে থেকে যাচ্ছেন তাদের হাত ধরে তৈরি হচ্ছে তীর্থ যাত্রার এবং তীর্থমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য রচিত শাস্ত্র। অনেক সময়ে পুরাণ তীর্থ মাহাত্ম্য প্রচার করছে। নগর অর্থনীতি তখন তীর্থযাত্রীদের সূত্রে একভাবে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে।[১০১] আর যাঁরা নগর ছেড়ে গ্রামে বসতি স্থাপন করছেন তাদের সূত্রে দানকে কেন্দ্র করে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে নতুন ভাবে। পূর্বে বিভিন্ন সংস্কার কর্মে যোগদান অথবা যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দক্ষিণা অর্জনের বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিল। বর্তমানের অর্থনীতিতে দান করার জন্য কোনও অনুষ্ঠান অথবা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন নেই, দান করাই একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করল। আগে পারমার্থিক পুণ্য করার জন্য যজ্ঞ করা হত, বর্তমানে দান করলেই সরাসরি সেই পুণ্য অর্জন করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।[১০২] মহাদান-এর প্রসঙ্গে আমরা আগেই দেখেছিলাম ক্ষত্রিত্বের দাবী-ই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণের হাত ধরে দানের মাধ্যমে ‘জাতে ওঠার’ ধরনটি এই সময় থেকে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি অর্জন করছে। সুতরাং প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্মের মাধ্যমেই যজমান এবং গুরুকেন্দ্রিক সম্পর্কের পুনর্নির্মাণ হল যার অন্যতম ভিত্তি ছিল ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনৈতিক জীবন।

পৌরাণিক ধর্মে গুরু পরম্পরার স্বীকৃতির পাশাপাশি আমরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্যান্য শাখাতেও গুরুকেন্দ্রিক ধর্মচর্যার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী সময় সীমায়। তবে ধর্মশাস্ত্র পরম্পরার অনুসরণে রচিত *মনুসংহিতা*-য় গুরুর সঙ্গে বেদাধ্যাপনের বিষয়টি পুনরায় গুরুত্ব পেয়েছে। *মনুসংহিতা*-র ধর্মানুশাসন প্রকরণ-এ বলা হয়েছে উপনয়নের পর গুরু শিষ্যকে শৌচক্রিয়া, অগ্নি পরিচর্যা এবং সন্ধ্যোপাসনার শিক্ষা দান করবেন।[১০৩] সুতরাং বেদশিক্ষা

---

[১০১] তদেব, পৃ. ৪৬-৫৪

[১০২] তদেব, পৃ. ৫৭

[১০৩] তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.). *মনুসংহিতা — কুল্লুকভট্ট-কৃত টীকা সম্বলিত.* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৪. ষষ্ঠ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ. পৃ. ১০১

এবং প্রণব এবং গায়ত্রী শিক্ষার সঙ্গে গুরুর সম্পর্ক সমপরিমাণেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় জন্মদাতা এবং পালনকর্তা পিতাকেও *মনুসংহিতা* গুরুর মর্যদা দিয়েছে, যদিও বলা হয়েছে পিতা যদি সন্তানের পালন দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তবে তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করা হবে না।[১০৪] কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-র 'বিনয়াধিকরম্'-এ পুরোহিত নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে পুরোহিত ষড়ঙ্গ বেদ, জ্যোতিষবিদ্যার পাশাপাশি অথর্ব বেদেও পারদর্শী হবেন এবং সামদানাদি উপায়ের মাধ্যমে দৈব তথা মনুষ্যকৃত বিপদের প্রতিকার করতে সক্ষম হবেন। শিষ্য যেমন আচার্যের অনুবর্তন করে, রাজাও একইভাবে পুরোহিতের অনুবর্তন করবেন।[১০৫] অর্থাৎ পঞ্চম শতকে ব্রাহ্মণদের নতুন পেশা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহিত পেশাগুলিও চলছিল। প্রসঙ্গান্তরে বলা দরকার কেবল রাজাকে পরামর্শ প্রদান করাই নয়, এক সময়ে যখন সমাজে ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল তখন ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় রাজমহিষীর গর্ভে সন্তানও উৎপাদন করতেন। এধরনের একটি আভাষা দ্রৌপদীর জন্ম বৃত্তান্তের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।[১০৬] নিয়োগ প্রথার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই পুরোহিতদের এই ভূমিকার অবসান ঘটে। তবে আমাদের অবশ্যই মনে থাকবে গুরুপ্রসাদী প্রথার কথা যেখানে স্ত্রীকে ভক্তরা গুরুর কাছে প্রসাদ করে দেওয়ার জন্য নিবেদন করতেন। যাই হোক মূল স্রোতে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কের সমান্তরালে সাধারণ শিষ্যদের কেন্দ্র করে একটি যজমানি প্রথার জন্ম হচ্ছে কীভাবে আমরা তা দেখলাম। এবার আসা যাক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরুদের ভূমিকা কীভাবে স্বীকৃতি অর্জন করছে সেই প্রসঙ্গে। শংকরাচার্যের আগে অবধি শৈব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবর্তনের তিনটি পর্যায় দেখা যাচ্ছে। প্রারম্ভিক পর্যায়, যার সময়সীমা কুষাণ যুগের আগে অবধি, কুষাণ যুগে শৈবধর্মে লকুলীশ এবং পাশুপাত মতের সূচনা হচ্ছে, বৈষ্ণব ধর্মে পাঞ্চরাত্র এবং গোপাল উপাসনার সূচনা দেখা

---

[১০৪] তদেব, পৃ. ৩৮

[১০৫] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.). *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৪. ষষ্ঠ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ. পৃ. ১০১

[১০৬] সেন, সুকুমার. 'ভারত-কথার গ্রন্থিমোচন'. *সুকুমার সেন প্রবন্ধ সংকলন* (৪). কলকাতা : আনন্দ. ২০১৮. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৫৬১

যাচ্ছে। এরপরের স্তরে শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের যোগাযোগ হচ্ছে, শৈবদের মধ্যে কাপালিক শাখার বিস্তার হচ্ছে, বৈষ্ণবধর্মে বাসুদেব উপাসনার সূচনা দেখা যাচ্ছে।[১০৭] তন্ত্র পৃক্ত শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মে গুরুর ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। একটি উদাহরণ সহ বিষয়টি দেখা যাক। পশুপাত শৈবদের একটি শাখা কাপালিক, যাদের মধ্যে আবার দুটি ভেদের কথা পাওয়া যাচ্ছে ইয়াং চুয়াং-এর বিবরণে। এঁদের একদল বেদ ও জাতিপ্রথাকে স্বীকার করতেন এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন, অন্য একটি দল যাঁদের কালামুখ নামে চেনা হয় তাঁরা বেদ স্বীকার করতেন না এবং জাতি প্রথাও মানতেন না।[১০৮] অতএব বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতার সূচনা শংকরাচার্যের আগেই শুরু হয়েছিল। মূলত এই প্রেক্ষিতেই শংকরাচার্যের ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা। শৈবদের পরবর্তীকালে উগ্র এবং সৌম্য—এই দুটি শাখায় ভাগ করা হতে থাকে। মধ্য ভারতে চেদি রাজত্বে শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা মত্তময়ূর নামে একটি শাখার কথা পাচ্ছি যাদের গুরু পরম্পরার সাপেক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। খ্রিস্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে মত্তময়ূর শাখা কেবল মধ্যভারতেই নয় সারা ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মত্তময়ূর শাখার অনেকেই রাজগুরুর ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১০৯] এঁরা সচরাচর নারীসঙ্গ থেকে দূরে থাকতেন এবং এঁদের নামের সঙ্গে ‘শিব’ অথবা ‘শম্ভু’ শব্দটি যুক্ত হত। এঁরা মঠ নির্মাণ করে থাকতেন। মলকাপুরম স্তম্ভ লিপি অনুসারে আচার্য বিশ্বেশ্বরশম্ভু বিশ্বেশ্বর গোলকীমঠ স্থাপন করেন, এর মাধ্যমে শাস্ত্র চর্চার পাশাপাশি আর্তদের অন্নদানও করা হত। আচার্য বিশ্বেশ্বর শম্ভু দক্ষিণ রায়ের গৌড়দেশের পূর্ব গ্রামের বাসিন্দা।[১১০] মত্তময়ূর আচার্যদের ইতিহাস থেকে বোঝা যাচ্ছে কেবল গৃহী ব্রাহ্মণরাই রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হতেন এমন নয়, অনেক

---

[১০৭] Chattopadhyaya, Sudhakar. *The Evalution of Theistic Sects in Ancient India upto the time of Samkaracharya.* Calcutta : Progressive Publishers. 1962. 1st Ed. p. 142

[১০৮] তদেব, পৃ. ১৩৯-১৪১

[১০৯] Banerjee, J.N. *Pauranic and Tantric Religion (Early Phase)*. Calcutta : University of Calcutta. 1966. 1st Ed. p. 105..

[১১০] তদেব, পৃ. ১০৫-১০৬

ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গুরুরাও রাজগুরু রূপে স্বীকৃত হতেন। বোঝা যাচ্ছে মূল স্রোতের গৃহী ব্রাহ্মণেরাই নয়, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরও রাজতন্ত্রে অংশগ্রহণের আগ্রহ ছিল। সুতরাং গুরু পদটি কেবল ধর্মচর্যার নয়, পাশাপাশি রাজনৈতিক ইতিহাসেরও অংশ। আমরা পরে দাদূপন্থীদের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাব।

আমরা বর্তমান আলোচনা শেষ করব শংকরাচার্যের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গের মাধ্যমে। একদিকে যেমন গুরুবাদের একটি স্রোত ছিল গৃহী ব্রাহ্মণদের হাতে, আরেকটি স্রোত বিবর্তিত হচ্ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হাতে, তৃতীয় আরেকটি ধারার অনুমান সম্ভব শংকরাচার্যের মাধ্যমে। শংকরাচার্য সন্ন্যাসী, তবে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে তিনি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরী, বদ্রিকাশ্রম, দ্বারকা এবং পুরীর গোবর্ধন মঠে আজও এই আচার্য পরম্পরা কার্যকর। আচার্য শংকরের মতাবলম্বীরা দশনামী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এর মধ্যে কর্ণাটকের শৃঙ্গেরী মঠে পুরী, ভারতী, সরস্বতী, দ্বারকার সারদা মঠে তীর্থ এবং আশ্রম, পুরীর গোবর্ধন মঠে বন এবং অরণ্য এবং বদ্রিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠে মঠে গিরি, পর্বত এবং সাগরের শিষ্য-প্রণালী প্রচলিত।[১১১] আমরা শংকরাচার্যকে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তী পাচ্ছি, কিছু সাহিত্য ধারাও শংকরাচার্যকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং বেদান্তের একটি অত্যন্ত বিস্তৃত তত্ত্ব প্রস্থানে শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাত্ত্বিকভাবে শংকরাচার্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্ব। শংকরাচার্যের মতে ব্রহ্মানুভব-ই হল যাবতীয় সাধনার মূল উদ্দেশ্য। ব্রহ্মানুভব আবশ্যিক ভাবেই ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি, যা জ্ঞানের পরিপুষ্টির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। অজ্ঞানতার নিরসনই জ্ঞানের একমাত্র কাজ।[১১২] অতএব তাত্ত্বিকভাবে শংকরাচার্যের দর্শনে গুরুর ভূমিকা পথ প্রদর্শকের, অনুভূতি ভক্তের নিজস্ব। অদ্বৈত সম্প্রদায়ের গুরু আচার্য শংকরের জীবন সংক্রান্ত আখ্যান থেকে

---

[১১১] দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (২). কলকাতা: নূতন সংস্কৃত যন্ত্র. ১২৮৯ বঙ্গাব্দ. []. পৃ. ৩০

[১১২] Ramamurti, A. *Advaitie Mysticism of Sankara*. Santiniketan : The Centre of Advance Study in Philosophy, Visva-Bharati. 1974. 1st Ed. p. 51

আমরা তাত্ত্বিক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা ছাড়াও গুরুর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা পাচ্ছি। নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য শংকরাচার্য যে দিগ্বিজয়ের সূচনা করেছিলেন তার অন্যতম অংশ ছিল তর্কযুদ্ধ করা। কেবল তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠাই করতেন না, পরাজিত হলে অপর পক্ষ অদ্বৈতমতে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বাধ্য থাকতেন। ওঁকারনাথের নিকট নর্মদাতীরে মাহিষ্মতী নগরে মণ্ডন মিশ্র এবং তাঁর স্ত্রী উভয় ভারতীর সঙ্গে শংকরাচার্যের দীর্ঘদিন ধরে তর্কযুদ্ধ চলেছিল এবং শেষে মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হন এবং শংকরাচার্যের কাছে অদ্বৈতমতে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন।[১১৩] শংকরাচার্য কিন্তু মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয় ভারতী-কে দীক্ষা দান করেন নি। অতএব অদ্বৈত মতের প্রসারে শংকরাচার্যের অভিযান মূলত পুরুষকেন্দ্রিক ছিল। তবে তর্ক যুদ্ধ করে পরাজিত করা এবং দীক্ষা দান থেকে বোঝা যাচ্ছে অদ্বৈতমতে গুরুর অন্যতম কাজ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তর্ক পটুত্ব অর্জন। শৃঙ্গেরী পঠে অবস্থান কালে শংকরাচার্যের এক শিলষ্য কেবল গুরু সেবার মাধ্যমে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন। পরে শংকর তাঁকে সন্ন্যাস মন্ত্র দান করেন এবং নামকরণ করেন তোটকাচার্য।[১১৪] দেখা যাচ্ছে জ্ঞানমার্গে সিদ্ধি অর্জন না করলে শংকরাচার্য সন্ন্যাসদীক্ষা দিতেন না, কিন্তু গুরুর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা এবং ভক্তির মাধ্যমে শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব এই তত্ত্বে অদ্বৈতমত বিশ্বাসী।

আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকের মধ্যে গুরু সংক্রান্ত বিশ্বাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম প্রস্থানে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমরা বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রবণতা কার্যকর হয়েছে। কোনও একটি সম্প্রদায় অথবা কোনও একটি ধরনকে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্ম দর্শন অনুযায়ী গুরুকেন্দ্রিক বিশ্বাস কীভাবে বিস্তার লাভ করছে তা বোঝার চেষ্টা থাকবে।

---

[১১৩] স্বামী, অপূর্বানন্দ. *আচার্য শঙ্কর.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ২০১১. ১৫তম পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৮৬

[১১৪] তদেব. পৃ. ১১২

চতুর্থ অধ্যায় বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে গুরু প্রসঙ্গ

৪.১ বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম: তত্ত্ববিস্তার এবং আদান-প্রদান (বিশেষ প্রসঙ্গ তিব্বত)

৪.২ বঙ্গদেশের সমাজ-পটভূমি এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়

৪.৩ বজ্রযানী শাস্ত্র-সাহিত্যের বয়ান ও সাধ্য-সাধনে গুরুর ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে গুরু প্রসঙ্গ

ফিরে আসা যাক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অগ্রহায়ণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রসঙ্গে। মন্ত্রযান এবং বজ্রযান বৌদ্ধ সাধনায় গুরুর সম্মান বৃদ্ধির বিষয়টি হরপ্রসাদ খুব ভালো চোখে দেখেননি। হরপ্রসাদের মন্তব্য—"কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। মন্ত্রযান গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড়ো ও একজন ছোটো হইয়া গেল।"[১] কেবল গুরুনির্ভর জীবনযাপন নয়, হরপ্রসাদ বজ্রযানের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 'অশ্লীল' বিশেষণও প্রয়োগ করছেন আশ্বিন, ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত' প্রবন্ধে।[২] 'অধঃপাত' শব্দটির মধ্যেও হরপ্রসাদের মনোভাব বোঝা যাচ্ছে। হরপ্রসাদের আগে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গবেষণায় শাক্ত এবং শৈব সম্প্রদায়ের তন্ত্রপৃক্ত আচরণগুলিকে একই দৃষ্টিতে দেখতেন। যেমন—অঘোরপন্থী সন্ন্যাসীদের বর্ণনায় পরবর্তী সংস্করণে অক্ষয় দত্ত টিপ্পনী করে বলছেন—অঘোরদের নারীদেহের প্রতি আসক্তি এবং নানা বুজরুকির কথা।[৩] সুতরাং গুরুকেন্দ্রিক এবং তন্ত্রলগ্ন ধর্ম প্রসঙ্গে উনিশ শতকের 'শিক্ষিত' সমাজের একধরনের রক্ষণশীলতা কাজ করত। তবে হরপ্রসাদের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে 'গুরু' বিষয়টি বজ্রযানে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। ইসলামি আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্ঘকেন্দ্রিক পূর্বভারতীয় বৌদ্ধধর্মের বিলোপের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে

---

১ চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পা.). হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০০১. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ২৪৯

২ তদেব, পৃ. ৩৭৬

৩ দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়.* কলকাতা : বসুমতী কার্যালয়. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ১৪৩-৪৪

বৌদ্ধধর্ম বিলোপের কারণ হিসাবে সেন বংশের রাজাদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাবের কথাও ঐতিহাসিকেরা বলেছেন।[8] ফলে বৌদ্ধ সাধনার নৈতিক অধঃপতন, যা উনিশ শতকের গবেষকের নির্দিষ্ট সময়সঞ্জাত সিদ্ধান্ত, তার সঙ্গে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। আমরা আলোচনার শুরুতেই বৌদ্ধধর্মের বিলোপের কথা বলছি, কারণ বজ্রযান এবং কালচক্রযানের পরে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ সাধনার বিবর্তনের কথা উনিশ শতকের আগে পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকেই বঙ্গদেশের ধর্মীয় মানচিত্রে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম তার গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। গুরুসর্বস্বতার সঙ্গে বজ্রযানের 'অবনতি'র সম্পর্ক কতদূর তা পৃথক গবেষণার বিষয় কিন্তু বজ্রযানের গুরু-ধারণা পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশের যাবতীয় ধর্মমতকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষত নাথ, শৈব সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা এবং শাক্ত সাধনায় গুরু-র যে প্রাধান্য তার প্রেক্ষাপটে বজ্রযানের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছিলাম নাগার্জুন দার্শনিক এবং তত্ত্ববেত্তা রূপে স্বীকৃতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে তিব্বতে থাঙ্কা আঁকা শুরু হয়েছিল। মহাযানের থেকেই গৌতম বুদ্ধ এবং সাধারণ উপাসকের মধ্যবর্তী বোধিসত্ত্ব ধারণার বিকাশ হয়েছিল। পাশাপাশি তত্ত্ববেত্তা এবং ব্যাখ্যাতাদেরও বোধিচিত্ত অর্জনের কথা পাচ্ছি। তত্ত্ব এবং শীলের চর্যাতে বোধিচিত্ত অর্জন করা সম্ভব একথা সকল তত্ত্বগ্রন্থ স্বীকার করেছে। এখান থেকেই গুরু ধারণায় দেবত্ব আরোপের সূচনা বলতে পারি।

বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশ ছাড়াও পূর্ব ভারতের একাধিক এলাকায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বর্তমানে আমাদের আলোচনা বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অধ্যায়ে আমরা বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং বৌদ্ধধর্মে অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করব। বৌদ্ধধর্ম যখনই অন্য ধর্মের সংস্পর্শে এসেছে, তখনই তার মধ্যে বিকাশ দেখা গিয়েছে, অন্য ধর্মের কিছু কিছু উপাদান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। এরপর মূলত বঙ্গদেশে

---

[8] Mitra, R.C. *The Decline of Buddhism in India*. Santiniketan: Research Publications Committee, Visva-Bharati. 1981. p – 78

রচিত সাহিত্য এবং অপরাপর ঐতিহাসিক উপাদান থেকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের একটি প্রাথমিক ইতিহাস নির্মাণের চেষ্টা করা হবে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা বঙ্গদেশের বজ্রযানী বৌদ্ধ সাহিত্যের এবং সাধ্য-সাধনতত্ত্বে গুরু প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। পূর্ববর্তী স্তর অর্থাৎ মহাযানের সঙ্গে বজ্রযানের মূল ফারাকের কারণগুলির সাপেক্ষে গুরু প্রসঙ্গের আলোচনাই বর্তমান অধ্যায়ের মূল উপজীব্য।

৪.১ বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম: তত্ত্ববিস্তার এবং আদানপ্রদান (বিশেষ প্রসঙ্গ তিব্বত)

রাজানুগ্রহে বৌদ্ধধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে মৌর্য সম্রাট অশোক অবশ্যই উল্লেখযোগ্য নাম। অশোকের রাজধর্মেরই একটি অংশ ছিল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং তার প্রসার—একথা ঐতিহাসিক মহলে প্রতিষ্ঠিত। আর অশোক কেবল বৌদ্ধ সঙ্ঘের কথাই ভাবতেন না, পাশাপাশি ব্রাহ্মণ, আজীবিক, নির্গ্রন্থদের কথাও সমপরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতেন। পাশাপাশি অশোকের শিলাস্তম্ভ উৎকীর্ণ করার অন্যতম কারণ ছিল স্থায়ী রূপে তাঁর বক্তব্য সংরক্ষণ এবং প্রসারের ব্যবস্থা করা।[৫] 'স্থায়ী' শব্দটির দিকে আমরা জোর দিচ্ছি, এর থেকে বোঝা যায় অশোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অশোকই নিয়েছিলেন। এর মধ্যে অশোকপুত্র মহেন্দ্র কর্তৃক সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে *দ্বীপবংশ*-র নবম-দশম অধ্যায়ে। এক্ষেত্রে বলা দরকার *দ্বীপবংশ*-এর বয়ান অনুযায়ী মহাথের মজ্ঝন্তিক গান্ধারে গমন করেন এবং সেখানের বহুজনকে বন্ধনমুক্ত করেন।[৬] অতএব অশোকের সমসময়ে স্থলপথ এবং জলপথে বৌদ্ধধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপরেই বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হল চিন। খ্রিস্টীয় ৬৮ অব্দে চিনে মিংতি রাজত্ব কাকে কশ্যপ মাতঙ্গ এবং ধর্মরক্ষক প্রথম ভারতবর্ষ থেকে চিনে

---

৫ সরকার, দীনেশচন্দ্র. *অশোকের বাণী.* কলকাতা : সাহিত্যলোক. ২০০১. পরিবর্তিত দ্বিতীয় সং. পৃ. ৭২-৭৩

৬ দাশ, আশা (সম্পা.). *দ্বীপবংশ.* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী. ১৪১০ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫৭

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের জন্য পৌঁছোন এবং পাঁচটি বৌদ্ধগ্রন্থের চিনা অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থগুলি মূল ত্রিপিটকের মধ্যে নয়, ব্যাবহারিক ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের পরিচিতি প্রদান করার জন্য রচিত। এই সময়েই চিনে প্রথম বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় যার নাম 'Po ma sse' অর্থাৎ 'শ্বেত অশ্ববিহার'।[৭] এর পরবর্তী সত্তর বছরে সম্ভবত পূর্ব তুর্কিস্থানের রাজনৈতিক অশান্তির কারণে চিন এবং ভারতবর্ষের যোগাযোগ স্থাপনের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে না। খ্রিস্টীয় ১৪৪ অব্দে শ্বেত অশ্ববিহারের সংস্কার করা হয়। এরপর ২২০ খ্রিস্টাব্দ অবধি চিনে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদের ধারা দেখা যাচ্ছে হান সাম্রাজ্যের পতনের আগে অবধি এই অনুবাদের ধারা বজায় ছিল। প্রথম দিকে *সূত্রপিটক* অনুবাদের কথা পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী সাম্রাজ্যের সময়কালে (Wei Rulers, 220-265 A.D.) ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিতদের চিনে যাত্রা এবং *বিনয়পিটক* অনুবাদ করতে দেখা যাচ্ছে। অতএব চিনে প্রথম বৌদ্ধ দর্শন প্রসার লাভ করেছে এবং কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি দৃঢ় হলে *বিনয়পিটক*-এর অনুবাদ শুরু হচ্ছে। এরপর থেকে ভারত থেকে প্রতিনিয়ত চিনে যাত্রা এবং শাস্ত্র অনুবাদের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।[৮] ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সরাসরি ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ব্রহ্মদেশের পরম্পরায় মনে করা হয় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আচার্য বুদ্ধঘোষ অজস্র বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। এর আগে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কথা পাওয়া যাচ্ছে নাগার্জুনিকোণ্ডার অনুশাসনে।[৯] থাইল্যান্ড (তৎকালীন সিয়াম)-এ হীনযানী বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে ইৎ-সিঙ-এর বৃত্তান্তে।[১০] কম্বোডিয়াতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয় এবং বুদ্ধদেবের কেশ সম্বলিত স্তম্ভ ৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে কম্বোডিয়াতে প্রেরণ করেন চিনের সম্রাট (Wu-

---

৭ Bagchi, P.C. 'The Beginnings of Buddhism in China'. Sino-Indian Studies Vol-I, Part-I. Santiniketan: Visva-Bharati. 1946. p. 01

৮ তদেব, পৃ. ৮-৯

৯ Banerjee, Anukul Chandra. *Buddhism in India and Abroad*. Calcutta: The World Press Private Limited. 1973. 1st Edition. p. 193

১০ তদেব, পৃ. ২০২

ti)।[১১] অতএব বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে সব সময় ভারতবর্ষ থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছিল এমন নয়। প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, তবে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে অবশ্যই বাণিজ্য এবং অর্থনীতির সরাসরি সম্পর্ক ছিল। দাক্ষিণাত্যে অধিকাংশ বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়েছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে, যার অন্যতম কারণ জলপথ ব্যবহারের সুবিধা। বৌদ্ধরা প্রথমদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগরের মধ্যেই বাণিজ্যিক সম্পর্কে নিযুক্ত ছিলেন। এরপরে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন চলতে থাকে। চিনের সঙ্গে ভারতবর্ষের যাতায়াতের অন্যতম অবলম্বন ছিল সিল্করুট। যদিও সিল্করুট বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট পথকে বোঝায় না। নানা সময়ে একাধিক পথই সিল্ক রুটের আওতাভুক্ত হয়েছে। সিল্করুটে বৌদ্ধবিহার স্থাপনের থেকে বোঝা যায় এই অঞ্চলে বৌদ্ধদের যাতায়াত ছিল। আবার মূলত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতেই বৌদ্ধবিহারগুলি নির্মিত হয়, যেমন খোটানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূলত পৃষ্ঠপোষকতার উপরেই বৌদ্ধধর্ম চালিত হলেও বৌদ্ধসঙ্ঘ চিন এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিক সম্পর্কে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন। বাণিজ্য বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য না হলেও বাণিজ্যের সমঝোতা বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের করতে হয়েছে।[১২] ফলে বহির্ভারতে ধর্মপ্রসার, শাস্ত্র অনুবাদ, ব্যাখ্যার সূত্রে বৌদ্ধদের মধ্যে একটি ধর্মীয় বাণিজ্যের সূচনা হয়। চিনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সব সময় একধরনের ছিল না। চতুর্দশ শতকে ভারতবর্ষে আগত চৈনিক ব্যবসায়ীর কথা পাচ্ছি, এই ব্যবসা মূলত দক্ষিণ ভারতের বন্দর থেকে চালিত হত।[১৩] বোঝা যাচ্ছে জলপথেও চিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তবে বৌদ্ধদের সঙ্গে চিনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই নষ্ট হতে শুরু করে। এর অন্যতম কারণ চিনের বৌদ্ধধর্ম তখন ভারতবর্ষের

---

[১১] তদেব, পৃ. ২০৭

[১২] Neelis, Jason. *Early Buddhist Transmission and Trade Networks.* Boston: Brill. 2011. 1st Edition. p. 317

[১৩] Sen, Tansen. *Buddhism, Diplomacy and Trade The Realiqument of Sino-Indian Relations. 600-1400*. Honolulu & USA: Association for Asian Studies. 2003. 1st Edition. p. 231

বৌদ্ধধর্ম থেকে পৃথক অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে শুরু করে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চিনে আবির্ভূত হন একজন ভিক্ষু (Mount Wutai) যিনি বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার রূপে স্বীকৃত হন, পাশাপাশি চিনের থেকেই বৌদ্ধধর্ম তখন কোরিয়া, জাপানে প্রসার লাভ করছিল। এথেকে বোঝা যায় চিনের বৌদ্ধ সাধনায় তখন আর ভারতীয় ভিক্ষুদের সরাসরি যোগদান আবশ্যক ছিল না।[১৪] ফলে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ বৌদ্ধধর্ম ব্যতিরেকে রাজনীতি এবং বাণিজ্যিক লাভ-ক্ষতির অঙ্কেই পরিচালিত হতে থাকে।

চিনের পরেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কথা বলতে হয়। বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতে চিনের তুলনায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রেক্ষাপট অনেক বেশি জরুরি। এর কারণ চিনে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং প্রচার হয়েছে বঙ্গদেশে তখনও বৌদ্ধধর্মের যথাযথ বিকাশ হয়নি। তবে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশের ইতিহাস ঠিক কোথা থেকে শুরু করা উচিত এবিষয়ে বেশ সন্দেহ রয়েছে। *ললিতবিস্তার*-এ বঙ্গদেশের লিপির কথা পাচ্ছি আবার সিংহলী *মহাবংস*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে বঙ্গদেশের রাজকন্যার সঙ্গে সিংহের বিবাহের কাহিনি পাওয়া যাবে।[১৫] যাই হোক না কেন পাল যুগের থেকে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিকাশের একটি সমান্তরাল অগ্রগতি লক্ষ করা সম্ভব। তিব্বতে যাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রসারের জন্য গিয়েছিলেন বঙ্গদেশের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল বলা যায়। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম প্রসার হয়েছিল খ্রিস্টীয় ৬৪০ অব্দে। দেখা যাবে এর অনেক আগেই চিন এবং জাপানে বৌদ্ধধর্ম পূর্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাকৃত দেরিতে পৌঁছোনোর কারণ তিব্বত ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত দুর্গম। খ্রিস্টীয় ৬৪০ অব্দে তিব্বতের সম্রাট স্রোঙ্ গচ্. ন. গম্স্-পো-র সঙ্গে নেপালের অধিপতি অংশুবর্মার কন্যার বিবাহ হয়। নেপালের রাজকন্যা অক্ষোভ্য, মৈত্রেয় এবং তারার

---

[১৪] তদেব, পৃ. ২৩৯

[১৫] বড়ুয়া, শুভ্রা. *মহাবংস*. কলকাতা : গোবিন্দ প্রসাদ বড়ুয়া প্রকাশিত. ২০০৪. প্রথম সং. পৃ. ৪৯-৫০

চন্দনকাঠের মূর্তি তিব্বতে নিয়ে গেলে তার সূত্রেই সম্রাট বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষিত হন এবং অমাত্য থোন্ মি-র মাধ্যমে তিব্বতে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ, ভোটলিপির প্রসার করেন।[১৬] এরপর তিব্বতে চিনের আক্রমণের কারণে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরপর আচার্য শান্তরক্ষিত তিব্বতে দুবার যাত্রা করেন, প্রথমবার তিব্বতের প্রাকৃতিক বিপর্যএরপর আচার্য শান্তরক্ষিত তিব্বতে দুবার যাত্রা করেন, প্রথমবার তিব্বতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয়, পরে ৭৫ বছর বয়সে তিনি পুনরায় তিব্বতে গেলে ৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয় এবং সাতজন ভোটদেশের পুরুষ সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধমতে ভিক্ষু-দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১৭] এই ভিক্ষুরা শান্তরক্ষিতের তুলনায় আচার্য পদ্মসম্ভবকে অনেক বেশি মানতেন এবং পদ্মসম্ভব তিব্বতে বুদ্ধদেবের থেকেও বেশি পূজিত হতে থাকেন। শান্তরক্ষিতের পরে খ্রিস্টীয় ১০৪২ অব্দে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে যান। এর মাঝের সময়ে তিব্বতে নানা রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলতে থাকে, বিশেষত বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, ভিক্ষুরা তিন মাসের বর্ষা যাপনের সময়টুকু বাদ দিলে মদ-নারী-ভোগে লিপ্ত থাকতে থাকেন। এই প্রেক্ষিতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যান এবং জীবনের শেষ তেরো বছর তিব্বতে শাস্ত্র সংশোধন করেন, কালচক্রের উপর টীকা লেখেন। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা এবং তিব্বতে শাস্ত্র রচনার ইতিহাস সুবিখ্যাত। ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে দীপঙ্কর গৌড়ের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃদত্ত নাম চন্দ্রগর্ভ। চন্দ্রগর্ভ শ্রাবকযানের ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযানের ত্রিপিটক, মাধ্যমিক এবং যোগাচার শাখার অধিবিদ্যা এবং তন্ত্রের চারটি শাখার উপর বিশেষ পারঙ্গমতা অর্জন করেন।[১৮] অতীশ দীপঙ্করের তান্ত্রিক দীক্ষা হয় হেবজ্রচক্রমতে। এরপর অবধূতি পা-র থেকে বরাহী ষষ্ঠধারণী ও অন্যান্য ক্রিয়াচক্রে দীক্ষা

---

[১৬] সাংকৃত্যায়ন, রহুল. *তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম.* অনু. সুমন পাল ভিক্ষু. কলকাতা : বোধি-নিধি. ২০১৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৭

[১৭] তদেব, পৃ. ২২

[১৮] Das, Sarat Chandra. *Indian Pandits in the Land of Snow*. New Delhi : Asian Educational Services. 1992. Reprint. p. 50

হয়।[১৯] দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একাধিক তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি তিব্বতি ভাষাতেই বর্তমানে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত দুটি রচনায় আমরা গুরু প্রসঙ্গ পাচ্ছি। দীপঙ্কর রচিত চর্যাগীতি-র **২১** সংখ্যক পঙ্ক্তিতে বলা হল—গুরুর বাণী যেন জলের মতো। একে গ্রহণ করে নিজেকে মার্জন করো। হে মন নিজেকে বোঝো, নিজেকে দেখো। নিজেকে বিভ্রান্তির মূল থেকে পরিষ্কার করে নাও।[২০] শ্রীজ্ঞানেরই রচিত 'চর্যা-গীতি-বৃত্তি'-তে এই পঙ্ক্তিটির ব্যাখ্যা পাচ্ছি—"এ পদের অর্থ যেন আয়নায় দেখে নিজের মুখে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করার মতন। গুরু যে আয়নার মতো, তার দেওয়া উপদেশগুলি হল মুখ ধোওয়ার জল, যা অবিদ্যাকে মার্জিত করে, এই ময়লা মার্জনের প্রয়োজন হয়। একারণেই বলা হয়েছে গুরুর উপদেশ অনুযায়ী এই কল্পনার ধূলা ধুয়ে ফেল।"[২১] *বোধিপথপ্রদীপ* নামে আরেকটি তত্ত্বগ্রন্থে দীপঙ্কর গুরু প্রসঙ্গে বলছেন—"অভিষেক লাভ করার জন্য গুরুর কাছে বহুমূল্য দ্রব্য নিয়ে যেতে হবে, গুরুর বর্ণিত পথ ধরেই এগোতে হবে।" আবার বলা হয়েছে—"গুরু প্রসন্ন হলেই তুমি সম্পূর্ণ অভিষেক লাভ করবে। তার আশীর্বাদে সমস্ত ভুল শুদ্ধ হবে এবং তুমি যথার্থ উপলব্ধির (বোধি) উপযুক্ত হয়ে উঠবে।"[২২]

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের রচনা এবং তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি প্রবণতা বোঝা সম্ভব। প্রথমত, তিব্বত বারবার বৌদ্ধ আচার্যদের নিয়ে যেত শাস্ত্র সংশোধন করতে। বোঝা যায় মূলের প্রতি একটি বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার চেষ্টা এদের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। দ্বিতীয়ত, অতীশ দীপঙ্কর নিজে তন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, সুতরাং তিব্বতে গিয়ে তন্ত্রপৃক্ত বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধার থেকে মূলত বুঝতে হবে আচারের সংস্কার।

---

[১৯] চট্টোপাধ্যায়, অলকা. অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান. কলকাতা : অনুষ্টুপ. ২০১৮. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৬০-৬১।

[২০] Chattopadhyay, Alaka. *Atisa and Tibet*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2011. Reprint. p. 510

[২১] তদেব, পৃ. ৫১৮

[২২] Shastri, Lobsang Norbu. *Bodhipathaprasipah of Acharya Dipankar Srijnana*. Sarnath: Central University of Tibetan Studies. 2014. 3rd Revised Edition. pp. 62-63

তৃতীয়ত, অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষার বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহাযানী এবং তন্ত্রযানী বৌদ্ধরাও থেরবাদ-কে বাদ দিয়ে শাস্ত্র শিক্ষা করতেন না। চতুর্থত, অতীশের দীক্ষা প্রসঙ্গে দেখার যে তিনি যাঁদের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, গুরু হিসেবে তাঁরা শিষ্যকে তত্ত্ব শিক্ষার থেকে বেশি ক্রিয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন। থেরবাদ এবং মহাযানের সঙ্গে এটি একটি দরকারি তফাত। পঞ্চমত, অতীশের লেখায় সরাসরি গুরু কথা আসছে। গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধবচন, তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত নয়, গুরুর পথই শিষ্যের অবলম্বন। বিশেষত গুরু বাণীর উপর সরাসরি এতটা গুরুত্ব আমরা দেখিনি। বলা যেতে পারে আগের উপাধ্যায় ও আচার্যের সঙ্গে এই অবস্থার গুরুর ফারাক কোথায়? আগে আচার্য-উপাধ্যায় শীল-চর্যার শিক্ষা দিতে গিয়ে বুদ্ধবচনেরই সাহায্য নিতেন, বুদ্ধ কথিত পথই ছিল একমাত্র পালনীয়। সেক্ষেত্রে আচার্যদের স্বাধীন ভূমিকা ছিল না। মহাযানীরাও শীল-চর্যা স্বীকার করতেন বলে তত্ত্ব প্রস্থান নির্মাণ করাই ছিল মহাযানী গুরুদের নিজস্বতা। এখানে আমরা দেখছি গ্রন্থ নয় গুরুই সব। শিষ্যের চিত্তমন গুরু বাণীর মাধ্যমেই মার্জিত হবে, গুরু প্রসন্ন হলেই অভিষেক সম্পন্ন হবে। ষষ্ঠত, *বোধিপথপ্রদীপ* নাম থেকে বোঝা যায় এখানে 'বোধিচিত্ত' অর্জনের পথ বলা হবে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 'বোধি' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। তাঁর সময়ে বঙ্গদেশের সিদ্ধাচার্যরা তখন 'সহজ'কেই মূল সাধ্য করে তুলেছিল। মনে রাখতে হবে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সঙ্ঘকেন্দ্রিক বৌদ্ধধর্মের আচার্য ছিলেন। অন্যদিকে সিদ্ধাচার্যেরা সঙ্ঘানুশাসন যে খুব মানতেন না তার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নয়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য অতীশ দীপঙ্করের রচনা থেকে বঙ্গদেশের সমকালে বৌদ্ধধর্মের আরেকটি বিস্তারের সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। গুরু প্রসঙ্গে বহির্ভারত কী অবস্থায় ছিল তাও বোঝা যাচ্ছে। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করার আগে 'বন্' ধর্ম প্রচলিত ছিল। মূলত আদিম আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মবিশ্বাস কেন্দ্রিক 'বন্' ধর্ম পুরোহিতদের দ্বারাই চালিত হত। 'বন্' ধর্ম বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রভাব দেখা যাবে, একইভাবে 'বন্' ধর্মে মন্ত্র এবং জাদুবিদ্যাকেন্দ্রিক সংস্কার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছে। এর প্রমাণ আমরা সিদ্ধাচার্যদের অলৌকিক কার্যক্রম থেকে পাচ্ছি। এছাড়াও আমরা দেখেছি তিব্বতে শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বুদ্ধদেবের থেকে বেশি আদৃত। এটাই স্বাভাবিক। মানুষের

কাছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। এছাড়া এঁরা নিজেদের তত্ত্ব প্রকাশে কুণ্ঠাও বোধ করতেন না। তাই তিব্বতে সরাসরি পদ্মসম্ভব ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আরাধনাকে আমরা গুরু উপাসনার নিদর্শন হিসাবেই দেখব। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের চারটি শাখার প্রসার হয়েছে। এর মধ্যে গেলুক সম্প্রদায় ব্যতীত তিনটি সম্প্রদায়ই গুরুকেন্দ্রিক। প্রাচীনতম শাখা Nyingma গুরু সমন্তভদ্রকে নিজ শাখার প্রবর্তক মনে করে।[২৩] এছাড়াও এঁরা আদি পর্যায়ের বৌদ্ধ আচার্যদের উপাসনা করেন, যেমন—বিমলমিত্র, বৈরোচন এবং শান্তরক্ষিত। Kagyu সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য তিলোপা (৯৮৮-১০৬৯ খ্রি)।[২৪] Sakya সম্প্রদায় বিরূপা-কে নিজেদের শাখার প্রবর্তক বলে স্বীকার করছে।[২৫] এই প্রত্যেকটি শাখার পৃথক সঙ্ঘ নিয়ম এবং তত্ত্ব প্রস্থান রয়েছে। গুরুকেন্দ্রিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা এবং তার বিস্তার থেকে বোঝা যায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাস গুরুকেন্দ্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

৪.২ বঙ্গদেশের সমাজ-পটভূমি এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বঙ্গদেশের ধর্মীয় ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের জানা প্রয়োজন বৌদ্ধধর্মের আগে বঙ্গদেশের ধর্মীয় পটভূমি কীরকম ছিল? এবিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সত্যিই অপ্রতুল। বঙ্গদেশ আদৌ আর্যাবর্তের সীমার অন্তর্গত ছিল কি না তা নিয়ে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুসারে পুণ্ড্রদেশে প্রবেশ করলে পাতক হয় এবং সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টি যজ্ঞের মাধ্যমে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বৌধায়ন এবং হিরণ্যকেশী স্রৌতসূত্র অনুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থযাত্রার জন্য যাওয়া চলে কিন্তু ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করলে দোষমুক্ত হওয়া যায়। তবে *মনুসংহিতা*-য় বর্ণিত সীমা অনুযায়ী পূর্ব-পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বত

---

[২৩] Powers, John. *Introduction to Tibetan Buddhism*. New York: Snow Lion Publicatios. 2007. Revised Edition. pp. 367-368

[২৪] তদেব, পৃ. ৩৯৯

[২৫] তদেব, পৃ. ৪৩৩

—এই সীমায় যেখানে কৃষ্ণসার হরিণ বিচরণ করে তাকেই যজ্ঞের উপযুক্ত ভূমি বলে মনে করা যাবে। বঙ্গদেশে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে পালবংশের রাজা দেবপাল দেবের মুঙ্গের অনুশাসনে অশ্বলায়ন শাখার বেদার্থবিদ্ যাজ্ঞিকদের কথা পাচ্ছি। এই অনুশাসনে ব্রাহ্মণদের শ্রম দান করার কথা পাচ্ছি।[২৬] বঙ্গদেশে গুপ্ত রাজাদের মধ্যে প্রথম কুমার গুপ্ত (৪১৪-৫৫ খ্রি.) এবং দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত (৪৬৫-৭৫ খ্রি.)-এর জারি করা কিছু অনুশাসন পাওয়া যাচ্ছে রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া অঞ্চলে।[২৭] বঙ্গদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে ৫০৭ খ্রিস্টাব্দে (বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে প্রাপ্ত) গুপ্ত সম্রাট বৈন্যগুপ্তর (আ. ৪৯৫-৫০৯ খ্রি.) প্রবর্তিত গুণাইঘর অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈন্যগুপ্ত বঙ্গদেশ ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন করেছিলেন। নালন্দাতে তাঁর নামাঙ্কিত সিল-এ 'মহারাজাধিরাজ' বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়।[২৮] বৈন্যগুপ্ত নিজে ছিলে শৈব। তাঁর অনুশাসনে বেদ এবং ইতিহাস শ্রেণির রচনার উল্লেখ পাচ্ছি।[২৯] অনুশাসনে হীনযান এবং মহাযান দুই শাখার বৌদ্ধদেরই দানের কথা উৎকীর্ণ হয়েছে। পাল রাজবংশের প্রথম রাজা গোপাল (৭৫০-৭৫ খ্রি.) প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে বঙ্গদেশ শাসন শুরু করেন। প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া বলতে কী বোঝায় অথবা বর্ণনাটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কি না এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে।[৩০] তবে গোপালের পুত্র ধর্মপালের সুবিখ্যাত খালিমপুর প্রশস্তি থেকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ধারাবাহিক ইতিহাসের সূচনা বলা যায়। এই অনুশাসনে ধর্মপালকে বজ্রতুল্য 'সুদৃঢ় সিংসাহনে অধিষ্ঠিত' বলা

---

[২৬] বাগচী, প্রবোধচন্দ্র. *প্রবন্ধ সংগ্রহ.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. ২০০১. প্রথম সং. পৃ. ৩০-৩১

[২৭] সরকার, দীনেশচন্দ্র. *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত.* কলকাতা : সাহিত্যলোক. ২০১৫. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ১৫-১৬

[২৮] Sircar, Dines Chandr. Select Inscription Bearing on India History and Civilization. Calcutta : University of Calcutta. 1942. 1st Edition. pp. 331-332

[২৯] Ghosh, Monomohan. 'Newly Discovered Gunaighar Grant'. Indian Historical Quarterly. Narendranth Law Edited. Vol. VI. 1930. p. 561

[৩০] সরকার, দীনেশচন্দ্র. *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত.* কলকাতা : সাহিত্যলোক. ২০০৯. সংশোধিত ও সংযোজিত নতুন সংস্করণ. পৃ. ৫৬-৫৯

হয়েছে।[৩১] প্রথমেই প্রণতি জ্ঞাপিত হয়েছে মারবিজয়ী বজ্রাসনে অধিষ্ঠিত গৌতমবুদ্ধের প্রতি। দেবপাল (৮১০-৪৭ খ্রি.)-এর নালন্দা ও মুঙ্গের লিপিতে (সিদ্ধার্থের সিদ্ধি প্রজাগণের সর্বোত্তম সিদ্ধিবিধান করুক'-এই বন্দনাটি পাওয়া যাবে।[৩২] এছাড়াও পূর্ববঙ্গের রাজাদের মধ্যে চন্দ্রবংশীয়েরা সকলেই ছিলেন 'পরম সৌগত'। পাল রাজা এবং চন্দ্র বংশের রাজাদের অনুশাসনে বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন ব্যবহৃত হত। একাধিক বৌদ্ধ বিহার ছিল পূর্ববঙ্গে। ময়নামতী এবং সোমপুর বিহার যার মধ্যে অন্যতম। সোমপুর মহাবিহারে ভবদেবের তাম্রলিপি এবং ময়নামতী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটার উপকরণে বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি দেখতে পাচ্ছি।[৩৩] এছাড়া অনেকগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে মৃগের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। পাল যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে বঙ্গদেশে শিব এবং বুদ্ধের যুগ্মমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে, এই মূর্তিগুলিকে 'শিব-লোকেশ্বর মূর্তি' বলে চেনা হয়। এছাড়াও বিষ্ণু এবং বুদ্ধের যুগ্ম মূর্তিও পরিকল্পিত হয়েছিল, কিন্তু এটি জনপ্রিয় হয়নি।[৩৪] মনে রাখতে হবে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের উল্লেখ আমাদের আলোচিত সময়পর্বের অনেক আগেই পাওয়া গেছে। অশোক পরবর্তী সময়ে সাঁচীতে প্রাপ্ত ঔদ্দেশিক স্তূপে পুণ্ড্রবর্ধন নিবাসীদের দানের কথা পাওয়া যাচ্ছে এবং খ্রি. তৃতীয়-চতুর্থ অব্দে নাগার্জুনিকোণ্ডায়

---

[৩১] মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার. *গৌড়লেখমালা* (প্রথম স্তবক). রাজশাহী : বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি. ১৩১৯ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ১৮।

[৩২] রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব).* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. ১৪২০ বঙ্গাব্দ. অষ্টম সংস্করণ. পৃ. ৫২১।

[৩৩] Sircar, D.C. *Epigraphic Discoveries in East Pakistan*. Calcutta: Sanskrit College. 1973. 1st Edition. pp. 4-6

[৩৪] দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ. *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম.* কলকাতা : শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ. ১৪০৭ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ৪০

প্রাপ্ত অনুশাসনে 'বঙ্গ'-কে বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখযোগ্য স্থান বলে স্বীকার করা হয়েছে।[৩৫] অতএব বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সূচনা বলতে আমরা খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতককে ধরতে পারি। পাল যুগ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বঙ্গদেশের প্রধান ধর্মমতের স্বীকৃতি অর্জন করছে। চিন থেকে আগত পর্যটকদের বিবরণে বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্মের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। য়ুয়ান চুয়াং-এর ভ্রমণ বিবরণ *সিউ-ইউ-কি*-র দশমভাগে বঙ্গদেশের বৌদ্ধ মঠের বিবরণ পাওয়া যাবে। পুণ্ড্রবর্ধনে য়ুয়ান চুয়াং ২০টি সঙ্ঘারামে প্রায় তিন হাজার ভিক্ষু এবং রাজধানী থেকে কিছু দূরে অবস্থিত পো-চি-পো বিহারে সাতশ ভিক্ষুর আবাসস্থল দেখেছিলেন। সমতটে ত্রিশটি সংঘারামে দুই হাজার স্থবিরবাদী ভিক্ষু এবং নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীদের কথা এবং একটি আট ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাম্রলিপ্তে দশটি সঙ্ঘারামে হাজার ভিক্ষুর বাস এবং অশোক নির্মিত একটি স্তূপের কথা পাওয়া যাচ্ছে এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি সঙ্ঘারামে দুই হাজার হীনযানী শাখার বৌদ্ধদের বসবাসের কথা পাচ্ছি।[৩৬] য়ুয়ান চুয়াং-এর পরে ইৎসিঙ (৬৩৫-৭১৩ খ্রি.) ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর বিবরণে তাম্রলিপ্তের বর্ণনা পাচ্ছি। তাম্রলিপ্তে এসে ইৎসিঙ ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করতে চাইলে বাকি ভিক্ষুরা বলেন অতিথির যথাযথ আপ্যায়নের জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার, অতিথি অল্প খাদ্য গ্রহণ করলেও এটিই রেওয়াজ।[৩৭] উপাসনার ক্ষেত্রে তাম্রলিপ্তের ভিক্ষুদের পৃথক আচারের কথাও আমরা ইৎ-সিঙের বর্ণনায় দেখতে পাই। তাম্রলিপ্তে ইৎ-সিঙ চার বছর ছিলেন। ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাম্রলিপ্তে আসেন এবং এখানে সংস্কৃত ভাষা এবং ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। এরপরে তিব্বতের পরিব্রাজক লামা তারনাথের বিবরণে

---

[৩৫] Khettry, Sarita. Buddhism. *History of Bangladesh Early Bengal in Regional Perspectives (up to C. 1200 CE)*. Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarty Edited. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 2018. p. 298

[৩৬] সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ (অনু). *বৌদ্ধযুগের ভারত – হিউয়েন সাং.* কলকাত : পত্রলেখা. ২০১৭. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১৬০-৬২

[৩৭] Takakusu, J (Translated). *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelaco by I-Tsing.* London : Oxford, The Clarendon Press. 196. 1st Edition. p. 40

বঙ্গদেশের পাল রাজাদের কথা পাওয়া যায়। তারনাথ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিবরণটি লেখেন। তারনাথের মতে ধর্মপালের গুরু ছিলেন হরিভদ্র এবং জ্ঞানপদ। এঁরা *প্রজ্ঞাপারমিতা* এবং *গুহ্যসমাজতন্ত্র*-এর মতে ধর্মপালকে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা দান করেন। তাঁর সময়েই সিদ্ধ কুক্কুরী পা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারনাথের মতে ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহার নির্মাণ করেন।[৩৮] তারনাথের বিবরণ অনেক পরবর্তী সময়ে রচিত। একারণে হয়তো তাঁর বর্ণনায় অলৌকিকতার উপাদান বেশি, কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের অনেক তথ্যই তারনাথের বর্ণনায় পাচ্ছি। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং পর্যটকের বিবরণ থেকে বঙ্গদেশে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত তন্ত্রযান অর্থাৎ বজ্রযানী সাধনার জনপ্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিত বোঝা যায়। নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গে বঙ্গদেশের বিহারগুলির সরাসরি যোগাযোগ ছিল। সূক্ষ্মভাবে দেখলে য়ুয়ান চুয়াং-এর সমসময়ে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রবল আকার ধারণ করেনি। পাল যুগ থেকে তন্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর অনুশাসন বঙ্গদেশের সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি সমর্পণ করার প্রথম নিদর্শন। এই অনুশাসনে মঠের প্রধান ভিক্ষু শান্তিদেবের নাম পাওয়া যাচ্ছে, এখানে ভূমিদান করার কারণ ছিল মঠের ধর্মীয় খরচ নির্বাহ।[৩৯] সমতট অঞ্চলে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক অবধি এরকম একাধিক দানপত্র পাওয়া যাচ্ছে যেখানে বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যে ভূমিকদান করা হয়েছে গুনাইঘর অনুশাসন মূলত মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেই ছিল। প্রসঙ্গত আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গদেশে জৈন এবং আজীবিকদেরও প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে হয়েছিল। জৈনরা বঙ্গদেশে বিশেষ সম্মান অর্জন করেননি এর প্রমাণ *ভগবতী সূত্র*-তে রয়েছে। আজীবিকদের প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বৌদ্ধশাস্ত্র *দিব্যাবদান*-এ উল্লিখিত ‘পুণ্ড্র’ শব্দটির অর্থ পৌণ্ড্রবর্ধন ধরে

---

[৩৮] Lama, Chimpa & Alaka Chattopadhyaya (Trans.), *Tarnth’s History of Buddhism in India*. Calcutta: K.P. Bagchi & Company. 1980. Reprint. p. 274.

[৩৯] Morrisom, Barrie M. *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*. USA: The Association for Asian Studies. 1970. 1st Edition. p. 115

বলছেন সম্ভবত বঙ্গদেশে নির্গ্রন্থ এবং আজীবিকদের বসবাস ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে।[৪০] বঙ্গদেশে আজীবিক শ্রমণদের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় ৪১১ খ্রিস্টাব্দে নাথচন্দ্র নামক একজন রাজার আজীবিকদের ভূমিদান পত্র থেকে। এই পত্রটি সরাসরি পাওয়া না গেলেও বৈন্যগুপ্তের প্রচারিত একটি অনুশাসনে নাথচন্দ্রের দানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।[৪১] এছাড়াও সমতট অঞ্চলে আজীবিকদের নির্মিত একটি আয়তন মন্দিরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে বঙ্গদেশের পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে। সুতরাং বঙ্গদেশে কেবল বৌদ্ধ ধর্মই নয় আজীবিকদের অস্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে শ্রামণ্যধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মই বঙ্গদেশে সব চাইতে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

বঙ্গদেশে মহাযানী এবং স্থবিরবাদী দুটি শাখারই অস্তিত্বের কথা পর্যটকদের বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে। চৈনিক পর্যটক সেঙচি ইৎ-সিঙের সমসময়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় সমতটের রাজা রাজভট্টের কথা পাওয়া যাচ্ছে যিনি ত্রিরত্নের উপাসনা করতেন, প্রত্যেক দিন মাটির এক হাজার বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করতেন, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র-এর এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করতেন এবং অবলোকিতেশ্বরের সামনে অজস্র উপহার উৎসর্গ করতেন।[৪২] বৌদ্ধ শাখার মধ্যে বঙ্গদেশের পৌণ্ড্রবর্ধনে চ্ছবগ্গিয় শাখার অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায় মহাস্থানগড় অনুশাসনে। য়ুয়ান-চুয়াং-এর বিবরণ অনুযায়ী পৌণ্ডবর্ধনে হীনযান এবং মহাযান সম্প্রদায় তাম্রলিপ্তে সর্বাস্তিবাসী, কর্ণসুবর্ণে সম্মতিয় এবং সমতটে মহাযানীদের অবস্থান ছিল।

---

৪০ রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*. কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. ১৪২০ বঙ্গাব্দ. অষ্টম সং. পৃ. ৪৯৪

৪১ Basu Majumdar. Susmita. The Ajivikas in Eastern India and Bangladesh. *History of Bangladesh Early Bengal in Regional Perspectives (upto C. 1200E)*. Abdul Momin Chowdhury & Ranabir Chakravarti Edited. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 2018. pp. 341-350

৪২ Bagchi, P.C. Religion. *The History of Bengal* (Vol-I, Chapter-XIII). R.C. Majumdar Edited. Dacca: The University of Dacca. 1943. 1st Edition. p. 414

চৈনিক পর্যটকেরা আমরা যে অর্থে হীনযান এবং মহাযান শব্দগুলি ব্যবহার করি সেই অর্থে ব্যবহার করতেন না। তাঁদের মতে হীনযান এবং মহাযান একইধর্মের দুটি পর্যায় বলে বিবেচিত হয়েছে। হীনযান হল প্রথম স্তর এবং মহাযান হল উন্নততর স্তর। এমনকি য়ুয়ান চুয়ান কলিঙ্গের বৌদ্ধদের 'মহাযানীস্থবিরবাদী শাখা'-র অন্তর্গত বলে মনে করেছলেন যা আমাদের বর্তমান সংজ্ঞার পরিপন্থী।[৪৩] তিব্বতি শাস্ত্র অনুযায়ী বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হয়েছিল চন্দ্রবংশের রাজা গোপীচন্দ্রের সমকালে। পাল রাজাদের সমকালে তন্ত্র বৌদ্ধধর্মের পরিচয় থেকে বোঝা যাবে অষ্টম-নবম শতকে বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম চৈনিক পর্যটনের বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বঙ্গদেশে বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাচ্ছি। এর মধ্যে একটি বরেন্দ্র অঞ্চলের বিহারের কথা পাওয়া যাবে যা মূলত চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত হয়েছিল।[৪৪] এছাড়া বঙ্গদেশে প্রায় তেইশটি বৌদ্ধ মঠ, বিহার ও সঙ্ঘারামের কথা পাওয়া যাচ্ছে—যার মধ্যে কর্ণসুবর্ণের বঙ্গভিত্তি সঙ্ঘারাম, বজ্রযোগিনী মঠ, সোমপুরী বিহার, হলুদ বিহারের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।[৪৫] বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ উপাসক-উপাসিকাদের এবং বৌদ্ধ মঠের সঙ্গে সংলগ্ন অঞ্চলের যোগাযোগ থেকে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল বঙ্গদেশে সে সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ইৎ সিঙ তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধ মঠের আওতাভুক্ত জমিতে বাইরের লোক দিয়ে চাষ করাতেন এবং উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের একভাগ নিতেন মঠের ভিক্ষুরা এবং বাকি দুই ভাগ নিতেন চাষীরা। বঙ্গদেশে কিছু ভিক্ষুণী মঠ ছিল যেখানকার ভিক্ষুণীরা ভিক্ষু মঠে আসার আগে অনুমতি নিয়ে আসতেন। এছাড়া বঙ্গদেশে শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে শিশুশিক্ষা গ্রন্থ 'সিদ্ধিরস্তু' পড়ানো হত, ছয় বছর বয়স থেকে পড়ানো শুরু হত।[৪৬]

---

[৪৩] তদেব, পৃ. ৪১৬

[৪৪] Niyogi, Puspa. Buddhism in Ancient Bengal. Calcutta: Jijnasa. 1st Edition. p. 59

[৪৫] পাঠক, সুনীতিকুমার. 'তিব্বতি স্রোতে প্রাচীনবঙ্গের বৌদ্ধমত'. *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম.* ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া সম্পাদিত. কলকাতা : নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন. ২০১৩. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১৫১

[৪৬] সেন, সুকুমার. বঙ্গভূমিকা. প্রবন্ধ সংকলন (৪). কলকাতা : আনন্দ. ২০১৮. প্রথম সং. পৃ. ২৮-৩১

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের পালনের পাশাপাশি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের বেশ কিছু কথা পাওয়া যায়। নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতট অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পড়াশোনায় আগ্রহের কারণে দেশভ্রমণে যান এবং নালন্দায় ধর্মপালের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কালক্রমে তাঁর খ্যাতি বিশ্বে প্রসারিত হয়। শীলভদ্রের সঙ্গে পর্যটক য়ুয়ান চুয়াং-এর সাক্ষাৎ হয় এবং শীলভদ্র য়ুয়ান চুয়াং-এর যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেন।[৪৭] বঙ্গদেশের মহাবিহার জগদ্দলের পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এছাড়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বোঝা যায় বঙ্গদেশে কেবল ধর্ম হিসেবেই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ছিল না, বরং তত্ত্বরচনা, অধ্যাপনার মাধ্যমে বঙ্গদেশে একটি তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল। বিদ্যাকর সংকলিত *সুভাষিতরত্নকোষ*-এ আমরা বঙ্গদেশের কবিদের রচিত বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব বন্দনার সংকলন পাচ্ছি। বঙ্গদেশে দুজন বোধিসত্ত্ব নবম-দশম শতাব্দীতেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন বলে বোঝা যায়। প্রথমত, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর যাকে বিদ্যাকর-এর কাব্যে লোকেশ্বর বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হলেন বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষ অথবা মঞ্জুশ্রী। নিজে অর্হত্ব লাভ না করে সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার জন্যই যে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর অর্হত্ব অর্জন করেননি একথা আমরা বিদ্যাকরের সংকলনে একাধিকবার পাচ্ছি। যেমন জ্ঞানশ্রীমিত্র নামক কবির বন্দনায় দেখব— "যদি তার জঠর এত ক্ষুদ্র না হত, এবং তার হৃদয় যদি এত বড় না হত, তাহলে তিনি নিজের মুক্তিতে এত মন্থর হতেন কীভাবে অথবা সকলের উপকারই বা তার শুভ কামনা করতেন কীভাবে?"[৪৮] অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা দরকার বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে তৎকালে রসায়ন এবং অপরসায়ন অথবা কিমিতির (Alchemy)-র চর্চারও প্রসার হয়েছিল। একাধিক শাস্ত্র যেমন 'রসরত্নাকর'-এ আচার্য নাগার্জুন এবং রাজা সালিবাহন-এর সংলাপে রাসায়নিক

---

[৪৭] শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. প্রাচীন বাংলার গৌরব. কলকাতা : বিশ্বভারতী. ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৮-৩১

[৪৮] Ingalls, Dniel H H. *An Anthology of Sanskrit Court Poetry Vidyakara's subhshitaratnakosa'*, Massachusetts: Havard University Press. 1965. 1st Edition. p. 64

প্রক্রিয়ার কথা পাওয়া যাচ্ছে। নাগার্জুনকে বলা হয়েছে রসায়নাচার্য এবং বুদ্ধদেব স্বপ্নে তাঁকে এই শিক্ষা প্রদান করেন। এরপর দেখা যাচ্ছে বিক্রমশীলা মহাবিহারের পাঠ্যক্রমেও কিমিতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৪৯] সুতরাং বঙ্গদেশের বৌদ্ধ ধর্মে কিমিতি একটি পরিচিত বিষয় ছিল।

বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষিতটি বোঝা দরকার। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বোঝার জন্যও বাণিজ্যের কথা বলা যেতে পারে। পালযুগে বঙ্গের ব্রোঞ্জ শিল্প বিভিন্ন বিহারে আগত সন্ন্যাসী এবং পরিব্রাজকের সূত্রে জাভা-বালিতে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এক্ষেত্রে মূলত নালন্দা মহাবিহারের ব্রোঞ্জ কারিগরিতে উন্নতি এবং ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করার কথাও বলা দরকার। সম্ভবত জাভা-বালি থেকে আগত পরিব্রাজকদের সংগৃহীত নিদর্শন থেকেই সে দেশে ব্রোঞ্জ শিল্প উন্নতি লাভ করেছিল।[৫০] এছাড়াও বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতে বণিকদের সামাজিক সম্মান এবং বণিকদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহৃদয় মনোভাবের কথা জানা যাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ অর্থাৎ সমতট এবং হরিকেল (বর্তমানে বাংলাদেশের নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং ভারতবর্ষের ত্রিপুরা) অঞ্চলে বঙ্গোপসাগর ধরে একটি বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। এই বন্দর অঞ্চলগুলির সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং জাভা-বালি অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। বৌদ্ধ মঠগুলি থেকে মূলত ব্রোঞ্জের মূর্তি এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপ এই সব অঞ্চলে রপ্তানি হত। বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ময়নামতী অঞ্চলের বিহারগুলি থেকে অজস্র রূপার বোধিসত্ত্ব ও তারা মূর্তি পাওয়া গেছে। বোঝা যায় মহাযান এবং তন্ত্রযান-কালচক্রযানের সূত্রে যে মূর্তি তত্ত্বের বিস্তার হয়েছিল তার সঙ্গে এই বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়াও নাবিক, সাধারণ মানুষের

---

৪৯ Ray, Prafulla Chandra. *A History of Hindu Chemistry*. Calcutta: The Bengal Chemical & Pramaceutical Works Limited. 1909. 1st Edition. p. XIII

৫০ Islam, Kamrunnesa. *Aspects of Economic History of Bengal C. 400-1200 A.D.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 1984. 1st Edition. p. 145

কাছেও উপাসনার বস্তু হিসাবে স্তূপ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সমুদ্রে জাহাজ বিপাকে পড়লে শ্রীলঙ্কার পরম্পরায় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের উপাসনা করা হত বলে জানা যায়। সুতরাং পালযুগের বণিকদের এবং বৌদ্ধ মঠের অন্যতম বাণিজ্যিক উপরকণ ছিল ব্রোঞ্জ।[৫১] খ্রিস্টীয় নবম শতকের প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে বঙ্গদেশের বৌদ্ধমঠগুলি বিপুল পরিমাণ জমি দান স্বরূপ পেয়েছিল। বৈন্যগুপ্তের অনুশাসন ছাড়াও আমরা কৈলান আশরফপুর, দেবপর্বত অনুশাসনেও বিপুল পরিমাণ ভূমি বৌদ্ধমঠে সমর্পণ করা হয়েছে—এই প্রমাণ পাচ্ছি।[৫২] এছাড়াও বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত ধাতুপাতের উপর খোদিত একটি অনুশাসনে ধর্মসভা বিহার তেইশ দ্রোণবাপস জমি আশেপাশের বাসিন্দাদের থেকে ক্রমশ ক্রয় করে নিয়েছিল এই কথা উৎকীর্ণ হিসাবে পাচ্ছি। এছাড়াও কখনও কখনও ভিক্ষুরা সরাসরি চাষবাসের কাজে অংশগ্রহণ করছেন এমনও দেখা যাচ্ছে। এই বিপুল ভূসম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য রাজানুগ্রহের দরকার। আমরা সেঙ চি-র বর্ণনাতে দেখেছি সমতটের রাজা কতটা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পাল রাজাদের সময়েও এই সুসম্পর্ক বজায় ছিল। ধর্মপালের প্রদত্ত ভূমিদানের কথা পাওয়া যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত এক অনুশাসনে। এছাড়াও পালযুগের থেকে অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়কে ভূমি দান করার ইতিহাস আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহীপাল এবং নয়পালের সঙ্গে মত্তময়ূর শাখার শৈবদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল।[৫৩] নারায়ণ পালের ভাগলপুর অনুশাসনে পাশুপতি শৈবদের গ্রাম দান করার কথা পাচ্ছি। এই দানপত্রগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে পাল রাজারা ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে বিশেষ কোনো বিবাদে যাননি এবং রাজ্য পরিচালনের আবশ্যিক অংশ হিসাবে কেবল বৌদ্ধদেরই নয় অন্যান্য ধর্ম

---

৫১ Ghosh, Suchandra. *Locating South Eastern Bengal in the Buddhist Network of Bay of Bengal (C. 7^{th} Centruy – ce 13th)*. Proceedings of the India History Congress. Vol. 74. 2013. pp. 148-153

৫২ Furui, Ryosuke. *Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the fifth to the Thirteenth Century*. Ph.D thesis submitted to Jawaharlal Nehuru University. 2007. pp. 152-154

৫৩ তদেব. পৃ. ২০২

সম্প্রদায়ের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম অষ্টম-নবম শতাব্দীতে রীতিমত সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। সুপ্রতিষ্ঠিত, সংহত, শাস্ত্রানুগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্মের বিপ্রতীপেই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রাখা সম্ভব। যদিও মনে রাখতে হবে এই বিপ্রতীপতা অনেক বেশি করে ব্যাবহারিক, তাত্ত্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে বিরোধিতার অবকাশ হয়তো ততটা ছিল না। বৌদ্ধমঠগুলির এহেন অবস্থার ক্রমশ ক্ষয় শুরু হয়েছিল সেন যুগে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি দাক্ষিণাত্য থেকে আগত ব্রাহ্মণ্য মনোভাবাপন্ন সেন রাজাদের বিশেষ অনুরাগ ছিল না। আমরা একারণেই দেখছি বিদ্যাকর-এর সংকলনে বৌদ্ধদের তুলনায় ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের কবিতাই বেশি সংকলিত হয়েছে। সেন রাজাদের বৌদ্ধধর্মে অনাগ্রহের সঙ্গে বঙ্গদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সম্পর্ক রয়েছে। তবে কেবল সেন রাজাদের অনাগ্রহ অথবা ইসলামের আক্রমণের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সম্পর্ককে বর্তমান ঐতিহাসিকেরা সমর্থন করেন না। তাঁরা অনেক বেশি করে বঙ্গদেশের জনমানসে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার কথা বলেন যেখানে বৌদ্ধধর্মের আচার, ধর্মীয় অভ্যাস ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অঙ্গীভূত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[৫৪] তবে সেন রাজাদের বৌদ্ধধর্মে অনাগ্রহ, সংগঠিত বৌদ্ধধর্মের ক্রমশ অবক্ষয়, সিদ্ধাচার্যদের জনপ্রিয়তা এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ক্রমশ ব্যাপ্তি—এই কার্যকারণ সূত্রেই আমরা বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসকে দেখতে চাইব।

বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং বিকাশ হয়েছিল সিদ্ধাচার্যদের হাতে। সাধারণ বৌদ্ধ সঙ্ঘজীবী সন্ন্যাসীদের 'ভিক্ষু' অথবা 'ভন্তে' নামে সম্বোধন করা হলেও বঙ্গদেশে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রসারে যুক্ত গুরুদের সিদ্ধ অথবা সিদ্ধাচার্য নামে সম্বোধন করা হয়েছে। সাধারণভাবে 'সিদ্ধ' বলতে সম্পন্ন, নিবৃত্ত, অমোঘ, অব্যর্থ এবং লোকপ্রচলিত বোঝালেও

---

[৫৪] Ling, Trevor. *Buddhist Bengal, and After. History and Society Essays in honour of Professor Niharranjan Roy*. Debiprasd Chattopadhyay Edited. Calcutta: K.P. Bagchi & Company. 1976. 1st Edition. pp. 317-324

বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিভাষায় সিদ্ধ বলতে বোঝাচ্ছে সিদ্ধিপ্রাপ্ত, মন্ত্রসিদ্ধ, অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ ইত্যাদি ক্ষমতার অধিকারী মুক্ত মানুষকে। এই অর্থগুলিও আভিধানিক ভাবে স্বীকৃত।[৫৫] ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে সিদ্ধ বলতে সালোক্য প্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে বোঝানো হয়েছে।[৫৬] উভয় ক্ষেত্রেই 'সিদ্ধ'দের মধ্যে যে অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শনের ক্ষমতা রয়েছে তা স্বীকৃত। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের অবস্থান, সময়কাল, গ্রন্থ, ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নানা মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এই সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে আদি অথবা প্রথম সিদ্ধাচার্য কে সে বিষয়েও নানা মতপার্থক্য রয়েছে। তিব্বতি ভিক্ষু মোনডুপ শেরপা কর্তৃক তিব্বতি ভাষায় অনুবাদিত এবং অভয়দত্তশ্রী কথিত চুরাশিজন সিদ্ধের জীবনকথার সংকলন 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রভৃতি' অনুযায়ী আদি সিদ্ধাচার্যরূপে স্বীকৃত লুই পা। অনেকে মনে করেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবং লুই পা প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর মানুষ লুই পা। লুই পা মুনি দত্ত টীকা সম্বলিত চর্যাগীতিতেও অত্যন্ত সম্মানিত একজন সিদ্ধ। লুই পা আজও বঙ্গদেশের বিভিন্ন এলাকায় পূজিত, বাঁকুড়াতে লুই পা-এর নামে মেলা বসে। ভাষাতাত্ত্বিকেরাও লুই পা-কে প্রাচীনতম সিদ্ধাচার্য মনে করছেন।[৫৭] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদনায় তেত্রিশ জন সিদ্ধাচার্যের কথা সংকলিত করেন। তবে সিদ্ধাচার্যদের মোট সংখ্যা চুরাশি, কারো মতে আবার পঁচাশি।[৫৮] সিংহলের *নিকয়-সংগ্রহ*-এ রাজা মত-বল-সেনের সমকালে একজন বজ্রযানী সিদ্ধর সিংহল যাত্রা এবং রাজা বজ্রযানে দীক্ষা দান করার কথা পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে প্রজাদের মধ্যেও বজ্রযান জনপ্রিয় হয় এবং *রত্নকূট* জাতীয় গ্রন্থের প্রচার হয়। পরবর্তীকালে সিংহলের রাজারা বজ্রযানী মতে বিশেষ

---

[৫৫] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (দ্বিতীয় খণ্ড). নিউ দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১. অষ্টম মুদ্রণ. পৃ. ২২১৬

[৫৬] Williams, M.M. *A Sanskrit-English Dictionary*. Delhi: MLBD. 2002. Corrected Edition. p. 1215

[৫৭] Chatterjee, Suniti Kumar. *The Origin and Development of the Bengali Language*. New Delhi : Rupa Publication. 2017. Fifth Impression. p. 120

[৫৮] চট্টোপাধ্যায়, অলকা. *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী.* কলকাতা : অনুষ্টুপ. ২০১০. পরিবর্ধিত সং. পৃ. ৭৯

উৎসাহ প্রদর্শন না করলেও সিংহলের প্রজারা এই ধর্মকে পালন করতেন বলে জানা যায়।[৫৯] রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে সরহ পা ছিলেন আদি সিদ্ধাচার্য, রাজা ধর্মপালের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিস্টীয় নবম শতকে সরহ পা আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৬০] সরহ পূর্ববর্তী একশ বছর সময়কালকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন সাধারণ মন্ত্রযান এবং বজ্রযানের সন্ধিক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে মন্ত্রযানের সময়পর্ব খ্রি. ৪০০ থেকে খ্রি. ৮০০ অব্দ এবং বজ্রযানের সময়কাল ৯০০ খ্রি.-১২০০ খ্রি.। মন্ত্রযান মূলত 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' অনুযায়ী সঞ্চালিত হত, তবে বজ্রযান এবং মন্ত্রযানের মূল ফারাক মৈথুনকে স্বীকার করা নিয়ে। মন্ত্রযানের বহু পূর্বে বিশেষ অভিপ্রায়ে মহাযান মতে মৈথুনের প্রয়োগ স্বীকৃত হলেও বজ্রযানে তা বহুল প্রচারিত হয়।[৬১] সিদ্ধাচার্যদের রচনার ভাষা নিয়ে নানা মত পার্থক্য আছে। বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া এবং হিন্দি—উত্তর ভারতের এই কটি ভাষার প্রত্নরূপ হিসাবেই সিদ্ধাচার্যদের ভাষাকে রাখা সম্ভব। হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্ল সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে অনেকদূর শুদ্ধতাবাদী ছিলেন বলেই মনে হয় সিদ্ধাচার্যদের রচনাকে বিকৃত বৌদ্ধ সাহিত্য বলেছিলেন। সিদ্ধাচার্যদের ভাষাকে অনেকে বৌদ্ধ অপভ্রংশ বলেছেন। তবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তথাকথিত মার্জিত রুচির ইতিহাসে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাহিত্য ভাষা এবং বিশেষত বিষয়ের দিক থেকে বিকৃত মনে করার একটি সময়-নির্ভর কার্য-কারণ কাজ করে। যাই হোক সিদ্ধাচার্যদের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। সরহ পা-কে হিন্দির প্রথম কবি রূপে স্বীকার করা হয়। সরহ পা-র সময়কাল প্রসঙ্গে কোনো কোনো তিব্বতি শাস্ত্রে সরহ পা-কে কালিদাস অর্থা শুঙ্গ রাজা ভাগভদ্রের সমসাময়িক বলা হয়েছে। তবে এই তথ্যটি সম্পূর্ণই অবিশ্বাসযোগ্য এবং ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৬২] সিদ্ধাচার্যদের পরম্পরা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাবে বারবার বলা হয়েছে একই সিদ্ধাচার্য একই সময়ে অথবা নানা সময়ে নানা

---

৫৯ সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী.* এলাহাবাদ : কিতাব মহল. ১৯২৭. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৪৫

৬০ তদেব, পৃ. ২৪৮

৬১ তদেব, পৃ. ২৩৯

৬২ ভারতী, ধর্মবীর. *সিদ্ধ সাহিত্য.* নিউ দিল্লি : লোকভারতী প্রকাশন. ২০১৫. প্রথম সং. ২৫৯

দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমন সিদ্ধ জালন্ধরী পা জ্বালামুখী অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিই আবার পরে পূর্বদেশে হাড়ী পা নামে আবির্ভূত হন। আবার বলা হয়েছে বিরূ পা প্রথমে নালন্দায় ছিলেন, পরে তিনি বঙ্গদেশে রামপালের সময় উপস্থিত হন এবং তারপর চিনে গিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। লামা তারনাথের এই বিবরণের ঐতিহাসিকতা নেই, তবে এটুকু আন্দাজ করা যায় যে একই সিদ্ধের নানা স্থানে আবির্ভাব থেকে একটি গুরু পরম্পরার অনুমান করা সম্ভব, যাঁরা নিজেদের আদিগুরুর অথবা মার্গপ্রতিষ্ঠাতার নামেই পরিচয় দিতে আগ্রহ বোধ করতেন। যাই হোক, সিদ্ধাচার্যদের পরম্পরার কথা তিব্বতি উৎস ছাড়াও ভারতবর্ষের কিছু সাহিত্যে পাচ্ছি। যেমন—কবীর পন্থ এবং নাথ পন্থ চুরাশি সিদ্ধ-কে তাদের পরম্পরায় স্বীকার করেছেন।[৬৩] এই চুরাশি জন সকলেই মানুষ এবং এঁদের সকলেই যোগ সাধনার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন অতিলৌকিক ক্ষমতা, সব পরম্পরাতেই সিদ্ধরা সবাই পুরুষ। মিথিলার পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বরের *বর্ণ-রত্নাকর* গ্রন্থের সপ্তম কল্লোলে চুরাশি জন সিদ্ধের একটি অসমাপ্ত তালিকার পাশাপাশি শ্মশানে অবস্থিত বিভিন্ন ভৈরব, ভৈরবী, বেতাল এবং কাপালিকদের কথয়া পাওয়া যাচ্ছে।[৬৪] বঙ্গদেশের প্রসঙ্গে সিদ্ধাচার্যরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বজ্রযানের প্রসারে, তবে সিদ্ধ বলতে বজ্রযান ছাড়াও কয়েকটি সাধন-পরম্পরার কথা পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সিদ্ধ-কেন্দ্রিক ধর্ম-সংস্কৃতির কয়েকটি আলাদা প্রসঙ্গের আলোচনা করে আবার বজ্রযানী সিদ্ধদের কথায় ফিরব।

অনুশাসনের সাক্ষ্যে ‘সিদ্ধ’ শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহার দেখা যাচ্ছে খ্রি.পূ. দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতকে খারবেলের হাতিগুম্ফা অনুশাসনে, এখানে ‘সিদ্ধ’ বলতে মূলত জৈন সন্ন্যাসীদের বোঝানো হয়েছে। খ্রিস্টীয় ৪৭৫ অব্দে বন্ধুবর্মণের মন্দাসোর শিলালেখে সিদ্ধ বলতে সূর্যের

---

[৬৩] Bagchi, Prabodh Chandra. *Indological Studies*. Santiniketn: Research Publiction Committee, Visva-Bharati. 1982. 1st Edition. pp. 68-69

[৬৪] Chatterji, Sunity Kumar & Babua Misra (Edited). *Varna-Ratnakara of Jyotirisvwara Kavisekharacharya*. Calcutta: The Royal Asiatic Society of Bengal. 1940. 1st Edition. p. xxx

উপাসক এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারীদের বোঝানো হয়েছে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত সাহিত্যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী সিদ্ধদের রূপকল্প বহু কবিদের হাতেই পুষ্টি অর্জন করেছিল। এর মধ্যে সিদ্ধদের কোথাও কোথাও অসৎ এবং ক্ষতিকর হিসাবেও দেখানো হয়েছে। খ্রি. সপ্তম শতকে রচিত 'অবন্তিসুন্দরীকথা' কাব্যে সিদ্ধদের নরবলি দানের প্রসঙ্গ পাচ্ছি।[৬৫] এছাড়াও সিদ্ধ পরম্পরা শৈব এবং শাক্ত সাধনাতেও দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকের পূর্বেই। দক্ষিণ ভারতেও সিদ্ধদের পরম্পরার বিস্তার দেখা যাচ্ছে তামিল সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে সিদ্ধ বলতে মূলত অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন চিকিৎসক এবং সাধকদের বোঝায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি 'দেশীয়' শাখা হিসাবে আয়ুর্বেদের পাশাপাশি সিদ্ধ ঔষধির চর্চা ভারতবর্ষে প্রচলিত। তবে চিকিৎশাসাস্ত্রের অনিবার্য অংশরূপে সিদ্ধ ঔষধির অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে ভারতের নিজস্ব চিকিৎসার ইতিহাস নির্মাণের প্রেক্ষিত এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসার সাপেক্ষে নিজেদের ইতিহাসের নির্মাণের প্রচেষ্টাও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার বছরে মাদ্রাজে College of Integrated Medicine প্রতিষ্ঠার থেকে এই প্রচেষ্টার সূচনা হয়।[৬৬] তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে তামিল সিদ্ধদের গুরুত্ব যাই-ই হোক না কেন সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই পরম্পরার গুরুত্ব আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তামিল পরম্পরায় আঠারোজন সিদ্ধের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই সংখ্যাটি ঐতিহাসিক নয়, অনেক বেশি ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত বলেই অনুমান করা সমীচিন। তামিলে সিদ্ধদের রচনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথমত, একদল যাঁরা কিমিতি (alchemy) এবং চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত; দ্বিতীয়ত, একদল দার্শনিক এবং কবি যাঁরা তান্ত্রিক যোগের উপর একাধিক সাহিত্য রচনা করেছেন, যেমন—তিরুমূলর।

---

[৬৫] Davidson, Ronald M. *Indian Esoteric Buddhism A Social History of the Tantric Movement*. New York: Columbia University Press. 2002. 1st Edition. pp. 173-176

[৬৬] Weiss, Richard. *The Reformulation of a Holy Science: Siddha Medicine and Trdition in South India*. Chicago: The University of Chicago. 2003. p. 35

তৃতীয়ত, একদল কবি যাঁরা নিজেদের উক্ত সিদ্ধ পরম্পরার অংশ বলে দাবি করেছেন।[৬৭] প্রথম দলের সিদ্ধদের কাছে সিদ্ধি বলতে অমরত্বের ধারণাই বিশেষভাবে স্বীকৃত। তামিল সিদ্ধদের ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এঁরা ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী এবং ভক্তিমার্গের সমালোচক। চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সিদ্ধ অথবা 'চিত্তর'-রা যাবতীয় মূর্তি পূজার সমালোচনা তো করতেনই, এমনকি তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতাতেও পিছু পা হতেন না।[৬৮] এই সিদ্ধরা নাস্তিক ছিলেন না, শিব-এর উপাসনা করতেন, তবে এই শিব নির্গুণ শিব। তামিল সিদ্ধদের কাব্যে পাচ্ছি—'তিনি হরি নন, ভগবান শিবও নন তিনি/ তিনিই হলেন শেষ কারণ/ তাঁর অবস্থান সীমাতীতেরও সীমাতীতে/ কৃষ্ণত্ব, লোহিতত্ব বা শুভ্রতারও উর্ধ্বে তিনি/ তিনি অমোচনীয়।/ বোঝার চেষ্টা করো/ তিনি বৃহৎ নন, তিনি ক্ষুদ্র নন/ তিনি অসীম দূরত্বে আছেন/ অমোচনীয় তিনি/ চরম শান্তিরও অপর পারে তাঁর অবস্থান।'[৬৯] [অনুবাদ গবেষকের]। কিংবদন্তী অনুসারে তামিল সিদ্ধরা অমর এবং তাঁরা অদৃশ্যরূপে বিরাজিত। সাধারণ মানুষ তাঁদের দেখতে পায় না অথচ সিদ্ধরা তাদের দেখতে পান। দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের মধ্যে সিদ্ধদের প্রতি আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান, বিশেষত সিদ্ধদের কেন্দ্র করে নির্মিত কিছু দূরদর্শনের অনুষ্ঠান তাঁদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। এই অনুষ্ঠানটি ২০০৪ সাল থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে।[৭০] বোঝাই যাচ্ছে দর্শনের বাইরে সিদ্ধ পরম্পরাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী প্রকল্প এবং সাম্প্রতিক কালে বাণিজ্যিক প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। তবে এখনও সিদ্ধদের এই জনপ্রিয়তা ভারতীয় জনমানসের প্রবণতাকে বুঝতে সাহায্য করে। কিমিতিকে কেন্দ্র করে সিদ্ধাচার্য সম্প্রদায়ে বিভিন্ন বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছিল, প্রায় একই ধরনের আখ্যান

---

৬৭ Zvelevill, Kamil V. *The Poets of the Powers Magic, Freedom and Renewal*. USA: Integral Publishing. 1993. 2nd Edition. pp. 17-18

৬৮ তদেব, পৃ. ৬৩

৬৯ তদেব, পৃ. ৬৫

৭০ Weiss, Richard S. *Recipes for immortality Medicine, Religion and Community in South India*. New York: Oxford University Press. 2009. 1st Edition. p.42

আমরা চিন থেকে পারস্যেও পাচ্ছি। মূলত পারদ-কে কেন্দ্র করে কিমিতি বিদ্যার প্রসার পরবর্তী কালে নাথ সম্প্রদায়েও গৃহীত হয়েছে। কিমিতি বিশারদ সিদ্ধদের বিদ্যাধর বলার প্রবণতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭১] কিমিতি-কেন্দ্রিক এই বিশ্বাস থেকে মানুষের অলৌকিক শক্তি অর্জনের বর্ণনা আমরা বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এ পাচ্ছি, যেখানে শৈব সন্ন্যাসী ভৈরবাচার্য নিজেকে যাদুবিদ্যার অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। বোঝাই যাচ্ছে সিদ্ধ পরম্পরা কেবল দার্শনিক প্রস্থান হিসাবেই নয়, একটি ব্যাবহারিক বিদ্যারূপেও খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। আরও লক্ষণীয়, কেবল বঙ্গদেশে নয়, এই বিশ্বাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বজ্রযানের উদ্ভব প্রসঙ্গে অনেকে মনে করেন উড়িষ্যর উড্র প্রদেশে এই দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল। চুরাশি জন সিদ্ধের মধ্যে সরহ, লুই, বজ্রঘণ্টাপাদ, অনঙ্গবজ্র, ইন্দ্রভূতি—এই সিদ্ধাচার্যেরা উড়িষ্যাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কয়েকটি সূত্রে জানা যায়।[৭২] সিদ্ধদের জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। সিদ্ধাচার্যদের ভাষা নিয়েও একই বিতর্ক রয়েছে। তবে চুরাশি সিদ্ধ-দের জন্মস্থানের যে কোনো বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় এদের বিস্তৃত কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না। সুতরাং বঙ্গদেশে বজ্রযানী সিদ্ধদের রচনা, সাধন পদ্ধতি, দার্শনিক বিশ্বাস বোঝার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সিদ্ধ পরম্পরার বিভিন্ন প্রবণতাকেই বিবেচনার মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

বজ্রযানী সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে বঙ্গদেশের কোনো কোনো আচার্য ছিলেন তা নিয়ে তিব্বতি শাস্ত্র এবং পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ রয়েছে। তবে সিদ্ধাচার্যদের একটি বিচরণক্ষেত্র অবশ্যই ছিল পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চল। সিদ্ধাচার্যেরা প্রায় সকলেই পুরুষ হলেও বঙ্গদেশের নারী সমাজের বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বঙ্গের চন্দ্রবংশীয়

---

৭১ White, David Gordon. *Mountains of Wisdom: On the interface between Siddha and Vidyadhara Cults and the Siddha orders in Medieval India*. International Journal of Hindu Studies, Vol-I, No. 1. 1997. p. 80

৭২ Pradhan, Biswajit. *Rise and Growth of Siddha Cult in Orissa*. Proceedings of the Indian History Congress. Vol. 64. 2003. pp. 269-276

রাজবংশের সম্রাজ্ঞী ময়নামতী তান্ত্রিক গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[৭৩] বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল মহাবিহারের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সন্ধ্যাকর নন্দী-র *রামচরিত*-এ। এই মহাবিহারে অবলোকিতেশ্বর লোকেশ এবং তারা মূর্তির উপাসনার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি তারানাথের বিবরণে পালযুগে সিদ্ধাচার্য, মন্ত্রবজ্রাচার্যদের কথা পাচ্ছি যাঁরা বিবিধ অলৌকিক শক্তির প্রদর্শন করতেন বলে জানা যায়।[৭৪] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে বৌদ্ধদেবীরূপে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, য়ুয়ান চুয়াং-এর বিবরণে দেখা যায় নালন্দা মহাবিহারে তারা মূর্তির উপাসনা করা হত।[৭৫] তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ক্রমপ্রতিষ্ঠার সঙ্গেই তারা উপাসনার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। নালন্দা মহাবিহারে একাধিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা থাকতেন। নালন্দা মহাবিহারেও আমরা খসর্পণ, মঞ্জুশ্রী, জ্ঞাননাথ এবং দেবী তারার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে জানতে পারি তিব্বতি পরিব্রাজক ধর্মস্বামীর বর্ণনায়। প্রসঙ্গত নালন্দা মহাবিহারে আচার্য আর্য চন্দ্রকীর্তি এবং আচার্য চন্দ্রগোমনের দার্শনিক তর্কের অপূর্ব বর্ণনা পাচ্ছি ধর্মস্বামীর বিবরণে। এই বর্ণনায় আমরাদেখছি খসর্পণ বিগ্রহ আচার্য চন্দ্রকীর্তিকে 'গুহ্যসমাজ'-এ মনোনিবেশ করার নির্দেশ প্রদান করছেন।[৭৬] সুতরাং বজ্রযানী ধর্মদর্শন যেমন মহাবিহারে চর্চিত হয়েছে তেমনই তন্ত্রপৃক্ত বৌদ্ধধর্ম মন্ত্রযানের দেবতাদের গ্রহণ করেছে—এই দুটি প্রমাণই ধর্মস্বামীর বর্ণনায় স্পষ্ট হয়। মহাবিহারে তন্ত্রযানের সাধনা প্রতিষ্ঠিত হলেও সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গে সঙ্ঘের বিবাদের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় *চতুরশীতিসিদ্ধ-প্রবৃত্তি*-তে। এই গ্রন্থে সিদ্ধ ভুসুকুর সঙ্গে নালন্দা মহাবিহারের উপাধ্যায় এবং অন্যান্য সহবিহারীদের বিতণ্ডা হয়েছিল, কারণ ভুসুকু

---

[৭৩] Tripathi, R.K. *Social and Religious Aspects in Bengal Inscriptions*. Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1987. 1st Edition. p. 44

[৭৪] তদেব, পৃ. ২০৭

[৭৫] Shastri, Hirananda. *The Origin and Cult of Tara*. New Delhi: Archaeological Survey of India. 1998. 1st Edition. p. 21

[৭৬] Roerich, George. *Biography of Dharmasvamin*. Patna: K.P. Jayswal Research Institute. 1959. 1st Edition. p. 91

সূত্র পাঠে অনাগ্রহী ছিলেন এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং সারাদিন ঘুমোতেন। ভুসুকুর সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় ভুসুকু প্রথমে *বোধিচর্যাবতার*-এর পাঠ দান করেন এবং প্রবজ্যার উপকরণ ফেলে রেখে, উপাধ্যায় এবং সঙ্ঘ-কে না জানিয়েই নালন্দা মহাবিহার ত্যাগ করেন।[৭৭] অতএব সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গে সঙ্ঘবাসী ভিক্ষুদের অনেক সময়েই মতের অমিল ঘটত। আমরা দেখেছিলাম মহাযানী বৌদ্ধরা বিনয় নিয়মের ক্ষেত্রে থেরবাদী আদর্শকে অনুসরণ করতেন। সুতরাং সঙ্ঘের আচার অনুশাসনের সঙ্গে থেরবাদী নিয়মের প্রবল পার্থক্য ছিল না, ফারাক ছিল মূলত দর্শনে। সিদ্ধাচার্যদের আমরা অনেক সময়েই এই গতানুগতিক নিয়মের বাইরে চলতে দেখছি। সিদ্ধাচার্যদের অনেকেই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ ছিলেন বলে জানা যায়। তন্ত্রিপাদ ছিলেন তাঁতী, তিল্লিপাদ ছিলেন তেলি।[৭৮] যদিও এঁদের প্রত্যেকেই তিব্বতি পরম্পরায় আসলে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই একই ধরনের কিংবদন্তী কবীর প্রসঙ্গেও প্রচলিত। আমাদের মনে হয় প্রতিষ্ঠা লাভের পরে এই সকল সাধকদের একটি ব্রাহ্মণ্য উৎসের অনুসন্ধান আসলে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ চালিত সমাজব্যবস্থার ফলশ্রুতি। তবে একাদশ-দ্বাদশ শতকের বঙ্গদেশের জাতিব্যবস্থায় তন্তুবায়কে ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন উত্তম সঙ্কর জাতি এবং তেলি-কে বৈশ্যের গর্ভে গোপের ঔরসে জাত মধ্যম সঙ্কর বলে বর্ণিত হয়েছে।[৭৯] সুতরাং সিদ্ধাচার্যদের পেশা ভিত্তিক নামের ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও এঁদের উচ্চবর্ণের মনে করার কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং, আমরা দেখলাম বজ্রযান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লিঙ্গ, জাতি এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিকেন্দ্রিক ধর্মব্যবস্থাকে কিছুদূর পর্যন্ত অস্বীকার করতে সমর্থ হয়েছে, সর্বোপরি বজ্রযান বৌদ্ধধর্মেরও বিরোধিতা করেছে।

---

[৭৭] চট্টোপাধ্যায়, অলকা. *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী.* কলকাতা : অনুষ্টুপ. ২০১০. পরিবর্ধিত সংস্করণ. পৃ. ১৬১-৬৩

[৭৮] Sinha, Ratna & Shyamalkanti Chakravarti (Edited). *Forty Essays on Indological Studies A Collection from the Works of P.C. Bagchi (Vol-I)*. Kolkata: Pritonia. 2014. 1st Edition. pp. 398-400

[৭৯] তর্করত্ন, পঞ্চানন. *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ.* কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স. ১৪২০. দ্বিতীয় সং. পৃ. ৩৩৯

সিদ্ধাচার্য-কেন্দ্রিক সাহিত্যের কিছু আলোচনা আগে আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম থেকেই গৌতম বুদ্ধের জীবন এবং তার দর্শন নিয়ে সাহিত্যরচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সিদ্ধাচার্যরা যেহেতু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং জনমানসে জনপ্রিয় ছিলেন তাঁদের কেন্দ্র করেও সাহিত্যরচনার একটি ধারা ছিল। এর মধ্যে আচার্য পদ্মসম্ভবের জীবনকেন্দ্রিক চরিত রচনার উদাহরণ পাচ্ছি। আনুমানিক ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে পদ্মসম্ভবকে নিয়ে তিব্বতি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিব্বতে পদ্মসম্ভবের শিক্ষা প্রদানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই গ্রন্থে পদ্মসম্ভবকে গুহ্য বিদ্যা, সাহিত্য, ঔষধি-বিষয়ক শিক্ষা দান করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই গ্রন্থের সাতাশ সংখ্যক অধ্যায়ে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম এবং তন্ত্র শাস্ত্রের শিক্ষা পদ্মসম্ভব আচার্য আনন্দের কাছে করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৮০] এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্রগুলি বিনয়, সূত্র এবং অভিধর্ম পিটকের সমপর্যায়ে গৃহীত হল। একই সঙ্গে আচার্য আনন্দের থেকে তন্ত্রশিক্ষা গ্রহণের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে তন্ত্রগুলিকেও মূল ত্রিপিটিক শাস্ত্রের মর্যাদা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার সিদ্ধাচার্যদের রচিত একটি বিস্তৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ। অপভ্রংশের মধ্যেই প্রত্নবাংলায় রচিত সাহিত্যের নিদর্শনরূপে চর্চাগীতি স্বীকৃত হয়েছে। তবে বর্তমানে এই শাস্তের অধিকাংশই রক্ষিত হয়েছে তিব্বতি এবং চিনা অনুবাদে। 'চর্যাগীতি' সম্পাদনার সময়েও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিব্বতি অনুবাদে রক্ষিত সিদ্ধাচার্যদের রচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিব্বতি অথবা চিনা ভাষাতে রক্ষিত অনুবাদই সিদ্ধাচার্যদের রচনার আকর। তিব্বতি অনুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এগুলি আক্ষরিক অনুবাদ। তিব্বতি অনুবাদগুলি সূত্র এবং শাস্ত্র—এই দুটি পর্বে বিভক্ত। মূলত বুদ্ধবচনগুলি সূত্রে আর অন্যান্য শিক্ষাগুরুদের রচনা শাস্ত্র পর্যায়ভুক্ত। সূত্র অর্থাৎ কাঞ্জুর-এর সাতটি ভাগের একটি হল তন্ত্র। শাস্ত্র অর্থাৎ তাঞ্জুরে আচার্য নাগার্জুন, আচার্য আর্যদেব, আচার্য

---

৮০ Singh, Bireswr Prashad. *Biography of Pdmasambhava*. Patna: The Bihar Research Society. 1988. 1st Edition. p. XIII

বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ এবং অন্যান্য ধর্মশিক্ষকদের রচনা সংকলিত হয়েছে।[৮১] এই সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে কয়েকজনের রচনা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধাচার্যদের রচনায় বজ্রযানের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট-কে বোঝার চেষ্টা করব। বর্তমানে আমরা চারজন সিদ্ধাচার্য সম্পর্কে আলোচনা করব। লুই পা, ভুসুকু পা, সরহ পা এবং তিলো পা। লুই পা তিব্বতি পরম্পরায় আদি সিদ্ধাচার্য বলে স্বীকৃত। লুই পা-কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গদেশের অধিবাসী বলতে চেয়েছেন। বঙ্গদেশের মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন বলে হরপ্রসাদের অনুমান। তবে হরপ্রসাদ তিব্বতি উৎস ব্যবহার করে বলেছেন এই লুই আর নাথপন্থের মৎস্যেন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নন।[৮২] তবে মণিপাদ-এর রচিত *বাহ্যান্তর-বোধিচিত্ত-বন্ধোপদেশ* গ্রন্থে লুই পা-কে মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৩] হরপ্রসাদ লুই পা-র রচিত চারটি গ্রন্থের কথা বলেছেন—*বজ্রসত্ত্বসাধন, বুদ্ধোদয়, শ্রীভগবদাভিসভয়* এবং *অভিসময়বিভঙ্গ* । এছাড়াও *তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকা* এবং *লুহিপাদগীতিকা* নামেও দুটি গ্রন্থ লুই পা-র রচনা।[৮৪] এর মধ্যে *অভিসময়বিভঙ্গ* গ্রন্থটি নিয়ে সমস্যা হল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের রচিত *অভিসময়-বিভঙ্গ-নাম* গ্রন্থের পুষ্পিকায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবং লুই পা দুজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে অনুমান করা হয়েছে সম্ভবত লুই পা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গ্রন্থের আদিতম টীকাকারদের একজন। তবে অন্য একটি পুষ্পিকা থেকে অনুমান করা হয় এই গ্রন্থের লুই পা এবং সিদ্ধ লুই পা সম্ভবত পৃথক ব্যক্তি ছিলেন।[৮৫] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লুই পা-কে বঙ্গদেশের বাসিন্দা বললেও এবিষয়ে বেশ

---

৮১ Bhattcharya, Vidhushekhar. *Bhota-Prakas*. Calcutta: University of Calcutta. 1939. 1st Edition. p. xxix

৮২ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. *প্রাচীন বাংলার গৌরব.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ৪৪

৮৩ De, S.K. *The Buddhist Tantric Literature (Sanskrit) of Bengal)*. New Indian Antiqury. Vol-I. 1938-39. p.17

৮৪ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. ১৪১৫. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ২১

৮৫ Chattopadhyay, Aloka. *Atisa and Tibet*. Delhi: MLBD. 2011. Reprint. p. 445

কিছু সন্দেহ আছে। কোনো কোনো মত অনুযায়ী লুই পা উড্ডীয়ানের বাসিন্দা ছিলেন।[৮৬] আবার *চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি*-র হিন্দি অনুবাদে দেখা যাবে লুই পা সিংহল দ্বীপের রাজপরিবারের মধ্যম সন্তান।[৮৭] লুই পা-র রচিত দুটি গান চর্যাগীতিতে সংকলিত হয়েছে। চর্যাগান প্রসঙ্গটি আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব বলে অন্য রচনাগুলির প্রতিই মনোনিবেশ করতে চাইছি। *তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকা*-য় লুই-এর যে রচনাটি রয়েছে তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংকলিত চর্যাগীতির ২৯ নং গানেরই পরিবর্ধিত রূপ। মূলত নারথাং সংস্করণে এই গানের পাঠে কয়েকটি অতিরিক্ত পদ ছিল যা হরপ্রসাদ সংকলিত *তত্ত্বসম্বোধিচর্যা*-য় নেই। এই কারণে এই পদটি নিয়ে পৃথক আলোচনার দরকার। তিব্বতি অনুবাদে মূল দোহায় প্রবেশের পূর্বে কয়েকটি লাইন পাচ্ছি—'শ্রী হেরুককে প্রণাম। তথাগতদের প্রণাম জানানোর পরে আমি সকলের ভালোর জন্য বলব, বিশুদ্ধ চিন্তা, দৃষ্টি, করণীয়র মাধ্যম কী তাই আমার বলার। যা সকলকে পরিশেষে নিয়ে যাবে অদ্বয়বোধরূপ অমৃতের নিকট।'[৮৮] [অনুবাদ গবেষকের]। হেরুকের প্রতিনমস্কার জ্ঞাপন থেকে লুই পা-র সঙ্গে বজ্রযানের সরাসরি সম্পর্ক বোঝা যায়। হেরুক যখন শক্তির সঙ্গে যুগনদ্ধ রূপে থাকেন তখন তাকে হেবজ্র বলা হয়, হেরুক অক্ষোভ্যকুলের দেবতা। একক অবস্থায় হেরুক দ্বিভুজ, শবের উপর বামপদ বিন্যাস করেন এবং দক্ষিণ পদ বামপদের উরুতে রেখে নৃত্য ভঙ্গিমায় থাকেন।[৮৯] সুতরাং হেরুকের প্রতি প্রণতি প্রসঙ্গটি 'চর্যাগীতি'তে না থাকায় আমরা *তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকা*-র সাহায্যে দার্শনিক প্রস্থানের সঙ্গে সাধনার ইতিহাসকে সংযুক্ত করতে পারছি। লুই পা এবং

---

[৮৬] তদেব, পৃ. ৭৫

[৮৭] Dorje, Shempa. *The Biography of Eighty-Four Saints by Acharya Abhuudatta Sri*. Varanasi: Central Institute of Higher Tibetan Studies. 1998. 2nd Edition. pp. 01-03

[৮৮] Basu, Anath Nath. *Tattvasvabha-dristigitika-doha*. Indian Historical Quaterly, Part III. 1927. pp. 679-680

[৮৯] ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ. *বৌদ্ধদের দেবদেবী.* কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৬. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ৬৪-৬৫

মৎসেন্দ্রনাথ-কে অভিন্ন বলে ধরলে লুই পা-কেই কৌলশাখার প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করতে হয়।[৯০] আমাদের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং সিদ্ধাচার্য লুই-এর প্রাপ্ত রচনায় দার্শনিক সামঞ্জস্য নেই। তাই এঁদের পৃথক বিবেচনা করাই ঐতিহাসিকভাবে যুক্তিযুক্ত।

মহাসিদ্ধ সরহ পা সম্পর্কে হিন্দি এবং তিব্বতিতে প্রভূত চর্চা হয়েছে। সরহ পা সম্পর্কে তথ্য একাধিক তিব্বতি শাস্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং আরও অনেকের মতেই সরহ-কে আদিসিদ্ধ বলা হয়েছে। সরহ শব্দের অর্থ নিয়ে বেশ কিছু মত পাচ্ছি। সুকুমার সেন মনে করেন, সরহ শব্দটি 'সরধ' অর্থাৎ মৌমাছির অপভ্রংশ রূপ।[৯১] চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের মতে সরহ পা ষষ্ঠ। অভয়শ্রী দত্তের বর্ণনা অনুযায়ী সরহ জাতিতে ব্রাহ্মণ, পূর্ব ভারতের বাসিন্দা। ব্রাহ্মণ হয়েও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আগ্রহের জন্য তিনি গুহ্য মন্ত্রের শিক্ষা করেন এবং দিনে ব্রাহ্মণ্য ও রাতে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। এরপর রাজ্যের ব্রাহ্মণদের অপবাদের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি নানা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন এবং শেষে রাজা, রানী এবং প্রজাদের তিনটি গীতির মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করেন। এরপর সরহ তাঁর পঞ্চদশবর্ষীয়া স্ত্রীকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন। এর সঙ্গে সরহ সাধনা করেন এবং পরিশেষে স্ত্রীর দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েই লক্ষণ ও বিকল্প ত্যাগ করে মহামুদ্রার পরম সিদ্ধি অর্জন করেন।[৯২] সরহ পা-র আরও কিছু নাম পাওয়া যায়—সরোজবজ্র, পদ্ম, পদ্মবজ্র, রাহুলভদ্র। দোহা রচনার পাশাপাশি সরহ পা কিছু তত্ত্ব গ্রন্থ লিখেছিলেন, যেমন *মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি, ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতি*।[৯৩] সরহ পা-র দোহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং পরবর্তী সময়ে প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদনা করেন,

---

[৯০] Banerji, SC. *Tantra in Bengal A Study in its Origin, Development and Influence*. Calcutta: Naya Prakash. 1978. 1st Edition. p. 65

[৯১] সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১)*, কলকাতা : আনন্দ. ২০০৭. অষ্টম মুদ্রণ. পৃ. ৬৮

[৯২] চট্টোপাধ্যায়, অলকা. *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী.* কলকাতা: অনুষ্টুপ. ২০১০. পরিবর্ধিত সং. পৃ. ৯৯-১০১

[৯৩] শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. ১৪১৫ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ২৬

রাহুল সাংকৃত্যায়ন দোহাগুলির ছায়ানুবাদ করেন। এছাড়া সরহ পা-র রচিত দোহাগুলির (চর্যায় সংকলিত চারটি দোহা বাদ দিয়ে) কোনো যথাযথ বঙ্গানুবাদের তথ্য আমরা জানি না। অথচ বাংলার বৌদ্ধধর্ম তো বটেই তিব্বতের বৌদ্ধ সংস্কৃতি সরহ পা বিশেষ ভাবে সম্মানিত। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের যে চারটি শাখার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি তার মধ্যে সরহ পা Kagyu শাখায় বিশেষভাবে উপাসিত হন। তিব্বতি পরম্পরায় 'সরহ' শব্দের অর্থ যিনি তির ছুঁড়েছিলেন ('The one who has shot the arrow')[৯৪] *চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি*-র আখ্যানটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। খেয়াল রাখতে হবে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে 'চিত্ত'-কে তিরের মতো ঋজু করার উপদেশ বুদ্ধদেব দিয়েছিলেন। *ধম্মপদ*-এর 'চিত্তবর্গ'-এ বলা হয়েছে—তিরনির্মাতা যেমন তিরকে সোজা করে তৈরি করে, তেমনই মেধাবী বা জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের স্পন্দনশীল, চপল, দুরক্ষণীয় এবং দুর্নিবার চিত্তকে সরল করেন।[৯৫] অর্থাৎ চিত্তের সঙ্গে রূপকল্পনাটি বৌদ্ধ সাহিত্যে সিদ্ধ রূপকল্প বলেই 'সরহ' শব্দের অর্থে তিরের অনুষঙ্গটি এসেছে। এখানে 'সরহ' বলতে চিত্তের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকেই বুঝতে হবে। এই গ্রন্থের মতে সরহ ছিলেন একজন ডাকিনীর পুত্র, অর্থাৎ নিজে ছিলেন ডাক। Kagyupa Lama Trinlaypa-র রচিত খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের একটি গ্রন্থে সরহের জীবনের আরেকটি আখ্যান পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থ অনুযায়ী সরহ পা চারজন ডাকিনীর কাছে চার পাত্র মদ্য পান করেন এবং চারপ্রকার সিদ্ধি অর্জন করেন। এরপর বোধিসত্ত্ব সুখনাথের আদেশে তিনি একজন নীচু জাতের মহিলার থেকে (যিনি পেশায় তিরনির্মাতা) তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। মদ্যপান এবং নীচুজাতের মহিলাকে সাধনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করার জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে সমালোচিত হন।[৯৬] তিব্বতি পরম্পরায় সরহকে কেন্দ্র করে

---

[৯৪] Braistein, Lara E. *Saraha's Adamantic Songs: Texts, Contexts, Translations and Traditions of the Great Seal*. Canada: Library & Archieves Canada. 2004. 1st Edition. p. 16

[৯৫] সেন, রণব্রত. *ধম্মপদ*. কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. ১৯৯৬. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ২০

[৯৬] Braistein, Lara E. *Saraha's Adamantic Songs: Texts, Contexts, Translations and Traditions of the Great Seal*. Canada: Library & Archieves Canada. 2004. 1st Edition. p. 25-26

আরও কিছু আখ্যান প্রচলিত। সামগ্রিকভাবে সরহ একজন প্রতিবাদী সিদ্ধরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। সরহ পা-র সময়কাল রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতানুযায়ী খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। সরহ পা-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিষ্য হলে শবর পা, নাগার্জুন, সর্বভক্ষ এবং মেখলা। শবর পা-র শিষ্যরূপে লুই পা-কে রাখা হয়েছে সরহ পা অনুসারী সাধন পরম্পরায়।[৯৭] সরহ পা বজ্রযানী সাধনায় মহামুদ্রার উপাসকরূপে স্বীকৃত, শুধু তাই নয় বিভিন্ন প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে সরহ পা-ই মহামুদ্রা সাধনার প্রবর্তক। সরহ পা কথিত দোহাত্রয় প্রাথমিকভাবে রাজা, রানী এবং প্রজাদের জন্য কথিত বলে বর্ণনা করা হলেও এই তিন প্রকার দোহা সাধনার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করছে। প্রজাদের জন্য কথিত দোহাগুলিকে সরহ পা-র নিজস্ব রচনা এবং বাকিগুলি সরহ পা-র শিষ্যদের রচনা বলে মনে করা হয়। প্রজাদের জন্য কথিত দোহা-য় বর্ণিত হয়েছে বজ্রবারাহীর মাহাত্ম্য এবং বজ্রযানী সাধনায় ব্যবহৃত চারটি চিহ্নের তাৎপর্য। পরের পর্যায়ে এই দোহার অর্থ এবং শিষ্যদের করণীয় প্রসঙ্গে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সরহ পা-র দোহাকোষের উপর অদ্বয়বজ্র সংস্কৃতে টীকা রচনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় সাংকেতিক অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্যই টীকার প্রয়োজন ছিল, তিব্বতি ভাষাতেও একাধিক পণ্ডিতেরা এই দোহার তিব্বতি টীকা রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত আমরা সরহ পা-র রচিত একটি দোহার অনুবাদ দিয়ে এই আলোচনাটি শেষ করব। দোহাত্রয়-এর সূচনা রয়েছে আর্য মঞ্জুশ্রীর বন্দনার মাধ্যমে। সরহ তাঁর পদে বলছেন—“আমি যত যৌনক্রিয়া করি/ ক্লান্ত হয় গর্ভস্থ শিশু/ অন্য কোন মায়েদের থেকে এই শিশুদের জন্ম হয় না/ এই সিদ্ধজীবন অন্য সব কিছুর থেকেই তুলনা রহিত।’ [অনুবাদ গবেষকের]। এই পদটি সাংকেতিক। আসলে সন্তানের জন্ম না হওয়া থেকে বোঝা যায় এখানে লৌকিক যৌন ক্রিয়ার কথা বলা হয়নি। যৌনতায় লৌকিকভাবে দুই-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয়। এখানে বোঝানো হল সাধক দুই-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। পিতা-মাতা-সন্তান—এই তিনটি পৃথক অস্তিত্ব বাহ্য জীবনে থাকলেও সাধনার ক্ষেত্রে সাধনার

---

[৯৭] সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *দোহা-কোশ.* পাটনা : বিহার-রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ. ১৯৫৮. প্রথম সং. পৃ. ২১-২২

প্রেরণা, সাধনার দেহ এবং সাধনলব্ধ ফল একই সত্তার বিবর্তনমাত্র। যোগী এই সত্য জানেন এবং উপলব্ধি করেন।[৯৮]

সিদ্ধাচার্য ভুসুকু এবং আচার্য শান্তিদেব-কে *চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি*-তে একই ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আচার্য শান্তিদেব নালন্দায় আর্য মঞ্জুশ্রীর আশীর্বাদে বোধিচর্যাবতারের দশম অধ্যায় দেশনা করেন।[৯৯] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনজন পৃথক শান্তিদেবের অস্তিত্বের কথা বলেন। তাঁর মতে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শান্তিদেব এবং সিদ্ধাচার্য ভুসুকু পৃথক। তবে তন্ত্রশাস্ত্র প্রণেতা ভুসুকু এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণেতা শান্তিদেবকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন তিনি।[১০০] মহাযানের শাস্ত্রপ্রণেতার নামের অনুবৃত্তি আমরা 'চর্যাগীতি'-তে আরও পাচ্ছি। যেমন—৩১ নং চর্যাগানের রচয়িতা আচার্য আর্যদেব। আর্যদের মাধ্যমিক দর্শনের একজন প্রখ্যাত তত্ত্ববেত্তা। তাঁর লেখা *চতুঃশতক* এবং আচার্য চন্দ্রকীর্তির রচিত ভাষ্য মাধ্যমিক দর্শনের বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মোট ষোলটি অধ্যায়, রাজা ধর্মপালের এই গ্রন্থের শেষ আটটি অধ্যায়ের উপর টীকা রচনা করেছিলেন। ধর্মপালের টীকা তাঁর গুরু নালন্দার প্রখ্যাত আচার্য শীলভদ্র দেখে দিয়েছিলেন।[১০১] ধর্মপালের টীকা রচনার থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মাধ্যমিক দর্শনের একটি শাস্ত্রধারা বজ্রযানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাত্ত্বিক সমতা না থাকলে টীকা রচনার প্রসঙ্গে আসে না। তাই ভুসুকু এবং মহাযানের শান্তিদেব-এর ভিন্নতা থাকলেও শান্তিদেব প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার মাধ্যমে আমরা বজ্রযানের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি বোঝার চেষ্টা করব। যদিও লক্ষণীয় ভদন্ত শান্তিভিক্ষু *বোধিচর্যাবতা*-র অনুবাদ প্রসঙ্গে চর্যাগীতির রচয়িতা ভুসুকুর উল্লেখ করেছেন এবং

---

[৯৮] Guenther, Herbert V. *The Royal Song of Saraha A Study in the History of Buddhist Thought*. California: Shambala Publications, Inc. 1973. 1st Paperback Edition. p. 76

[৯৯] চট্টোপাধ্যায়, অলকা. *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী.* কলকাতা : অনুষ্টুপ. ২০১০. পরিবর্তিত সং. পৃ. ১৬১-১৬৫

[১০০] শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. ১৪১৬ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ২৩

[১০১] Bhattacharya, Vidhushekhara. *The Catuhsataka of Aryasava (Part-II)*. Santiniketan Visva-Bharati. 1931. 1st Edition. pp. 22-23

আচার্য শান্তিদেবের সঙ্গে সিদ্ধ ভুসুকু-র পার্থক্য বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেন নি। 'ভুসুকু' একটি পারিভাষিক শব্দ, একধরনের সমাধির নাম। ভুসুকু-র পিতার নাম মঞ্জুবর্মা। তাঁরা নলন্দায় একটি কুটিরে থাকতেন এবং শান্তিদেব ভুসুকু সমাধির অভ্যাস করতেন। ভুসুকু সমাধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"ভুঞ্জানোদৃপি প্রভাস্বর সুপ্তোদৃপি বুণ্টী ততোদৃপি তদেবৈতি ভুলসুকুসমাধিসমাপন্নত্বাদ্ ভুসুক নামখ্যাতি সখেদৃপি।"[১০২] যাবতীয় অবস্থাতেই নিরুদ্বিগ্ন থাকার সমাধিই ভুসুকু সমাধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শান্তিদেব *শিক্ষাসমুচ্চয়, সূত্রসমুচ্চয়* এবং *বোধিচর্যাবতার*—এই তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে *সূত্রসমুচ্চয়* গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের মোট দশটি অধ্যায়। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'সংপ্রজন্যরক্ষণ' অর্থাৎ চৈতন্যকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সেই বিষয়ক উপদেশ। বলা হয়েছে 'চিত্ত-মাতঙ্গ' স্মৃতি রজ্জুর দ্বারা বাঁধা গেলে সময় ভয় দূর হয় এবং সকল কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। এখানে 'স্মৃতি' বলতে memory নয়, উপযুক্ত বিষয়, কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা উচিত নয় এই বিষয়ে যথাবিহিত জ্ঞানকেই বলা হয় 'স্মৃতি'। উল্লেখ্য শান্তিদেবের মতে দান পারমিতা এবং শীল পারমিতা চিত্তের বিভিন্ন দশার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। আচার্য-উপাধ্যায় এবং গুরুর সঙ্গে বসবাস এবং তাঁদের অনুশাসনের মাধ্যমে শিষ্যের 'স্মৃতি' অর্জন লাভ সম্ভব হয় এবং স্থিরচিত্ত, বিনয়ী শিষ্য তাঁর সাধনার দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হন।[১০৩] *বোধিচর্যাবতার*-এর দশম অধ্যায় 'বোধি-পরিণমন'-এ বলা হল সকল মানুষের মুক্তির জন্যই এই শিক্ষাপদ বর্ণিত হল। বোধিসত্ত্ব, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং শ্রাবকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং আচার্য মঞ্জুঘোষের প্রতি প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে।[১০৪] শান্তিদেবের রচনায় আমরা মহাযানী আদর্শের যথাযথ রূপায়ণ—

---

[১০২] ভিক্ষুশস্ত্রী, শান্তি. *বোধিচর্যাবতার.* লখনউ : বুদ্ধবিহার. ১৯৫৫. প্রহতম সং. পৃ. ১-১৫

[১০৩] মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার. *শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৪-২৭

[১০৪] Croslay, Kate & Andrew Skilton, *Santideva the Bodhicaryavatar*. New York: Oxford University Press. 2008. Reissued. p. 143

সর্বজীবে করুণা প্রদর্শনের ঐতিহ্য দেখতে পাই। চিত্তবৃত্তি নিয়ে ভাবনা আমরা থেরবাদ থেকে বজ্রযান সর্বস্তরেই দেখতে পাচ্ছি। শান্তিদেবের তত্ত্ব প্রস্থানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তিনি যাবতীয় কায়িক কর্মের ব্যাখ্যা আসলে চিত্তের অবস্থার মাধ্যমে করতে আগ্রহী। একারণে শীল এবং দান পারমিতা-র প্রসঙ্গ আসে চিত্তের ক্রম সংযমের মাধ্যমে। বজ্রযানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাহ্য আচরণের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি। দেহ এবং মনের মাধ্যমেই সাধনার যাবতীয় স্তর অতিক্রম করতে চেয়েছেন সিদ্ধাচার্যেরা। অতএব আচার্য শান্তিদেবের রচনায় আমরা সিদ্ধাচার্যদের দর্শনেরই প্রাক্‌রূপ দেখতে পাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'চর্যাগীত'-এর পুথিতে কুড়িজনের সিদ্ধাচার্যের কথা পাওয়া যায়। তিলো পা-র কোনো রচনা আমরা এই গ্রন্থে পাচ্ছি না। তবে সিদ্ধাচার্য পরম্পরায় তিলো পা অথবা তিল্লো/ তেল্লো পা অন্তত গুরুত্বপূর্ণ একজন গুরু। তিব্বতি আখ্যান অনুযায়ী তিনি প্রথম জীবনে রাজপুরোহিত ছিলেন, পরে সর্বস্ব ত্যাগ করেন এবং কাঞ্চী নগরে শ্মশান সাধনা করেন। দশবছর সাধনার ফলে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধি অর্জন করেন।[১০৫] তিল্লো পা-র শিষ্য হলেন নারো পা। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের Kagyu শাখায় সরহ পা-র পাশাপাশি তিলো পা একই ভাবে বন্দিত হয়েছেন। Kagyu শাখার প্রবর্তক যোগী এবং সিদ্ধ Khyung-Po-rNal-a 'Byor ভারতবর্ষে পঞ্চাশ বছর থেকে সূত্র এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর গুরুদের মধ্যে আছেন আচার্য নারো পা এবং তাঁর সাধন সঙ্গিনী নিগু, সুখসিদ্ধ এবং রাহুলগুপ্ত।[১০৬] তিলো পা-র জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য তিব্বতি সূত্রে পাওয়া যায়। তিলো পা একদিন নাগার্জুনের *প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র* পাঠ করছিলেন এমন সময় একজন ডাকিনী উপস্থিত হলেন এবং তিলো পা-কে মন্ত্রযানের শিক্ষা প্রদর্শন করেন। এরপর ডাকিনী আকাশে চক্রসম্ভবের রূপ ধারণ করেন এবং তিলো পা-কে উৎপত্তি ক্রম এবং উৎপন্ন ক্রমের শিক্ষা প্রদান করেন। শূন্যতার শিক্ষাও প্রদান করেন

---

[১০৫] চট্টোপাধ্যায়, অলকা. *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী.* কলকাতা: অনুষ্টুপ. ২০১০. পরিবর্ধিত সং. পৃ. ১৩৫

[১০৬] Banerjee, Anukul Chandra. *Aspects of Buddhist Culture from Tibetan Sources*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd. 1984. 1st Edition. p. 64

এবং তিলো পা-কে ভিক্ষুর বেশ ত্যাগ করে সাধারণ উন্মাদের মতো জীবনযাত্রার উপদেশ দান করেন। এই ডাকনীর তিব্বতি নাম Karpo Gangmo।[১০৭] মহামুদ্রা বিষয়ে তিলো পা-র রচনা পাওয়া যাচ্ছে। বজ্রডাকিনী-র প্রতি প্রণাম জানিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে মহামুদ্রার সাধনা কাউকে শেখানো যায় না, তবে নারো পা গুরুর প্রতি নিবেদিত চিত্ত, তাঁর প্রসাদে নারো পা তিলো পা-র তত্ত্ব শ্রবণ করছেন।[১০৮] এই গ্রন্থের নাম *মহামুদ্রোপদেশ*। তিলো পা চিত্ত-কে মনে করেন গাছের শিকড়ের মতো। যদি গাছের শিকড় থাকে তবেই সহস্র পাতা পুষ্টি অর্জন করে। একারণে চিত্তের মূল যদি কেটে ফেলা সম্ভব হয় তাহলেই সকল সুখ-দুঃখের অনুভূতি নষ্ট হবে। তন্ত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্র অথবা সঙ্ঘ নিয়ম কিংবা ধর্মোপদেশ কোনো কিছুই মহামুদ্রার উপলব্ধি দিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষার মুক্তি যদি না হয় তাহলে শাস্ত্র কোনো অর্থ তৈরি করে না। একমাত্র গুরুর দীক্ষা এবং গুরুর প্রজ্ঞার মাধ্যমেই শিষ্যের উন্নতি সম্ভব হয়।[১০৯] তিলো পা-র রচিত কিছু দোহা পাওয়া যায়। *তিল্লোপাদীয়-দোহাকোষ*-এ মোট উনিশটি দোহা আছে। কয়েকটি দোহার অনুবাদ করা হল। সমসুখ অথবা সহজের উপলব্ধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ‘মন যখন আকাশের মতো ব্যাপ্ত সম সুখে প্রবেশ করে তখন আর বস্তুর পৃথক অনুভূতি থাকে না। এই আনন্দ শুরু এবং শেষ শূন্য। গুরুর আশীর্বাদে এই বোধ-ই অদ্বয়ের বোধ।’ সহজ-এর উপলব্ধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–‘আমি শূন্য, ত্রিজগত শূন্য, অস্তিত্ব রয়েছে কেবল নিরবচ্ছিন্ন সহজের যা ভালোও নয় মন্দও নয়।’ মন প্রসঙ্গে তিলো পা বলেন, মন স্বেচ্ছাচারী। কোনো ভ্রান্তিকেই তাই গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। অর্ধ-নিমিলীত চোখে ধ্যান করার থেকে কোনো

---

[১০৭] Rinpoche, Khenchen Tharangu. *The Life of Tilopa & The Ganges Mahamudra*. USA: Namo Buddha Publications. 2002. 1st Edition. pp. 10-15

[১০৮] তদেব, পৃ. ৩৫

[১০৯] Tiso, Fransis & Fabrizio Torricelli. *The Tibetan Text of Tilopa’s Mahamudropadesa*. East & West. Vol. 41. No. 1/4.December 1991. pp. 205-229

বিশ্রাম অথবা তন্দ্রার সুযোগ মাত্র নেই।’[১১০] তিলো পা-র শাস্ত্র এবং পদগুলির সঙ্গে আমরা ‘চর্যাগীতি’র সিদ্ধাচার্যদের ভাবনার সাদৃশ্য পাচ্ছি। তিলো পা-র শিষ্য নারো পা-ও একাধিক শাস্ত্র লিখেছিলেন। গুরু তিলো পা-র সঙ্গে নারো পা-র কথোপকথনের একটি অংশ উদ্ধার করা হল—‘একদিন গুরু তিলো পা তার দিব্য অশ্বে চেপে আকাশ পথে বিচরণ করতে করতে নারোপা-কে দেখতে পান। তিনি নারোপা-কে বললেন—গুরু এবং ডাকের অনুমতি ব্যতীত এবং আত্মজ্ঞান এবং স্বজ্ঞার অধিকার অর্জন না করা অবধি চিত্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব অনুযায়ী নানা বিষয়ের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কোনো রকম কাজ করা অনুচিত। নারো পা জানতে চাইলেন তবে কি ধর্মানুশাসন শোনাই করণীয়? তিলো পা বললেন, ধর্মের অনুশাসন লবণাক্ত জলের মত।, এতে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। নারো পা এরপর জিজ্ঞাসা করলেন তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। তাহলে কি তার ধর্মোপদেশ দান করা সমুচিত? গুরু বললেন, তুমি শব্দের অর্থ বুঝতে পারছ না। অনুমানের দ্বারা অর্থ হয় না।’[১১১] [অনুবাদ গবেষকের]। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বজ্রযানে গুরু লৌকিক দেহে না থাকলেও তাঁর অবস্থান শিষ্য অনুভব করবে এবং গুরুর নির্দেশে চালিত হবে এমনটাই কাঙ্ক্ষিত। নারো পা এবং তিলো পা-র কথোপকথনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাবনার সাদৃশ্য পাচ্ছি। প্রথম সাদৃশ্য, গুরুতে বিশ্বাস, দ্বিতীয় সাদৃশ্য রামকৃষ্ণের নানা উপদেশেই আমরা দেখেছি নিজের ইচ্ছায় যে কেউ গুরু হয়ে বসবে অথবা মার্গ প্রতিষ্ঠা করবে—এই ভাবনার বিরোধিতা করতেন তিনি। তাঁর মতে যখন সৎভাবে কারো ভেতর থেকে গুরু হওয়ার উপলব্ধি হয়, একটা আলাদা সাড়া অনুভব করা যায়—তখনই কেউ গুরু হবেন, নচেৎ নয়। রামকৃষ্ণের ভাষায়—“তাই বলছি, হেঁজি পেঁজি

---

[১১০] Bhayani. H.C. *Dohakosagiti of Krishnapada, Tellopada*. Varanasi: Central Institute of Higher Tibetan Studies. 1998. First Edition. pp. 13-19

[১১১] Guenther, Herbert V. *The Life and Teaching of Naropa*. Oxford: The Clarendon Press. 1963. 1st Edition. pp. 90-91

লোক লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাশ থাকলে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না। যে লোকশিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই।"[১১২]

আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বজ্রযানের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন এবং প্রসার সিদ্ধাচার্যদের হাতেই হয়েছিল। আমরা এতক্ষণ মূলত সিদ্ধাচার্যদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আলোচনা করেছি। এবার সিদ্ধাচার্যদের সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং সমাজ অর্থনীতিতে তাঁদের যোগদানের দিকটি বোঝা দরকার। আমরা আগেই দেখেছিলাম বঙ্গদেশে বৌদ্ধরা কীভাবে রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সঙ্ঘের একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিলেন। এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন অবধি কার্যকর ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি বঙ্গদেশে হ্রাস পেলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেই সঙ্ঘকেন্দ্রিক অর্থনীতি পরিচালিত হত। সঙ্ঘের গুরুরা তাই কেবল ধর্ম জীবনের উপদেষ্টাই নন, অর্থনৈতিক জীবন-ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। মূলত হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে সে ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। কেবল বৌদ্ধ নয় বৈষ্ণব সংস্কৃতিতেও এই ধরনের গুরুদের কথা পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা সমান্তরাল একটি শাসন ব্যবস্থা চালনা করতেন। প্রসঙ্গত ১৮৪২ নাগাদ শম্ভু ঠাকুর নামে একজন বৈষ্ণব গুরুর কথা পাচ্ছি যিনি ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের কিছু এলাকা নিয়ে একটি বিকল্প 'রাজত্ব' চালানোর অপরাধে ব্রিটিশ শাসকের হাতে গ্রেপ্তার হন।[১১৩] উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যেই বৌদ্ধ অথবা বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ কেন্দ্রিক অর্থনীতি ছিল যা ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে অনিবার্যত বিবাদে উপস্থিত হয়। খ্রিস্টান মিশনারিদের পক্ষেও এই সব অঞ্চলে তাদের ধর্ম প্রচার করা অত্যন্ত অসুবিধার ছিল। এর অন্যতম কারণ পার্বত্য অঞ্চলে একাধিক ভাষার প্রচলন।[১১৪] সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে গুরু এবং ধর্মকেন্দ্রিক ব্যবস্থার এক রীতিমত প্রভাব উনিশ-বিশ শতকের

---

[১১২] শ্রীম. *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত.* কলকাতা : ১৯৯৩. অষ্টাদশ মুদ্রণ. পৃ. ১১৪

[১১৩] Chatterjee, Indira. *Forgotten Friends Monks, Marriages and Memories of North-East India*. New Delhi: Oxford University Press. 2013. 1st Edition. pp. 180-181

[১১৪] তদেব, পৃ. ৩১০-৩১১

ভারতবর্ষেও কার্যকর ছিল। কেবল ধর্মকেন্দ্রিক ছিল না বলেই, বিশেষত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই ব্রিটিশ শসকের সঙ্গে এই ব্যবস্থার সরাসরি সংঘাত হত। আমরা বুঝতে পারি এই বিকল্প অর্থনীতির মূল রাশ ছিল সঙ্ঘের, নির্দিষ্ট করে বললে একজন গুরুর হাতে। এই কারণেই সিদ্ধাচার্যদের কথা আমরা দেখতে চাইছিলাম। আসলে অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ, শিষ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার মত যোগ্যতা এবং অনেকের মতের মধ্যে সমতা বিধান না করতে পারলে কোনো ভাবেই একটি সমাজব্যবস্থা নির্মাণ এবং দীর্ঘকাল ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

৪.৩ বজ্রযানী শাস্ত্র-সাহিত্যের বয়ান ও সাধ্য-সাধনে গুরুর ভূমিকা

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় তিনটি দার্শনিক পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায়। বজ্রযান, সহজযান এবং কালচক্রযান। বঙ্গদেশের প্রেক্ষিতে এই তিনটি পরিভাষারই ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে এই তিনটি পরম্পরার আন্তঃসম্পর্কটি বুঝে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে দেখলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনার প্রথম স্তর হল বজ্রযান। এখানে সাধক তাঁর সাধনার সূচনায় মূর্তির সহায়তায় মনঃসংযোগ শুরু করেন। বজ্রচিত্ত অর্জন করার জন্য গুরুর আদেশ অনুযায়ী যোগসাধনায় যুক্ত হন। বজ্রযানের পথে অগ্রসর হয়ে শিষ্য আরও সূক্ষ্ম পর্যায়ে উপস্থিত হলে তাকে বলা হয় সহজ। এই পর্যায়ে মূর্তির গুরুত্ব থাকছে না, বাহ্য উপদান অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে।[১১৫] সুতরাং বজ্রযান এবং সহজযানের পার্থক্য অনেক বেশি সাধনার সঙ্গে যুক্ত, তত্ত্ব কাঠামোর দিক থেকে এরা একই ভিত্তিভূমিতে রয়েছে। তবে বজ্রযানের স্তরে যেহেতু শিক্ষার্থী একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছেন তাই তাঁর গুরুর তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন অনেক বেশি। সহজযানের স্তরে শিক্ষার্থী অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং বজ্রর অনুভব একারণেই স্বসংবেদ্য। কালচক্রযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বিবর্তনেরই নাম। এই দর্শনকে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের সাম্প্রতিকতম বিবর্তিত এবং পরিণত রূপ বলা যায়। সুতরাং বজ্রযান-

---

[১১৫] রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব).* কলকাতা: দে'জ. ১৪২০. অষ্টম সং. পৃ. ৫২৭-৫২৮

সহজযানের সঙ্গে কালচক্রযানের পার্থক্যের একটি দিক সময়কেন্দ্রিক। বজ্রযানের সূচনাকাল যদি খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতক ধরা হয় তাহলে কালচক্রযানের সময় ধরতে হবে অন্তত এক শতক পরে। আদি বুদ্ধের কল্পনা এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেব-দেবীর কল্পনা কালচক্রযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে নানা দেবতার আরাধনাই কালচক্রযানের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। *শ্রীকাল-চক্র-তন্ত্র* নামক গ্রন্থের সূচনায় দেখা যাচ্ছে রাজা সুচন্দ্র সর্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধকে কলি যুগে সকল মানুষের মুক্তি কীভাবে হবে জানতে চাইলেন। ভগবান বুদ্ধ তখন তাঁকে এমন এক যোগের শিক্ষা প্রদান করলেন যা এতদিন অবধি সকল সাধারণের অজানা ছিল। এই যোগে মণ্ডল এবং অভিষেক এমনকি এই জগতের সমস্ত অস্তিত্বই এই শরীরের ভেতরেই রয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেন ভগবান বুদ্ধ। এই আলোচনায় বুদ্ধদেব দুই প্রকার শ্বাস বায়ু—প্রাণ এবং অপান-এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেন। কালচক্র-এ প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক অর্থ রয়েছে। 'কা' অর্থাৎ কার্য-কারণ, 'ল' অর্থাৎ লয়, 'চ' অর্থাৎ চঞ্চল মন এবং 'ক্র' অর্থাৎ ঘটনা অর্থাৎ কার্যের ক্রম অথবা কার্যপদ্ধতি। সুতরং 'কাল' বলতে বোঝাচ্ছে যেখানে যাবতীয় কার্য-কারণ সম্পর্ক শেষ হয় এবং শূন্যতার বোধ উৎপন্ন হয়, এই শূন্যতাই হল বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। চক্র শব্দের অর্থ হল চঞ্চল মন যখন স্থির হয় এবং জগতের মূলতম কর্মপদ্ধতিকে বুঝতে সমর্থ হয়। সুতরাং 'চক্র' থেকেই আসে 'উপায়'। সুতরাং 'কালচক্র' হল শূন্যতা এবং উপায়-এর যুগনদ্ধ অবস্থা। কালচক্রযানের অন্যতম উপলব্ধি হল ধর্মধাতু রূপে 'কাল'-এর অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং 'চক্র' আসলে কালের ত্রিবিধ অস্তিত্বের বোধ। আমরা দেখতে পাচ্ছি কালচক্রের মূল দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে বজ্রযানের কোনো বিরোধ নেই বরং নারো পা-র *সেকোদ্দেশটীকা* থেকে একথা বোঝা যায় যে কালচক্রযান আসলে বজ্রযানেরই একটি সাধনার ধারা।[১১৬] অতএব উপলব্ধির দিক থেকে দেখলে বজ্রযান এবং কালচক্রযান সহজযানের উপলব্ধিতেই সমাপতিত হবে। কালচক্রতন্ত্রের উদ্ভব এবং বিকাশ নিয়ে কিছু কথা বলার প্রয়োজন। কালচক্রযান ভারতবর্ষে

[১১৬] Dasgupta, Shashibhushan. *An Introduction to Tantrik Buddhism*. New Delhi: Cosmo Publications 2016. 1st Edition. pp. 73-77

প্রথম উদ্ভূত হয় এবং তার পরে তিব্বতে এই মতের বিস্তার ঘটে—এই মত তিব্বতি পরিব্রাজক বু-তোন-এর।[১১৭] আবার কালচক্রতন্ত্রের সূচনা মধ্য-এশিয়ায় হয় এবং ক্রমে এই মত ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এই মতও অনেকে পোষণ করেন। প্রমাণ হিসাবে বলা হয়েছে নারো পা-কে কালচক্রপাদ হিসাবে তিব্বতি পণ্ডিত পদ্ম-কার-পো-এর তুলনায় হীন মনে করা হয়েছে। তিব্বতি আখ্যান অনুযায়ী Tsi lu pa দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং একজন মন্ত্রী, একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন বৈয়াকরণকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তারপরে নালন্দায় আসেন এবং নারো পা-কে দীক্ষা দান করেন।[১১৮] তবে এই আখ্যানটিকে কতটা গ্রহণ করা যাবে সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা থাকছে। নারো পা-র রচিত *পরমার্থসংগ্রহ* এবং *সেকোদ্দেশ*-এর উপর তিনটি টীকা অত্যন্ত বিখ্যাত। *পরমার্থসংগ্রহ* কালচক্রযানের অত্যন্ত দরকারি গ্রন্থ এবং তাত্ত্বিক ভিত্তিরূপে স্বীকৃত। এই গ্রন্থের নামকরণ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে এটি মৌলিক রচনা নয়, সংগ্রহ জাতীয় রচনা। এখানে নারো পা-র নিজের কিছু রচনার পাশাপাশি *লঘুকালাচক্রতন্ত্র*, *গুহ্যসমাজতন্ত্র* এবং *ধর্মধাতুসত্ত্ব*-র থেকে শ্লোক সংকলিত হয়েছে।[১১৯] উদ্ধৃত প্রত্যেকটি গ্রন্থ বজ্রযানের তত্ত্বগ্রন্থ এবং ভারতেই লিখিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কালচক্র-র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাস্ত্রেরই সহায়তা নেওয়া হল। আমরা আগেই বলেছি কালচক্রযান-কে বজ্রযান-এরই একটি সাধন পথ হিসাবে দেখা সম্ভব। নারো পা-র *পরমার্থসংগ্রহ*-র শ্লোক নির্বাচন থেকে আমাদের পূর্বতন সিদ্ধান্তই পরিপুষ্ট হচ্ছে। কালচক্রযানের আরেকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ *কালচক্রমূলতন্ত্র* অনুযায়ী বুদ্ধদেব বোধি অর্জনের বারো মাস পরে কম্বলের রাজা চন্দ্রভদ্রের অনুরোধে ধান্যকটকের চৈত্যে বারো হাজার মন্ত্র সম্বলিত *কালচক্রমূলতন্ত্র*-র উপদেশ প্রদান

---

[১১৭] Ghosh, B. *Emergence of Kalachakratantra*. Bulletin of Tibetology. Edited by N.C. Sinha & J.K. Rechung. Gangtok: Sikkim Research Institute of Tibetology. 1985. No. 2. pp. 23-25

[১১৮] Vira, Raghu & Chndr, Lokesh. *Kalachakra-Tantra and Other Texts*. New Delhi: International Academy of Indian Culture. 1966. 1st Edition. pp. 06-09

[১১৯] Merzagora, Stefania. *The Sekoddesatika by Naropa*. Roma: Intituto Italiano Per L’ Africa E L’ Oriente. 2006. 1st Edition. pp. 13-14

করেন। এই বছরেই তিনি প্রজ্ঞাপারমিতার তত্ত্বও ব্যাখ্যা করেন। এই ধান্যকটককে উড়িষ্যার কটক বলে মনে করা হয়েছে।[১২০] ১৪৭৬-১৪৭৮ খ্রি. মধ্যে তিব্বতে রচিত *Blue Annals*–এর দশম অধ্যায়ে কালচক্র নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থটির মতানুযায়ী মহাসিদ্ধ বজ্রঘণ্টা পা-র *সহজসম্ভরসাধনা* থেকে কালচক্রযানের সূচনা। বজ্রঘণ্টা পা—কূর্ম পা—জালন্ধরী পা—কৃষ্ণ পা—ভদ্র পা—বিজয় পা—তিল্লি পা—নারো পা এই গুরু পরম্পরায় কালচক্রযানের বিবর্তনের কথা বলা হয়, এই গ্রন্থেরই বিক্রমশীলা মহাবিহারে একটি বিতর্ক সভার উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে সভায় বলা হয়েছিল যিনি কালচক্র জানেন না তিনি বজ্রযানও জানেন না।[১২১] সময়ের দিক থেকে মনে করা হয় কালচক্রযান ভারতবর্ষে দশম শতকে (৯৬৫ অব্দে) প্রথম উদ্ভূত হয় এবং তারপর কাশ্মীর এবং তিব্বতে এই মতের প্রসার ঘটে।[১২২]

কালচক্রযানের প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য আদি বুদ্ধের প্রসঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে কালচক্রযানকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেকেই আদি বুদ্ধের ধারণাকে সামনে রাখতে চান। আদিবুদ্ধ স্বয়ম্ভূ এবং জগৎ সৃষ্টির কারণ। নেপালে আদি বুদ্ধের ধারণা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আদিবুদ্ধ মানবীয় আকারে উপস্থিত হলে তাকে বজ্রধর বলা হবে। এই বজ্রসত্ত্ব অথবা বজ্রধর ভারতবর্ষীয় তন্ত্র তত্ত্বে অক্ষোভ্য, তিব্বতি ব্যাখ্যায় সমন্তভদ্র এবং জাপানী ব্যাখ্যায় বৈরোচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে জাপানের বৌদ্ধ ধর্মে 'আদিবুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।[১২৩] তিব্বত এবং জাপান দুই দেশেই আদিবুদ্ধের শিক্ষা প্রদানের তিনটি মণ্ডল-এর কল্পনা রয়েছে। জাপানে প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবৈরোচন প্রথমে আভ্যন্তরিক শিষ্যগণ, দ্বিতীয় মণ্ডলে অপর শিষ্য এবং

---

[১২০] Das, Sarat Chandra. *On the Kalachakra System of Buddhism Which Originted in Orissa. Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol-III*. Kolkata: The Asiatic Society. 1907. pp. 225-227

[১২১] Roerich, George N. *The Blue Annals*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. 1976. 2nd Edition. pp.754-759

[১২২] Csoma De Koros, Alexander. *Grammar of the Tibetan Language*. Calcutta : The Asiatic Society of Bengal. 1834. p. 192

[১২৩] হাজরা, কানাইলাল. *আদি-বুদ্ধ.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০১৪. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৩০-৩১

পবিত্র প্রাণিগণ এবং তৃতীয় মণ্ডলে অপবিত্র শিষ্য ও প্রাণিদের শিক্ষা প্রদান করেন। তিব্বতে প্রচলিত বুদ্ধগুহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম মণ্ডলী হল সময়-মুদ্রা, এই স্তরে আদি বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব ও সমন্তভদ্রে প্রবেশ করেন, দ্বিতীয় মণ্ডলে তিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ, জগতের অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণিগণকে শিক্ষা দান করেন এবং তৃতীয় স্তরে মঞ্জুশ্রী এবং অন্যান্য বোধিসত্ত্বদের জ্ঞান দান করেন। এই তিনটি পর্যায়ে প্রদত্ত শিক্ষা পদকেই আদিবুদ্ধে ত্রি-কায় বলা হয়।[১২৪] নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে *স্বয়ম্ভূ-পুরাণ* নামে এক গ্রন্থের কথা পাওয়া যাচ্ছে। গ্রন্থের রচয়িতা মঞ্জুশ্রী, যিনি খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। মূলত ব্রাহ্মণ্য পুরণের ধারা অনুসারে গ্রন্থটি অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা।[১২৫] গ্রন্থে আদি বুদ্ধই স্বয়ম্ভূ নামে আখ্যাত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার ছাপ এই রচনায় স্পষ্ট। আদি বুদ্ধের ধারণার সঙ্গে সামানিজমের সাদৃশ্যের কথাও বলা হয়েছে। এই মতের বিরুদ্ধেও যথেষ্ট যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে প্রথম থেকেই।[১২৬] ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ আদি বুদ্ধের ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। একইভাবে কালচক্রের মূল বিষয় শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ভর যোগের কথাও শ্রুতিগ্রাহ্য তন্ত্র পরম্পরাতে একই ভাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। খ্রি. দশম শতকে আবির্ভূত ভারতবর্ষের প্রখ্যাত দার্শনিক অভিনব গুপ্ত-র *তন্ত্রালোক*-এর ষষ্ঠ আহ্নিকে প্রাণ-অপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার বায়ুর কথা বলা হয়েছে।[১২৭] এই অধ্যায়েই 'কাল' সম্পর্কেও কিছু আলোচনা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং কালচক্র এবং সামগ্রিক ভাবে তন্ত্রপৃক্ত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এক ধরনের সরাসরি সম্পর্ক নির্মিত হয়েছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকছে না।

---

[১২৪] তদেব, পৃ. ১২৩-২৪

[১২৫] Mitra, Rajendralal. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*. Calcutta: The Asiatic Society of Bengl. 1882. 1st Edition. p. 249

[১২৬] Csoma De Koros, Alexander. 'Note on the Origin of the Kala-chakra and Adi-Buddha System'. *The Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol-II. Kolkta : The Asiatic Society. 183. p. 58

[১২৭] ভট্টাচার্য, সুখময়. *অভিনবগুপ্ত প্রণীত তন্ত্রালোক*. কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০১৫. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ১৮১

প্রসঙ্গত, বজ্র শব্দটির প্রয়োগ নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে বজ্র শব্দটি অমোঘ-ভীষণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আট প্রকার বজ্রের উল্লেখ পাচ্ছি—বিষ্ণুর সুদর্শন, শিবের শূল, ইন্দ্রের বজ্র, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকের শক্তি এবং দুর্গার অসি।[১২৮] সুতরাং বজ্র বলতে পৌরাণিক সংস্কৃতিতেও বোঝানো হয়েছে বিশেষ শক্তিশালী অস্ত্রকে। তবে বজ্র শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু পর্যায়ের ক্রমিক পরিবর্তন দেখা যায়। ঋগ্বেদেই আমরা ইন্দ্রের বজ্রপ্রয়োগে বৃত্রাসুরকে হত্যার কথা পাই। তৈত্তিরীয় সংহিতা-র বর্ণনা অনুসারে বজ্রকে তীর জাতীয় অমোঘ অস্ত্র বলে মনে হয়।[১২৯] পরবর্তী সময়ে *ললিত-বিস্তর*-এ বজ্রকেই মারের বিরুদ্ধে গৌতম প্রয়োগ করেছিলেন বলে দেখা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে বজ্রের ধারণা মহাযানী বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হয়েছে। তবে বৈদিক সংস্কৃতিতে বজ্র কেবল ইন্দ্রেরই অস্ত্র নয়, রুদ্র এবং রুদ্রপুত্র মরুৎ-ও বজ্রের অধিকারীরূপে বর্ণিত হয়েছে। বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক এবং মহাকাব্যের সংস্কৃতিতে বজ্রের উত্তরাধিকার বহন করেছেন, কুষাণ যুগের মুদ্রায় আমরা বজ্রপাণি শিবের অস্তিত্ব পাচ্ছি, যদিও একই সঙ্গে ত্রিশূল এবং বৃষ বাহনের কল্পনাও কুষাণ যুগের থেকেই দেখা যাচ্ছে।[১৩০] বজ্রের ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাবিলনের কিংবদন্তীতে বরদুক নামক দেবত্র হাতে, জরথুস্ত্র মতের দেবী নন-এর হাতেও। বজ্রকে একারণেই অনেকে আসিরীয় সংস্কৃতির প্রভাব বলতে চেয়েছেন। আবার ইন্দো-গ্রিক মুদ্রায় জিউস এবং অন্যান্য দেবতাদের হাতেও বজ্রের উপস্থিতি দেখা যায়। গান্ধার শিল্পকলায় বজ্রের যথেষ্ট ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। বৌদ্ধ দেবতাদের মধ্যে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের একাধিক শাস্ত্রের পাশাপাশি শিল্পকলাতেও বজ্রপাণির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে উত্তরভারতের বৌদ্ধধর্মের একাধিক দেবতার মধ্যে বজ্রের অস্তিত্ব দেখতে

---

[১২৮] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (২). নতুন দিল্লি. ২০১১. অষ্টম মুদ্রণ. পৃ. ১৪৪৩

[১২৯] Majumdar, N.J. ‘Notes on Vajra’. Journal of the Departmental Letters, Vol. XI, Calcutta : Clcutta Univeristy Press. 1924. pp. 173-174

[১৩০] তদেব, পৃ. ১৭৭-১৭৮

পাচ্ছি। বর্তমানে দলাই লামার চিহ্ন হিসাবেও বজ্র ব্যবহৃত হয়। দলাই লামা বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণিরই মনুষ্য সংস্করণ। বঙ্গদেশের মূর্তি শিল্পেও বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি।[১৩১] বজ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে মূলত অস্ত্র রূপে উপস্থিত হলেও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বজ্র বলতে মূলত অস্ত্র বোঝাচ্ছে না, কারণ বোধিসত্ত্বেরা সকলেই করুণার অবতার। করুণার সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রের কাঠিন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার বৌদ্ধদের মধ্যেই বজ্রব্রত পালনের কথাও পাচ্ছি অশুভ শক্তির হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়।[১৩২] সুতরাং বজ্রের কল্পনা পৃথিবীর নানা ধর্মে দেখা যায় এবং ভারতবর্ষে তা ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। বঙ্গদেশের বজ্রযানে বজ্র অস্ত্র নয়, বরং বজ্রের কাঠিন্য-ই এই ক্ষেত্রে সাধনার অভিপ্রেত অর্থ। বঙ্গদেশ এক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত একটি ধারণাকে গ্রহণ করেছে এবং তাকে তাত্ত্বিক কাঠামো দান করেছে।

এবার বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক প্রেক্ষাপটটি বোঝার দরকার। মাধ্যমিক শাখার শূন্যবাদ বিবর্তিত হয়ে যোগাচার দর্শন এবং তার থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। সুতরাং বজ্রযানের দার্শনিক প্রেক্ষাপট রয়েছে এবং মাধ্যমিক দর্শন এবং যোগাচার দর্শন। মাধ্যমিক দর্শনে শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠার কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শূন্যের ধারণা স্বীকৃত হয়েছে, যদিও মাধ্যমিক দর্শন এবং বজ্রযানে ব্যবহৃত ‘শূন্য’ শব্দের অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। বজ্রযানে যোগাচার শাখার বিজ্ঞানবাদের প্রভাবও সুস্পষ্ট। বজ্রযানের প্রথম দিকের সর্বজন স্বীকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ হল—পদ্মবজ্রের *গুহ্যসিদ্ধি*। পরবর্তী সময়ের শাস্ত্রকারেরা যেমন ইন্দ্রভূতি তাঁর *জ্ঞানসিদ্ধি*-তে *গুহ্যসিদ্ধি*-র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। বজ্রযান মহাযানের মন্ত্রযানের থেকে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ইত্যাদিকেও গ্রহণ করেছে। বজ্রযানের শাস্ত্রে সুসজ্জিত

---

[১৩১] তদেব, পৃ. ১৯৭-১৯৮

[১৩২] তদেব, পৃ. ১৯৯

মন্ত্রগুলির অনেকাংশই *মঞ্জুশ্রী মূলকল্প* থেকে গৃহীত।[১৩৩] বজ্রযানকে আমরা এই কারণে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনেরই স্তর হিসাবে দেখব। যদিও একাধিক সিদ্ধাচার্যদের রচনায় থেরবাদী এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্লেষ এবং বিরূপ মনোভাবের উল্লেখ আমরা দেখতে পাব। আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মৈত্রেয়নাথের যোগাচার সংক্রান্ত রচনাকেই বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের সূচনাবিন্দু রূপে বিচার করা যায়। মৈত্রেয়নাথ এবং অসঙ্গ যোগাচার শাখার প্রতিষ্ঠাতারূপে স্বীকৃত। মূলত নাগার্জুন এবং ভবসংক্রান্তির রচনার টীকা লিখতেই এই শাখার সূচনা হয়। নাগার্জুনের তত্ত্বানুযায়ী পুদ্গল (সত্তা-দেহ), ধর্ম সবকিছুই পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, এদের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই এরা অসৎ। যেহেতু এই পুদ্গল এবং ধর্ম অসৎ, তাই এঁরা নৈরাত্ম্য এবং শূন্য। এই মতে বোধিচিত্ত-ও তাই শূন্য এবং করুণাগর্ভ। বোধিসত্ত্বের চেতনার দিক হল প্রজ্ঞা এবং ধ্যানের মাধ্যমে এই প্রজ্ঞায় পারমিতা অর্থাৎ পারঙ্গমতা অর্জন করতে হয়। তবে মহাযানের এই সিদ্ধান্ত নাগার্জুনের রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও অনেক সময় একই লেখকের একাধিক রচনায় বিভিন্ন স্ববিরোধিতার সুযোগ ছিল, বিশেষত থেরবাদী অভিধর্মের সঙ্গে একাধিক তাত্ত্বিক অবস্থানের বিরোধ দেখা দেয় যা মৈত্রেয়নাথ এবং অসঙ্গ-র রচনায় অনেকটা সুসংহত আকার লাভ করে। মৈত্রেয়নাথ-এর লেখা 'অলঙ্কার' গোত্রীয় রচনাগুলি থেকে নাগার্জুনের শূন্যবাদের পৃথকতর ব্যাখ্যার সূচনা হয়। *অভিসময়ালঙ্কার, মহাযানসূত্রালঙ্কার, মধ্যন্তবিভঙ্গ*—এই গ্রন্থগুলি মৈত্রেয়নাথের রচিত বলে জানা যায় এবং বইগুলি পাওয়াও যায়। নাগার্জুনের মতে শূন্যতা সৎ হতে পারে না, দৃষ্টিও হতে পারে না। সুতরাং শূন্যতাকে প্রসঙ্গ বলাই সমীচীন। মৈত্রেয়নাথের মতে শূন্যতা একই সঙ্গে সৎ এবং অসৎ। জগতে সব কিছুই যদি শূন্য হয় এবং শূন্য-ও যদি অসৎ হয় তাহলে নির্বাণও তো অসৎ বলেই গৃহীত হবে, মৈত্রেয়নাথ একে বলবেন 'অদ্ভুতপরিকল্প'। মৈত্রেয়নাথের মতে অদ্ভুতপরিকল্প এবং শূন্যতা—এই দুটি বোধই চূড়ান্ত অবস্থায় থাকছে, অদ্ভুতপরকল্প হল মিথ্যা

---

[১৩৩] Bhattacharyya, Benoytosh. *Origin and Development of Vajrayana*. Indian Historical Quarterly (Part III). 1927. pp. 733-746

জ্ঞান এবং শূন্যতা হল সত্য জ্ঞান। দিঙ্‌নাগ-এর ব্যাখ্যায় শূন্যতা যে রজ্জু, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্পের রূপ ধারণ করে কিন্তু এই রজ্জু কিন্তু প্রকৃত অর্থে শূন্যতা নয়।[১৩৪] যোগাচার দর্শন মনে করে এই জগৎ আসলে একটি স্বপ্নের মতন। জগতের সকল জীবই মুহূর্তের চেতনার সমষ্টির মধ্য দিয়ে জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। শূন্যতার চেতনা থেকেই এই চক্র থেকে মুক্তি লাভ হতে পারে, তবে এই মুক্তির পথে দুটি বাধা—ক্লেশাভরণ এবং জ্ঞেয়াভরণ। প্রথমটি হল জাগতিক দুঃখ এবং দ্বিতীয়টি হল বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা।[১৩৫] জ্ঞেয়াভরণ থেকে মুক্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন নেই, দরকার মনঃসংযোগের। এই ক্লেশ বা বাধাটি দূর হলে সাধকেরা সর্বগুণ অর্জন করেন অর্থাৎ জগতের সকল জীবের দুঃখ অনুভবে সম্মত হন। অনঙ্গবজ্র নামক সিদ্ধের রচিত *প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রজ্ঞোপায় ধ্যানের কথা পাচ্ছি। এই ধ্যান শূন্যতার ধ্যান নয় আবার অশূন্যতার ধ্যানও নয় অথবা এই দুইকেই অস্বীকার করার ধ্যানও নয়।[১৩৬] দেখা যাচ্ছে তাত্ত্বিকভাবে বজ্রযান শূন্যতাকে স্বীকার করলেও শূন্যতাকেই মুখ্য অভীষ্ট বলে মনে করছে না। মৈত্রেয় এবং অসঙ্গের রচনার সঙ্গে আচার্য নাগার্জুনের মূল পার্থক্য হল পরমার্থ সত্য প্রসঙ্গে নাগার্জুনকে নেতি অথবা ইতিবাচক বলাটা সমস্যাজনক কিন্তু পরবর্তী সময়ে মৈত্রেয় এবং অসঙ্গ পরমার্থ প্রসঙ্গে ইতিবাচক অবস্থানই গ্রহণ করেছে। বসুবন্ধু-র *বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা-সিদ্ধি* গ্রন্থে বিজ্ঞানকে অচিন্ত্য অনাস্রব ধাতু, ধ্রুব, মঙ্গলস্বরূপ এবং বিমুক্ত-কায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিজ্ঞান শূন্য নয় বরং বেদান্তের নির্বিশেষ ব্রহ্মের কাছাকাছি।[১৩৭] বজ্রযানে সরাসরি বিজ্ঞান-কে ‘সৎ’ হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি, এরা স্বীকার

---

[১৩৪] Tucci, G. *Some Aspects of the Doctrines of Mitreya (Natha) and Asanga*. Calcutta: University of Calcutta. 1st Edition. 1930. p. 122

[১৩৫] Bhattacharyya, Benoytosh. *An Introduction to Buddhist Esotorism*. Varnasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office. 1964. Second Edition. p. 35

[১৩৬] তদেব, পৃ. ৩৯-৪০

[১৩৭] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি. ১৪১৯. তৃতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৩৪

করেছে বজ্রকে। তবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব-ই বজ্রযানে ‘বজ্র’ রূপে স্বীকৃত। থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মে গৌতম বুদ্ধের দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে—শাক্য সিংহের মানুষী রূপ, যাকে বলা হয়েছে রূপকায় আবার তিনি তো কেবল মানুষী কায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাই মানুষরূপ তার সমগ্র তত্ত্বরূপের অংশমাত্র, বুদ্ধদেবের সমগ্র তত্ত্বরূপকে বলা হয় অরূপকায়। মহাযান-এ তিনটি কায়ের কল্পনা পাচ্ছি—নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় এবং ধর্মকায়। নির্মাণকায় হল মানুষী বুদ্ধ, সম্ভোগকায় হল বুদ্ধের জ্যোতির্ময় আনন্দময় দেহ যেখানে অসংখ্য বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি, এইখানে তিনি সর্বজীবে ধর্ম দেশনা করেন। আর ধর্মকায় হল বুদ্ধের সর্ব-অস্তিত্বের অদ্বয় রূপ, অখণ্ড মহাতত্ত্বের রূপ। বজ্রযান বুদ্ধের আরেকটি সর্বোচ্চ রূপের কল্পনা করেছে যাকে বলা হবে বজ্রকায়।[১৩৮] এখানেও বজ্রযান, মহাযানের সঙ্গে পৃথক তাত্ত্বিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান-এর তত্ত্বই যেহেতু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক উপাদান তাই বিজ্ঞান প্রসঙ্গেও কিছু আলোচনা আবশ্যক। বিজ্ঞানকে বৌদ্ধদের আগেই বেদান্তদর্শন স্বীকার করেছিল। বৌদ্ধদর্শনে চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি—এগুলি পর্যায়বাচক অর্থাৎ প্রায় একই বিষয়ক বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। বেদান্তের মতে অবিদ্যা এবং বৌদ্ধদের মতে বাসনাই বিজ্ঞানকে বাহ্য বস্তুরূপে প্রতিভাত করে। *লঙ্কাবতারসূত্র*-এ বলা হয়েছে কেবল চিত্ত আছে, দৃশ্য নেই। গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এই দুই প্রকারে চিত্তের প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই চিত্ত শাশ্বতও নয় আবার এই চিত্তের উচ্ছেদও নেই। অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে সবই চিত্ত, গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই দুই রূপে চিত্তের প্রবৃত্তি থাকে, আত্মা এবং আত্মীয় বলে কিছু নেই।[১৩৯] গৌড়পাদের আগমশাস্ত্র *মহাযানসূত্রালঙ্কার*-এ বিজ্ঞানমাত্রতাকেই একমত্র স্বীকার করা হয়েহে। তবে বেদান্তীরা যেমন চিত্তকে শাশ্বত মনে করছে, বৌদ্ধরা কখনই চিত্তকে শাশ্বত মনে করছে না। তবে নাগার্জুনের দর্শনের সঙ্গে তাত্ত্বিক পার্থক্য বোজার জন্য কেবল বিজ্ঞপ্তিমাত্রতার তত্ত্বই যথেষ্ট বলে আমরা

---

[১৩৮] তদেব. পৃ. ৩৫

[১৩৯] ভট্টাচার্য, বিধুশেখর. *বিজ্ঞানবাদ.* কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা- ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা. ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ. পৃ. ১৬৫-১৬৬

মনে করি। অদ্বয়বজ্র মহাযানের দুটি শাখার কথা বলেছেন—মন্ত্রনয় এবং পারমিতানয়। বজ্রযানে এই দুটি পন্থার সহাবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি। বজ্রযান মন্ত্রের গুরুত্ব স্বীকার করছে এবং মন্ত্রের মাধ্যমেই বোধিচিত্ত অর্জনের কথ বলছে। আবার মহাযানে প্রজ্ঞাপারমিতা এবং বোধিচিত্ত্বের ধারণা স্বীকৃতই ছিল। বজ্রযান প্রজ্ঞাপারমিতা-র সঙ্গে উপায়ের ধারণাকে স্বীকার করছে এবং প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে উপায়ের অবিনাভাব স্বীকার করে এদের যুগ্মতা অর্থাৎ প্রজ্ঞোপায় যোগ থেকেই বোধিচিত্তের উৎপত্তির তত্ত্ব স্বীকার করছে। মহাযামে বোধিচিত্তকে বোধিসত্ত্বের সাধনার অংশ বলে মনে করা হয়েছে কিন্তু বজ্রযানে বোধিচিত্ত হয়ে উঠেছে সাধ্যতত্ত্ব। বোধিচিত্ত-কেই বজ্রযানে বলা হল বজ্রচিত্ত। বজ্র চিত্ত হওয়ার কারণে একে অনুত্তর তত্ত্ব অর্থাৎ যার উপরে আর কিছু নেই—এইভাবে স্বীকৃতি দান করা হল এবং পরবর্তী সময়ে একে মহাসুখের আখ্যা দান করা হল।[১৪০] এবার আমরা বজ্রযানী বৌদ্ধদর্শনের সাধ্য-সাধন তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে বোঝার চেষ্টা করব—এই মার্গে গুরু ভূমিকা কীভাবে পূর্ববর্তী বৌদ্ধ তথা ভারতীয় সাধনার সঙ্গে পৃথক হয়ে যাচ্ছে।

বজ্রযানী সাধ্য-সাধন তত্ত্বের ইতিহাস এবং ক্রম বোঝার চেষ্টা করা গেলেও যেহেতু বিষয়টি কেবল তাত্ত্বিক নয়, মূলত শরীরকেন্দ্রিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল তাই সাধ্য-সাধনের উপলব্ধি ব্যতীত এই আলোচনা সব সময়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বজ্রযানের সাধ্য বস্তু হল 'সহজ' এবং সাধন পথ হল দেহ অর্থাৎ পিণ্ডকেন্দ্রিক। সাধ্যের উপলব্ধি সাধককেই করতে হয়, এই উপলব্ধি বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। গুরু মূলত শিষ্যের সাধন পথে সঙ্গে থাকেন, পথ বলে দেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিষ্যকে অভিষেক এবং মুদ্রা প্রদান করেন। থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের গুরু মার্গোপদেশক এবং শীল-চর্যার শিক্ষাদানকারী। মহাযান অর্থাৎ মাধ্যমিক শাস্ত্রে গুরু তত্ত্ব প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করেন, পারমিতার শিক্ষা দান করেন। মনে রাখতে হবে এই দুটি

---

[১৪০] উপাধ্যায়, জগন্নাথ. *বজ্রযান: ধর্ম, দর্শন অউর জীবন-দর্শন.* ধীর দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থ শোধ পত্রিকা. সংখ্যা ২৪. বারাণসী : কেন্দ্রীয় উচ্চ তিব্বতি শিক্ষা সংস্থান. ১৯৯৭. পৃ. ৪৭-৫৫

দর্শন প্রস্থানেই গুরুর উপরে রয়েছেন শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ। যেহেতু থেরবাদ মূলত শাস্ত্রকেন্দ্রিক তাই এখানে উপাধ্যায়-আচার্য নিজস্ব উপলব্ধির কথা বলেন না। মহাযানে আচার্য বা কল্যাণমিত্র নিজস্ব তত্ত্ব প্রস্থানের কথা বলেন, তবে কল্যাণমিত্রের থেকেও মহাযানে গুরুত্বপূর্ণ হলেন বোধিসত্ত্বগণ, যাঁদের প্রত্যক্ষ দয়া এবং পথপ্রদর্শনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে বারবার। বজ্রযান এখানেই পৃথক। বজ্রযানে গুরু হলেন সর্বোচ্চ তত্ত্ব। বজ্রযানে গুরুর পিতাস্থানীয়। লৌকিক জীবনে যেমন পিতা জন্ম দান করেন তেমনি আধ্যাত্মিক দেহ বা অপ্রাকৃত দেহের জনক হলেন গুরু।[১৪১] বুদ্ধদেব যেমন সকলের হিতাকাঙ্ক্ষায় ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন, তেমনভাবেই গুরুর কাজ শিষ্যের দেহে ধর্মচক্রের প্রবর্তন করা। সাধনায় মানুষের জীবনের তিনটি স্তর কল্পিত হয়েছে। যখন পথে আরোহণ করা হল এবং ক্রমিক সিদ্ধির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া চলেছে তাকে বলা হবে সাধক দশা। দ্বিতীয় দশায় সম্যক সংবোধি লাভ হয় এবং মানুষের ক্লেশ নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তাকে বলা হয় সিদ্ধ দশা, তৃতীয় দশা হল সিদ্ধগুরুর দশা। এই অবস্থায় সমস্ত প্রাণিজগতের উন্নতি করাই হয় মূল উদ্দেশ্য, এই তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়েই সাধক পরমজ্ঞান অর্জন করেন।[১৪২] বজ্রযানের সাধ্য-সাধন নানা শাস্ত্রে এবং সিদ্ধাচার্যদের রচিত পদে গুরুর প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তা বোঝার চেষ্টা করব। সামগ্রিকভাবে বজ্রযানী সাধ্য-সাধন অত্যন্ত বিস্তৃত একটি আলোচনা। আমাদের সব কটি দিক বোঝার দরকার নেই। তাই একটি ছকের মাধ্যমে আমরা বজ্রযানী সাধন পথে গুরুর অবস্থান বুঝে নেব। ছকে যাওয়ার আগে আমাদের কয়েকটি সাধনার পরিভাষা সম্পর্ক অতি সামান্য আলোচনার প্রয়োজন হবে। বজ্রযানের সাধনার প্রক্রিয়া প্রায় সমস্তটাই দেহের অভ্যন্তরে সংগঠিত হয়, বাহ্য উপকরণের প্রায় কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য অনেক সময়েই সিদ্ধাচার্যরা বেশ কিছু প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সামগ্রিক ভাবে এই সাধনতত্ত্ব গুহ্য

---

[১৪১] কবিরাজ, গোপীনাথ. *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত.* বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৯. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ২৬৫

[১৪২] তদেব, পৃ. ২৬০

এবং গুরুমুখে শ্রবণযোগ্য বলে আখ্যাত হয়েছে। আমাদের আলোচনায় সাধ্য-সাধনের একটি তাত্ত্বিক রূপ মাত্র ফুটে উঠবে। ব্যাবহারিক দিকে এর প্রয়োগ গুরু এবং শিষ্যের উপরেই নির্ভরশীল।

- **সাধনক্রম :** বজ্রযানী সাধনায় ক্রমের প্রসঙ্গ আসছে গুরুত্ব। শিষ্যের আধার এবং চিত্তের অবস্থা বিচার করে গুরুর প্রথমে শিষ্যকে দীক্ষা দান করবেন এবং তারপর শুরু হবে সরাসরি সাধন প্রক্রিয়া। বজ্রযানে প্রথম কাজ যথাযথ গুরুর অনুসন্ধান ও শিষ্যত্ব গ্রহণ।

  √ **উৎপত্তি :** সাধনায় গুরু শিষ্যকে প্রথমে উৎপত্তি ক্রমের শিক্ষা দেবেন। এই ক্রম সৃষ্টিক্রম বা আরোহণক্রম নামেও পরিচিত। বিন্দু অর্থাৎ বীর্য এবং রজঃ ক্রমে সংযুক্ত হয়, ভ্রূণ, ভ্রূণের সামান্য বিস্তার, অঙ্গ গঠন এবং অবশেষে ভূমিষ্ঠ হওয়া—এই রূপকে উৎপত্তি ক্রম ব্যাখ্যাত হয়।

  √ **উৎপন্ন :** উৎপন্ন ক্রমের অপর নাম সংহারক্রম অথবা অবরোহণক্রম। এখানে সৃষ্টিতে শুরু এবং শেষ হয় ধ্বংসের প্রাক্-অবস্থায়। উৎপন্ন ক্রম অনেক বেশি জটিল এবং এই স্তরেই গুরুর মূল ভূমিকা। এই পর্যায়ে নিত্য আনন্দের অনুভূতি হয়।

- **মুদ্রা :** শ্রুতিগ্রাহ্য তন্ত্রে যাকে শক্তি বলে, বজ্রযানে তাকেই বলে মুদ্রা। মুদ্রা মুখ্যত উৎপন্ন ক্রমে ব্যবহৃত হয়। মুদ্রা হল প্রজ্ঞা। গুরুই মুদ্রা প্রদর্শন করেন। এই পর্যায়েই মহাসুখের অনুভব হয়।

- **সেক :** তন্ত্রতত্ত্বে কেবল মুখের কথা শুনে জ্ঞান সঞ্চারিত হয় না। তার সঙ্গে দরকার কিছু ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের। অভিষেক বা সেক-এর মাধ্যমে গুরুর জ্ঞান শিষ্যে সঞ্চারিত হয়।

√ **পূর্ব সেক :** উৎপত্তি ক্রমে যে সেকগুলি প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় পূর্ব সেক। পূর্ব সেক সাত প্রকার।

√ **উত্তর সেক :** উৎপন্ন ক্রমে যে সেকগুলি গুরু শিষ্যকে দেন তাকে বলে উত্তর সেক। বজ্রযানে উত্তর সেক তিন প্রকার।

- **বজ্রজাক :** বজ্রযানের একটি নির্দিষ্ট প্রকারের প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি। এই যোগে প্রাণবায়ু সিদ্ধ হয়।

- **সাধনপ্রণালী :** বজ্রযানের সাধনার পদ্ধতি হল ষড়ঙ্গ যোগ। প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি ও সমাধি এই ছয়টি পথে গুরু নির্দেশে দেহ এবং মনের ক্রমিক শুদ্ধি হয়। সমাধি দশায় পরমার্থ ও সংবৃতি সৎ-এর দ্বৈতভাবে কেটে যায় এবং তাদের অদ্বয়রূপের প্রকাশ হয়।[১৪৩] এই অদ্বয় সত্ত্বাই হল বুদ্ধ বা আত্মার প্রকৃত রূপ এবং এই বোধ অচল। সমাধি দশায় গুরুর বিশেষ করণীয় নেই, এই বোধ স্বসংবেদ্য যদিও অদ্বয়রূপ গুরুই প্রদর্শন করেন।

- **সাধনপ্রণালীতে গুরুর অবদান :** বজ্রযানের সাধন প্রণালী যেহেতু যোগ, মন্ত্র, মুদ্রা, অভিষেক—এই চারপ্রকার উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত তাই গুরুর এখানে সরাসরি সাধনায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই যাত্রা যেন গুরু-শিষ্যের যুগ্মযাত্রা। এই যাত্রাপথে গুরু শিষ্যকে নিম্নোক্ত ভাবে সাহায্য করেন—

১. উৎপত্তি ক্রমে সাতটি অভিষেক দান।
২. উৎপন্ন ক্রমে তিনটি অভিষেক দান।
৩. উৎপন্ন ক্রমে কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা, সময়মুদ্রার শিক্ষা ও শক্তি প্রদর্শন।
৪. উৎপন্ন ক্রমে বিন্দু-কে নামিয়ে আনার পথ নির্দেশ।
৫. অবধূতী শনাক্তকরণ, অদ্বয় রূপ প্রদর্শন এবং সর্ব প্রথমে ধর্মচক্র প্রবর্তন।

---

[১৪৩] তদেব, পৃ. ২৬১-২৬৩

৬. বজ্রযানের মতে বাক্যদ্বারা সহজ জ্ঞান প্রদান করা যায় না। তাই গুরু মৌন মুদ্রায় উপদেশ প্রদান করেন।

সারণি—১

বজ্রযানী সাধনক্রম এবং সাধন প্রক্রিয়ায় গুরুর যোগদান[১৪৪]

ক্রম	বিষয়	বজ্রযানী যোগের প্রথম স্তর	বজ্রযানী যোগের দ্বিতীয় স্তর	বজ্রযানী যোগের তৃতীয় স্তর	বজ্রযানী যোগের চতুর্থ স্তর
উৎপত্তি ক্রম	বজ্রযোগ	বিশুদ্ধযোগ	ধর্মযোগ	মন্ত্রযোগ	সংস্থানযোগ
	বিমোক্ষ	শূন্যতা বিমোক্ষ	অনিমিত্ত বিমোক্ষ	অপ্রণিহিত বিমোক্ষ	অনবিসংস্কার বিমোক্ষ
	ব্রহ্মবিহার স্তর	করুণা	মৈত্রী	মুদিতা	উপেক্ষা
	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	তুরীয় অবস্থার ক্ষয় হয়, অতীত ও অনাগতের ভাব থাকে না	সুষুপ্তি দশা ক্ষয় হয়, নিত্য- অনিত্যের দ্বন্দ্ব নষ্ট হয়	স্বপ্ন ক্ষয় হয়, 'আমি সংবুদ্ধ' ভাবের উৎপত্তি হয়	জাগ্রত অবস্থার ক্ষয় হয়, রৌদ্র/শান্ত রূপ থাকে না
	সাধকসত্তার স্তর	জ্ঞানবজ্র	চিত্তবজ্র	বাক্‌বজ্র	কায়বজ্র
	মল	রাগ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বয়	তম	শ্বাস-প্রশ্বাস	দেহবোধ
	সংবোধি	একক্ষণ অভিসংবোধি	পঞ্চাকার অভিসংবোধি	বিশংত্যাকার অভিসংবোধি	মায়াজাল অভিসংবোধি
	শিশুর সঙ্গে তুলনীয় অবস্থান	গর্ভে কেবল রজ: ও বীর্যের সংযোগ	মাতৃগর্ভে বাসনার জন্ম	গর্ভে দেহের প্রত্যঙ্গের বিকাশ	জঠর ভেদ করে জন্ম গ্রহণ
	বিন্দুর অবস্থান	নাভি	কণ্ঠ	হৃদয়	সহস্রার
	আনন্দ	আনন্দ	পরমানন্দ	বিরমানন্দ	সহজানন্দ
	গুরুর ভূমিকা	উদকাভিষেক ও মুকুটাভিষেক দান	নামাভিষেক ও অনুজ্ঞাভিষেক দান	পট্টাভিষেক ও বজ্রকণ্ঠাভিষেক দান	প্রজ্ঞাভিষেক দান
উৎপন্ন ক্রম	বিন্দুর অবস্থান	উষ্ণীষ/ সহস্রার থেকে ললাট	কণ্ঠ থেকে হৃদয়কমল	নাভি থেকে গুহ্যকমল	বিন্দুর আবর্তন পূর্ণ হয়
	আনন্দ	আনন্দ	পরমানন্দ	বিরমানন্দ থেকেই সহজানন্দ, এখানেই বজ্রগুরুর অবস্থান[১৪৫]	

---

[১৪৪] তদেব, পৃ. ২৫২-২৬৫

[১৪৫] কবিরাজ, গোপীনাথ. *ভারতীয় সাধনার ধারা.* কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ. ১৯৭৫. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৮৬

ক্রম	বিষয়	বজ্রযানী যোগের প্রথম স্তর	বজ্রযানী যোগের দ্বিতীয় স্তর	বজ্রযানী যোগের তৃতীয় স্তর	বজ্রযানী যোগের চতুর্থ স্তর
	গুরুর প্রদত্ত সেক	কুম্ভাভিষেক	গুহ্যাভিষেক	প্রজ্ঞাভিষেক	প্রয়োজন নেই, অদ্বয় দশার সাক্ষাৎ হয়
	গুরু প্রদত্ত মুদ্রা	কর্মমুদ্রা বাক্-কায়-চিত্ত-চিন্তা বিষয়ক অনুজ্ঞা	ধর্মমুদ্রা মধ্যম প্রতিপদা ও অবধূতী বিষয়ক অনুজ্ঞা	মহামুদ্রা নির্বাণস্বরূপ বিষয়ক অনুজ্ঞা	সময়মুদ্রা মধ্যমার্গ নিরুদ্ধ হয় এবং প্রকৃতিদোষ ও সমাধিমল ধ্বংস হয়

এবারে বজ্রযানী শাস্ত্রে গুরু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বজ্রশাস্ত্রগুলিতে বজ্রযানের সাধন প্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই গুরুকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। বজ্রযানী শাস্ত্রে সাধারণভাবে মণ্ডল, মুদ্রা এবং পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই আলোচনাগুলিও যে গুরুগম্য তা বলা হয়েছে। সুতরাং থেরবাদের সঙ্গে বজ্রযানের শাস্ত্রার্থ বিচারগত পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি। থেরবাদের ক্ষেত্রে আগ্রহী পাঠক সূত্র এবং বিনয় অংশ নিজ আগ্রহে বুঝতে পারবেন। বজ্রযানে তা হবে না। অন্যদিকে বজ্রযানের অধিকাংশ বর্ণনাই রূপক। অর্থাৎ দেবতাদের মাধ্যমে যে আখ্যানটি প্রস্তুত করা হচ্ছে তা আসলে শারীরিক ক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছে। বিষয়টি বোঝার আগে তিব্বতের থাঙ্কা নিয়ে কিছু কথা বললে আলোচনাটি সুগম হবে। থাঙ্কা হল পট, যাতে নানা বিষয় তিব্বতিরা এঁকে রাখতেন। এই থাঙ্কায় আঁকা ছবিগুলি যেমন নানা আভিচারিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হত, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের কাজেও ব্যবহৃত হত। আর থাঙ্কাকে সামনে রেখে ধ্যান করা হত।[১৪৬] সুতরাং বজ্রযানের যে তত্ত্ব আমরা বজ্রযানী তত্ত্বগ্রন্থে পাচ্ছি, থাঙ্কাতেই পাচ্ছি তার চিত্রিত রূপ। বিশেষত বৌদ্ধ মণ্ডল প্রসঙ্গে এই বিষয়টি ভীষণভাবে প্রযোজ্য। মণ্ডলগুলি মূলত ধ্যানের উপকরণ। মণ্ডলগুলির কেন্দ্রে মূল আরাধ্যের অবস্থান এবং মণ্ডলের আরাধ্য তার শক্তির সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় থাকেন। আশেপাশে অপরাপর দেবতা, উপদেবতা,

[১৪৬] Chakravarti, Sipra. *Tibetan Thankas in the Indian Museum*. Calcutta: Indian Museum. 2000. Reprint. p. 03

জৈবচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। এই মণ্ডল কল্পনায় গুরুদের চিত্রও অঙ্কিত হয়। যেমন—কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত সম্ভরের মণ্ডলে (থাঙ্কাটি সম্ভবত পশ্চিম তিব্বত থেকে প্রাপ্ত) একেবারে কেন্দ্রস্থলে আমরা শাক্য পা শাখার তিনজন গুরুর চিত্র দেখতে পাচ্ছি।[১৪৭] মণ্ডলের কেন্দ্রে গুরুর চিত্র অঙ্কন থেকে অনুমিত হয় এটি চিত্রের মাধ্যমগত বিশেষত্ব, সাধনতত্ত্ব লিখলে গুরুর কথা সরাসরি মণ্ডলে না বললেও চলে, গ্রন্থের অন্যত্র বোঝানো সম্ভব যে বিষয়টি গুরুর থেকে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু চিত্রে একথা প্রকাশ করার জন্য মণ্ডলের মধ্যে গুরুকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

গুহ্যসমাজতন্ত্র বজ্রযানের একটি প্রাচীন এবং প্রামাণ্য শাস্ত্ররূপে স্বীকৃত। এখানে 'সমাজ' বলতে একটি নির্দিষ্ট সমবায়কে বোঝানো হয়েছে। তথাগত, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং বুদ্ধের শক্তিগণ সমবেত হয়েছেন। তথাগতের দেহ, বাক্ এবং মন থেকে উদ্ভূত জ্ঞান তিনি বাকি উপস্থিতদের মধ্যে ব্যাখ্যা করছেন। সুতরং যথাযথ যোগের পন্থা, যা বুদ্ধত্ব অর্জনের দিকে নিয়ে যায় তাই বর্ণিত হয়েছে এই শাস্ত্রে।[১৪৮] এখানে গ্রন্থের বর্ণনায় পালি ত্রিপিটক-এর সঙ্গে একটি সম্পর্ক খেয়াল করার মতো। সংগীতিতে বুদ্ধবচন অন্যান্য অর্হতেরা সংকলন করেছিলেন, বজ্রযানের শাস্ত্র কিন্তু সরাসরি তথাগত কথিত। সুতরাং বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভিন্নতর ধারার প্রমাণ এই তত্ত্বগ্রন্থটি। গ্রন্থে বর্ণিত মণ্ডল কল্পনা কোনো বাহ্যিক বর্ণনা নয়, এবং পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং বুদ্ধগণের শক্তিও এক আদি বুদ্ধেরই ভিন্নতর অভিব্যক্তি। মণ্ডলে ব্যবহৃত চক্রগুলি মনঃসংযোগেরই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের কথা বর্ণনা করে। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধেরা আসলে পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক। *গুহ্যসমাজতন্ত্র*-র প্রথম পটলে বর্ণিত মণ্ডলগুলি প্রকৃতপক্ষে বোধিচিত্ত নির্মাণেরই উপায়।[১৪৯] গ্রন্থের পঞ্চদশ পটল 'সর্বচিন্তসময়সারবজ্জসম্ভুতির্নাম'-এ দেখছি আদি বুদ্ধ নিজেই

---

[১৪৭] তদেব। পৃ. ২১-২২

[১৪৮] Bhattacharyya, Benoytosh. *Guhyasamaja Tantra*. Baroda: Oriental Institute, Baroda. 1331. 1st Edition. p. X

[১৪৯] তদেব, পৃ. XIX

বজ্রধর, তিনি সম্রাট, স্রষ্টা, সম্পাদনকারী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত। তিনি মহাসময় জ্ঞান প্রদান করছেন এবং নির্জন স্থানে গিয়ে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে মনঃসংযোগের নির্দেশ দিচ্ছেন।[১৫০] বজ্রযানের যোগ সাধনায় মহামুদ্রা সাধনার তিনটি মৌলিক উপলব্ধির কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। সাম্যভাব অর্থাৎ কায়, বাক্ এবং চিত্তের সমতা। সহজভাব অর্থাৎ চিত্তে সহজভাবের উদয় হয়, বস্তু সম্পর্কে যাবতীয় আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ এবং প্রকৃতিভাব অর্থাৎ চেষ্টাকৃতভাবে কোনো কিছু অর্জনের চেষ্টা না করা।[১৫১] মহামুদ্রা সাধনায় ব্যবহৃত হয় মহামুদ্রা বা মহাসময় মুদ্রা। গর্ভধাতু মণ্ডলে এই মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায় মন্ত্রের সহযোগে।[১৫২] বিক্রমশীলা মহাবিহারের পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্ত-র *নিষ্পন্নযোগাবলী*-র ঊনবিংশতম অধ্যায়ে গর্ভধাতুমণ্ডলের আলোচনা পাচ্ছি।[১৫৩] মণ্ডলের বৈচিত্র্য নিয়েই অভয়কর গুপ্ত তাঁর শাস্ত্রটি লিখেছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মণ্ডলকে প্রত্যক্ষ করে ধ্যানের গুরুত্ব বজ্রযানে বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বে আলোচিত সম্ভরমণ্ডলের বর্ণনা পাব বর্তমান গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে। অনঙ্গবজ্রের *প্রজ্ঞোপায়নিশ্চয়সিদ্ধি*-তে দেখতে পাচ্ছি বজ্রজ্ঞান অর্জন করার পর সাধক বজ্রসত্ত্বের ন্যায় আচরণ করবেন। তিনি নিজেই নিজের সাধনা করতে পারেন। বজ্রসত্ত্ব কখনই নারী, বিশেষত নিম্ন বর্ণের নারীদের অসম্মান করবেন না, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করবেন না।[১৫৪] অনঙ্গবজ্রের তত্ত্বগ্রন্থ থেকে অনুমান করা যায় নিজে বজ্রসত্ত্ব অর্জন করলে তবেই কারোর পক্ষে গুরু হওয়া সম্ভব। আবার অন্যদিকে বজ্রযানে বজ্রসত্ত্ব অর্জনের পর মুণ্ডিত মস্তকে সন্ন্যাস জীবন যাপন করা বা বিবাহ করে সংসার যাপন

---

১৫০ Fremantle, Francesca. *A Critical Study of the Guhyasamaja Tantra*. London: University of London Library. 1971. p. 102

১৫১ নেগী, ঠাকুর সেইন. *বজ্রযানী অনুত্তরযোগ.* বারাণসী: কেন্দ্রীয় উচ্চ তিব্বতি শিক্ষা সংস্থান. ১৯৯৯. প্রথম সং. পৃ. ৪৩৫-৪৩৬

১৫২ Bunee, Fadrick W. *Mudras*. New Delhi: D.K. Printers. 2009. 2nd Edition. p. 133

১৫৩ Bhattacharyya, Benoytosh. *Nispannayogavali of Mahapandita Abhaya Karagupta*. Baroda: Oriental Institute, Baroda. 1949. pp. 44-45

১৫৪ Bhattacharyya, Benoytosh. *Two Vajrayana Works*. Baroda: Oriental Institute, Baroda. 1929. 1st Edition. p. xx

করা কোনো বিষয়েই কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকে না। বজ্রযানেও যেহেতু সর্বজীবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃত তাই বজ্রসত্ত্ব অর্জনের পরে সকলেই গুরু হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। *অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ*-তেই বলা হয়েছে অদ্বয়বোধ জাগ্রত হলে সাধক নিজেকে হেরুকের সমতুল্য মনে করবেন এবং জগতে সিংহের মত বিচরণ করবেন যেমন তার গুরু করতেন।[১৫৫] *চক্রসম্ভরতন্ত্র*-র সপ্তম অধ্যায়ে গুরুর ক্রিয়ানুষ্ঠানের এবং কর্তব্যের বর্ণনা পাচ্ছি। গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রথমে বাহ্য এবং অন্তঃমণ্ডলের সূচনা করবেন এবং শিষ্যের ধ্যানের মধ্যে নিজে যুক্ত হবেন। নিজে ঐশী শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রমে শিষ্যকে অদ্বয় বোধ দান করবেন। এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়টিকে প্রয়োগ বিজ্ঞানের অন্তর্গত করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত তন্ত্র মণ্ডলের বর্ণনা ছিল মূলত তত্ত্বের বিষয়। গুরুর মাধ্যমেই এই তত্ত্ব শিষ্যের মধ্যে প্রায়োগিক বোধ উৎপন্ন করবে।[১৫৬] বৌদ্ধমূর্তিতত্ত্বের গ্রন্থ *সাধনমালা*-য় আমরা দেখছি একাধিক সিদ্ধাচার্য গুরুদের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন রক্তলোকেশ্বরের সাধনায় এসেছে সিদ্ধ সরহের কথা।[১৫৭] সম্ভবত এই সকল সিদ্ধদের পরম্পরার উপলব্ধির উপর ভিত্তি করেই রক্তলোকেশ্বরের রূপ নির্মিত হয়েছে। সুতরাং গুরুর মাধ্যমে যেমন তত্ত্ব প্রায়োগিক রূপ অর্জন করেছে আবার গুরু পরম্পরার কল্পনা থেকেই মূর্তিতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে।[১৫৮] প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরু তাঁর দেহেই মণ্ডলের অবতারণা করেন, দেবতাদের চিহ্ন অঙ্কিত করে দেবতাদের

---

১৫৫ Sastri, Haraprasad. *Advayavajrasamgraha*. Baroda: Oriental Institute, Broda. 1927. 1st Edition. p. xxxviii

১৫৬ Dawa-Samdup, Kazi. *Shrichakrasambhara-Tantra*. Calcutta: Thacker, Spink & Co. 1919. 1st Edition. pp. 76-79

১৫৭ Bhattacharyya, Benoytosh. *Sadhanamala (Vol. II)*, Baroda: Oriental Institute, Broda. 1928. 1st Edition. p. cxvi

১৫৮ Lessing, F.D & Alex Wayman. *Introduction to the Buddhist Trantic System*. Delhi: MLBD. 2008. Reprint. P. 319

আহ্বান করেন এবং প্রজ্ঞা-করুণাকে অদ্বয়রূপ দানের মাধ্যমে দীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।[১৫৯] সুতরাং গুরু শিষ্যের কাছে সাধনার সহায়, উপায় এবং নিদর্শন। এখানে বজ্রযানের বিশেষত্ব।

বজ্রযানী সাধনায় গুরু প্রসঙ্গ বোঝার ক্ষেত্রে তত্ত্বগ্রন্থগুলির পাশাপাশি সিদ্ধাচার্যদের রচনার গুরুত্ব অসীম। সিদ্ধাচার্যদের রচনাগুলিকে চর্যাগীতি বলা হয়। চর্যাগীতিগুলি মূলত সাধারণের সমক্ষে বজ্রযানের দার্শনিক মহত্ত্ব প্রচার করার জন্য গাওয়া হত। এছাড়াও শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে এই ধরনের পদের ব্যবহার দেখা যায়, চর্যাগীতির সঙ্গে বজ্রগীতির ফারাক হল বজ্রগীতিতে পদকর্তাদের ভণিতা থাকে না।[১৬০] সিদ্ধাচার্যদের রচনার একাধিক সংকলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরমধ্যে বেশ কয়টি সংকলন বা টুকরো পদ কেবল তিব্বতি অনুবাদেই পাওয়া যাচ্ছে। চর্যাগীতির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত চর্যাগীতি সংকলনের নামকরণ প্রসঙ্গে বিধুশেখর শাস্ত্রীর আপত্তি ছিল।[১৬১] হরপ্রসাদ প্রদত্ত *চর্যাচর্যবিনশ্চয়* নামের অর্থ কী কর্তব্য এবং কী অকর্তব্য সে বিষয়ে নিশ্চিত মত প্রদান। বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে বর্তমান সংকলনটিতে এই প্রসঙ্গটি একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। তবে বিধুশেখর শাস্ত্রীর বক্তব্য পরবর্তীকালে অনেকেই অস্বীকার করেছেন, যেমন শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী। তাঁর মতে কর্তব্য, অকর্তব্যের বিচারই হরপ্রসাদ সম্পাদিত চর্যাগীতিগুলির মূল কাজ।[১৬২] চর্যাগীতিগুলি সহজের মহত্ত্ব এবং অপরদর্শনের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা রয়েছে। তবে যদি বলা হয় চর্যাগীতিগুলিতে কর্তব্য, অকর্তব্য প্রসঙ্গে সব থেকে দরকারি বার্তা কোনটি? আমাদের উত্তর হবে সাধনমার্গ যে একান্তই গুরুগম্য—একথাই বারবার সিদ্ধাচার্যরা বলেছেন। চর্যাগানে

---

১৫৯ Bhattacharyya. Benoytosh. *Sadhanmala* (Vol- I). Baroda: Oriental Institute, Broda. 1928. 1st Edition. p. cxvi

১৬০ সেন, সুকুমার. *চর্যাগীতি পদাবলী.* কলকাতা : আনন্দ. ২০১২. ষষ্ঠ মুদ্রণ. পৃ. ৩১

১৬১ Bhattacharya, Vidhushekhar. *Is it Caryacaryaviniseaya or Ascaryacaryaca?* Calcutta: The Indian Historical Qurterly (Vol-VI). Narendra Nath Law Edited. 1930. pp. 169-70

১৬২ Bagchi, Prabodh Chandra & Santi Bhiksu Sastri. *Caryagitikosa of Buddhist Siddhas*. Santiniketan: Visva-Bharti. 1956. 1st Edition. p. xi

এবং তার সংস্কৃত টীকায় বারংবার গুরুকে শোনার, মেনে চলার, নির্ভর করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। চর্যাগানে আমরা দুটি শব্দ পাচ্ছি—গুরু এবং সদ্‌গুরু। তত্ত্বত গুরু এবং সদ্‌গুরু শব্দদুটির মধ্যে কিছু ফারাক রয়েছে। মূলত দীক্ষা প্রদান এবং শিষ্যের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চার করার ক্ষমতা থাকলেই তাকে সদ্‌গুরু বলা হবে। সদ্‌গুরু হতে হলে অভীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করলেই হয় না, অভীষ্টকে নিজের বশে আনতে হয়, নচেৎ শিষ্যকে সেই অভীষ্ট দেখানো সম্ভব নয়।[১৬৩] চর্যাগীতি-র একাধিক গানে এবং প্রায় অধিকাংশ টীকাতেই আমরা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার কথা, গুরুর অবদান ইত্যাদির কথা পাচ্ছি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা একটি সারণির মাধ্যমে চর্যাগীতিতে গুরুর কর্তব্য বিষয়ক তথ্যগুলিকে সাজিয়ে নেব—

চর্যাগীতিতে গুরু প্রসঙ্গ[১৬৪]

পদ সংখ্যা	পদের নাম	পদকর্তা	গুরু সংক্রান্ত পদ	পদে শিষ্য ও গুরুর কর্তব্য প্রসঙ্গে মতামত
০১	মহারাগনয়উদ্দীপন চর্যা	লুইপাদ	*দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ* *লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।*	মহাসুখ কীভাবে দৃঢ় হয় তা গুরুর থেকেই জানতে হয়।
১২	ভবলয়জয়চর্যা	কৃষ্ণপাদ	*করুনা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅ বল* *সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল।।*	সদ্‌গুরুর উপদেশে ভববল অর্থাৎ সংসার ঘুঁটি জেতা হল।
১৪	প্রবাহাভ্যাসচর্যা	ডোম্বীপাদ	*বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা* *সদগুরু পাওপএ জাইব পুণু জিণউরা- ধ্রু*	সদ্‌গুরুর প্রসাদে জিনপুর যেতে হবে।
২১	চিত্তবিশোধনচর্যা	ভুসুকুপাদ	*তবসে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।* *সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল।।*	সদ্‌গুরুর উপদেশে মুষা স্বরূপ চিত্তকে নিশ্চল করতে হবে।
২৩	জ্ঞানমুদ্রাসাধনচর্যা	ভুসুকুপাদ	*মাআজাল পসরি উরে বাধেলি মাআহরিণী।*	অবিদ্যার মায়া হরিণীর তত্ত্ব সদ্‌গুরুর তত্ত্ব বচনে স্পষ্ট হয়।

[১৬৩] কবিরাজ, গোপীনাথ. *তত্ত্ব ও সাধনা.* কলকাতা: প্রাচী পাবলিকেশন্‌স. ২০১৩. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ২৭৭-৭৮

[১৬৪] সারণিতে উল্লিখিত চর্যাগীতির পাঠ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. ১৪১৫. পুনর্মুদ্রণ থেকে গৃহীত

পদ সংখ্য	পদের নাম	পদকর্তা	গুরু সংক্রান্ত পদ	পদে শিষ্য ও গুরুর কর্তব্য প্রসঙ্গে মতামত
			সদ্‌গুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কদিনি।।	
২৫[১৬৩]		তন্ত্রীপাদ	*অনাহতো বেমবরশব্দো হি গুরূপদেশেনাবিরহিতং।* *দ্বে স্থিতী ছিত্ত্বা সূত্রাণি ব্যাবৃত্য দ্বন্দ্বং প্রসারিতানি।।*	গুরুর উপদেশে দুদিকের স্থিতি ছিন্ন হয়েছে এবং সুতোগুলি দৃঢ় ভাবে প্রসারিত হয়েছে।
২৮	জ্ঞানমুদ্রাসাধনচর্যা	শবরপাদ	*গুরুবাক পুঞ্চুয়া বিন্ধ নিঅ মণে বাণেঁ* *একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহবিন্ধহ পরম ণিবানেঁ-ধ্রু*	গুরুর বচন যেন ধনুক, যার সাহায্যে বোধিচিত্তকে বাণ ক'রে নির্বাণ নামক লক্ষ্যে বিদ্ধ করতে হবে।
৩৪	পারিমকুলবিহারচর্যা	দারিকপাদ	*লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভুঅণেঁ লধা*	এখানে সরাসরি লুই পাদের শিষ্য পরম্পরার উল্লেখ পেলাম।
৩৮	উজানবাওয়াচর্যা	সরহপাদ	*কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুয়আল* *সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল*	সদ্‌গুরুর বচনে হাল ধরতে হবে।
৩৯	মনশিক্ষা বা চিত্তানুশাসনচর্যা	সরহপাদ	*সুইণা হ অবিদারঅরে নিঅমন হোহারেঁ দোসে* *গুরুবঅণ বিহারেঁরে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে*	অবিদ্যার ভ্রান্তি ত্যাগ করে গুরুর কথা শোনা দরকার।
৪০	সহজদৌর্লভ্যচর্যা	কাহ্নপাদ	*আলে গুরু উএসই সীস* *বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস*	বাক্‌পথাতীত পথ গুরু আর কী বলবেন?
৪৫	অমনস্কারচর্যা	কাহ্নপাদ	*বরগুরুব অণে কুঠারে ছিজঅ* *কাহ্ন ভণই তরু পুণ ণ উইজঅ*	গুরুর বচন যেন কুঠার, অবিদ্যার মহাতরু তা দিয়েই কাটতে হবে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগানের এগারোটি গানের পাঠে সরাসরি গুরু শব্দের উল্লেখ পাচ্ছি। ২৩-২৫ এবং ৪৮ সংখ্যক গান হরপ্রসাদ সম্পাদিত গ্রন্থে ছিল না। পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শান্তিভিক্ষু সম্পাদিত *চর্যাগীতিকোষ*-এ এই গানগুলির পাঠ তিব্বতি পাঠের সাহায্যে নির্মাণ করা হয়। এই চারটি গানের মধ্যে ২৫ সংখ্যক চর্যাগানে গুরুর কথা

পাওয়া যাচ্ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গানগুলির মধ্যে ৩৪ সংখ্যক গান দারিকপাদ রচিত পারিমকুলবিহারাচর্যায় আমরা গুরু-শিষ্য পরম্পরার সরাসরি উল্লেখ পাচ্ছি। দারিকপাদ–এর গানের টীকায় মুনি দত্ত-র ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা বিষয় মোহে আবদ্ধ হয়ে আছেন, একমাত্র গুরুর উপদেশ বলে, লুই পা-র আশীর্বাদে দারিক দ্বাদশভূমির অধিকার অর্জন করেছেন।[১৬৫] সদ্‌গুরুর উপদেশেই যে সহজ অর্জন করতে হবে এবিষয়ে সকল পদকর্তাই সহমত। তবে কোনো কোনো গানে কেবল গুরুর থেকে জেনে নেওয়ার প্রসঙ্গটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে। ০১, ১২, ১৪, ২৮ নং গানে গুরুর থেকে উপদেশ গ্রহণের নির্দেশ আছে। তবে গুরুর ঠিক করণীয় কী এবং শিষ্যই বা কী করবেন তার নির্দেশ মুনি দত্তের টীকায় কোথাও কোথাও বলা হয়েছে। লুই পা-র *মহারাগনয়উদ্দীপনচর্যা*-য় মহাসুখ কীভাবে দৃঢ়ভাবে অর্জন করতে হয় সে প্রসঙ্গে টীকায় বলা হল —বজ্র ও পদ্মের সংযোগে অক্ষয় সুখ লাভের পথ গুরুই বলে দিতে পারেন। বজ্রগুরুর সাহায্য ব্যতীত সকল ক্লেশের বিনাশকারক শান্ত, বিবর্তহীন, নির্বাণপদ অর্জন করা অসম্ভব।[১৬৬] বজ্র ও পদ্ম সংযোগেই ভববল জেতার কথা কৃষ্ণপাদের পদ এবং টীকায় বলা হয়েছে। ডোম্বীপাদের প্রবাহাভ্যাস চর্যায় গুরুর প্রসাদেই সংসার সমুদ্রে পার হওয়া সম্ভব। *জ্ঞানমুদ্রাসাধনচর্যা*-য় শবরপাদ একটি রূপকল্পের ব্যবহার করছেন, গুরুবাক্য যেন ধনুক আর বোধিচিত্ত যেন বাণ, গুরুবাক্যরূপ ধনুকে ভর করেই বাণরূপ বোধিচিত্ত নির্বাণের পথে ছুটে যায়। আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি শর, শর নির্মাতার চিত্রকল্প বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ধনুর্বেদে ধনুকের গুণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা *অগ্নিপুরাণ, বশিষ্ঠ্য ধনুর্বেদ*-এ পাওয়া যাবে। ধনুকের মানের উপরেই তির কতদূর অবধি যাবে তা নির্ভরশীল। ধনুক কী থেকে তৈরি করতে হবে এবং কাদের হাতে কী ধরনের ধনুক থাকবে তা বিস্তারে আলোচিত হয়েছে *ধনুর্বেদ*-এ।[১৬৭] সুতরাং ধনুকের নির্মাণ, প্রয়োগের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ছিল বলেই শবরপাদের গানে চিত্রকল্পটি

---

[১৬৫] রাণা, সুমঙ্গল. *চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৮৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৮

[১৬৬] তদেব, পৃ. ০৩

[১৬৭] রায়, যোগেশচন্দ্র. *ধনুর্বেদ.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়. ১৩৬১ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ১৮

ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে যিনি ধনুক চালাবেন তিনি ধনুকের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হবেন এটিই যুদ্ধশাস্ত্রের নীতি।[১৬৮] সাধনার প্রেক্ষিতে এই দিকটি প্রযোজ্য নয় স্বাভাবিক ভাবেই। কাহ্নপাদের *অমনস্কচর্যা*-তে গুরুর বচন কুঠারের সঙ্গে তুলনীয়, যার মাধ্যমে অবিদ্যার মোহতরু ছেদন করতে হয়। গুরু বচনের অপর প্রান্তে রয়েছে আগম, পুরাণ, শাস্ত্র। কাহ্ন পা-র কথায়—"সহজ একক পরম। কৃষ্ণাচার্য্য তাহা স্পষ্ট জানে। বহু মূর্খ আগম পড়ে, আবৃত্তি করে, কিছুই জানে না।"[১৬৯] আরেক পদেও কাহ্ন পা বলবেন—"পণ্ডিত আগম বেদ পুরাণে অভিমান বহন করে, পঞ্চ শ্রীফলে অলিসমূহ যেমন বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়।"[১৭০] অবশ্যই এখানে বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র ইত্যাদি বলতে ব্রাহ্মণ্য তথা অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্রীয় পরম্পরাকে বুঝতে হবে। সুতরাং গুরুবাক্যই বজ্রযানীর কাছে শাস্ত্র, অপরাপর শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বজ্রযানে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে না। ২১, ২৩ এবং ২৫ সংখ্যক গানে গুরুর কাছে সরাসরি কোনো বিষয়ে জ্ঞান বা পরামর্শ নিতে হবে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। ভুসুকু পাদের *চিত্তবিশোধনচর্যা*-য় সদ্‌গুরুর আশীর্বাদে মুষা স্বরূপ চিত্তকে নিশ্চল করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মুষা অর্থাৎ মূষিক। মুষা মুনিদত্তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সন্ধ্যা শব্দ। চর্যাগানে ব্যবহৃত সকল দ্ব্যর্থবোধক শব্দকেই সন্ধ্যা শব্দ বলা হয়নি, যে শব্দগুলিকে মুনি দত্ত নিজে সন্ধ্যা বলেছেন তাকেই সন্ধ্যা শব্দ ধরা হবে। সাধন-সংক্রান্ত অনেক শব্দ ইতিপূর্বের বজ্রযানী গ্রন্থে সন্ধ্যা শব্দ রূপে প্রচলিত হলেও মুনিদত্ত তাদের সন্ধ্যা শব্দ বলেন নি। আমরা দেখছি ৮ সংখ্যক চর্যাগানের ব্যবহৃত 'করুণা' সন্ধ্যা শব্দ বলে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু ৩০ এবং ৩১ সংখ্যক চর্যাগানে একই অর্থে 'করুণা' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তাকে সন্ধ্যা শব্দ বলা হয়নি। বজ্রযানে 'সহজ' বাক্‌পথাতীত কিন্তু গোপনীয় নয়, কিন্তু সহজে প্রতিষ্ঠার উপায়টি বিশেষভাবে গোপনীয়। সন্ধ্যা ভাষা—এই সহজে প্রতিষ্ঠার সময়-সংকেতগুলি

---

[১৬৮] সেন, রামদাস. *ভারত-রহস্য.* বহরমপুর: নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১২৯২ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ৭৫-৭৬

[১৬৯] মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ্. *সিদ্ধ কামুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ.* কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (৪৯শ বর্ষ, ১ সংখ্যা). ১৯৪২. পৃ. ৩৬

[১৭০] তদেব, পৃ. ৩৫

উল্লেখ করে, যার অর্থ কেবল গুরু সম্প্রদায়ে সাধনার মাধ্যমেই জানা সম্ভব, অন্য উপায়ে নয়।[১৭১] বজ্রযানে গুরু কতটা প্রয়োজন তা বোঝা যাচ্ছে সান্ধ্যভাষার প্রসঙ্গে সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণের প্রসঙ্গটি থেকে। 'মুষা' শব্দটির অর্থ চিত্তপবন। টীকায় বলা হয়েছে প্রথমে গুরুর নির্দেশে মূষিক নিঃস্বভাব অর্জন করেন, কিন্তু তখনও বালযোগীর দশা চলে তাই দ্বৈতভাব ছিন্ন করা সম্ভব হয় না। এই মূষিকের বর্ণ কালো। তবে পুথির পাঠে 'কাল' শব্দটির ব্যবহার পাচ্ছি। প্রবোধচন্দ্র বাগচী পাঠ গ্রহণ করেছেন—'কালা মুসা', মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাঠ নিয়েছেন 'কাল মুসা'[১৭২]। এই অবস্থায় মূষিকের বর্ণ কেমন তা বোঝা সম্ভবপর হয় না। মুনি দত্ত তাঁর টীকায় এক্ষেত্রে মীননাথের উল্লেখ করে বলেন, গুরুই পরমার্থের পথ বলে দেবেন, বালযোগী গুরুর নিকটে গিয়ে উপদেশ না নেওয়া অবধি মনে মোহ বা অভিমানের অবসান হয় না।[১৭৩] পদকর্তা ভুসুকু পা আমরা বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি, প্রসঙ্গত বলা দরকার আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্যদের মধ্যে একজন ভুসুকু-র নাম পাওয়া যায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দীপঙ্কর শিষ্য ভুসুকু এবং চর্যাকার ভুসুকু-কে অভিন্ন মনে করেন এবং এঁকেই *চতুরাভরণ*-এর রচয়িতা বলে অনুমান করেন।[১৭৪] কাহ্নপাদের আরেকটি গান সহজদৌর্লভ্যচর্যা-র মতে—"বৃথাই গুরু উপদেশ দেয় শিষ্যকে, / বাক্ পথাতীত কহিবে কেমনে। / যতই বলিল ততই ছল, / গুরু বোবা, সে শিষ্য কালা।"[১৭৫] আপাতভাবে মনে হয় সাধনার একটি স্তরে গুরু বোবা এবং শিষ্য কালা হয়ে যান অর্থাৎ গুরুর শিষ্যকে উপদেশ দেওয়ার কিছু থাকে না। 'সহজ'-এর উপলব্ধি স্বসংবেদ্য, শিষ্যকেই এই পথে একা যেতে হবে, গুরুর করার কিছু থাকছে না। এই ব্যাখ্যাটি অযথার্থ। মুনি দত্তের টীকা-য় সিদ্ধ তিলো পা-কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে—যা মনোগোচর হয় অর্থাৎ মন

---

[১৭১] চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার. *চর্যাগীতির ভূমিকা.* কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরি. পৃ. ২১৪-১৫

[১৭২] সেন, নীলরতন. *চর্যাগীতিকোষ.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. ২০১০. সংশোধিত দ্বিতীয় সং. পৃ. ৬৩

[১৭৩] রাণা, সুমঙ্গল. *চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা.* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৮১ প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫২-৫৪

[১৭৪] মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ. *ভুসুকু.* কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৪৮ শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা). ১৯৪১. পৃ. ৪৫-৪৮

[১৭৫] Muhammad, Shahidullah. *Buddhist Mystic Songs*. Dhaka: Mowla Brothers. 2013. 2nd Edition. p. 106

যাকে বুঝতে পারে (মনে রাখতে হবে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় মন কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপেই স্বীকৃত হয়েছে) তা কখনই পরমার্থ নয়। 'সহজ'-এর সাধন পথে গুরু যে উপদেশ দেন তা বাক্য দ্বারা দেন না। বজ্রগুরু ধর্মে বচন-দরিদ্র, অর্থাৎ স্বল্প-বাক্। সুতরাং গুরু এখানে কেবল উপদেষ্টা নন, পথ বলে দেন না, কারণ এই পথ মুখে বলা যায় না। বুদ্ধদেবকে নানা শাস্ত্রে শাক্যমুনি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মুনি শব্দটির আভিধানিক অর্থে মৌন শব্দটি রয়েছে। বুদ্ধদেবকে *লঙ্কাবতারসূত্র*-এ মুনি এবং মহামুনি বলে সম্বোধন করা হয়েছে বারংবার। এই গ্রন্থে বারংবার বাক্যাতীতে উপদেশ প্রদান করার কথা বলা হচ্ছে, শব্দ এবং সত্যের সম্পর্কে *লঙ্কাবতারসূত্র* মনে করেছে শব্দ কখনই যথাযথ অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, একারণে বুদ্ধদেব মৌন অর্থাৎ স্বল্পবাক্/ বাক্-দরিদ্র মুনি। শব্দ এবং শব্দের অর্থের মধ্যে সম্পর্ক স্বচ্ছ হলেই একমাত্র অনুত্তর-সম্যক-সমাধি লাভ করা সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হল বুদ্ধদেব নিজে এই সমাধির অধিকারী, তাহলে তাঁর বাক্যে বাধা কোথায়? আসলে গুরু নিজে সিদ্ধ, শিষ্য যেহেতু সিদ্ধির থেকে অনেক দূরে তাই তাকে বাক্যে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয় কারণ গুরু যে অর্থে কথাটি বলবেন, সাধনার শূন্যতার জন্য শিষ্য তা উপলব্ধি করতে পারবে না। এই কারণেই গুরু সব সময় বাক্যে উপদেশ প্রদান করেন না। সাধক সহজের উপলব্ধি কোন্ সময়ে করবেন, এবিষয়ে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে বজ্রযানের তত্ত্বগ্রন্থে। হেবজ্রতন্ত্র-মতে বিরমানন্দ স্তরের শেষে সহজ উপলব্ধ হয়, আবার অন্য শাস্ত্রে বিরমানন্দের সূচনা পর্বেই সহজের উপলব্ধি হয়—এমন বলা হয়েছে। তবে মনে করা হয় সহজ-এর ক্ষেত্রে পুর্ব বা পরের কল্পনা যথাযথ নয় এটি বিরমানন্দ স্তরের সঙ্গে সহাবস্থান করে এমন অনুমান-ই যথার্থ।[১৭৬] গুরু প্রসাদেই শিষ্য প্রথমে শূন্যতার জ্ঞানলাভ করে এবং শূন্যকে অবলম্বন করে চিত্ত তরীকে

[১৭৬] Suzuki, *D.T. Studies in the Lankavatara Sutra*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1998 [ ]. p. 349

সহজের পথে নিয়ে যেতে হবে। শূন্যতার জ্ঞানলাভের পরেও চিত্তে আভাস দোষ থেকে যায়, গুরুর উপদেশে তাকেও অতিক্রম করতে হয়।[১৭৭]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র পরে আরও বেশ কিছু চর্যাগান পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। চর্যাগান-এর ধারা বিভিন্নরূপে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমরা এবারে পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত চর্যাগানগুলিতে গুরু প্রসঙ্গটি দেখার চেষ্টা করব। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মোট ৯৮টি গান সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ১৯টি গান দশম-দ্বাদশ শতকের, ৪৪টি গান ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের এবং ৩৫-টি গান পঞ্চদশ শতকের পরে রচিত বলে মনে করা হয়েছে।[১৭৮] বিভিন্ন সময়ে রচিত এই গানগুলির সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত গানের কিছুদূর সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তবে বৌদ্ধ দেব-দেবীর উল্লেখ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত পদগুলিতে অনেক বেশি পাওয়া যায়। গানগুলিতে বিভিন্ন দেবতার মণ্ডল বর্ণনা ও বন্দনা করা হয়েছে। তবে এই দেবতার অর্থ স্বদেবতাযোগের সাধন অর্থাৎ সাধক নিজের দেহের মধ্যেই তাদের আরাধ্য দেবতাদের দেখতে পায় এবং তাদের ধ্যান করে। তবে স্বদেবতাযোগ কিন্তু সাধারণ শিষ্যের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এখানেই আসে গুরুর প্রসঙ্গ। সাধক প্রথমে আদিকর্ম অর্থাৎ ত্রিশরণ গ্রহণ, পাপদেশনা, পুণ্যানুমোদন ও ব্রহ্মবিহার ভাবনার পরে গুরু তাকে অভিষেক প্রদান করবেন। অধিকারী ভেদ ও সাধনা স্তরের ভেদ অনুযায়ী গুরুর মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর—স্তরের শিষ্যদের ভিন্ন ভিন্ন অভিষেক দান করেন।[১৭৯] ৭৩ সংখ্যক নবচর্যাপদে দেখছি শিষ্য-গুরু কাছে অনুত্তর বোধিপদের উপদেশ প্রার্থনা করছেন অথচ গুরু তাকে মহাযান নরোত্তম উপদেশ প্রদান করলেন—"প্রবশিতু ভগবন মহামোক্ষপুরে দেশই অনুত্তর বোধিচাদ্/ জরামরণভয়বন্ধন মোচয় পরমামৃতময় পরমগুরু।।/ এহি বৎস মহাযান নরোত্তম সেহি চিন্তামৃত পানরন্দে/ দেশই ক্ষর হম গোচর গুর্হ্য তথানুত্তর বোধিপাদ।"[১৮০] ৩৩ সংখ্যক নবচর্যাপদে

---

১৭৭ Kvaerne, Per. *An Anthology of Buddhist Tantraic Songs A Study of the Caryagiti*. Thailand: Orchid Press. 2010. Third Edition. p. 64

১৭৮ পাল, রামেশ্বর. *দার্শনিক শূন্যবাদ ও বাংলা সাহিত্য.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৯৭৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৮-৮০

১৭৯ দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *নব চর্যাপদ.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮৯. প্রথম সং. পৃ. ১৫

১৮০ তদেব. পৃ. ১৯-২০

মুদ্রাসহ গুহ্য অভিষেক দানের পরে শিষ্যের সাধনার কথা আছে। সুতরাং নবচর্যাপদে মুদ্রাসহ গুহ্য অভিষেক দানের পরে শিষ্যের সাধনার কথা আছে।[১৮১] সুতরাং নবচর্যাপদের অভিনবত্ব হল দেবতাদের উল্লেখ এবং স্বাধিষ্ঠানযোগে গুরুদের অবদান পূর্বের চর্যাগীতির সঙ্গে মূলগত সাধনপ্রণালীর পার্থক্য না থাকলেও অভিব্যক্তিগত পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। বেনারসের সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমণবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক জগন্নাথ উপাধ্যায় নেপাল থেকে চর্যাগীতির আরও তিনটি পুথি সংগ্রহ করেছিলেন— *চর্যা-সংগ্রহ, চর্যা-পুস্তক* এবং *চর্যা-গ্রন্থ*।[১৮২] একাদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে গানগুলি রচিত হয়েছিল এবং গানগুলির রচয়িতারা সম্ভবত রাজানুগ্রহ অর্জনও করেন, কারণ কয়েকটি গানে নরেন্দ্রনাথ মল্লদেব-এর উল্লেখ পাই। নরেন্দ্রনাথ মল্লদেব নেপালের রাজাদের অন্যতম। এই সংগ্রহে বজ্রযান, সহজযান এবং কালচক্রযানের গান রয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ পরম্পরার ঐতিহ্য অনুযায়ী এখানেও সাধনপ্রণালীতে গুরুকরণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাচ্ছি। *চর্যাসংগ্রহের*-এর ৪৭ সংখ্যক গানে পাচ্ছি—'সতগুরু চরণপ্রসাদে চতুর্থাভিষেক/ প্রাণেশ্বরী সংসার সমুদ্রা'।[১৮৩] *চর্যাসংগ্রহ*-এ কলষাভিষেক, গুহ্যাভিষেক, প্রজ্ঞাভিষেক এবং চতুরাভিষেক-এর বারংবার উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। বারবার সাধনপ্রক্রিয়ায় এই অভিষেকের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ-এর আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত *নতুন চর্যাপদ*-এও গুরুসংক্রান্ত মনোভাবের কোনো পরিবর্তন চোখে আসে না। এই গানগুলি এখনও নেপালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীত হয় এবং বজ্রগুরুদের অস্তিত্ব এখনও দেখা যাবে যথেষ্ট পরিমাণেই। নেওয়ারদের মধ্যে এক সহস্র ছয় জন বজ্রাচার্য ও শাক্যমুনির খোঁজ মেলে যাঁরা পূজাচারে চর্যাগানের ব্যবহার করা হয়।[১৮৪] পৃথুমতিমুনিয়া কায়-এর নামাঙ্কিত একটি চর্যাগানে পাচ্ছি—"নমামি নমামি শ্রীচক্রসম্ভব গুরুবাক্য

[১৮১] তদেব. পৃ. ৮৪

[১৮২] তদেব. পৃ. ৪২

[১৮৩] De, Bhakti. *Carya Samgrana*. Varanasi: Central Univeristy of Tibetan Studies. 2012. 1st Edition. p. 07

[১৮৪] তদেব, পৃ. ১০০

দৃঢ় ধরিয়া/ সদ্‌গুরু চরণকমল প্রসাদে অনুত্তর বোধিপদ।"[১৮৫] দেখা যাচ্ছে চর্যাগানের ঐতিহ্যের বিভিন্ন বদল সময়ক্রমে হলেও সাধন প্রণালীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বদল এখনও আসেনি। ভাষার পরিবর্তন এই সংগ্রহগুলিতে যথেষ্ট বোঝা গেলেও ধরণে ও তাত্ত্বিক কাঠামোয় বদল আসেনি। এতক্ষণ আমরা চর্যাগানের সংকলনের কথা বলছিলাম যেখানে একাধিক কবিদের রচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু সহরপাদের *দোহাকোষ*-এও এই প্রবণতার ফারাক দেখা যাবে না। সরহ পা বলছেন "এমন কী যখন চিহ্ন মুক্ত হয় তখন অচিত্তের আবির্ভাব হয়। উপযুক্ত গুরুর নির্দেশেই এই অচিত্ত দশা দূর হয়।"[১৮৬] [অনুবাদ গবেষকের] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে ডোম্বী হেরুক-এর *সহজসিদ্ধি* নামক গ্রন্থেও পাওয়া যায় গুরুবাক্য অনুসরণ না করলে অভীচি নরক যন্ত্রণা ভোগের বিবরণ।[১৮৭] বজ্রযানী সাধনায় কেবল গুরুর প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করেই একটি প্রণাম এবং স্তোত্রগল্প রচিত হয়েছে, গ্রন্থের নাম *গুরুপঞ্চাশিকা*। তিব্বতি এবং চৈনিক অনুবাদে *গুরুপঞ্চাশিকা*-র লেখক হিসাবে অশ্বঘোষের নাম লিপিবদ্ধ। গুরুকে বজ্রসত্ত্ব বিশেষণ দেওয়া হয়েছে এবং সম্ভবের সাধনায় গুরুর অপরিহার্যতার কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৮৮] সামগ্রিকভাবে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম গুরুদের দ্বারাই চালিত একথা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের সাধন পদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্য এবং বাইরের সমাজের কাছে প্রকাশের উপযুক্ত বলে বজ্রযানী সাধকেরা মনে করেন না। 'বজ্রযান'-এর একাধিক রূপকল্প নর-নারীর যৌন সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে। এই কারণে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে স্বৈরাচার, দেহ-সর্বস্বতার প্রকাশ হয়েছিল একথা অনেকেই বলেছেন। বাংলা উপন্যাসে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের নারী সম্ভোগ, সাধন-সঙ্গী নির্বাচন ইত্যাদির প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বেনের মেয়ে* (১৯১৯ খ্রি.) উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বণিক বিহারীর মেয়ে মায়া বিধবা হওয়ার পরে

---

১৮৫ সৈয়দ মহম্মদ, *শাহেদ.* নতুন চর্যাপদ. পাঠ ও পাঠান্তর. ঢাকা: কথাপ্রকাশ. ২০১৭. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৯

১৮৬ তদেব, পৃ. ৩৪৮

১৮৭ Bagchi, Prabodh Chandra. *Dohakosa with Notes and Translations*. Calcutta: University of Calcutta. 1933. 1st Edition. p. 179

১৮৮ Pathak, Suniti Kumar. *Sahaja Sidhi of Sri Dombi Heruka: A Hermeneutic Exposition*. in Saha Edited by Andrea Loseries. Delhi: Buddhist World Press. 2015. 1st Edition. p. 73

ভিক্ষুণীরা তাঁকে বজ্রগুরুর সেবা করার, দেবতা হতে চাইলে গুরুর শক্তি হওয়ার পরামর্শ দিতেন।[১৮৯] ২০১৮ সালে প্রীতম বসুর *চৌথুপীর চর্যাপদ* নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসেও গণচক্রে গুরুদের নারী সঙ্গমের বিবরণ পাচ্ছি।[১৯০] সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রূপকল্পটি প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে গবেষকদের অনেকেই বজ্রযানের রূপকল্পগুলিকে যৌনতার রূপ কল্পনা হিসাবেই গ্রহণ করেন, এমনকি এই রূপকল্পগুলিকে আক্ষরিক বলেই মনে করেন। চর্যাগানের রূপকল্পগুলির বিশ্লেষণ করে যৌনতাকেই বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধনার কেন্দ্রিয় তত্ত্ব বলেই লি সিয়েগেল-এর সিদ্ধান্ত—"Sexual intercourse was the central activity of the Sahajiya Tantric Sadhana."।[১৯১] এছাড়াও সিদ্ধাচার্যদের অসংলগ্ন, যথেচ্ছ জীবনাচরণ বারবার গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যদিও এই মতের বিরুদ্ধ তত্ত্বও যথেষ্ট প্রাচীন। চর্যাগান বা বজ্রযানী তত্ত্ব কাঠামোয় বর্ণিত মুদ্রা ও মণ্ডল যে কেবল শরীরকেন্দ্রিক নয়, এর দার্শনিক প্রেক্ষাপট-টি যে মুখ্য এবং বজ্রযানী তত্ত্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে একথাও অনেকেই বলেছেন।[১৯২] এর পাশাপাশি বজ্রযানের একাধিক সময়পর্বকে স্বীকার করে লি সিয়েগেল-এর সিদ্ধান্তকে অস্বীকারও করেছেন গবেষকেরা।[১৯৩]

বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের আরো বিবর্তন হয়েছিল কালচক্রযানে। বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মে গুরুর অবস্থান বিষয়ক আলোচনা আমারা শেষ করতে চাইছি দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে। প্রথমত, তুর্কি বিজয়ের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির যে আলোচনা সাধারণভাবে করা হয়ে থাকে তার মধ্যে ঐতিহাসিক যুক্তির অভাব আছে, ইতিপূর্বে আমারা সেই কথা বলেছি। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের

---

১৮৯ Szanto, Peter Daniel. *Minor Vajrayana Texts II A new manuscript of Gurupacasika*. www.academia.edel. Accessed on 10.06.2020

১৯০ চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)*. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০১২. তৃতীয় প্রকাশ. পৃ. ২৪৪

১৯১ বসু, প্রীতম. *চৌথুপীর চর্যাপদ*. কলকাতা: প্রীতম বসু প্রকাশিত. ২০১৮. দ্বিতীয় প্রকাশ. পৃ. ১৭৩

১৯২ Siegel, Lee. *Bengal Blackie and the Sacred Slut: A Sahajayana Buddhist Song*. Buddhist-Christian Studies (Vol-I). 1981. pp. 51-58

১৯৩ Bagchi, P.C. Reviews. Sadnaramala Vol-II by Dr. Benoytosh Bhattacharyya. *The Indian Historical Quarterly (Vol-VI)*. 1930. pp. 576-580
Ray, Raginald. *Reading the Vajrayana in context: A Reassessment of Bengal Blackie*. Buddhist-Christian Studies (Vol-5). 1986. pp. 173-189

সঙ্গে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধারার একটি সম্পর্কের কথা অনেকে বলেছেন। বৈষ্ণব ধারায় প্রচলিত রথযাত্রার পূর্বসূত্র হিসাবে খ্রি. পঞ্চম শতকে পর্যটক ফা-হিয়েন বর্ণিত খোটানের বুদ্ধযাত্রাকে রাখা যেতে পারে।[১৯৪] মঞ্জরী ভাবের সাধনার সঙ্গে বৌদ্ধ চক্রসাধনার সম্পর্কের কথা অনেকেই বলেছেন। এই সূত্রটি আমরা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে নজর রাখতে চাইছি। গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবিষয়ে আমাদের আরও কিছুটা বিস্তারে যাওয়ার চেষ্ঠা থাকবে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে নেড়া-নেড়ি বলে ডাকা হত। নেড়া-নেড়িরা পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লাভ করেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের কাছে। সুতরাং বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের ধারা ইসলাম আগমনের ফলে নষ্ট হয়েছে, এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বীকার করছি না। বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার এখনো নেপালে দেখা যায়। আমরা নেপালের বর্তমান বৌদ্ধধর্মে গুরু প্রসঙ্গের কথা বলে বর্তমান আলোচনা শেষ করব। নেপালে বৌদ্ধধর্মে গুরুস্থানে স্বীকৃত ব্যক্তিরা বজ্রাচার্য এবং শাক্য নামে পরিচিত। বজ্রাচার্য এবং শাক্যরা অবশ্যই কোন একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বজ্রাচার্যদের ধর্ম-সাধনার সঙ্গে তন্ত্রের যোগ স্পষ্ট। বজ্রাচার্যেরা সচরাচর তাদের গোষ্ঠীর বাইরে পুরোহিত বা ধর্মব্যাখ্যাতার কাজ করতে পারেন না।[১৯৫] নেওয়ারি বৌদ্ধধর্মে পূজা এবং সাধনাকে দুটি পৃথক পথের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চক্রসম্ভরের সাধনায় সাধক চারটি ক্রমোচ্চ পর্যায়ে যৌগিক দৃষ্টি লাভ করতে পারেন বলে নেপালের বৌদ্ধ সাধনায় বিশ্বাস করা হয়েছে।[১৯৬] অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষই শাক্য এবং বজ্রাচার্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মজীবনের বিভিন্ন রীতি-নীতি পালন করেন। বোঝা যায় বজ্রযানী সাধনায় গুরুবাদ এখনো নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে।

---

[১৯৪] চক্রবর্তী, জনার্দন. *আচার্য রাধাগোবিন্দনাথ স্মারক-গ্রন্থ.* কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী. ১৯৭৩. পৃ. ৭২

[১৯৫] Gellner, David N. Monk, *Householder and Tantric Priest Newar Buddhism and its Hierarchy of Ritual.* New Delhi: Cambridge university Press. 2009. Reprint. P. 164

[১৯৬] তাদেব, পৃ. ২৮৮

পঞ্চম অধ্যায়

চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের নির্বাচিত ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরু

৫.১ লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ে গুরু

৫.২ নাথ সাধনায় গুরু প্রসঙ্গ

৫.৩ গুরুবাদ ও সুফি এবং নির্গুণ সাধনধারা

৫.৪ শংকরদেব এবং পঞ্চসখাদের সাধনায় গুরুবাদ

পঞ্চম অধ্যায়

চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের নির্বাচিত ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরু

বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের কয়েকটি নির্বাচিত সাধনার ধারায় গুরু-ধারণার অস্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য। আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের পদ্ধতি এবং লক্ষ্যগত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফারাক রয়েছে। আগের অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মে গুরু সংক্রান্ত ধারণার বিবর্তন কীভাবে হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। ফলে আমাদের আলোচনায় একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রগুলি উঠে এসছিল। বর্তমানে আমাদের আলোচনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের একাধিক ধর্ম-দর্শনের প্রতি মনোনিবেশ থাকবে। ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গুরু সংক্রান্ত ধারণার ক্রমিক বিবর্তন আমাদের অভিনিবেশের বিষয় নয়। এই অধ্যায়টিকে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে রেখে দেখতে চাইছি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরু ধারণা বিষয়ে আলোচনা করব। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে যে ভক্তিধর্মের প্রচার করেছিলেন তার পূর্বসূত্র ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে সংগঠিত ভক্তিধর্মের স্রোত। ফলে চৈতন্যদেব-কে বোঝার জন্য চৈতন্য পূর্ববর্তী ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষিতটি বোঝা দরকার। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপট-কে বোঝার চেষ্টা করব মোট পাঁচটি সাধনার ধারার সাপেক্ষে। খুব স্বাভাবিক নিয়মেই বেশ কিছু ভক্তি ধর্ম বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না। যেমন গুজরাতের অষ্টছাপ। আবার যে ধর্ম সম্প্রদায়গুলি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি তাদের সম্পর্কেও আমরা কেবল একটি প্রাথমিক ধারণা নির্মাণ করারই চেষ্টা করব, নইলে প্রত্যেকটি ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরু ধারণার বিকাশ পৃথক গবেষণার দাবি রাখে।

আমরা বর্তমানে আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি কর্ণাটকের লিঙ্গায়েৎ, বঙ্গদেশ তথা সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতে বিস্তৃত নাথ ধর্ম, সূফি ধর্ম এবং সন্ত কবীরের মত, চৈতন্যদেবের সমসময়ে অসমের শঙ্করদেব এবং উড়িষ্যার পঞ্চসখা সম্প্রদায়কে। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একমাত্র কর্ণাটকের লিঙ্গায়েৎ ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি সাধনার সঙ্গে চৈতন্যদেব অথবা বঙ্গদেশের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের কথা আমরা আলাদা করে আলোচনা করতে চাইছি কয়েকটি বিশেষ কারণে। প্রথমত, শৈব-দর্শনের মধ্যে লিঙ্গায়েৎ ধারা গুরু সংক্রান্ত ধারণাকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গায়েৎ-রা গুরু কেন্দ্রিক জীবনযাত্রাকে স্বীকার করেছে। দ্বিতীয়ত লিঙ্গায়েৎ গুরু অল্লম প্রভুর সঙ্গে গোরক্ষনাথের সাক্ষাতের কাহিনি বিশেষভাবে পরিচিত। যদিও অল্লম প্রভু এবং গোরক্ষনাথ সমসাময়িক ছিলেন না, কিন্তু এই আখ্যান নিঃসন্দেহে নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে লিঙ্গায়েৎ দর্শনের সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে।[১] অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ বসু-র বর্ণনা অনুযায়ী লিঙ্গায়েতদের একটি শাখা কাশী থেকে বঙ্গদেশে (বর্তমানে দেওঘর, ঝাড়খন্ড) এসে বসবাস করা শুরু করেন এবং তাদের ধর্মীয় আচার থেকেই বৈদ্যনাথের ষাঁড় কথাটির উৎপত্তি হয়েছে।[২] বচন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ এবং বচন সাহিত্যে মেয়েদের কৃতিত্ব, সর্বোপরি সাধক হিসাবে মেয়েদের অনন্য স্বীকৃতি প্রদান সব মিলিয়ে লিঙ্গায়েৎ-রা দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। যেহেতু চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সরাসরি সম্পর্ক ছিল তাই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের আলোচনাকে আমরা অপরিহার্য বলেই মনে করি।

---

[১] Sharma, Krishna. *Bhakti and the Bhakti Movement: New Perspective*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publications. 2015. p. 224

[২] বসু, নগেন্দ্রনাথ. বিশ্বকোষ (খন্ড-১৯). কলকাতা: ইউ সি বসু এন্ড কোম্পানি. ১৩০১ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৭৩

৫.১ লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ে গুরু

শৈব ধর্মের বা শৈবদর্শনের আটটি শাখার কথা পাওয়া যায়। পাশুপত দ্বৈতবাদ, শৈবসিদ্ধান্তের দ্বৈতবাদ, লকুলিশ পাশুপাত শাখার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত শৈবধর্ম, বিশেষাদ্বৈত শৈববাদ বা বীরশৈব মত, নান্দিকেশ্বর শৈবমত, রামেশ্বর শৈবমত, কাশ্মীরের সংঘকেন্দ্রিক শৈবমত।[৩] শৈবদর্শনের এই শাখাগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের সাদৃশ্য সহজেই খেয়াল করা যায়। মূলত ইষ্ট দেবতাকে কেন্দ্র করে যে তাত্ত্বিক পার্থক্য তা বৈষ্ণব এবং শৈব দু'টি দর্শনের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। এমনকি, শৈব সাধকদের 'শৈবভাগবত' বলে চেনা হয়েছে। বঙ্গদেশে এই আটটি শাখার মধ্যে পাশুপাত ও লকুলিশ-পাশুপাত শাখার বিশেষ প্রসার দেখা যায়। এছাড়াও শিবের লৌকিক উৎসের কথা বলতে গিয়ে বঙ্গদেশের পুরুষ-গ্রামদেবতার প্রতীক লম্বা শিলাখণ্ড শিবের সঙ্গে এবং লম্বা না হলে ধর্ম ঠাকুরের সিংহাসনের প্রতীকের সঙ্গে 'মিলে' গেছে বলে মনে করা হয়েছে।[৪] বঙ্গদেশে শৈব ধর্মের প্রাচীন নিদর্শনের অন্যতম বাণগড় স্তুপ থেকে প্রাপ্ত শিবের মূর্তি এবং অন্যান্য প্রত্ন উপাদান। যেমন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুধগুপ্ত এবং জয়দত্তের দামোদর তাম্রশাসনে বঙ্গদেশে শৈব ধর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়, বৈন্যগুপ্তের অনুশাসনেও শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন পাওয়া যায়।[৫] গুপ্তযুগ থেকে (খ্রি. চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী) বঙ্গদেশে পৌরাণিক শিবের প্রসার দেখা যায়।[৬] লকুলিশ-পশুপাত শাখার গুরুরা বঙ্গদেশে তাদের মত প্রচার করেছেন দীর্ঘ দিন অবধি।[৭] বঙ্গদেশের থেকে একাধিক শৈব গুরুরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের মান্ধাতা

---

[৩] Pandey, Kanti Chandra. *An Outline of Saiva Philosophy*. Kolkata: MLBD. 1999. Reprint. p. 6

[৪] সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: আনন্দ. ২০০৭. অষ্টম মুদ্রণ. পৃ. ১৩

[৫] Chatterjee, Rama. *Religion of Bengal*. Calcutta: Punthi Pustak. 1985. 1st Edition. p. 135

[৬] ভট্টাচার্য, গুরুদাস. *বাংলা কাব্যে শিব.* কলকাতা: ইন্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং. ১৯৬১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৬৯

[৭] Chatterjee, Rama. *Religion of Bengal*. Calcutta: Punthi Pustak. 1985. 1st Edition. p. 143

অঞ্চলে অমরেশ্বর মন্দিরের গাত্র থেকে প্রাপ্ত অনুশাসন অনুসারে দক্ষিণ রাঢ়ের হলায়ুধ নামে একজন পাশুপাত শাখার শৈব আচার্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তামিল কবি পাল কুরিক সোমনাথের রচনায় হলায়ুধের নাম পাওয়া যাচ্ছে, অনুমান করা যায় রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সভায় হলায়ুধ বিশেষভাবে সম্মানিত হলেন এবং শৈব গুরু হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।[৮] প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সমসময়ে শৈবাচার্য সর্বশিব পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাচ্ছে বর্তমান ত্রিচিনোপোলির রাজরাজেশ্বর মন্দির লিপি থেকে। আরপাক্কম অনুশাসনে জ্ঞানপতি দেবের প্রতি গ্রামদানের উল্লেখ পাচ্ছি। দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্বগ্রাম অঞ্চলের শৈবাচার্য বিশ্বেশ্বরশম্ভুকে দু'টি গ্রাম দানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে কাকতীয় রাজ গণপতির খ্রিস্টীয় ১১৯৬ অব্দে প্রদত্ত মল্লিকাপুরম শিলালেখে।[৯] সুতরাং বঙ্গদেশের শৈব ধর্মের একাধিক গুরুরাই দক্ষিণ ভারতে গিয়ে শৈবমতের প্রসার করেন। যদিও গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং শশাঙ্কের পরে বঙ্গদেশে শৈব ধর্ম প্রধান রাজধর্মের স্থান পাচ্ছে না। তবে বঙ্গদেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের শৈব ধর্মের সূত্রে যোগ পাল পূর্ববর্তী যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুরু সংক্রান্ত ভাবনায় শৈব ধর্মের অন্যতম অন্যতম অবদান গুরু হিসাবে শিবের একটি বিশেষ অবতারের কল্পনা। দক্ষিণামূর্তি হলেন শিবের গুরু অবতার, অর্থাৎ শিব এই রূপে জ্ঞান প্রদান করেন। *স্কন্দ পুরাণ*-এর 'শিব রহস্য' অধ্যায় শিবের ছাব্বিশটি অবতারের কথা বলেছে যাঁর অন্যতম হলেন দক্ষিণামূর্তি। দক্ষিণামূর্তি অবতারের কারণ—দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংসের পরে শিব যজ্ঞ কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং মহাযোগী দক্ষিণামূর্তি-র রূপ ধারণ করলেন জগতে জ্ঞান বিতরণের প্রয়োজনে।[১০] আচার্য শংকরের রচনায়

---

[৮] তদেব, পৃ. ১৪৫

[৯] তদেব, পৃ. ১৪৬-১৪৭

[১০] Ramanathan, Indira. *Guru of Gurus*. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan. 2013. 1st Edition. p. 24

আমরা প্রথম আদি গুরুরূপে দক্ষিণামূর্তির বন্দনা পাচ্ছি। দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ।[১১] দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রের থেকে দক্ষিণামূর্তির ধ্যানটি দেখা যাতে পারে এই প্রসঙ্গে—

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিত পরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং

বর্ষিষ্ঠান্তে বসদ্ ঋষিগণৈঃ আবৃতং ব্রহ্ম নিষ্ঠৈ।

আচার্যেন্দ্রং করকলিত চিন্মুদ্রমানঁদমূর্তি

সাত্মারামং মুদিত বদনং দক্ষিণামূর্তি মীড়ে।।[১২]

অর্থাৎ, আমি প্রফুল্লমূর্তি গুরু দক্ষিণামূর্তির উপাসনা করি, যিনি মৌনের মাধ্যমে ব্রহ্ম বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রকটিত করেন। যিনি বেদজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত এবং মহাগুরুদের দ্বারা পরিবৃত, যাঁর হাতে জ্ঞানমুদ্রা, যিনি সুখ স্বরূপ, যিনি আনন্দস্বরূপ, যিনি আত্ম-উপলব্ধিতে সর্বদা নিমজ্জিত এবং সদা মৌন। এই বর্ণনাটি থেকে গুরু হিসাবে দক্ষিণামূর্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। প্রথমত, ভারতীয় জ্ঞানোলপব্ধির দুটি মার্গের কথা সুপ্রতিষ্ঠিত—ঋষি ধারা এবং মুনি ধারা। এই বিষয়টি আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম। শৈবমতের সঙ্গেও এই ভাবনার সরাসরি সংযোগ দেখা যায়। শিবের সঙ্গে দক্ষের বিরোধ এবং শিবের যজ্ঞ প্রত্যাখ্যান ঋষিধারার সঙ্গে বিরোধের ভাষ্য এবং শিবের দক্ষিণামূর্তিরূপ প্রকাশ এবং মৌনাবলম্বনে জ্ঞান প্রদান স্পষ্ট করে মুনিধারায় জ্ঞান প্রদানের আদর্শকে যেখানে গুরু শিষ্যকে শ্রুতি-র মাধ্যমে জ্ঞান দান করেন না। মুনিধারার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উপনিষদ সাহিত্যেই; কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর এই দুটি উপনিষদ হল মুনিধারার উপনিষদ।[১৩] ঋষিধারা ব্রহ্মকেন্দ্রিক এবং মুনিধারা আত্মকেন্দ্রিক। মুনিধারা মূলত যোগকেন্দ্রিক— এখানে বৈদিক যোগ, সাংখ্যোক্ত রাজযোগ এবং শৈব হঠযোগ এই তিনটি ধারার সংমিশ্রণ ও সমন্বয় দেখতে

---

[১১] অধিকারী, রামচন্দ্র. *শ্রীবিজ্ঞান-ভৈরব.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮০. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ০৯

[১২] তদেব, পৃ. ১২৫

[১৩] অনির্বাণ. *বেদ-মীমাংসা* (১). কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ. ১৯৯১. তৃতীয় সংস্করণ. পৃ. ১০২

পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে ঋষি প্রস্থানের পুরোধা ছিলেন বিষ্ণু, মুনি প্রস্থানের পুরোধা ছিলেন রুদ্র।[১৪] সুতরাং দক্ষিণামূর্তির ভাবনার বীজের পূর্বসূত্র হিসাবে বৈদিক রুদ্রকে দেখা যাতে পারে। দক্ষিণামূর্তি ভাবনার বিকাশ হয়েছে মূলত দক্ষিণ ভারতে তামিল শৈব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। দক্ষিণামূর্তির চারটি প্রকার দেখা যায়। যোগগুরু, রসগুরু, জ্ঞানগুরু এবং শাস্ত্রগুরু। শাস্ত্রগুরুর ব্যাখ্যানমূর্তি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে।[১৫] সুতরাং শৈব দর্শনে গুরু সম্পর্কে একটি পৃথক তাত্ত্বিক অবস্থান দক্ষিণ ভারতে নির্মিত হয়েছিল। তামিলনাড়ু ছাড়া কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশে দক্ষিণামূর্তি বিগ্রহের আরো কিছু প্রকারভেদ দেখা যায়। শিবকে সরাসরি গুরু মনে করার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা যায় না, যেখানে বৌদ্ধধর্ম মুনিধারার চিন্তাবিশ্বেরই প্রকাশ। দক্ষিণামূর্তি বিগ্রহ ব্যতীত উড়িষ্যায় শৈবগুরু হিসাবে লকুলিশের মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং শৈব ভাবনায় গুরুরূপে দেবতা বা মানুষ উভয়েরই রূপ কল্পনা স্বীকৃত হয়েছিল।

এবার বীরশৈব দর্শনের প্রসঙ্গে সরাসরি যাওয়া যেতে পারে। বীরশৈব অথবা লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ে গুরু সংক্রান্ত ভাবনা বোঝার জন্য আমরা বীরশৈব দর্শনের প্রাথমিক ইতিহাস, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, বচন সাহিত্য এবং বীরশৈব দর্শনের তত্ত্বকাঠামো নিয়ে আলোচনা করব। বীরশৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় মহীশূরের ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বসবন্নার হাতে। আনুমানিক ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে হরিহর রচিত *বসবরাজদেবররগলে* নামক ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী বসবন্না বা বসবের আবির্ভাব হয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে। বসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বর্ণাশ্রমধর্মের সমালোচনা। বসব নিজে উপনয়ন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও তিনি মাত্র আট বছর বয়সেই ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা শুরু করে

---

[১৪] অনির্বান. *বেদ-মীমাংসা* (৩). কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ. ১৯৭০. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৫৯১

[১৫] Rao, T. A. Gopinath. *Elements of Hindu Iconography (Vol-II, Part-I)*. Delhi: MLBD. 1965. 1st Edition. p. 271

দেন। এরপর বসব মত প্রকাশ করা শুরু করলেন এবং বীরশৈব মতের প্রচার শুরু করেন। বসবের বীরশৈব তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন বীরশৈব মত অতি প্রাচীন মত; বসব এই মতকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বীরশৈব মতের প্রধান দুটি ভাগের কথা পাওয়া যায়- একদল রেবণসিদ্ধের মতাবলম্বী এবং অপরদল বসবের মতাবলম্বী।[১৬] বসব সম্পর্কে বলা হয় তিনি শিবের থেকে বীরশৈব মতের দীক্ষা লাভ করেন এবং শিব স্বয়ং তাকে কুডলসঙ্গমে একটি লিঙ্গ প্রদান করেন। বসবের সমসময়ে কর্ণাটকে বৈষ্ণব এবং শৈবমতের জনপ্রিয়তা থাকলেও মূলত বর্ণাশ্রম এবং মন্দিরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বীরশৈব মতের উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম কর্ণাটক-এর অর্থনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্কটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে। লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি সামাজিক শ্রেণির মূল যোগদান দেখা যায়- পুরোহিত, বণিক, কৃষক এবং কারিগর/ শিল্পী। কর্ণাটকের ধারবার, বিজাপুর এবং বেলগাও-এই তিনটি জেলায় বীরশৈব মতের প্রতিষ্ঠা সব থেকে বেশি হয়েছিল। ধারবারের মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি মানুষ লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে প্রায় বারো শতাংশ বণিক। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যে কর্ণাটকের বিশেষ যোগদানের কথা পাওয়া যাচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে আদা, আখের গুড়, খেজুরের গুড় রপ্তানি করা হত। এই সময়ের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রমাণ কর্ণাটকে প্রায় নয়টি টাঁকশালের নির্মাণ। এর মধ্যে ছয়টি ছিল ধারবার জেলায় যেখানে বীরশৈবদের বিশেষ প্রভাবের কথা পাওয়া যায়।[১৭] সুতরাং অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের দিক থেকে বীরশৈবরা তৎকালীন বিত্তশালী শ্রেণির সাহচর্য বিশেষভাবে অর্জন করেছিলেন। এর পাশাপাশি বীরশৈবরা বিশেষ

[১৬] চিদানন্দ মূর্তি, এম. *বসবন্না*. নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট. ১৯৯৮. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ১৭

[১৭] Nandi, Ramendra Nath. *Social Roots of Religion in Ancient India*. Calcutta: K.P. Bagchi & Company. 1986. pp. 141-148

আনুকূল্য পেয়েছিলেন ছোট ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের থেকেও। অনেক তাঁতি, দর্জি, রঙ নির্মাতা-রা বীরশৈব মত গ্রহণ করেছিলেন মূলত তৎকালীন মন্দির তথা ব্রাহ্মণদের বসানো খাজনার দায় থেকে মুক্তি লাভের জন্য। তেলিরা বীরশৈব মত গ্রহণ করেন মূলত মন্দিরের আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভের আশায়। একাদশ শতকের একাধিক অনুশাসনে তেলিদের তেল নির্মাণের স্থান মন্দিরকে দান করার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ধারবার, বিজাপুর এবং বেলগাও- এই তিনটি জেলায় বীরশৈব জনসংখ্যার প্রায় বারো থেকে কুড়ি শতাংশ তেলি।[১৮] সুতরাং নিম্নবর্গের অনেক মানুষ বীরশৈব মত গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির চাপে। তবে বীরশৈব মতে অনেক স্মার্ত ব্রাহ্মণেরাও যোগদান করেছিলেন। যদিও বীরশৈব মতের অন্তর্গত হওয়ায় তাঁদের জাত্যভিমান বজায় রাখা সব সময় সম্ভব ছিল না। তবে ব্রাহ্মণদের থেকে বণিকরা বীরশৈব সমাজে অনেকবেশি গুরুত্ব লাভ করলেও অসবর্ণ বিবাহ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।[১৯] প্রসঙ্গত তৎকালীন দক্ষিণ ভারতের মন্দিরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে দেবতার উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করা হয়, কিন্তু ক্রমশ মন্দিরগুলি হয়ে ওঠে ক্ষমতা এবং অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। খ্রিস্টীয় অষ্টম এবং দশম শতকের বেশ কিছু অনুশাসনে দক্ষিণ ভারতের মন্দির প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্তাদের কথা পাওয়া যায়। মন্দির প্রশাসনের মধ্যে অনিবার্যত ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য ছিল। মন্দিরের প্রশাসনিক সভার সদস্যপদ গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণ হওয়া ছিল আবশ্যক।[২০] দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের উদ্দেশ্যে গ্রাম এবং ভূমিদানের প্রভূত উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। অনুশাসনের সাক্ষ্য অনুযায়ী ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯২৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি তামিলনাড়ুতে মোট ভূমি দানের ৬.৫% রাজাদের করা, ২৪.৫% ভূমি দান করেছেন অন্যান্য

[১৮] তদেব, পৃ. ১৬০

[১৯] তদেব, পৃ. ১৪২

[২০] Dayalan, D. *Early Temples of Tamilnadu*. New Delhi: Harman Publishing House. 1992. p. 43

বিত্তশালী বা রাজ পরিবারের সদস্যরা। স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা বণিকরা ৪.৫% ভূমি দান করেছিলেন।[২১] এছাড়া মন্দিরে দীপ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা, গবাদি পশু প্রদান করা অথবা স্বর্ণ বা অর্থদানের রীতি বেশ জনপ্রিয় ছিল। অর্থনীতিতে মন্দির আধিপত্যের সবথেকে বড় প্রমাণ— মন্দির প্রচুর সোনা এবং অর্থের মালিকানার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করত। কৃষিকাজ এবং বাণিজ্যের জন্য এই ঋণ প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। ৮৮৭ অব্দের একটি অনুশাসনে দেখা যাচ্ছে বার্ষিক ২০% সুদে গ্রামের একটি মন্দির অপর একটি মন্দিরের সভাকে স্বর্ণ ঋণ প্রদান করেছে।[২২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে মন্দিরের অর্থনীতিতে কেবল দান নয় সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উপায়ও ছিল। এছাড়া মন্দির মূলত তিন প্রকারের কর্মচারী নিয়োগ করত। প্রথমত, যাঁরা কেবল পূজা-অর্চনার কাজ করতেন, দ্বিতীয়ত, যাঁরা মন্দির প্রশাসন এবং টাকা পয়সার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করা হত বিবিধ কাজের জন্য। অনেক সময়েই এই নিয়োগ ছিল বংশানুক্রমিক। মন্দিরের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বেদপাঠ করা বা সংগীত পরিবেশনের জন্য বেশ কিছু কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে বিভিন্ন অনুশাসনে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটিকা স্থাপিত হয়েছিল। ঘটিকা বলতে মূলত ব্রাহ্মণ পরিচালিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই ঘটিকাগুলি শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সমকালীন প্রশাসনের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখত। এই ঘটিকা এবং মঠগুলি মূলত মন্দিরের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। ৯৫০ অব্দে কর্ণাটকে শাসকের দ্বারা শৈব মঠ নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কোডিয়া মঠের অন্যতম ব্যুৎপত্তির জায়গা ছিল জৈন, লোকায়ত, বৌদ্ধ এবং লকুলিশ সিদ্ধান্তে।[২৩] সুতরাং দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষিতে মন্দির ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

---

[২১] তদেব, পৃ. ৮২

[২২] তদেব, পৃ. ১৫০

[২৩] তদেব, পৃ. ১৯৯

বসবের বীরশৈব দর্শন এই মন্দিরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিপ্রতীপ অবস্থানে তৈরি হয়েছিল। বসব তথা অন্যান্য বীরশৈব সাধকের হাতে কন্নড় ভাষায় নির্মিত হয়েছিল বচন সাহিত্য নামে একটি অতি শক্তিশালী সাহিত্যিক পরম্পরা। বচন বলতে বোঝায় মুখের ভাষা। মুখের ভাষা ব্যবহার এবং কন্নড়কে সংস্কৃতের বদলে ব্যবহার করার অন্যতম কারণ ছিল ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক আবহকে অস্বীকার করার চেষ্টা। আমরা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতক অবধি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে স্থানীয় ভাষায় সাহিত্য রচনার নিদর্শন সহজেই দেখতে পাব। সুতরাং বীরশৈবদের হাতে ব্রাহ্মণ্যমতের যে বিরোধ হচ্ছিল তা ভাষা রাজনীতিকেও উদ্দেশ্য করে শুরু হয়েছিল। বসব মন্দির এবং মন্দিরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের বিরোধিতা করে বলছেন—

যার আছে, সে বানিয়ে দেবে শিবমন্দির
আমি কি পারি? গরীবদুঃখী মানুষ, প্রভু!
আমার পাদুটো থাম, দেহটাই নাটমন্দির
এই মাথাটাই স্বর্ণকলস হোক—
শোনো হে প্রভু কুডলসঙ্গমের
স্থাবর যা, তা বিনিষ্ট হয় বটে
জঙ্গমের তো বিনাশ নেই জগতে।[২৪]

বসবের তত্ত্বে দেহই যেন মন্দির। সুতরাং মন্দিরে পৃথকভাবে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আবার এই দেহ মন্দির সচল, সুতরাং তা অবিনাশী। বীরশৈব সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সহজ রূপকল্পের মাধ্যমে গভীর তাত্ত্বিক মতের প্রকাশ। আমরা বীরশৈব মতে গুরুর অবস্থান বোঝার জন্য এই সকল সাধকদের (বীরশৈব পরিভাষায় শরণ) রচিত বচন সাহিত্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছি। প্রথমত, শাস্ত্রের বিকল্প হিসাবে বীরশৈব দর্শনে এই বচনগুলি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার্য। দ্বিতীয়ত, গুরু ভক্তিবাদে যে বিশেষ জায়গার অধিকারী, তাকে বোঝার জন্য গুরুরা

[২৪] দেব সেন, নবনীতা. *শতেক বচন.* কলকাতা: প্যাপিরাস. ১৯৮৭. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৫৫

ব্যক্তিগতভাবে যে দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তা বিশেষভাবে বোঝা দরকার। গুরুদের রচিত বচন সাহিত্যের পাশাপাশি আমরা গুরুদের নিয়ে রচিত কিছু চরিতধর্মী সাহিত্যের নিদর্শন পাচ্ছি—যেমন বসবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল *বসবপুরাণ* । আবার জৈনদের রচিত একটি চরিতগ্রন্থ *বিজ্জলাচার্যচরিত*- এ বসবকে বিজ্জলাচার্যের শত্রু হিসাবে দেখানো হয়েছে।[২৫] এই চরিতগুলিতে বর্ণিত বিভিন্ন আখ্যানের থেকেও বীরশৈব দর্শনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারা যায়। *বসবপুরাণ*-এর আখ্যান থেকে বোঝা যায় বসব নতুন দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করছেন না, পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মতকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। একোরাম, পন্ডিতারাধ্যা, রেবণ, মরুলা এবং বিশ্বারাধ্য এই পাঁচজন আচার্যের মাধ্যমেই লিঙ্গায়েত মতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[২৬] বসব এবং অন্যান্য বীরশৈব সাধকদের রচনার মাধ্যমে বীরশৈব দর্শনের যে মূলসূত্রগুলি পাওয়া যায় সে বিষয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাইব। বচন সাহিত্যের মাধ্যমেই যে বীরশৈব ভাবনা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বীরশৈব সাহিত্যে আমরা শিবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিদর্শন পাই। শিব লিঙ্গকে বীরশৈবরা তাঁদের গলায় বা বক্ষে চিহ্নরূপে ধারণ করেন। এই লিঙ্গকে বীরশৈবরা জঙ্গম লিঙ্গ বলেন। আক্ষরিকভাবে জঙ্গম বলতে সচল, গতিশীল, চরিষ্ণু বিষয়কে বোঝায়। ধর্মের প্রেক্ষিতে জঙ্গম শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় *পরাশর-সংহিতা*-য় যেখানে বলা হল- “ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থম্” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হলেন চলমান তীর্থ।[২৭] সুতরাং ‘জঙ্গম’ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে স্থাবরের বিপরীতে, বিশেষত স্থাবরত্বের বিকল্প বা সমালোচনা হিসাবেই। বীরশৈবদের ক্ষেত্রে জঙ্গম লিঙ্গ-এর তাৎপর্য যেহেতু তা ভক্তের কণ্ঠ লগ্ন তাই তা মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের মত স্থাবর নয়। বীরশৈব সাধক কবিদের আরেকটি

---

[২৫] Bhandarkar, R. G. *Vaishnavism Saivism and Minor Religious Systems*. Varanasi: Indological Book House. 1965. 1st Edition. p. 132

[২৬] Sastri, K.A Nilakanta. *A History of South India*. New Delhi: Oxford University Press. 2008. 27th impression. p. 393

[২৭] বন্দ্যোপাধায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১). নিউ দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১. অষ্টম মুদ্রণ. পৃ. ৯১৭

বৈশিষ্ট্য হল বচনের পদে এঁরা সকলেই শিবকে কিছু বিশেষ নামে সম্বোধন করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় শিব তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত উপাস্য হয়ে উঠেছেন। যেমন বসবের ইষ্ট কুডলসঙ্গমদেব, মহাদেবী আক্কার দেবতা চেন্নামল্লিকার্জুন, অল্লমপ্রভু বা আল্লামার গোহেশ্বর, চেন্নাবাসবনার কুডলসঙ্গমদেব, দেবর দাসীমাইয়ার আরাধ্য রামনাথ। প্রসঙ্গত পৌরাণিক শিবের রূপকল্পকে বীরশৈবরা স্বীকার করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রবণতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তামিলনাড়ু এবং দাক্ষিণাত্যে শৈবমতের বিকাশ হয়েছিল ছিল দুটি মূল স্রোতে। একটি তামিল শৈবসিদ্ধান্তের পরম্পরা যার ভিত্তি ছিল বিভিন্ন শৈবাগম, অপর স্রোতটি ছিল আমাদের বর্তমান আলোচ্য কর্ণাটকের বীরশৈব দর্শন। শৈবসিদ্ধান্তের ভিত্তি শৈবাগমের প্রাচীনতম উদাহরণ স্বরূপ নবম খ্রিস্টাব্দে রচিত *তিরুমূলার*-এর কথা বলা যায়। এই ধারার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় মেয়কাণ্ডদেব-এর রচনা থেকে। মেয়কাণ্ডদেব আচার্য শংকরাচার্য প্রবর্তিত শিবের ধারণাকে স্বীকার করতেন না, বরং কবি কালিদাসের নির্মিত শিবের ধারণাই তাঁর বিশেষ পছন্দ ছিল।[২৮] সুতরাং তামিল শৈবাগমের আরাধ্য শিব হলেন সাকার এবং সগুণ দেবতা। বীরশৈবদের আরাধ্য শিব নিরাকার হলেও সম্পূর্ণত নির্গুণ নন। প্রকৃতপক্ষে ভক্তির আরাধ্য সগুণ না নির্গুণ এবিষয়ে একধরনের টানাপোড়েন সবসময়েই চলে। একারণেই বীরশৈবরা নিজেদের দর্শনকে দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদের মাঝামাঝি একটি দর্শনে তত্ত্বায়িত করতে চেয়েছেন। বসবের রচনায় ‘শিব’ শব্দটির ইষ্ট অর্থে ব্যবহার কম, অনেক বেশি করে ‘শিবপথ’, ‘শিবনাম’, ‘শিবজ্ঞান’ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। তাই বীরশৈবরা শিবভক্তি বা শিবভক্তকে বচন সাহিত্যের বিষয় হিসাবে দেখতে চেয়েছেন

---

[২৮] Sastri, K.A Nilakanta. *A History of South India*. New Delhi: Oxford University Press. 2008. 27th impression. p. 392

ভক্তির বিষয়ী বা আরাধ্য শিবকে হিসাবে নয়।[২৯] মহাদেবী আক্কা-র বচনে আমরা শিব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আখ্যানের ব্যবহার দেখতে পাই, যেখানে মহাদেবী তাঁর সতীন পার্বতীর উদ্দেশে পদ রচনা করছেন।[৩০] ভক্তিসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ইষ্টের প্রতি আত্মনিবেদন, সুতরাং স্বরের দিক থেকে ভক্তিসাহিত্যের মূল স্বরটি কিন্তু পৌরুষদৃপ্ত নয়, বরং 'মেয়েলি'। আবার সমাজের সাধারণ নির্মাণ অর্থাৎ সমাজের সবার উপর পুরুষ, তার নীচে নারী, আবার পুরুষের মধ্যে উচ্চবর্ণের পুরুষের নিচে নিম্নবর্ণের পুরুষ, মেয়েদের মধ্যেও বর্ণের এই একই উচ্চাবচতাকে ভক্তিদর্শন প্রশ্নের মুখে ফেলেন। ভক্তিতে যিনি যত নিচে, যত বঞ্চিত তিনি ঈশ্বরের তত প্রিয়। ভক্তি কবিতা বিশেষত বচন সাহিত্য নারীর সতীত্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত ধারণাকেও প্রশ্ন করেছে। মহাদেবী আক্কা বিবাহ করলেও স্বামীকে ত্যাগ করেছেন (মহাদেবীর বিবাহ রাজা কৌশিকের সঙ্গে হয়েছিল কি না এবিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে)। তবে সামাজিক যাবতীয় নির্মিতিকেই বীরশৈবরা একেবারে ত্যাগ করেছিলেন তা বলা যাচ্ছে না। মহাদেবী অল্লম প্রভুর কাছে ভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, অল্লম প্রভু তাঁকে দীক্ষা দান করেন। পুরুষের কাছে নারীর পরীক্ষা দানের মাধ্যমে পুরুষকেন্দ্রিক সমাজের স্বীকৃতির একটা গুরুত্ব থেকে গেছে বীরশৈব সমাজ কাঠামোয়।[৩১] মহাদেবী আক্কা-র সূত্রে আমাদের অবশ্যই মনে পড়বে *নালায়ির-দিব্যপ্রবন্ধম*-এর সাধক কবি অণ্ডালের কথা যিনি নিজেকে গোবিন্দের স্ত্রী বলেই মনে করতেন। কেবল সামাজিক নির্মিতিকে অস্বীকারের মাধ্যমেই নয় বচন সাহিত্য দার্শনিক তত্ত্ব নির্মাণেও পুরুষকেন্দ্রিক এবং বর্ণানুশাসন চালিত সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে সমর্থ হয়েছে। বীরশৈব দর্শনের শক্তিতত্ত্ব বসব, মহাদেবী-র রচনায় স্পষ্ট হয়েছে। বীরশৈব দর্শন অনুযায়ী শিব জগতের মুখ্য তত্ত্ব, শিব এবং

[২৯] Dharwadker, Vinay. *The collected essays of A.K. Ramanujan*. New Delhi: Oxford University Press. 2004. Reprint. pp. 295-297

[৩০] Ramanujan, A.K. *Speaking of Siva*. Haryana: Penguin Books India. 1993. 1st Edition. p. 106

[৩১] Dharwadker, Vinay. *The collected essays of A.K. Ramanujan*. New Delhi: Oxford University Press. 2004. Reprint. pp. 270-275

পরমা শক্তির প্রতীকী সম্পর্ক থেকেই এই জগতের নির্মাণ। বীরশৈব দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ভক্তের ভক্তির মাধ্যমে নিজস্ব সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়কে অতিক্রম করে যাওয়া।[৩২] বচন সাহিত্যের রচনাশৈলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—এই সাহিত্যের রচয়িতা বেশির ভাগ সময়েই ব্যক্তি হিসাবে কথা বলেছেন, কবি হিসাবে নন। নিজস্ব সমস্যাকে তুলে ধরেছেন তাদের সাহিত্য ভাষায়। মহাদেবীর রচনায় মল্লিকার্জুনের প্রতি কেবল প্রেম নয় প্রেমের হতাশার প্রকাশও দেখা যাচ্ছে।[৩৩] বৈদিক প্রার্থনার সঙ্গে বচনের অন্যতম ফারাক ব্যক্তিগত ভাষ্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মাধ্যমে। বচন সাহিত্যের এই প্রকাশের মধ্যে বীরশৈব ভাবনার ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণার প্রকাশকেই বোঝায়।

বীরশৈব ভাবনায় গুরু প্রসঙ্গ তথাকথিত মূলধারার ভারতীয় ধর্ম ব্যবস্থার প্রচলিত বয়ানের থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শে সর্বোচ্চ প্রামাণ্য বলে যদি কিছু থাকে তবে তা শ্রুতি এবং তারপরে স্মৃতি। ভক্তিদর্শনে গুরু এই শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উর্দ্ধে বলেই ভক্তি দর্শন নিজস্ব একটি অভিমুখ নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল। বীরশৈবরা উপনয়ন এবং জন্ম নির্দিষ্ট ধর্ম পরিচয়কে অস্বীকার করেন। তাই বীরশৈব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও প্রত্যেককে আলাদা করে বীরশৈব ধর্ম গ্রহণ করতে হয় এবং লিঙ্গধারণ করতে হয়। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যকে বীরশৈবরা অস্বীকার করেন এবং ব্রাহ্মণের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার জন্য গ্রামের মধ্যে কুয়ো খনন করেন না এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৪] লিঙ্গায়েত সমাজের দীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ এবং মৃত্যুর পরে সৎকারের জন্যও গুরুরই প্রয়োজন হয়। বীরশৈব মতে শিব প্রতীক লিঙ্গের তিনটি স্তর—

---

[৩২] Ramaswamy, Vijaya. *Walking Naked Women, Society, Spirituality in South India*. Shimla: IIAS. 1997. 1st Edition. p. 151

[৩৩] Ramanujan, A.K. *Speaking of Siva*. Haryana: Penguin Books India. 1993. 1st Edition. p. 35

[৩৪] বসু, নগেন্দ্রনাথ. *বিশ্বকোষ* (খন্ড-১৯). কলকাতা: ইউ সি বসু এন্ড কোম্পানি. ১৩০১ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৭৪

ইষ্ট লিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ এবং ভবলিঙ্গ। ইষ্ট লিঙ্গের দুটি ভাগ— আচারলিঙ্গ, যা ত্যাগ স্বরূপ, তারপরে গুরুলিঙ্গ যা জ্ঞান স্বরূপ। গুরুলিঙ্গের থেকেই ক্রমোচ্চ স্তরে অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তি এবং আদি শক্তি হয়ে পরা শক্তি চিৎশক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়।[৩৫] বীরশৈব দীক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে— বেধাত্মিকা, মন্ত্রাত্মিকা এবং ক্রিয়াত্মিকা। 'বেধা' বলতে এখানে গুরুর স্পর্শকে বোঝানো হচ্ছে। গুরু শিষ্যের মাথায় হাত রাখেন এবং তার মাধ্যমে গুরুর শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং এর মাধ্যমে শিষ্যের সঙ্গে ভবলিঙ্গের সংযোগ হয়। মন্ত্রাত্মিকা দীক্ষায় শিষ্যের কানে গুরু পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দান করেন এবং জীবের ভোগলিঙ্গের সঙ্গে প্রাণ লিঙ্গের সংযোগ স্থাপিত হয়। ক্রিয়া দীক্ষা আনুষ্ঠানিক রীতি মেনে পালিত হয়। ক্রিয়া দীক্ষা হল গুরুর কাছে শরণাগতির প্রথমস্তর এবং শেষে বেধাত্মিকা দীক্ষার পরে শিষ্যের মধ্যে 'তৎ ত্বম অসি' ভাবনার উদয় হয়, অঙ্গ ও লিঙ্গের মধ্যে অভেদ ভাবনার সূচনা ঘটে।[৩৬] বীরশৈব দর্শনের এই পর্যায়ের সঙ্গে যোগ এবং তন্ত্রসাধন ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়। মূলত এক্ষেত্রে লক্ষণীয় গুরুই যেহেতু জ্ঞানশক্তি স্বরূপ তাই আলাদা করে শিষ্যের জন্য জ্ঞানমার্গের কথা বলা হয়নি। অল্লম প্রভু বীরশৈব দর্শনের অন্যতম প্রধান গুরু। তবে বীরশৈব পরম্পরার সূচনা শ্রীপতি-র *ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য* অনুযায়ী সদাশিবের থেকে এবং মায়িদেব-এর *অনুভব-সূত্র* এবং *বিশেষার্থ-প্রকাশিকা* অনুযায়ী উপমন্যুর থেকে হয়েছে বলে মনে করা হয়।[৩৭] এই বর্ণনা অবশ্যই বসবের পূর্ববর্তী সময়কে কেন্দ্র করে রচিত। বসবের সময়ে বীরশৈব মতাদর্শ শাস্ত্রীয় কাঠামোকে অস্বীকারের মধ্যে নির্মিত হলেও চেন্নাবসবের সময় থেকে বীরশৈব মতের শাস্ত্রীয় নির্মাণ শুরু হয়। বসবের সমকালে বীরশৈব সাধক-কবিদের নাম থেকে, বিশেষত নানা কবির নামের আগে 'আন্না' অর্থাৎ ছোট এবং 'আক্কা' অর্থাৎ বড়—এই ধরনের

---

[৩৫] Gopinath, Kaviraj. *Aspects of Indian Thought*. Burdwan: The University of Burdwan. 1966. 1st Edition. pp. 154-155

[৩৬] তদেব, পৃ. ১৫৮-১৫৯

[৩৭] তদেব, পৃ. ১৪৯

বিশেষণের ব্যবহার থেকে অনুমান করা হয় বীরশৈবদের মধ্যে ধর্মমত নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি দলগত প্রচেষ্টা কাজ করত।[৩৮] পরে তা ক্রমে মঠকেন্দ্রিক রূপ লাভ করে। বীরশৈব মঠের মধ্যে যাঁরা গুরু হিসাবে কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে জাতি-বর্ণ প্রথার বিরোধিতা দেখা গেলেও লিঙ্গায়েৎদের মধ্যে একধরণের নিজস্ব জাতিকাঠামোর উপবিভাগের উপস্থিতি দেখা যায়। আমরা ভূমিকায় দেখেছিলাম বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে লিঙ্গায়েত গুরুরা ক্রমে 'মিস্টিক' থেকে 'আধুনিক' হতে শুরু করলেন। বীরশৈব ভক্তদের থেকে অনুদান সংগ্রহ করে তাঁরা মঠগুলিকে নতুন প্রজন্মের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিবর্তিত করেন। একারণে কর্ণাটকের বেশ কিছু বীরশৈবমঠের ছাত্র এবং গুরুরা ক্রমে রাজনৈতিক ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন। যেমন— মাইসোরের সুত্তুর মঠ।[৩৯] বীরশৈবধর্ম অবশ্যই যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। বীরশৈবরা আজও তাই ধর্ম তথা জাতি-বর্ণ সম্প্রদায় হিসাবে কর্ণাটকের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা এতক্ষণ বীরশৈব এবং লিঙ্গায়েৎ এই শব্দ দুটিকে সমার্থে ব্যবহার করেছি। অধিকাংশ প্রামাণ্য গবেষণা এবং বিষয়ভিত্তিক অভিধান ও বিশ্বকোষেও শব্দদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবিষয়ে বীরশৈব তথা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের একটি সাম্প্রতিক অতীতের প্রসঙ্গ টেনে আমরা বর্তমান আলোচনা শেষ করব। প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সমাজকর্মী গৌরী লঙ্কেশের রাজনৈতিক হত্যার স্মৃতি আমাদের স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট। ২০১৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর গৌরী লঙ্কেশকে হত্যা করা হয়। ৮ই অগস্ট ২০১৭-তে গৌরী লঙ্কেশ একটি প্রতিবেদনে লেখেন, তাঁর মূল প্রশ্নটি ছিল- বীরশৈব এবং লিঙ্গায়েৎরা কি অভিন্ন?।[৪০] এই প্রশ্নটি কর্ণাটকের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে খুবই জরুরি। লিঙ্গায়েৎরা নিজেদের বীরশৈবদের

---

[৩৮] Dharwadker, Vinay. *The collected essays of A.K. Ramanujan*. New Delhi: Oxford University Press. 2004. Reprint. pp. 279-294

[৩৯] Copeman J & Aya Ikegame, *The Guru in South Asia: New Interdisciplinary Perspectives*, New York: Routledge, 2012, 1st Edition, p.49

[৪০] https://thewire.in/history/karnataka-lingayat-veerashaive-debate accessed on 01.09.2020

থেকে পৃথক মনে করেন। তাঁদের মত বসবের হাতে যে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে লিঙ্গায়েৎ সাধনার ধারা নির্মিত হয়েছিল তার সঙ্গে পঞ্চাচার্যকৃত বীরশৈব মতকে অনেক পরে সমাপতিত করে বর্তমানে লিঙ্গায়েৎ পরিচয় তৈরি করা হয়েছে যাঁরা ব্রাহ্মণ্য রীতি-নীতিকেই অনেকাংশে অনুসরণ করে। এই প্রসঙ্গে গৌরী লঙ্কেশ আরো কিছু যুক্তি উপস্থাপিত করেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিঙ্গায়েৎ-রা আজও নিজেদের হিন্দুদের থেকে পৃথক বলেই মনে করেন এবং লিঙ্গায়েৎ জাতি পরিচয়েই বাঁচতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বর্তমানে লিঙ্গায়েৎদের 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু' মর্যাদার দাবি আসলে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের ইতিহাসের সঙ্গেই যুক্ত। এই বিবাদকে শাস্ত্রকেন্দ্রিক ধর্মচর্যার সঙ্গে গুরুকেন্দ্রিক ধর্মচর্যার বিরোধ হিসাবেই আমরা দেখতে চাইছি।

৫.২ নাথ সাধনায় গুরু প্রসঙ্গ

সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব ভারতে নাথ সাধনার ব্যাপ্তি আজও দেখতে পাওয়া যাবে। নাথ ধর্মাবলম্বীদের মূল বৈশিষ্ট্য যোগ কেন্দ্রিক সাধন পদ্ধতি। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে যোগ সাধনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। তাত্ত্বিকভাবে যোগ সাধনার কথা পাওয়া যাচ্ছে পাতঞ্জল *যোগসূত্র*-এ। এখানে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, এই অঙ্গগুলি নাথধর্মেও স্বীকৃত।[৪১] বঙ্গদেশে যুগি নামক উপ-জাতিবর্ণের মধ্যে নাথ ধর্মালম্বীদের ধরা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় বস্ত্র ব্যাবসায় অংশগ্রহণের আগে যুগিদের মূল পেশা হিসাবে তাঁত বোনার (ধুতি এবং গামছা তৈরির) কথা পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে যুগিদের সংখ্যা অনেক বেশি। কিছু জেলায় যুগিদের মধ্যে কুলীন, মধ্যলা এবং বাঙাল-এই তিনটি ক্রমোচ্চ শাখার কথা রিজলির লেখায় আছে। তবে রিজলি যখন বঙ্গদেশের জাতিবর্ণ সংক্রান্ত বিবরণ তৈরি করছিলেন (১৮৯১ সালে তাঁর *Tribes and Castes of Bengal Ethnographic Glossary*, Vol-I প্রকাশিত হয়) তখন

[৪১] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. *রাজযোগ ও হঠযোগ*. কলকাতা: আনন্দ. ১৯৯৪. প্রথম সং. পৃ. ১৩-২৭

তিনি যুগিদের মধ্যে একাধিক ধর্ম এবং একাধিক প্রকারের উল্লেখ করেছেন।[৪২] রিজলির তথ্য অনুযায়ী বঙ্গদেশের যুগিদের একটা অংশ শৈব যারা নিজেদের গোরক্ষনাথ, মৎসেন্দ্রনাথ এবং বীরভৈরবের সম্প্রদায়ের অংশ বলে করেন, আরেকটি অংশ বৈষ্ণব ধর্মের অনুসরণ করে চলেন। যুগিদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃতি নিয়ে সমস্যা আছে। নিত্যানন্দ শাখা যুগিদের দীক্ষা দান করলেও অদ্বৈত শাখা যুগিদের দীক্ষা প্রদান করেন না।[৪৩] সুতরাং বঙ্গদেশে নাথ ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি নিজস্ব চরিত্র নির্মিত হয়েছিল। যুগি এবং নাথপন্থীরা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশেই ছড়িয়ে আছেন। নাথধর্মাবলম্বীদের জাতি-বর্ণগত অবস্থান নিয়ে আজও বিভিন্ন মতামত দেখা যায়, প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ৫ জুলাই ২০১৯ সালে হরিয়ানা সরকারের তরফে সে রাজ্যে বসবাসকারী যোগি, যোগি নাথদের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির আওতায় রাখা হয়েছে।[৪৪] আবার সবক্ষেত্রেই যে যুগিদের সঙ্গে গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ের সরাসরি যোগাযোগ থাকছে এমনটাও নয়। যেমন পাঞ্জাবের জাকবর এলাকায় যুগিদের প্রতিষ্ঠিত মঠের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁদের ইতিহাস শুরু হয়েছে ষোড়শ শতক থেকে, তাদের প্রথম গুরু উদন্তনাথ। উদন্তনাথের সঙ্গে গোরক্ষ সম্প্রদায়ের সরাসরি যোগাযোগের কথা পাওয়া যাচ্ছে না। উদন্ত নাথের সঙ্গে সম্রাট আকবরের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত উদন্ত নাথের আকাশপথে গমন ইত্যাদি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, এই যুগিরা মূলত মঠকেন্দ্রিক জীবনযাপন করেন এবং বিবাহ করেন না।[৪৫] আমরা বর্তমানে বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের যুগিদের মধ্যে যাঁরা নাথধর্মের অনুসরণ করেন এবং মূলত সন্ন্যাস এবং মঠকেন্দ্রিক জীবন-যাপন করতেন এবং সেই সূত্রে গুরুকেন্দ্রিক জীবনচর্যা পালন করতেন তাঁদের

---

[৪২] Risley, H. H. *Tribes and Castes of Bengal Ethnographic Glossary* Vol-I. Calcutta: Bengal Secretariat Press. 1891. pp. 355-360

[৪৩] তদেব, পৃ. ৩৫৮

[৪৪] Haryana Government Gazette Extraordinary, published on 05.07.2019, published by Principal Secretary to Government, Haryana, Welfare of Schedule Castes and Backward Classes Department.

[৪৫] Goswamy, B. N & J. S. Grewal. *The Mughals and the Jogis of Jakhbar*. Simla: IIAS. 1967. 1st Edition. pp. 6-8

নিয়েই আলোচনা করছি, গৃহীরা আমাদের মুল আলোচনার বাইরে থাকছেন। গৃহীদের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের পাশাপাশি রাঢ়-বঙ্গেও যুগিদের অবস্থান দেখা যায়। রাঢ়ের যুগিদের মধ্যে নাথ, দেবনাথ, পণ্ডিত, দাস উপাধি এবং কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, নিরঞ্জন, অনাদি গোত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে যুগিদের তিনটি শাখা দেখা যায়- একদল ধর্মঠাকুরের পূজারী, তামার বলয় পরিধান করেন, দেবনাথ এবং নাথেরা উপবীত ধারণ করেন, আরেকদল কিছুই করেন না। এঁদের পুরোহিতেরা অধিকারী নামে পরিচিত। রাঢের যুগিদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কের কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন এবং যুগিদের আদিগুরু বলে বাহুল বা রাউলের কথা বলেছেন।[৪৬] মনে করা হয়, গোরক্ষনাথের আবির্ভাবের পরে বঙ্গদেশের যুগিরা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে শৈব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাঢ়ে যুগি শিশু জন্মগ্রহণের পরে নাপিত ডেকে কান চিরে দেওয়া হয় এবং তিন বছর বয়স হলে গুরু এসে শিশুর কানে মন্ত্র দান করেন। যুগিরা মৃতদেহকে যোগাসনে বসিয়ে সমাধিস্থ করেন। রংপুর অঞ্চলে যুগি এবং মুসলমানদের মধ্যে স্বজাতীয় বীর কালুয়ার পূজা করতে দেখা যায়। রাঢ়ের যুগিদের মূল জীবিকা বস্ত্র বয়ন তবে কিছু কয়েকজন যুগি চুন বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করেন।[৪৭] 'হিন্দু' ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের অনেকেই নাথপন্থাকে স্বীকার করেছেন বলে দেখা যায়। ভঙ্গরী যুগিরা মুসলমান। ভঙ্গরী ও নান্দিয়া যুগিরা গান করেন না কিন্তু ভর্তৃহরি যুগিরা গোপীচাঁদ এবং মহাদেবের উদ্দেশ্যে গান করেন।[৪৮] আমরা বুঝতেই পারছি যখন বঙ্গদেশেই নাথপন্থের এত বিচিত্র শাখার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে নাথপন্থের সামগ্রিক চিত্রটি অত্যন্ত বিস্তৃত হতে বাধ্য। তবে সারা ভারতের নাথপন্থের যদি কোন সামান্য বৈশিষ্ট্যকে চিনতে হয় তা বোঝা সম্ভব হবে গুরু প্রসঙ্গটিকে মাথায় রাখলে। মূলত গোরক্ষনাথের বিভিন্ন শিষ্যকে কেন্দ্র করে নাথপন্থের শাখা গোটা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ

---

[৪৬] সিংহ, মাণিকলাল. *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি* (১). বাঁকুড়া: প্রদীপকুমার সিংহ প্রকাশিত. ১৯৮২. প্রথম সং. পৃ. ১৮৫

[৪৭] তদেব, পৃ. ১৮৯

[৪৮] বসু, নগেন্দ্রনাথ. *বিশ্বকোষ* (ষষ্ঠদশ ভাগ). দিল্লি: বি.আর. পাবলিশিং. ১৯৮৮. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৭৩

করেছে। প্রাচীন যুগে গোরখপন্থীরা দুইদলে বিভক্ত ছিল। একদলে ১২টি শাখা এবং অপর দলে ১৮টি শাখার কথা পাওয়া যায়। এরমধ্যে ১৮ পন্থীরা শিব যোগী এবং ১২ পন্থীরা গোরখ-যোগী নামে পরিচিত ছিলেন। পরে শিবযোগী ৬ এবং গোরখ-যোগী ৬ মিলিয়ে মোট ১২টি পন্থার কথা পাওয়া যায়।[৪৯] যেমন গোরক্ষনাথের শিষ্যা বিমলাদেবী প্রবর্তিত আইপন্থ/ মাইপন্থ। এই পন্থায় শক্তিপূজা তথা দেবীপূজার প্রাধান্য। এদের মূলগ্রন্থ *অগ্নিপুরাণ*[৫০](অষ্টাদশ মহাপুরাণের *অগ্নিপুরাণ* নয়)। আবার গোরক্ষপন্থীরা নবনাথের কথা বলেন, যেমন- একনাথ, আদিনাথ, মৎসেন্দ্রনাথ, উদয়নাথ, দণ্ডনাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, কূর্মনাথ এবং জালন্ধরনাথ। আবার এই নবনাথের নামের তালিকার মধ্যেও যথেষ্ট অমিল দেখতে পাওয়া যায়। *নবনাথ ভক্তিসার* নামক মারাঠি গ্রন্থে নবনাথের তালিকায় চর্পটনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়, এছাড়াও *সুধাকরচন্দ্রিকা* নামক গ্রন্থে ৮৪ জন সিদ্ধ নাথের নাম পাওয়া যাচ্ছে।[৫১]

বঙ্গদেশে নাথপন্থের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গুরু হিসাবে মীননাথ, গোরক্ষনাথ এবং রাহুল বা রাউত পরিচিত। নাথ ধর্মের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের যোগাযোগের পাশাপাশি নাথগুরুদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধগুরুদের নামের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথের সঙ্গে চর্যাকার লুই পা এবং রাহুলের সঙ্গে চর্যাকার সরহ পা-র নামের সাদৃশ্য বিশেষভাবে মনোযোগের দাবি রাখে। মহাযান এবং বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের গুরুদের মধ্যে নামের সাদৃশ্য আমরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ইতিপূর্বেও দেখেছি। কিন্তু সমস্যা হল মহাযান এবং বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের গুরুদের মধ্যে নামের মিল থাকার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে করা হয়, মহাযান এবং বজ্রযান সাধ্য-সাধনে পৃথক হলেও তাদের আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় অভ্যাসে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। ফলে গুরুদের

[৪৯] নাথ, রাজমোহন. *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন-পুঁথি.* কলিকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলিনী. ১৯৬৮ খ্রি. প্রথম সং. পৃ. ২৩১-৩৩

[৫০] তদেব, পৃ. ২৫২

[৫১] বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ. *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী* (২). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ১৯৮৪. পৃ. ৪৪৬

নামের সাদৃশ্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তবে নাথধর্মের এবং বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের গুরুদের নামের সাদৃশ্য না থাকাই প্রত্যাশিত ছিল। ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসের একটি প্রবণতা এখানে মাথায় রাখতে হবে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম তথা বৌদ্ধ-জৈন ইত্যাদি সংঘকেন্দ্রিক ধর্মের বিপ্রতীপে সহজ এবং সাধারণ জীবনচর্যা থেকে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব—এই মতের সমর্থনে যে সমস্ত ধর্ম সম্পদায়ের জন্ম হয়েছিল, যাদের সামগ্রিকভাবে 'সহজসিদ্ধি' বলা হয় তাদের মধ্যে এই প্রবণতাটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই ধর্মমতগুলি যতটা না তত্ত্বকেন্দ্রিক তার থেকে অনেক বেশি করে জীবনচর্যা এবং ধর্মীয় অভ্যাস কেন্দ্রিক। এই ধর্মগুলি সেকারণে নিজেদের সঙ্গে অপরাপর 'সহজসিদ্ধি'কেন্দ্রিক মতের পার্থক্য রাখতে আগ্রহী নয়। সেকারণে তাঁরা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরুর নামের সঙ্গে নিজেদের ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরুর নামের পার্থক্য তৈরিতে উৎসাহী ছিলেন না, বরং অন্য ধর্মের গুরুদের নাম সহজেই প্রতিগ্রহণ এবং আত্তীকরণে আগ্রহী ছিলেন।[৫২] এবারে নাথ সম্প্রদায়ের আদিগুরু হিসাবে স্বীকৃত মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথ বা মচ্ছেন্দ বিভু বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। আমরা মৎসেন্দ্রনাথের নামে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাচ্ছি। যেমন—*কৌলজ্ঞাননির্ণয়, মৎসেন্দ্রসংহিতা*। আর মহাযোগী মৎসেন্দ্রনাথের উল্লেখ পাচ্ছি কাশ্মীরের প্রখ্যাত আলঙ্কারিক এবং সাধক আচার্য অভিনবগুপ্তের *তন্ত্রালোক* এবং জয়রথকৃত এই গ্রন্থের টীকায়। মীননাথ গোরক্ষনাথের গুরু। বঙ্গদেশে মীননাথের আখ্যান পাচ্ছি *গোর্খ-বিজয়, মীনচেতন* নামক গ্রন্থে। এছাড়াও মৎসেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ কেন্দ্রিক নানা আখ্যান নেপাল, পাঞ্জাব এবং ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। নেপালে মৎসেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে বিবেচনা করা হয়। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে মৎসেন্দ্রনাথ কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ভারতীয় শাস্ত্র পরম্পরায় স্বীকৃত। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মীননাথ এবং মৎসেন্দ্রনাথকে একই মানুষ বলে মনে করতেন, এবং মীননাথের কামরূপ মঠ থেকে কৌলমত ভারতবর্ষের অন্যত্র

---

[৫২] Majumder, R.C. *The History of Bengal* (Vol-I). Dacca: The University of Dacca. 1943. 1st Edition. pp. 339

বিস্তার লাভ করেছে মনে করতেন।[৫৩] তাঁর মতে, মৎসেন্দ্রনাথের মূল ঝোঁক শক্তি-উপাসনার দিকে এবং গোরক্ষের ঝোঁক শিব- উপাসনায়। সুতরাং আমরা নারী-আসক্ত মৎসেন্দ্রকে কদলী রাজ্য থেকে গোরক্ষনাথের উদ্ধারের আখ্যানটিকে শাক্ত এবং শৈব সাধনার বিতর্কের সাপেক্ষেও দেখতে পারি। মৎসেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রাচীনতম গ্রন্থ হল *কৌলজ্ঞাননির্ণয়*। মৎসেন্দ্রনাথের সময় নিয়ে একাধিক মতের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তবে প্রবোধচন্দ্র বাগচী-র মতানুযায়ী সম্ভবত তিনি খ্রিস্টীয় দশম শতকের প্রথম দিকে বঙ্গদেশের চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কৌলমতের প্রচার করেছিলেন। তবে জীবনের একটি পর্যায় সম্ভবত মৎসেন্দ্রনাথ কাটিয়ে ছিলেন কামরূপ অঞ্চলে।[৫৪] অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত-ও এই সময়কালকেই স্বীকার করেছেন।[৫৫] কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কৌলমার্গ ভারতের অত্যন্ত প্রভাবশালী সাধন পন্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রায় সব ধর্ম-সম্প্রদায়েই কৌলমার্গের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কৌল সাধনার নানা আঞ্চলিক ভেদ রয়েছে। কৌলমতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলে শিব এবং শক্তির অদ্বয়-অস্তিত্বের স্বীকৃতি। কৌলমার্গ পরাসম্বিতের কথা বলেছে। সাধনার দৃষ্টিতে কৌলমতের বড়ো ভাবে দুটিভাগ- পূর্ব কৌল (প্রাচীন কৌলমত, এর তিনটি ভাগ- মূলাধারনিষ্ঠা, স্বাধিষ্ঠাননিষ্ঠা, উভয়নিষ্ঠা) এবং উত্তর কৌল (এই মতের চারটি শাখা- মাতঙ্গী, বারাহি, কৌলমুখী, তন্ত্রনিষ্ঠা)।[৫৬] পূর্বকৌলে শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য কিছুটা থাকলেও শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বের সমতা রক্ষিত হয়েছে। উত্তর কৌলে শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত এবং শিবতত্ত্ব নিষ্ক্রিয়।[৫৭] পূর্ব কৌলে পঞ্চ-ম কার মূলত সাংকেতিক, উত্তর কৌল বামচারকে স্বীকার করে। মৎসেন্দ্রনাথ

---

[৫৩] কবিরাজ, গোপীনাথ. *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত*. বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৯. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ২৭৫

[৫৪] Bagchi, Prabodh Chandra. *Kaulajnana-Nirnaya*. Calcutta: Metropolitan Printing and Publishing House. 1934. 1st Edition. pp. 32

[৫৫] দাসগুপ্ত, শশিভূষণ. মীননাথ. শ্রীভারতী. ৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা. ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

[৫৬] Sensharma, Debabrata. *Matsyendra Samhita*. Calcuuta: The Asiatic Society. 1994. 1st Edition. pp. 12

[৫৭] তদেব, পৃ. ১৪

যোগিনী কৌলমতের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত। কৌলমত অনুসারে গুরু এবং কৌলের শক্তিতে অবিশ্বাসী মানুষকে কৌলমতের শিক্ষা প্রদান করা অনুচিত। কৌলজ্ঞান ব্রহ্মা, বিষ্ণুর থেকেও শক্তিশালী বলে স্বীকৃত।[৫৮] বঙ্গদেশে কৌলমতের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। কৌলমতের তিনটি ভাব- পশুভাব, বীররভাব এবং দিব্যভাব এবং সাতটি আচার- বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার।[৫৯] সুতরাং কৌল সাধনার এই সাতটি আচার থেকে বোঝা যাচ্ছে কৌল-মত আসলে একটি সাধন-পদ্ধতি এবং সাধনার দর্শন। প্রসঙ্গত সাধক কমলাকান্ত রচিত কৌলমার্গ বিষয়ক গ্রন্থ *সাধকরঞ্জন*-এর কথা বলা যেতে পারে। কমলাকান্ত কালীসিদ্ধ ছিলেন, কৌলমার্গ বিষয়ক শাস্ত্র রচনা করেছিলেন এবং কমলাকন্তের দীক্ষা হয়েছিল বৈষ্ণবগুরুর থেকে। কমলাকন্তের কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীর সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে।[৬০] ফলে কৌলমার্গের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব এবং শাক্ত একটি আচার হিসাবে বিবেচিত হয়, মূল দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে আচারের অনিবার্যত বিরোধ নেই। বঙ্গদেশে কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই আচার্য শংকর তাঁর দিগ্বিজয়ে বঙ্গদেশের কৌল সাধক ব্রহ্মানন্দের কাছে পরাজিত হন এবং বঙ্গদেশে শংকরাচার্যের মঠ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন-এই কিংবদন্তীটি সুপরিচিত।[৬১] কৌল সাধনার মৎসেন্দ্রনাথ এবং নাথ ধর্মের গোরক্ষনাথের গুরু মৎসেন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব ঐতিহাসিক দৃষ্টির সঙ্গে দার্শনিক মতের যথেষ্ট অসামঞ্জস্য রয়েছে। উক্ত দুজন মৎসেন্দ্রনাথকে একই ব্যক্তি মনে করা তখনই সম্ভব যদি আমরা নাথ ধর্মকে পূর্ব কৌল শাখার অন্তর্গত বলে বিবেচনা করি, যেখানে শিবতত্ত্বের প্রাধান্য রয়েছে, এবং পূর্ব কৌলের সাধক মৎসেন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে পূর্ব কৌল ত্যাগ করে (বলা উচিত পূর্ব কৌলকে অতিক্রম

---

[৫৮] Mukhopadhyay, Satkari. *The Kaulajnananirnaya*. New Delhi: Aditya Prakashan. 2012. 1st Publication. p. 193

[৫৯] বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র. *কৌলমার্গ সাধনরহস্য.* কলকাতা: প্রাচী পাবলিকেশন্স্. ২০১৮. পৃ. ৩৩

[৬০] রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন এবং অটলবিহারী ঘোষ. *সাধক-রঞ্জন.* কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. আট আনা

[৬১] সরস্বতী, সচ্চিদানন্দ. *গুরু-প্রদীপ.* কলকাতা: নবভারত. ১৪২২. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ০৫

করে) উত্তর কৌলে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ একই ব্যক্তির দুটি দার্শনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দু'টি সহজসিদ্ধি ধারার বিকাশ হয়েছে বলে ভাবা যেতে পারে। তবে একথা অনস্বীকার্য *কৌলজ্ঞাননির্ণয়* এবং *গোর্খ-বিজয়*-এ বর্ণিত দার্শনিক উপলব্ধি এতটাই পৃথক যে একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুটি মতের প্রবর্তন করা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক সব সময়ে থাকবে। নাথধর্মের মৎসেন্দ্রনাথ হঠ যোগের প্রবর্তক বলে পরিচিত। চর্যাকার লুই পা-র মতের থেকে হঠযোগের পার্থক্য খেয়াল করার মতো। লুই-এর সাধনায় ভ্রু-যুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গম স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ বেষ্টিত ত্রিকোণ মণ্ডল মধ্যে নিজ গুরুর ধ্যান করতে হয়। নাথেরা আজ্ঞাচক্রে নাদ বিন্দুর ধ্যান করেন, জ্যোতির্ময় বিন্দুর ধ্যান করে কর্ণে নাদ শ্রবণ করাই নাথেদের প্রথম লক্ষ্য।[৬২] সুতরাং চর্যাকার লুই পা এবং নাথগুরু মীননাথের মধ্যে দার্শনিক পার্থক্য আছে। আবার নাথধর্মের শাস্ত্র *গোরক্ষ সংহিতা* এবং মৎসেন্দ্রনাথের *কৌলজ্ঞাননির্ণয়*-এর মতের মধ্যেও মতের মিল নেই। কৌলরা যোগ এবং ভোগের মধ্যে সমতা তৈরির চেষ্টা করেন।[৬৩] নাথধর্ম শৈবমতের আটটি সাধন পদ্ধতির মধ্যে সিদ্ধান্ত ধারার অনুসারী, আবার নাথ ঐতিহ্য অনুযায়ী শিব নিজেই একজন নাথযোগী। নাদ সাধনার বৈশিষ্ট্য নাথ ধর্মে দেখা যায়। নাথ সাধনায় সাধক নানা শব্দ শুনতে পাবেন, সাধনার স্তরের ক্রমোন্নতির সঙ্গে নাদধ্বনি পরিবর্তিত হবে। সাধনার সূচনায় বিভিন্ন প্রকারের শব্দ শোনা যাবে এবং শব্দ হবে প্রবল। ক্রমে নাদ সূক্ষ্ম এবং মধুর ধ্বনিতে পরিণত হবে। প্রথমে মেঘ এবং সমুদ্রের প্রবল শব্দ শোনা যাবে। তারপর শোনা যাবে শঙ্খ, ঘন্টা ইত্যাদির ধ্বনি। এরপরের স্তরে যোগী বাঁশি, বীণা, মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে পাবেন। শেষে যোগী 'অনাহতধ্বনি' অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম-কে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সমর্থ হবেন সমাধি লাভে।[৬৪]

---

[৬২] নাথ, রাজমোহন. *কদলী-রাজ্য.* গৌহাটি: ট্রায়ো স্টোর. ১৯৪১. প্রথম সং. পৃ. ১৫-১৬

[৬৩] তদেব, পৃ. ১৮-১৯

[৬৪] Bandyopadhyay, P.K. *Nath Cult and Mahanad: A Study in Syncretism*. Delhi: B. R Publishing. 1992. 1st Edition. pp. 38

নাথধর্মকে অবধূত-যোগী এবং কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়ের মিলিত পন্থা বলে অনেকে মনে করেছেন।[৬৫] বলা হয়েছে যোগী-গুরুরা অবধূতী মার্গের সাধক হলেন এবং কাপালিকেরা ভিক্ষুক এবং গৃহস্থে পরিণত হলেন। তবে এই সিদ্ধান্তের কোন দার্শনিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মৎসেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এবং গোরক্ষনাথ ব্যাখ্যাত এবং প্রবর্তিত নাথ সাধনা মূলত যোগ এবং ধ্যান কেন্দ্রিক। গোরক্ষনাথের মতে মানুষের দেহ শিব-শক্তির অপূর্ব নিজ-প্রকাশ; নিজস্ব দেহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই সাধকের উদ্দেশ্য। গোরক্ষনাথের মতে এই পদ্ধতি হল পিন্ড-বিচার।[৬৬] সুষুম্না কাণ্ডে অর্থাৎ ব্রহ্মমার্গে দেহের নয়টি চক্রের অবস্থান। *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি* অনুযায়ী এই নয়টি চক্র হল—ব্রহ্ম-চক্র, স্বাধিষ্ঠান-চক্র, নাভি-চক্র, হৃদয়-চক্র, কণ্ঠ-চক্র, তালু-চক্র, ভ্রু-চক্র, নির্বান-চক্র এবং আকাশ-চক্র।[৬৭] আবার *গোরক্ষ-শতক* মতে দেহস্থিত চক্রের সংখ্যা ছয়টি।[৬৮] নাথধর্মে গুরুর অবস্থান সাধ্য-সাধনে কেমন ছিল তা বোঝা যায় *শিষ্যগুরু-সংবাদ* নামক গ্রন্থ থেকে। গুরু মৎসেন্দ্রকে শিষ্য গোরক্ষ প্রশ্ন করেন, এবং গুরু তার উত্তর প্রদান করছেন- "শ্রীগোরক্ষ- ওঁ স্বামী- কোন মূল কোন মেলা, কোন্ গুরু কোন্ চেলা।/ কোন তত্ত্ব লয়ে করে গুরু গোঁসাই ফিরে একেলা।। শ্রীমচ্ছন্দ- শুন সুবর্ণনাথ- মন মূল পবন মেলা, শব্দ গুরু শ্রুতি চেলা।/ নির্ব্বান তত্ত্ব লয়ে গুরু গোঁসাই ফিরে একেলা।।"[৬৯] সুতরাং সাধনায় গুরুর মূল অবস্থান শিষ্যকে শব্দব্রহ্মের সাক্ষাতে সাহায্য করা। শব্দ তথা নাদধ্বনি শ্রবণে শিষ্যকে সাহায্য করাই গুরুর মূল কাজ। নাথধর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মরণশীল দেহকে মৃত্যুঞ্জয় শিবতনু বা বৈষ্ণব তনুতে পরিণত করা এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরামুক্তিতে পরিচালিত করা। পরোপকার নাথধর্মের

---

[৬৫] সেন, সুকুমার. *প্রবন্ধ সংকলন* (১). কলকাতা: আনন্দ. ২০১৪. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৪৫৫

[৬৬] Banerjea, Akshaya Kumar. *Philosophy of Gorakhanath*. Delhi: MLBD. 2017. 6th Reprint. p. 169

[৬৭] তদেব, পৃ. ১৭৩-১৮০

[৬৮] তদেব, পৃ. ১৮১

[৬৯] নাথ, রাজমোহন. *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন-পুঁথি.* কলিকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলিনী. ১৯৬৮ খ্রি. প্রথম সং. পৃ. ২০২

অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাই সকল ধর্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরাই সিদ্ধদের কৃপা লাভ করেন। একারণেই নাথসিদ্ধরা শ্রেষ্ঠগুরু।[৭০]

এবারে আমরা বাংলা নাথ সাহিত্যে গুরুর অবস্থান প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করব। সরাসরি নাথ সাহিত্যে প্রবেশের পূর্বে হলায়ুধ মিশ্র রচিত *সেকশুভোদয়া* গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বর্ণিত একজন সিদ্ধযোগির কথা বলা দরকার। জালালুদ্দিন তাব্রিজি এই সিদ্ধ পুরুষকে দেখে ছিলেন যিনি বয়সে বেশি বৃদ্ধ ছিলেন না আবার যুবকও ছিলেন না, তার আদেশেই জালালুদ্দিন মুসলিম বিদ্বেষী লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে এসে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[৭১] সুতরাং খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকেই বঙ্গদেশে যোগিদের কথা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলা নাথ সাহিত্যের সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি রচনাকালের দিক থেকে খুব প্রাচীন না হলেও মূল ধর্মীয় তত্ত্ব বিশেষভাবেই প্রাচীন। প্রাচীনতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নাথধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক থাকলেও নাথদের সৃষ্টিতত্ত্ব বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত নয়, বৈদিক সাহিত্য তথা বুদ্ধ পূর্ববর্তী শ্রামণ্য মত থেকেই প্রাপ্ত।[৭২] মূলত পাঁচালিতে রচিত এই সাহিত্যিক নিদর্শনের প্রভাব বাংলা *শিবায়ন*-এর ধারায় এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। নাথধর্মের সাধনার সঙ্গে বঙ্গদেশের ধর্মঠাকুরের সাধনার মিল আছে। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার নাকোল, গোপীনাথপুর ইত্যাদি এলাকার ধর্মপূজকেরা নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত একটি ছড়ার সূত্রে জানা যায় ধর্মঠাকুরের বরে এক গোপকুমারীর গর্ভে গোরক্ষনাথের জন্ম হয়।[৭৩] নাথ সৃষ্টি তত্ত্বে আদি

[৭০] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা.* কলকাতা: ভারবি. ১৯৯৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৮৬

[৭১] Sen, Sukumar. *Sekasubhodaya of Halayudha Misra*. Kolkata: The Asiatic Society. 2002. Reprint. pp.178-179

[৭২] বড়ুয়া, বেণীমাধব. *"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা.* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২য় সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৩১ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৭৭

[৭৩] রায়, বসন্ত. *ময়নামতীর পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ.* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২য় সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৬০

পুরুষ অলেকনাথ, কিন্তু *হাড়মালা* নামক নাথশাস্ত্রে তিনি নিরঞ্জন গোঁসাই নামে পরিচিত।[৭৪] নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের আরেক নাম। আবার গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস কাহিনির বেশ কিছু অংশে মনসা মঙ্গলের প্রভাব দেখা যায়। যেমন চাঁদ সদাগর এবং ময়নামতী উভয়ের হাতেই দেখা যায় হেতালের লাঠি।[৭৫] নাথসাহিত্যের গোপীচন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিশচন্দ্র এবং মনসামঙ্গল-এর চাঁদ সদাগর অভিন্ন বলেও মনে করা হয়েছে।[৭৬] নাথ সাহিত্যের মধ্যে রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত গোপীচাঁদ-ময়নামতীর ছড়াটি বাদে কোন নাথ সাহিত্যই লোকসাহিত্যের পদবাচ্য নয়।[৭৭] রংপুর থেকেই প্রথম মানিকচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন গ্রীয়ার্সন পরে রংপুরের নীলফামারী মহকুমার থেকেই গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য।[৭৮] নাথ সাধনার কথা আমরা পাচ্ছি আলাওল-এর *পদ্মাবতী* কাব্যের 'যোগী খণ্ড'-এ পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা শুনে বিরহী রাজা রত্নসেনের যোগীবেশ ধারণ প্রসঙ্গে।[৭৯] যদিও এক্ষেত্রে রত্নসেনের যোগীবেশ ধারণের কারণটি কামজ প্রেরণাজাত। বাংলা নাথ সাহিত্যের আবার সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতের কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। *শ্রীনাথ মহা মেঘমালা* নামক সংস্কৃত কাব্যে মীননাথের কদলীরাজ্যে রাণী মঙ্গলার প্রেমে উন্মত্তাবস্থা লাভ এবং গোরক্ষনাথ কর্তৃক উদ্ধারের কাহিনি পাওয়া যাচ্ছে, *কদলী-মঞ্জু-নাথ মাহাত্ম্য* নামক সংস্কৃত কাব্য কর্ণাটকে আবিস্কৃত হয়েছে।[৮০] নাথ সাহিত্যে বর্ণিত কদলী রাজ্য মহীশূরের অন্তর্গত কর্ণাটকে ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে।[৮১] মহারাষ্ট্রের কবি

[৭৪] নাথ, রাজমোহন. নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২য় সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৩১ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৭৭

[৭৫] বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *উত্তরবঙ্গের অনক্ষর কৃষকের মৌখিক সাহিত্য- "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস".* বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (একাদশ সংখ্যা). কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০১. পৃ. ৬৭-৭১

[৭৬] শীল, শিবচন্দ্র. *চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র.* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৪র্থ সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩২৭ বঙ্গাব্দ. পৃ. ১৬৩- ১৭২

[৭৭] মুখোপাধ্যায়, সুখময়. *বাংলার নাথসাহিত্য-* সাহিত্যপ্রকাশিকা (১). শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী. [ ]. [ ]. পৃ. ১৫৭

[৭৮] সুফী, মোতাহার হোসেন. *বাংলা সাহিত্যে রঙ্গপুরের অবদান.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী. ২০০১. প্রথম প্রকাশ. পৃ.১১-১৩

[৭৯] মোহম্মদ আবদুল, কাইউম. *আলাওল রচনাবলী.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী. ২০০৭. প্রথম প্রকাশ. ৩১-৩২

[৮০] নাথ, রাজমোহন. *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন-পুঁথি.* কলিকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলিনী. ১৯৬৮ খ্রি. প্রথম সং. পৃ. ২৫৩-২৫৯

[৮১] তদেব, পৃ. ০৩

জ্ঞানদেব (জন্ম ১২৭৫ খ্রি.) রচিত *জ্ঞানেশ্বরী*-র অষ্টাদশ অধ্যায়ে মৎসেন্দ্রনাথ কর্তৃক গোরক্ষনাথকে জ্ঞানরহস্য প্রদানের আখ্যান পাচ্ছি।[৮২] বাংলা নাথসাহিত্যের মূল কাহিনি দুটি- গুরু মৎসেন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি গুরু হাড়ি সিদ্ধা বা জলন্ধরী পা, রাণী ময়নামতী এবং গোপীচন্দ্রকেন্দ্রিক। এই দুটি আখ্যান দুজন আলাদা গুরুর পরম্পরা কেন্দ্রিক হলেও *গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ* নামক শাস্ত্রের প্রথম বন্দনা শ্লোকে- "শ্রীজলন্ধরনাথায় নমঃ" ।[৮৩] সুতরাং গুরু পরম্পরা নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও সাধনস্তরে এদের কোন বিরোধ নেই। এর মধ্যে গোরক্ষনাথের কাহিনি প্রাচীন বলে পরিচিত, এই কাহিনি পাওয়া যাচ্ছে *গোর্খ-বিজয়* নামক কাব্যে, 'গোর্খ' শব্দটি এসেছে তিব্বতী 'কর্খ' শব্দটি থেকে যা আসলে শ্বাসনিয়ন্ত্রণের হ-ঠ পদ্ধতি।[৮৪] এই কাহিনির মূল আলোচ্য পথভ্রষ্ট গুরুর শিষ্য কর্তৃক মুক্তি লাভ। *গোপীচন্দ্রের গান*- এ আলোচ্য বিষয় ছিল রাণী ময়নামতীর নিজের পুত্র গোপীচন্দ্রকে দীর্ঘায়ু লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণে বাধ্য করা এবং গোপীচন্দ্রের হাড়ি সিদ্ধার থেকে মহাজ্ঞান অর্জন। এই আখ্যানেও গোপীচন্দ্র হীরা নটীর প্রলোভন দ্বারা সংযমের সাধনা থেকে চ্যুত হন এবং পরে মা ময়নামতী ও গুরুর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন।[৮৫] হিন্দু কবিদের পাশাপাশি মুসলিম কবিরাও গোপীচন্দ্রের গান রচনা করেছিলেন, শুকুর মাহ্‌মুদ ইত্যাদি মুসলিম কবিদের নাথ সাহিত্য বিষয়ক একাধিক রচনার কথা পাওয়া যাচ্ছে।[৮৬] এই দুইটি আখ্যানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল নারীভোগ থেকে মুক্তি লাভ এবং কাঙ্ক্ষিত অক্ষর দেহ লাভ। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ গুরু দ্বারা পরিচালিত হত, কেবল বঙ্গদেশেই নয় সারা ভারতবর্ষে এই সাধনার ধারা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। গোরক্ষপন্থী কানফট্

[৮২] সেন, গিরীশচন্দ্র. *জ্ঞানেশ্বরী*. নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ১৯৯৯. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ৬৬৭

[৮৩] Kaviraj, Gopinath. *The Gorakshasidhantasangraha*. Benaras: Published by Jaikrishna Dasgupta. 1925. 1st Edition. p. 01

[৮৪] মণ্ডল, পঞ্চানন. *গোর্খ-বিজয়*. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ. ১৪০৪. ২য় সংস্করণ. পৃ. ০১

[৮৫] ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ. *গোপীচন্দ্রের গান*. কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৯. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ২৪৮-২৪৯

[৮৬] আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া. *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*. ঢাকা: বাংলা একাডেমী. ১৯৭১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৯২

যোগীদের তীর্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তৃত, যেমন- প্রয়াগ, কাশী, অযোধ্যা, ত্রৈম্বক, দ্বারকা, হরিদ্বার, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, বৃন্দাবন, পুষ্কর, রামেশ্বর, দার্জিলিং, নেপাল, আসাম, অমরনাথ, হিংলাজ। সিকিমের কিছু বৌদ্ধমঠেও এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা তীর্থ করতে যান।[৮৭] সুতরাং নাথসাধনার সূত্রে গুরুবাদের হঠযোগ নির্ভর সাধনার একটি নির্দিষ্ট রূপ সমগ্র ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

৫.৩ গুরুবাদ ও সুফি এবং নির্গুণ সাধনধারা

খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে উত্তর ভারতের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল ইসলাম ধর্ম। শরিয়তী ইসলামের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সুফি মত ভারতবর্ষে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের বিরোধের কথা থাকলেও সমন্বয়ের আখ্যানও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের গবেষণা মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মকেন্দ্রিক হলেও আমরা সুফি সাধনার কথা আলোচনা করতে চাইছি কারণ ধর্ম-সংস্কৃতিতে কোন একটি ধারণা নির্মাণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রসঙ্গটি অবশ্যই দেখা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য চিন্তার সমন্বয়ের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন- বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে ইশ্‌মাইলী গুরুরা ধর্মপ্রচার করতেন, তাদের গুরু আগা খাঁ, কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত এরা মাধবজী, প্রেমজী, ফুলজী ইত্যাদি নাম ব্যবহার করতেন। কাশী প্রদেশের ভর্তরী যোগী গেরুয়া ধারণ করেন, হিন্দু আচার পালন করেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কীর্তন করা হয় কিন্তু তাদের গুরু মুসলমান।[৮৮] গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম শরিয়তী ইসলামে খলিফার অবস্থান নিয়ে। খলিফা ইসলামে একই সঙ্গে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের প্রধান। ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মের ধর্মগুরুদের

[৮৭] Brings, George Weston. *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*. Delhi: MLBD. 2016. 8th Reprint. p. 78

[৮৮] সেন, ক্ষিতিমোহন. *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-সাধনা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ. সংস্করণ. পৃ. ১৬-১৭

সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য, সহজিয়া বৌদ্ধ বা ইতিপূর্বে আলোচিত ধর্ম-দর্শনের ধর্মীয় নেতাদের পার্থক্য নিয়ে একটু কথা বলা যেতে পারে। শরিয়তী ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে একটি উচ্চাবচতার সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ মানুষের সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে খলিফা বা ভ্যাটিক্যানের পোপের সরাসরি সম্পর্ক থাকছে না কারণ এই ধর্মগুলি একটি ক্রমোচ্চ বিন্যাসে সাজানো। স্থানীয় মসজিদ বা চার্চের পাদ্রিরা অবশ্যই জন-সাধারণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা কেবল উপরতলার বেতনভূক ধর্মীয় কর্মচারী। খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিচালনা খুবই সুসংহতভাবে কাজ করে, প্রসঙ্গত বাংলার মেথোডিস্ট চার্চগুলির কথা বলা যেতে পারে। মেথোডিস্টদের কেন্দ্রীয়ভাবেই ভারত তথা বিশ্বের নানা দেশে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৮৯] মোটকথা ব্রাহ্মণ্য বা সহজিয়া মতের শিষ্যরা গুরুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, তাদের ধর্ম-জীবনের মূল সিদ্ধান্ত একজন গুরুর উপদেশ বা উপলব্ধিতে চালিত হয়, কোন কেন্দ্রীয়-নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় না। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্মগুলি সংঘকেন্দ্রিক হলেও, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে মূল পার্থক্য বোঝা যাবে গুরু প্রসঙ্গটি মাথায় রাখলেই। যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়-এর অজস্র শাখা সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হলেও শিষ্যদের দীক্ষাদানের একমাত্র অধিকার মঠের সভাপতি এবং সহ-সভাপতিরই আছে, আবার যিনিই দীক্ষা প্রদান করবেন তিনি কিন্তু সংঘের মূল আদর্শ থেকেই দীক্ষা দেবেন, ফলে সকলেই মঠের পরমগুরুর পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হবেন অর্থাৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই শিষ্য বলে বিবেচিত হবেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মে শিষ্য দীক্ষাগুরুর নামে পরিচিত হন, ধর্ম-দর্শনের নামটি এই পরিচয়ে গৌণ হয়, অন্যদিকে ইসলাম-খ্রিস্ট ধর্মে পরিচয়টি কিন্তু মূলত ধর্ম অথবা ধর্মীয় পথকেন্দ্রিক, গুরুকেন্দ্রিক নয়। কার হাতে একজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন, সেই ব্যক্তিটির ভূমিকা কিন্তু শুধুমাত্র একজন অনুষ্ঠান-সহকারী হিসাবেই বিবেচিত হবে। ধর্মীয়

---

[৮৯] Mitra, N. B. *Methodist in Bengal*. Durgapur: Diocese of Durgapur. 2011. Second Edition. pp. 29-30

শাস্ত্রগুলির কথাও এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে, ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধধর্ম (বিশেষত সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম) যে অর্থে শাস্ত্রমূলক, ইসলাম বা খ্রিস্ট-ধর্ম সে অর্থে শাস্ত্রমূলক নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মে শাস্ত্র কিছুদূর অবধি বহিরঙ্গ বিষয়, গুরু ব্যতীত কোন শাস্ত্র পাঠেই ফল লাভ হয় না তা শাস্ত্রগ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। থেরবাদে ত্রিপিটক-এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিনয় নিয়ম অনুশীলনে বা অভিধর্ম ব্যাখায় গুরু অনিবার্য, কৌল মত বা নাথ ধর্ম অথবা সহজ-সিদ্ধির অন্তর্গত যেকোন ধারাতেই গুরুর স্বাধীনতাই শেষ কথা, শাস্ত্রের উপরে এখানে গুরুর অবস্থান। ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে খলিফা বা পোপ কখনোই শাস্ত্রের উপরে যেতে পারেন না। তবে এই ব্যাখ্যাটি একটি আদর্শতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলের সাপেক্ষে বলার জন্য বলা হল। কারণ বাস্তবে ইসলামধর্মের চালচিত্রটিও পৃথক ছিল। কোরানের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের মান্য শাস্ত্র হাদিস, হাদিসের একাধিক পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। সব সময়ে হাদিস ও কোরানের মতামতে সামঞ্জস্য দেখাও যায় না। হাদিসের পাশাপাশি ইসলামি সমাজে কিছু কিছু দেশাচারের ব্যবহারও দেখা যায়।[৯০] ফলে তত্ত্বত ইসলাম এক গ্রন্থনির্ভর হলেও সামাজিক সত্যটি আলাদা। এখানেই সুফি মতের বিশেষত্ব, সুফি মতের সঙ্গে শরিয়তী ইসলামের আদর্শগত কিছু বিরোধ ছিল। সুফি মত কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে গুরুর অবদানকে ধর্মজীবনে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিচ্ছে। গুরুই সুফি-ধর্মের মূল নিয়ন্ত্রক। সুফিদের পীরের ধারণা এবং ভারতবর্ষের গুরু ধারণার সমন্বয়ে তাই গুরুবাদের একটি বিশিষ্ট রূপ তৈরি হয়েছিল 'মধ্যযুগ'-এর ভারতীয় সাধনায়। সুফিধর্মে গুরুবাদের পাশাপাশি আমরা উত্তর ভারতের দুজন নির্গুণ সাধক কবীর এবং দাদূ-কে নিয়েও কিছুটা আলোচনা করব। উত্তর ভারতের এই নির্গুণ ধারার সঙ্গে সুফি মতের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, আবার এই ধারা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। বঙ্গদেশের ধর্মাদর্শে সুফি এবং নির্গুণ সাধনাকে আমরা রাখতে চাইছি মূলত তিনটি কারণে—প্রথমত, সুফি মত এবং সুফি মতের গুরুবাদের একটি নিজস্ব চরিত্র

[৯০] সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *ইসলামধর্মের রূপরেখা.* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৫ বঙ্গাব্দ. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ৬৮

বঙ্গদেশে নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কবীর এবং দাদূ-র মতামত বঙ্গদেশের সাহিত্যে সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল। বঙ্গদেশের সামগ্রিক ধর্ম-দর্শনেও এই নির্গুণ সাধকদের প্রভাবের কারণে যুক্তিবিচারে একধরনের স্বাধীনতার অবকাশ রয়েছে, যে কারণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সনাতন মতালম্বীদের সঙ্গে বঙ্গদেশের সম্পর্ক ভালো নয়[৯১]; তৃতীয়ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সামাজিক প্রেক্ষিত বোঝার জন্যও সুফি এবং উত্তর ভারতের সন্ত পরম্পরার প্রেক্ষিতটি জানা জরুরি।

সুফি ধর্মের প্রাথমিক বিকাশ আরবে হয় এবং প্রথম থেকেই আচার সর্বস্বতার বিরোধের মধ্য দিয়ে সুফি ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। ভাবপ্রবণ ভক্তিবাদ সুফি মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুফি ধর্মে খলিফার গুরুত্ব নেই, আছে মুরশেদের প্রয়োজন। ভারতবর্ষে সুফি সাধকেরা প্রথম আসেন পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে। প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য সুফি সাধক ছিলেন মখদুম সৈয়দ অলি অল্-হুজুরী বা দাতা গঞ্জ বখ্ষ। লাহোরের ভাটি দরওয়াজার কাছে তার সমাধি স্থলে বহু ভক্ত সমাবেশ দেখা যায়, এই সাধকের সময়কাল ৪৬৫ হিজরাব্দ বা ১০৭২ খ্রিস্টাব্দ।[৯২] ভারতবর্ষে সুফিরা আসার সময় এবং তারপরে দীর্ঘদিন কালো পোশাক পরিধান করতেন, ক্রমে সুফিরা পাথরে ঘসা হিনার সোনালি রঙের কাপড় পরতেন।[৯৩] সুফিদের চারটি সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যাচ্ছে—চিশতি, কাদিরি, সুহরাবর্দি, নক্শ্বন্দি। বঙ্গদেশে সুফিদের মূলত চারটি ভাগ দেখা যায়—আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ।[৯৪] সুফিদের প্রাথমিক জীবন কাটে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। সুফি সাধকেরা চাইলে বিবাহ করতে পারেন, সুফিদের ধর্মচর্চার জন্য আশ্রম থাকে এবং দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে

---

[৯১] সেন, ক্ষিতিমোহন. *বাংলার সাধনা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩৫২ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪২

[৯২] সেন, ক্ষিতিমোহন. *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা.* কলকাতা: বঙ্গীয় কলা কেন্দ্র. ২০১০. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ০৪

[৯৩] ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ. *সূফী মতের উৎস সন্ধানে.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা. [ ]. [ ]. পৃ. ৪৫-৪৬

[৯৪] তদেব, পৃ. ৯১

চল্লিশ দিন চিল্লাখানায় বাস করে আত্মশুদ্ধি করতে হয়।[৯৫] শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে সুফি সাধকদের মতের মিল না থাকলেও খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক নাগাদ সনাতন পন্থী উলেমারা সুফিদের সঙ্গে এক প্রকারের সমঝোতায় বাধ্য হন। এর কারণ অবশ্য ছিল সুফিদের ভারতবর্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা। সুফিরা এই সমঝোতার পরে সাধারণভাবে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন আর উলেমারা মেনে নিয়েছিলেন সুফিদের পীর বা গুরুর প্রতি আত্ম নিবেদনকে। তবে প্রকাশ্যে আরাধ্যের উদ্দেশ্যে লেখা নিবেদিত প্রেমমূলক কাব্যপাঠ নিয়ে দ্বন্দ্ব মেটেনি। সুফি কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদন মূলক কবিতা। পাঞ্জাবের বিখ্যাত সুফি কবি বুল্লে শাহ (খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক)-র প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে মক্কা-মদীনার থেকেও উচ্চপদে স্থান দিয়েছেন।[৯৬] পদে সুফিদের মধ্যে গুরুবাদের প্রভাবে ক্রমে কয়েকটি গুরুপরম্পরা বা সিলসিলা গড়ে উঠে ছিল। ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মুলতান অঞ্চলে সুহরাবর্দি সিলসিলা এবং দিল্লি অঞ্চলে চিস্তি সিলসিলা সব থেকে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। চিস্তি সম্প্রদায়ের সব থেকে বিখ্যাত গুরু হলেন নিজামুদ্দিন।[৯৭] ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়র মুঘল আমলে ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁর বিবরণে দেখা যাচ্ছে সুফিদের চালচলনের সঙ্গে যোগিদের সাদৃশ্য ছিল। বার্ণিয়ার সুফি এবং যোগিদের মতবাদকে রহস্যবাদ বলছেন, কারণ এরা নিজেদের ধর্মের তত্ত্ব বাইরে প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না।[৯৮] সুফি সাধকদের যোগসাধনায় আগ্রহের আরও কিছু প্রমাণ আমরা পাচ্ছি—সুফি সাধক বাবা ফরিদ যোগী সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গে সাক্ষাতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। অল-বেরুণি সুফি এবং যোগধর্মের সমান্তরলতা প্রদর্শনের জন্য পতঞ্জলি-র *যোগসূত্র* অনুবাদ করেছিলেন। সুফি ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যার

[৯৫] তদেব, পৃ. ৫৬

[৯৬] Shackle, Christopher. *Blleh Shah Sufi Lyrics*. England: Harvard University Press. 2015. pp. 177-178

[৯৭] হাবিব, ইরফান. *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ.* নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট. ২০১০. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৫

[৯৮] ঘোষ, বিনয়. *বাদশাহী আমল.* কলকাতা: প্রকাশ ভবন. ২০১৮. ষষ্ঠ মুদ্রণ. পৃ. ১৮৩

জন্য তিনি সুফি মত এবং যোগ দর্শনকে পাশাপাশি রেখে পড়তে চেয়েছেন। অল-বেরুণির তাঁর বিবরণে সুফি ভক্তি বোঝানোর জন্য গীতার কথা বলছেন। এছাড়াও যোগ সাধনার একাধিক গ্রন্থ পার্সি-তে অনুবাদ হয়েছে। আবার শেখ আবদুল কুদ্দুস-এর *রুশদ-নামা*-য় আমরা গোরক্ষনাথ এবং কবীর-এর বচন সংগৃহীত হতে দেখেছি।[৯৯] ভারতবর্ষের প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বঙ্গদেশে যে লোকজ ইসলামের উৎপত্তি হয় তার মূল ভিত্তি ছিল পীরী-মুরীদী প্রথায় বিশ্বাস। বস্তুত পীর ইসলামধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে কখনো কখনো আল্লাহ-র বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। রোগ-ভোগ, অর্থনৈতিক-সামাজিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য সাধারণ মানুষ অনেক বেশি পীরের উপর নির্ভর করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। পীর ভাবনার প্রভাব অবশ্যই বঙ্গদেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। শরিয়তি ইসলাম কিন্তু পীর নির্ভরতাকে যথেষ্ট সমালোচনাই করেছে।[১০০] পীরভক্তিতে শিষ্যরা পীরের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতেন। প্রথমে শিষ্যরা পীরের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, এরপর শিষ্যরা গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করবেন, এবং গুরুর অনুমতিক্রমে তারা শিষ্যত্ব লাভে সমর্থ হন।[১০১] তবে মাথায় রাখতে হবে পীরভক্তির ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় আদান-প্রদানের এই প্রক্রিয়া, বিশেষত যোগ-সাধন এবং সুফি মতের সমন্বয়ের এই প্রবণতা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় দশম শতক নাগাদ, এই পদ্ধতি কার্যকর ছিল প্রায় উনিশ শতক অবধি। বঙ্গদেশের সাপেক্ষে সুফি মত এবং যোগ দর্শনের সমন্বয় প্রসঙ্গে আমরা কানু ফকির বা আলী রাজা-র *জ্ঞানসাগর* নামক গ্রন্থের কথা বলতে পারি। আলী রাজা চট্টগ্রামের মানুষ, তিনি গৃহাশ্রমে ছিলেন, সময়কাল খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক। সুফি-যোগ তত্ত্বের গ্রন্থ প্রণয়নের পাশাপাশি আলী রাজা বেশ কিছু বৈষ্ণব পদাবলিও লিখেছিলেন। আলী রাজার বর্ণনায় আমরা

---

[৯৯] Rizvi, S. R. R. *A History of Sufism in India*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. 1978. pp. 335-336

[১০০] হক, মুহম্মদ এনামুল. *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব*. কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক স্টোর. ২০১২. প্রথম সং. পৃ. ১৩৬

[১০১] Herklots, G. A. *Islam in India*. Delhi: Orient Books Reprint Corporation. 1972. 1st Edition. pp. 283-284

দেখব কীভাবে সুফি মতের একেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ এবং যোগধর্মের অদ্বৈতের ধারণা একই পর্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে—

কি বুজিয়া লোকে পুনি ভিন্ন ভিন্ন বোলে
দ্বিতীয় জে জানে সিদ্ধি নাহি যোগ মূলে।।
এক বিনু ত্রিলোক দ্বিতীয় না জানিব।
এক ভাব বিনু দ্বৈত ভাব না ভাবিব।।[১০২]

বাংলা সুফি তত্ত্বগ্রন্থে আমরা গুরুতত্ত্বের বিবরণ পাচ্ছি। ইসলামের সঙ্গে বিপ্রতীপ অবস্থানে গিয়ে সুফিধর্মে গুরুর বন্দনা এবং গুরুতত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা পাচ্ছি। শেখ চান্দ বিরচিত *তালিবনামা*-তে গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হল—

কাহার মুর্শিদ কেবা কি করে ভক্ষণ
পীরে বোলে শুন কহি তার বিবরণ।
তনের গুরু মন মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য শূন্যের গুরু নিরঞ্জন।[১০৩]

কাজী শেখ মনসুর *সিনামা*-য় পীরতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হল—

পীরে যে প্রচারি দিল গোপত বচন
তত্ত্ব হেন জানি মনে করিব যত্তন।
সেই কর্ম করিবেক এক মনে কায়
সেই পীর মুর্শিদ যে জানিব সদায়।[১০৪]

---

[১০২] সাহিত্যবিশারদ, আবদুল করিম. *জ্ঞানসাগর.* কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩২৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ১১
[১০৩] শরীফ, আহমদ. *বাঙলার সূফী সাহিত্য.* ঢাকা: সময় প্রকাশন. ১৯৬৯. পৃ. ৮১
[১০৪] তদেব, পৃ. ১৭১

কেবল তত্ত্ব ভাবনায় নয়, সুফি মতের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের দেব তত্ত্বের ভাবনাতেও সমন্বয়য়ের বর্ণনা পাচ্ছি, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল দেবতত্ত্বের উপরে গুরুতত্ত্বকে স্থান দেওয়া হয়েছে- "নিমাই-হজরত একে ভিন্ন ছবি, সাঁই একা একেশ্বর।/ কাহে হিন্দু কাহে মোছলমান মিলজল হও, মন, সাঁই-সেবনে।"[১০৫] পীর ভাবনার প্রসার বঙ্গদেশে সামাজিক এবং সাহিত্যিক দুই ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনেক পীরেদের আবার হিন্দু সংস্করণও নির্মিত হয়েছিল। যেমন—বন বিবি এবং বন দুর্গা, সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণ। কৃষ্ণহরি দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য-এর মত বর্ণ হিন্দুরাও সত্যপীরের মাহাত্ম্যমূলক আখ্যান লিখেছেন।[১০৬] পীরেদের মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকেন্দ্রিক, যেমন- আদম পীর, তিতুমীর, আবার কিছু পীর একেবারেই কাল্পনিক। তথাকথিত 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান'-এর অধিকাংশ কবিরা সুফি মতের সমর্থক ছিলেন। শাহ মুম্মদ সগীর বা দৌলত কাজী সুফি মতাবলম্বী। আলাওল জায়সীরের কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন, জায়সীর সুফী-দরবেশ ছিলেন, তিনি চিস্তি সম্প্রদায়ের অনুসরণ করতেন, জায়সীরের দীক্ষাগুরু ছিলেন সৈয়দ আশরফ জাহাঙ্গীর এবং শিক্ষাগুরু ছিলেন মুহীউদ্দিন।[১০৭] বঙ্গদেশে চিস্তি সম্প্রদায়ের প্রসার ছিল, তা পান্ডুয়াতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে।[১০৮] আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বঙ্গদেশের সুফি মত প্রভাবিত লৌকিক ইসলামে গুরুবাদ বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্যই যোগ ধর্মের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের কারণে সুফি সাধন তত্ত্বে গুরু বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছেন। ভারতবর্ষের ইসলামীভবনের ক্ষেত্রে সুফিরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সামাজিক জীবনে পীরেদের বিশেষ ভূমিকা ছিল, রোজকার জীবনের সঙ্গে পীর-

---

[১০৫] ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন. *বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮৪. প্রথম সং. পৃ. ১২৮

[১০৬] দাস, গিরীন্দ্রনাথ. *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা. ১৯৯৮. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ৩৩২-৩৩৩

[১০৭] আহমদ, ওয়াকিল. *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান.* ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি. ২০১২. নবম সংস্করণ. পৃ. ৮২-৮৩

[১০৮] Karim, Abdul. *Social History of the Muslims in Bengal*. Dhaka: Jatiya Grantha Prakashan. 2001. 3rd Edition. pp. 161-162

ফকিররা যুক্ত ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ, লিঙ্গায়েৎ, নাথ ধর্মের মতই বঙ্গদেশের ইসলামে গুরু একই সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

এবার উত্তর-পূর্ব ভারতের নির্গুণ-ভক্তির ধারায় গুরু প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়োজন। নির্গুণ ভক্তিতে উপাস্য-কে গুণাতীত বলে মনে করা হয়। কবীর এবং দাদূ উভয়ের পদেই তাই 'রাম'-এর কথা পাওয়া গেলেও এই রাম পৌরাণিক রাম নয়, নির্গুণ রাম। উত্তর ভারতের সন্তকবিদের প্রভাব বঙ্গদেশেও কার্যকর হয়েছিল। সন্ত কবিদের প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন তারা কেবল পদাবলিই রচনা করেননি। ভক্তি কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ভক্তি কবিতার সংকলন। শিখদের প্রধান গ্রন্থ *গুরুগ্রন্থসাহেব*-ও ভক্তি পদাবলিরই সংকলন। নির্গুণ সাধনার ধারার পূর্বসূত্র হিসাবে আমরা মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত দার্শনিক এবং পদকর্তা জ্ঞানদেব (সময়কাল খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক)-কে রাখতে পারি। জ্ঞানদেবের *অমৃতানুভব*-এ কাশ্মীরের শৈব প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা অনেকে বলেছেন।[১০৯] *অমৃতানুভব*-এর নানা সময়ে রচিত দশটি টীকা-ভাষ্যের কথা পাচ্ছি।[১১০] ফলে বোঝা যাচ্ছে জ্ঞানদেবের চিন্তা-ভাবনা মহারাষ্ট্রের ধর্মীয় ভাবনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। জ্ঞানদেবের শিষ্য তুকারামের কথাও এই সূত্রে উল্লেখ্য। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। মূলত সাধকদের তীর্থযাত্রার মাধ্যমে এবং দার্শনিক আলোচনা-সভার মাধ্যমে ধর্মীয় আদান-প্রদানগুলি চলত। কবীর এবং দাদূর সাধনার সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগও সেভাবেই। কবীর চৈতন্যদেবের প্রায় সমকালীন মানুষ ছিলেন। কবীরের সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য পরম্পরা, নাথ ধর্ম এবং বৈষ্ণব দর্শনের যোগাযোগের কথা পাওয়া যায়। প্রচলিত বিশ্বাসে কবীর নাথ ধর্মের দীক্ষা নিয়ে ছিলেন গোরক্ষনাথের থেকে, সুফি দীক্ষা নিয়েছিলেন শেখ তকী এবং বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়েছিলেন রামানন্দের

[১০৯] Chitre, Dilip. *Anubhavamrita*. New Delhi: Sahitya Akademi. 1996. 1st Edition. p. 09

[১১০] Bahirat, B.P. *The Philosophy of Jnanadeva*. Delhi: MLBD. 1998. Reprint. pp. 25-33

থেকে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এই তথ্যগুলির একটিও যথাযথ নয়। কবীরের সঙ্গে নাথ এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মতের যোগাযোগের কথা পাওয়া গেলেও কবীরের পদাবলিতে এই প্রত্যেকটি মতেরই কড়া সমালোচনা পাওয়া যাবে। কবীরের পদাবলিতে বাংলার বৈষ্ণব কীর্তনের প্রভাবের সম্ভাবনাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়।[১১১] ভারতবর্ষের ধর্ম-সাধনার প্রেক্ষিতে কবীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জাতি-বর্ণ প্রথার সমালোচনা, এমনকী কবীরের তাঁর পদে পীর-পয়গম্বর, কাজী-মোল্লা, রোজা-নামাজ, দ্বিজ, একাদশী, দীপাবলী- সবকটি ধর্মীয় পথকেই সাধনার পথে ভ্রান্ত বলেছেন।[১১২] কবীরের জীবন নিয়ে একাধিক চরিতগ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে একটিতে দেখতে পাচ্ছি কবীরের সঙ্গে গুরু গোরক্ষনাথের ধর্মদর্শন নিয়ে একটি বিতর্ক হয় এবং কবীর তাতে জয় লাভ করেন।[১১৩] *ভক্তমাল*-এ কবীরের শিষ্যদের মধ্যে কবীরের ধর্মমত নিয়ে বিতর্ক এবং মৃত্যুর পরে কবীরের দেহ ফুল এবং তুলসী পাতায় রূপান্তরিত হবার আখ্যানটি আছে।[১১৪] কবীরের প্রসঙ্গে প্রচলিত পরস্পর বিরোধী আখ্যান থেকে একটি বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় তা হল প্রচলিত ধর্ম-কাঠামোকে কবীর অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন (কবীর নির্দিষ্ট ধর্মপন্থা নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পরে কবীরপন্থায় কবীরকেই গুরু বলে বিবেচনা করা হতে থাকে। সুতরাং আমরা এতক্ষণ যে জাতীয় গুরুবাদের আলোচনা করেছি তত্ত্বগতভাবেই কবীরের গুরুবাদ তার থেকে পৃথক)। কিন্তু কবীরের পদাবলিতে আমরা গুরুর প্রতি নির্ভরতার কথা পাচ্ছি (যদিও এই গুরু কোন বিশেষ ব্যক্তি নাকি সাধকের অন্তস্থিত সত্তা, তা নিয়ে মতভেদ আছে)—

[১১১] চট্টোপাধ্যায়, সুধাকর. কবীর ও পূর্ব্বভারতীয় সাধনা. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (৬০ বর্ষ, ২ সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৯৬০. পৃ. ৫৩-৬০

[১১২] দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ. *কবীর.* নয়া দিল্লি: রাজকমল প্রকাশন. ২০০৪. নতুন সংস্করণ. পৃ. ১৪৫

[১১৩] Bhaghat, K. C. *Jivan Charitar of Sant Kabir*. Jammu: Mr. and Mrs. H.R. Bhagat. 2003. 1st Publication. pp. 105-106

[১১৪] বাবাজী, কৃষ্ণদাস. *শ্রীশ্রীভক্তমাল.* কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড. ১৪০৫ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃ. ১৭৫

গুরু বিন কৌন বতাবৈ বাট/ বড় বিকট জম ঘাট।// ভ্রান্তি কী পহড়ী নদিয়া বীচ মেঁ/ অহঙ্কার কী লাট// মদ মৎসর কা মেহা বরসত/ মায়া পবন বহৈ দাট।/ কহত কবীর সুনো ভাই সাধো/ ক্যোঁ তরনা য়হ ঘাট।[১১৫]

সাধনায় গুরুর অবদানের কথা ভারতবর্ষের ধর্ম-দর্শন অবশ্যই স্বীকার করবে, কবীরের রচনায় যে গুরুর কথা পাচ্ছি তিনি ধর্মপথের নির্দেশক হলেও ধর্মমতের ভিত্তিতে কোন মার্গ নির্মাতা নন। কবীর দীক্ষাদানেও বিশ্বাস করতেন না। কবীর পরবর্তী সময়ে যে কবীর পন্থের জন্ম তার প্রধান দুই শাখা- বাপ শাখা (মঠ কাশীতে), মাঈ শাখা (মঠ ছত্তিশগড়ের দামাখেরায়)। বাপ শাখাটি প্রাচীন, শাখার প্রতিষ্ঠাতা সুরতগোপাল দাস, এই শাখায় গুরুপদ বংশগত নয়। এই শাখায় কিছুদূর অবধি জাতিভেদ প্রথা মেনে চলা হয়। মাঈ শাখার প্রতিষ্ঠাতা ধরমদাস, এই শাখায় গুরু পরম্পরা বংশগত।[১১৬] অতএব কবীর গুরুপ্রথার সৃষ্টি না করলেও তার সরাসরি শিষ্যদের হাতেই গুরু-পরম্পরার জন্ম হয়েছিল। এথেকে বোঝা যায় কেবল মত-প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত ধর্মভাবনার উপরেই গুরুবাদ নির্ভর করে না, গুরুবাদের উপর শিষ্যমণ্ডলীর সরাসরি প্রভাব কাজ করে। কবীরের সঙ্গেই তার শিষ্য দাদূর কথা বলা যেতে পারে। দাদূ আকবরের সমসাময়িক সাধক। রাজস্থানের আজমীর এবং মাড়বার অঞ্চলে এই শাখার অনেক মানুষ থাকেন, নরৈনগ্রামে এই শাখার প্রধান ধর্মস্থান। দাদূ পেশায় ধুনকর বা মুচি ছিলেন। দাদূপন্থীরা তিলকসেবা ও মালা ধারণ করেন না। দাদূ কবীরের পুত্র এবং শিষ্য কমালের সঙ্গ লাভ করেন। কমালও গুরু সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন।[১১৭] *শ্রী দাদূচরিতামৃত*-এ দাদূ-র বয়ানে বলা হল- সদ্‌গুরুই তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন এবং সদ্‌গুরুই তাঁকে নির্গুণ সাধনার উপদেশ প্রদান করেছেন।[১১৮] দাদূও সম্প্রদায়কেন্দ্রিক গুরুর ধারণাকে অস্বীকার করছেন- “সেই গুরু সকল সম্প্রদায় ও দল,

---

[১১৫] বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *কবীর পদাবলী.* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স. ২০০৮. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৮৩

[১১৬] দাস, উপেন্দ্রকুমার. *ভক্ত কবীর.* কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি. ১৯৫৫. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১০৫-১১০

[১১৭] সেন, ক্ষিতিমোহন. *দাদূ.* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন. ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ০৩

[১১৮] স্বামী, নারায়ণদাস. *শ্রী দাদূচরিতামৃত.* জয়পুর: মন্ত্রী, স্বামী জয়রাম দাস স্মৃতিগ্রন্থমালা. ১৯৭৫. পৃ. ১৫৫

গুণ ও আকারের অতীত, তিনিই দাদূর গুরু।"[১১৯] দাদূপন্থীদের তিনটি প্রধান শাখা- বিরক্ত, এরা বিষয়শূন্য হয়ে পরমার্থ সাধনে কালক্ষেপ করেন, এদের সঙ্গে অঙ্গরক্ষিণী ও জলপাত্র থাকে, মস্তকে আবরণ থাকে না। দ্বিতীয় শাখা- নাগা, এরা অস্ত্রধারী এবং বেতন পেলে নাগারা যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করে। তৃতীয় শাখা- বিস্তরধারী, এরা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত।[১২০] বোঝা যাচ্ছে কবীরপন্থার মতই দাদূপন্থাতেও পরবর্তী সময়ে গুরুবাদের একধরনের বিকাশ হয়েছিল। বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গে নির্গুণ সন্তধারার পার্থক্য থাকলেও কবীর এবং দাদূ-র রচিত পদাবলি সাহিত্য বাংলা পদাবলি সাহিত্যে সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল। কবীরের রচনার প্রভাব দেখা যায় ষোড়শ শতকের পদকর্তা নরোত্তম আচার্য এবং সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তা নরোত্তম চক্রবর্তী-র পদগুলিতে।[১২১] নির্গুণ ভক্ত সম্প্রদায় নিয়ে আমাদের আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি করা যায় তা যথাক্রমে বলা যেতে পারে। প্রথমত, নির্গুণ সাধকদের অনেকেই সম্প্রদায়ে বিশ্বাস করতেন না, সুতরাং গুরুবাদের প্রচলিত ধারায় তাদের অনাস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, নিজেরা বিশ্বাস না করলেও প্রত্যেকেরই গুরু পরম্পরা পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, গুরুবাদকে স্বীকার না করলেও নির্গুণ সাধনায় গুরুকে স্বীকার করা থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষের সাধনার পথে গুরুকে বাদ দিয়ে ধর্ম-জীবন চলত না।

৫.৪ শংকরদেব এবং পঞ্চসখাদের সাধনায় গুরুবাদ

চৈতন্যদেবের সমসময়ে বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে যে ভক্তিধর্মের প্রসার দেখা গিয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে বঙ্গদেশের সংলগ্ন আসাম এবং উড়িষ্যা, পূর্বভারতের এই দুটি প্রদেশের কথা আলোচনার প্রয়োজন হয়। ভাষাবংশের দিক থেকে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া-র সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন।

---

[১১৯] সেন, ক্ষিতিমোহন. *দাদূ.* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন. ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৭

[১২০] বসু, নগেন্দ্রনাথ. *বিশ্বকোষ* (৮). দিল্লি: বি আর পাবলিশিং. ১৯৮৮. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৪৫৯

[১২১] মুখোপাধ্যায়, অণিমা. *সপ্তদশ শতাব্দে রাঢ়-দেশের সমাজ ও সাহিত্য-সমীক্ষা.* বিশ্বভারতী. ১৯৭৪ (অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ, তত্ত্বাবধায়ক- অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল)

উত্তর দিকে জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের সঙ্গে আসাম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জেলা মেদিনীপুরের সঙ্গে উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আজও দেখা যাবে। আসামের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ প্রথম থেকেই ছিল। জনজাতির দিক থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর, বিহারের পূর্ণিয়া এবং আসামের পশ্চিমাঞ্চলে মঙ্গোলীয় রক্তধারা থেকে উৎপন্ন নরগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন মীনহাজ তাঁর *তবকত-ই-নাসিরী* গ্রন্থে।[১২২] উড়িষ্যার সঙ্গে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় যোগাযোগ চৈতন্যদেবের সূত্রে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সাহিত্যিক যোগাযোগও বিশেষ ভাবে আলোচ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* বা বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির ওড়িয়া লিপিতে সংরক্ষিত পুথি থেকে এই যোগাযোগের কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একাধিক ওড়িয়া কবির রচিত বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির সন্ধান পাওয়া যায়, এই ধারায় উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন- অনন্তদাস (পঞ্চসখাদের অনন্তদাস নন), উদ্ভব দাস, কিশোরদাস, কুঞ্জানন্দ প্রভৃতি।[১২৩] সুতরাং বঙ্গদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিতে আসাম এবং উড়িষ্যার সরাসরি প্রভাব দেখা যাচ্ছে। আমরা মূলত আসাম এবং উড়িষ্যার বৈষ্ণব সংস্কৃতিতেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

আসামে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবেশ এবং পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের সূচনা হয়েছিল শংকরদেবের বহু পূর্বেই। আসামের বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল জনজাতির মানুষদের ব্রাহ্মণ্যধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই দিকটি বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য হলেও আমাদের আলোচনায় এই দিকটি সরাসরি আসছে না। তবে সামগ্রিক ধর্মীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যকরণের প্রচেষ্টার সরাসরি সম্পর্ক ছিল সেকথা আমরা স্মরণে রাখছি। আসামে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব বোঝা যায় আসামে বাল্মীকি *রামায়ণ*-এর অনুবাদের প্রাবল্য থেকে। আসামে

---

[১২২] দেব, রণজিৎ. *সাহিত্যের ইতিহাসে কোচ-রাজদরবার.* কলকাতা: তুহিনা প্রকাশনী. ২০১৮. চতুর্থ প্রকাশ. পৃ. ১২

[১২৩] রায়, মঞ্জুশ্রী. *ওড়িয়া লিপিতে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: প্যাপিরাস. ২০০৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৬-১৯

রামায়ণ-এর চার রকম প্রভেদের কথা বলা হয়- ১. পদ রামায়ণ, ২. কথা রামায়ণ, ৩. গীতি রামায়ণ, ৪. কীর্তনীয়া রামায়ণ।[১২৪] শংকরদেবের পূর্ববর্তী যুগে আসামে বাল্মীকি *রামায়ণের* অন্যতম অনুবাদক ছিলেন মাধব কন্দলী। মাধব কন্দলীর বাল্মীকি *রামায়ণ* অনুবাদ অসম্পূর্ণ ছিল। বলা হয়, শংকরদেব আদিকাণ্ড এবং শংকরদেবের শিষ্য মাধবদেব উত্তর কাণ্ডের অনুবাদ করে এই অনুবাদকর্ম শেষ করেন।[১২৫] মাধব কন্দলীর সময়কাল চতুর্দশ শতকের প্রথম-অর্ধ। বাল্মীকি *রামায়ণ*-এর তিনটি শাখার মধ্যে আসামের কবিরা গৌড়ীয় শাখা-কে অনুবাদের জন্য নির্বাচন করতেন।[১২৬] ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরবর্তী আলিপুখুরি গ্রামে একটি কায়স্থ পরিবারে শংকরদেবের জন্ম হয়, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন শাক্ত। শংকরদেব ছিলেন ধনুরাশি, দেবগণ, রোহিণী নক্ষত্র ও মহেন্দ্র যোগের জাতক।[১২৭] শিক্ষাগুরু মহেন্দ্র কন্দলীর পাঠশালায় কাব্য-দর্শন-ব্যাকরণে শিক্ষা লাভের পর শংকরদেব তাঁর পৈতৃক পেশায় (মূলত জমি রক্ষণাবেক্ষণ, কাছারিতে বসা ইত্যাদি) প্রবেশ করেন, কায়স্থ পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। শংকরদেবের প্রথম স্ত্রী-র নাম ছিল সূর্যবতী, শংকরদেবের কন্যা হরিপ্রিয়ার জন্মের অল্প পরেই সূর্যবতীর মৃত্যু হয়। ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে বত্রিশ বছর বয়সে মূলত বৈষ্ণব তীর্থগুলি পরিভ্রমণে যান। পুরীতে তিনি কিছু দিন কাটালেন। বলা হয় শংকরদেব প্রভু জগন্নাথকে নিজের গুরু হিসাবে নির্বাচন করেন।[১২৮] পুরীর সঙ্গে শংকরদেব কাশী, বদ্রিকাশ্রমেও তীর্থ করেন। তীর্থ থেকে ফিরে পিতামহীর অনুরোধে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কালিন্দী নামে এক কায়স্থকন্যাকে বিবাহ করেন। তাছাড়া সমসময়ে তিনি শিরোমণি- ভুঁইয়ার দায়িত্ব পালন করলেও শাস্ত্রের দিকেই তাঁর মন ছিল

---

[১২৪] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন. *অসমীয়া সাহিত্য.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩৫৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৮

[১২৫] তদেব, পৃ. ৩০

[১২৬] Deva Goswami, B. K. *A Critical Study of the Ramayana Tradition of Assam*. Calcutta: Puthi Pustak.1994. 1st Edition. p.169

[১২৭] ঘোষ চৌধুরী, বিজয় ভূষণ. শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৯০৭

[১২৮] Neog, Maheswar. *Sankardeva*. New Delhi: National Book Trust. 2005. Reprint. pp. 6-11

বেশি। এমন সময়ে ত্রিহুত নিবাসী জগদীশ মিশ্র নামে একজন সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের সঙ্গে শংকরদেবের সাক্ষাৎ হয়। জগদীশ মিশ্র *ভাগবত পুরাণ*-এর *ভাগবত-ভক্তি-রত্নাবলী* নামে একটি ভাষ্য লিখেছিলেন। এই ভাষ্যের উপর শ্রীধর স্বামী-র *ভাগবত* ব্যাখ্যার প্রভাব ছিল। জগদীশ মিশ্র-র থেকেই শংকরদেব একশরণ ধর্মের প্রেরণা লাভ করেন। একশরণ ধর্মের মূল প্রেরণা ছিল পৌরাণিক ধর্মাদর্শ থেকেই প্রাপ্ত। *ভাগবত পুরাণ* থেকে এসেছিল সৎসঙ্গ, নাম-এর ধারণা এসেছিল *পদ্ম-পুরাণ*-এর উত্তর কাণ্ড এবং একশরণ-এর ধারণা এসেছে *ভগবদ্গীতা* থেকে।[১২৯] পৌরাণিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত একশরণ এবং নিরাকার সগুণ উপাস্যের আরাধনা শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একশরণ মতের প্রেরণা থেকেই শংকরদেব চিহ্ন-যাত্রা নামে তাঁর প্রথম নাটকটি রচনা করেন। এই সময়ে শংকরদেবের সমকালীন বার-ভুঁঞয়াদের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক অশান্তির সূচনা হয়, শংকরদেব বিষয়টি মেটানোর চেষ্টা করতে থাকেন। ক্রমে কোচ এবং অহম রাজারা বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন শংকরদেবের থেকে। সুতরাং শংকরদেবের আসামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তনের এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজধর্মের অবদান সরাসরি দেখতে পাওয়া যায়। আসামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে শংকরদেব অত্যন্ত সুসংগঠকের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমেই বলতে হয় শংকরদেবের সত্র প্রতিষ্ঠার কথা। সত্রগুলি ছিল মঠের মত; নির্জন, শান্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সত্র শংকরদেব নিজে প্রতিষ্ঠা করেন তার পৈতৃক গ্রাম বড়দোবা গ্রামে। সত্রের প্রধান গৃহটি করপট, নামঘর, স্পণিকূট, হাতি এবং মহান্তের বাসগৃহ নিয়ে নির্মিত। নামঘরটি হল মূল উপাসনাগৃহ, যেখানে সিংহাসনের উপরে *শ্রীমদ্‌ভাগবত* গ্রন্থকেই মূলত পূজা করা হয়। তবে শংকরদেবের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত নামঘরে কৃষ্ণমূর্তি স্থাপিত হয়েছিল।[১৩০] সত্রগুলিতে নানা কাজের সঙ্গে একাধিক কর্মচারীরা যুক্ত থাকতেন। সত্রাধিকারীরা

---

[১২৯] তদেব, পৃ. ১২

[১৩০] ঘোষ, সতী. *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ১৯৮৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১১৭-১১৮

সত্র পরিচালনা করেন। মূলত সন্ন্যাসী হলেও কখনো কখনো তাঁরা গৃহীও হন। এছাড়া সত্রে থাকেন—ভাগবতী (ভাগবত ব্যাখ্যাকারী), পাঠক (ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী), দেউরী (মহাপ্রসাদ বিতরণকারী), ভাড়ালি (ভাঁড়ারের দায়িত্ব প্রাপ্ত), শ্রবণী (নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শোনেন), অঠপরিয় (সত্র পাহারা দেন, নামঘরে বাতি জ্বালান), হাতিমত (হাতিনিবাসী সন্ন্যাসীদের উপাসনা সভায় আহ্বান করেন), গায়েন-বায়েন (যারা সত্রে কীর্তন করেন)।[১৩১] সত্রে প্রার্থনার জন্য শংকরদেব ২৪০টি বরগীত (পদাবলী জাতীয় ছোট-বড় প্রার্থনার পদ, মূলত সত্রের কীর্তনে গাওয়া হয়) রচনা করেছিলেন, ব্রজবুলীতে। সম্ভবত বদ্রীকাশ্রমে তীর্থযাত্রার সময়েই শংকরদেব প্রথম বরগীত রচনা করেছিন।[১৩২] খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের আগে কোন সত্র পাথর বা ইঁটে তৈরি হয়নি, কাঠ, বাঁশ এবং খড় দিয়ে সত্রগুলি তৈরি করা হত। প্রাচীনকাল থেকেই নামঘরের কাঠের দেওয়ালে প্রাচীন কাব্য-শাস্ত্র থেকে নানা ছবি খোদাই করা হত।[১৩৩] কয়েকটি সত্রে শংকরদেব এবং মাধবদেবের দেহাবশেষ তথা অস্থির উপাসনা দেখা যায় বরপেটা, সুন্দরীদীয়া এবং পাটবাউসি সত্রে, এছাড়া গুরুদেব পদচিহ্নযুক্ত পদশিলায়, গুরুর পদ-ধূলার উপাসনার রীতিও প্রচলিত আছে।[১৩৪] নামঘরে গুরুর আসনের সামনে কীর্তনের রীতিও প্রচলিত আছে। শংকরদেবের রচনা থেকে গুরু ভক্তির কথা নানা ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। শংকরদেব রচিত *ভক্তি-রত্নাকর*-এর প্রথম অধ্যায়ের বিষয় গুরু। শংকরদেব তিন প্রকার গুরুর কথা বলছেন- জন্মদাতা গুরু, শিক্ষাদাতা গুরু এবং ব্রহ্ম-বিদ্যা তথা ভক্তি-জ্ঞানদাতা গুরু, এই গুরুর কৃপাতেই ভক্ত ভব-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন, গুরুই ব্রহ্ম-জ্ঞানী, গুরুই শিষ্যের একমাত্র আশ্রয়।[১৩৫]

---

[১৩১] তদেব, পৃ. ১১৯

[১৩২] Neog, M. The Bhakti Cycle of Assamese Lyrics: Bargits and After. Journal of the Srimanta Sankardev Sangha (vol-II). 1999

[১৩৩] Neog, M. *Sankardeva and His Times Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Assam*. Gauhati: LBS Publications. 2018. 2nd Edition. pp. 309-317

[১৩৪] তদেব, পৃ. ৩২২

[১৩৫] Neog, M. *The Bhakti-Ratakara of Sankardeva*. Punjab: Punjabi University Patiala. 1982. 1st Edition. p. 81

আসামের বৈষ্ণবতার ইতিহাসের অন্যতম উৎস ছিল বিভিন্ন গুরুদের নিয়ে রচিত চরিত সাহিত্য। প্রকৃতপক্ষে চরিত সাহিত্যের রচনা থেকে বোঝা সম্ভব গুরু, গুরুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং তাঁদের জীবন হয়ে উঠেছল ভক্তদের ধর্মচর্চারই একটি অংশ। এই প্রবণতা আমরা চৈতন্য-চরিত এবং পার্ষদ-চরিত গ্রন্থগুলিতেও দেখতে পাব। শংকরদেব এবং তাঁর পার্ষদের নিয়ে কয়েকটি চরিত-সাহিত্য হল- *কথা গুরু-চরিত*, রামচরণ ঠাকুরের *গুরু-চরিত্র*, ভূষণ দ্বিজের *শ্রীশ্রীশংকরদেব*, দৈত্যারি ঠাকুরের *গুরু-চরিত*, রামানন্দ দ্বিজের *গুরু-চরিত্র*। এই চরিতগুলিতে শংকরদেব, মাধবকন্দলী, মাধবদেব, অনন্তকন্দলী প্রভৃতি ধর্মীয় নেতৃত্ব সংক্রান্ত একাধিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।[১৩৬] অধিকাংশ চরিতেই 'গুরু' শব্দটির ব্যবহার থেকে বোঝা যাচ্ছে গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা আসামে ভালোভাবেই ছিল। মাজুলি দ্বীপে শংকরদেবের সূত্রে বৈষ্ণব সত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অহম রাজারা মাজুলিতে রাজত্ব করতেন এবং সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মাজুলিতে বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে তারা বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেন। মাজুলি ক্রমে সত্র এবং বৈষ্ণব গুরুদের সুবাদে বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রধান তীর্থ এবং 'এতক মহন্তর থান'-এ পরিণত হয়।[১৩৭] মাজুলি দ্বীপের অধিকাংশ মানুষেরাই বর্তমানে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, যারা বৈষ্ণবধর্মের লোক নয় তারাও পরোক্ষ ভাবে সত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।[১৩৮] শংকরদেবের শিষ্যদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাধবদেব, যিনি প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, পরে শংকরদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।[১৩৯] শংকরদেব জাতিপ্রথার বিরোধিতা বিশেষ করেন নি, তবে ভক্তদের প্রতি তিনি সাধারণ পরিচ্ছন্নতা এবং সদাচারের শিক্ষা প্রদান করতেন।[১৪০] শংকরদেবের বৈষ্ণবধর্ম

---

[১৩৬] Sarma, N. C. *The Vaisnavite Poets of North-Eastern India*. Calcutta: Puthi Pustak. 1991. 1st Edition. pp. 6-8

[১৩৭] Nath, D. *The Majuli Island Society, Economy and Culture*. Kolkata: Anshah Publishing House. 2003. 1st Edition. pp. 02-03

[১৩৮] তদেব, পৃ. ৯৩

[১৩৯] Bhattacharyya, N. N. *Medieval Bhakti Movements in India*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd. 1999. Reprint. p. 243

[১৪০] Neog, Maheswar. *Sankardeva*. New Delhi: National Book Trust. 2005. Reprint. pp. 39-40

মূলত ভাগবতীয় বৈষ্ণবধর্মের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল, ফলে গুরু সংক্রান্ত বিশ্বাসে আসামের বৈষ্ণবধর্ম বিশিষ্টতা লাভ করেছে সত্রকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তনের মাধ্যমে। মাধবদেব *নামঘোষা*-তে শংকরদেবকেই গুরু শ্রেষ্ঠ বলেছেন। সাধনায় গুরুর অবদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "হরি ভক্তি রাজমার্গে গুরু-পদ-নখ-চন্দ্র-প্রকাশিত! শ্রুতি জননীর পদ-পন্থ অনুসরণ করে আমরা আনন্দিত মনে ভ্রমণ করলে কদাচিৎও সেখান থেকে স্খলন হয় না- মহাজনগণ একথা জানবেন নিশ্চয়।"[১৪১] অর্থাৎ *ভাগবত-পুরাণ*-কে রেখে নামঘরে উপাসনা করা হলেও বা শংকরদেবের ধর্মভাবনা *ভাগবত-পুরাণ* কেন্দ্রিক হলেও শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য গুরুর ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে। শাস্ত্রকেন্দ্রিক বৈষ্ণবতার মধ্যেও গুরুরকে স্বীকার করাই একশরণ ধর্মের গুরুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের প্রভাবে পঞ্চসখা সম্প্রদায় নামে একটি ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। এই পঞ্চসখারা ছিলেন- অচ্যুতানন্দ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস এবং বলরাম দাস। পঞ্চসখাদের উপাস্য হল শ্রীকৃষ্ণের শূন্যমূর্তি।[১৪২] ভক্তিমার্গকে পঞ্চসখারা গ্রহণ করলেও তাঁদের মতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম এবং নাথপন্থের সরাসরি প্রভাব দেখা যায়। অচ্যুতানন্দ দাসের *শূন্যসংহিতা*-য় নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন, অসঙ্গ-এর যোগাচার, সৌত্রান্তিকদের মত এবং নাথপন্থা, উড়িষ্যার লোহিদাস এবং কপিলের প্রভাব স্পষ্ট।[১৪৩] বৌদ্ধপ্রভাবের জন্য পঞ্চসখাদের মধ্যে অচ্যুতানন্দকে বা বলরাম দাসের *ছত্তিশা* বা *গুপ্তগীতা*-কে নগেন্দ্রনাথ বসু মহিমা ধর্মের (আধুনিক বৌদ্ধধর্ম) গ্রন্থ বলেই নির্দিষ্ট করেছেন।[১৪৪] বৌদ্ধ প্রভাবের কারণে বা নাথ সাধনার সঙ্গে

---

[১৪১] শাসমল, সুভাষ. *নামঘোষা.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০১২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৮১

[১৪২] ঘোষ, সতী. *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ১৯৮৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৯৭

[১৪৩] Das, Paritosh. *Sahajiya Cult of Bengal and Pancha Sakha Cult of Orissa*. Calcutta: Firma KLM. 1988. 1st Edition. pp. 177-178

[১৪৪] Basu, Nagendranath. *The Modern Buddhism and its followers in Orissa*. Calcutta: Published by the author. 1911. pp. 160-161

যোগাযোগের কারণে পঞ্চসখাদের গুরু সংক্রান্ত মত বৌদ্ধ এবং নাথেদের গুরু সংক্রান্ত মনোভাবের সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অচ্যুতানন্দের *গুরুভক্তি-গীতা* থেকে বোঝা যায় পঞ্চসখারা ভববন্ধন থেকে মুক্তি, দেহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য গুরুকেই একমাত্র মাধ্যম বলে মনে করতেন।[১৪৫]

এই অবধি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় এবং বিভিন্ন প্রদেশভেদে গুরু সংক্রান্ত মনোভাব বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যোগ বা তন্ত্র নির্ভর সাধনার পাশাপাশি ভক্তিনির্ভর সাধনাতেও গুরু একই রকম গুরুত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরুবাদ কীভাবে প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করেছিল তা বোঝার চেষ্টা করব।

---

[১৪৫] Dei, Santilalta. *Vaishnavism in Orissa*. Calcutta: Punthi Pustak. 1988. 1st Edition. pp. 42-43

ষষ্ঠ অধ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে গুরু

৬.১ ভারতবর্ষে ভক্তিবাদের ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা

৬.২ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গুরু

৬.৩ বঙ্গদেশ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন: চৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতন্য পরবর্তী ধর্ম-সংগঠনে গুরু

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরু

চৈতন্যদেবের সমসময়ে সারা ভারতবর্ষের নির্বাচিত ভক্তিধারায় গুরুবাদ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এর মধ্যে আসামে শংকরদেব প্রবর্তিত ভক্তিমার্গ ব্যতীত প্রত্যেকটি ধারাই চরিত্রগতভাবে সগুণ ভক্তি সাধনার থেকে পৃথক। ভারতবর্ষে দ্বৈতবাদের ধারার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল আচার্য রামানুজের হাতে। দ্বৈতবাদে গুরুর স্থান বিশেষভাবে স্বীকৃত। আমরা এই অধ্যায়ে সরাসরি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে গুরুর ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করব। তত্ত্ব নির্মাণের পাশাপাশি গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুরা কীভাবে বৈষ্ণব সমাজকে প্রভাবিত করছেন সেবিষয়ে আমরা গবেষণাকর্মের ভূমিকাতেই কিছু কথা বলেছিলাম। এই অধ্যায়ে আমরা সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বর্তমান অধ্যায়ের তিনটি উপ-অধ্যায়ের প্রথমটিতে আমরা সগুণ ভক্তি সাধনার ধারার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার পারম্পর্য দেখানোর চেষ্টা করব। দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ের মূল আলোচ্য গৌরতত্ত্ব এবং গুরুতত্ত্বের সম্পর্ক। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গুরুর সাধন-ধারা বিষয়ে আলোচনা করব।

৬.১. ভারতবর্ষে ভক্তিবাদের ধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে চৈতন্যদেবের সঙ্গে উড়িষ্যার নৃপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের অমাত্য রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ এবং চৈতন্যদেবের সাধ্য-সাধন সংক্রান্ত আলোচনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (১৬১৫ খ্রি.)-এর মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে চৈতন্য-রায় রামানন্দ

সংবাদের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপুরের *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত* মহাকাব্যে। ‘সাধ্য’ বলতে বোঝায় অভীষ্ট অথবা লক্ষ্য, অর্থাৎ ধর্ম-সংস্কৃতিতে ‘সাধ্য’ বলতে বোঝাচ্ছে একজন ভক্ত কী কারণে সাধনা করবেন, আর সাধনার মূল লক্ষ্য কী। পাশাপাশি ‘সাধন’ হল সাধ্যে উপনীত হওয়ার পথ। যে কোনও ধর্মদর্শনের বৈশিষ্ট্য হল তার নিজস্ব সাধ্য-সাধন তত্ত্ব তৈরি করা। সাধ্য-সাধনের পার্থক্যেই একই দেবতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া দুটি ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে, আবার সেই বুদ্ধদেবকে নিয়েই খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। থেরবাদী এবং বজ্রযানী— দুটিই বৌদ্ধ ধর্মের শাখা হলেও এদের মধ্যে অজস্র পার্থক্য। সময়ের পাশাপাশি এই পার্থক্যের মূল কারণ হল সাধ্য-সাধনের ফারাক। থেরবাদীরা নির্বাণ লাভ করতে চায় আর বজ্রযানী বৌদ্ধরা পেতে চায় চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত ‘সহজ’। লক্ষ্য আলাদা বলেই এদের সাধনার পথও খুব স্বাভাবিক ভাবেই আলাদা। চৈতন্যদেব নিজে আটটি বৈষ্ণবীয় শিক্ষাপ্রদ শ্লোক ব্যতীত কিছুই রচনা করেননি। এই আটটি শ্লোকে বৈষ্ণবের আচরণীয় পথের পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় ভক্তির স্বরূপ বিষয়েও কথা রয়েছে। তবে যে কোনও ধর্মদর্শনই সাধ্য-সাধন তত্ত্ব ছাড়া প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। চৈতন্যদেব সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বিষয়ক কোনও দার্শনিক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা না করলেও নিজে সাধ্য-সাধন তত্ত্বটি নির্ণয় করেছিলেন। প্রশ্নোত্তর এবং সংলাপের মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্ব নির্মাণের প্রসঙ্গ ভারতীয় সাহিত্যে প্রচুর। *ভগবদগীতা*-য় কৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংলাপ [খ্রিস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী], খ্রিস্টীয় একশত অব্দে রাজা মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের প্রশ্ন-উত্তরকে কেন্দ্র করে *সুত্তপিটক*-এর অন্তর্গত *মিলিন্দপঞ্হ,* সর্বোপরি উমা-মহেশ্বরের প্রশ্নোত্তরের উপর ভিত্তি করে লিখিত তান্ত্রিক নিবন্ধ সাহিত্য— সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে নির্ণীত দার্শনিক তত্ত্বের কথা পাওয়া যায়। রায় রামানন্দ এবং চৈতন্যদেবের সংলাপও এই ধারারই

উত্তরাধিকার বহন করে। সাধ্য-সাধন নির্ণয়ের সময় রায় রামানন্দ একটি করে প্রস্তাব হিসাবে ‘সাধ্য’ বস্তুর কথা বলেছেন, চৈতন্যদেব সেটিকে নাকচ করতে করতে সংলাপটি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই সংলাপে সবশেষে বৈষ্ণবের সাধ্য হিসাবে প্রেমভক্তি এবং প্রেমভক্তির সর্বোচ্চ স্তর কান্তা প্রেম-ই মূল সাধ্যবস্তু রূপে স্থির হয়। এরপর প্রেমভক্তির উৎকর্ষের কথা বোঝাতে গিয়ে রায় রামানন্দ একটি শ্লোকের কথা বলেন, শ্লোকটি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই চৈতন্যদেব রায় রামানন্দের মুখ চেপে ধরেন।[১] প্রসঙ্গত বলা দরকার ব্রজবুলিতে রচিত পদটি রায় রামানন্দের নিজস্ব রচনা বলে মনে করা হলেও এবিষয়ে কিছু সংশয় রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমভক্তির তত্ত্ব যে সূক্ষ্মতায় উপনীত হয়েছে তা বোঝা যায়— অচিন্ত্যভেদাভেদ এবং প্রেমবিলাসবিবর্ত থেকে। বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষীয় ভক্তি সাধনার প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব নির্মাণের ইতিহাসটি পড়বার চেষ্টা করব। রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনায় চৈতন্যদেব ভক্তিসাধনার একটি বিশেষ রূপকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপজীব্য রূপে স্থির করছেন। রাধার কৃষ্ণ ভক্তির বৈশিষ্ট্য হল— ‘অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল’— প্রতিদিন এই কৃষ্ণানুরাগ বেড়েই চলেছে, কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ চলে যাওয়া তো দূরস্থান, প্রতিদিন আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও ক্রমবর্ধমান। অতএব কৃষ্ণানুরাগের ক্রমশ বৃদ্ধি, এমনকি পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে ততটা সময়ও কৃষ্ণের থেকে দূরত্বের যে বিরহ— এহেন কৃষ্ণ প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মূল সাধ্য। মনে রাখতে হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সাধ্য বস্তু এবং সাধন মার্গ দুটি হল ভক্তি। রাধা এবং গোপীগণ যে রকম নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণকে পেতে চান, ততটাই নিঃস্বার্থ ভক্তি করতে শেখাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সাধ্য। অর্থাৎ ভক্তিমার্গে, ভক্তির পথে গিয়ে ভক্তি করতে শেখা। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে ভক্তির প্রসঙ্গ

---

[১] শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০০৮. পৃ. ২৯২

বারংবার এসেছে। বর্তমান আলোচনায় বোঝার চেষ্টা করব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ভক্তির যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রেক্ষপটটি। এই আলোচনা তিনটি স্তরে ভেঙে করা সম্ভব। যদিও এই বিভাজনটি সম্পূর্ণ অবান্তর, বাইরে থেকে চাপানো। বাস্তবে এধরনের কোনও সীমারেখার কল্পনা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার্থে ভক্তি সাধনার তিনটি অভিমুখ কল্পিত হয়েছে—

১) ভক্তি দর্শনের বিবর্তন, ২) ভক্তিসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা এবং ৩) ভক্তিরসের বিবর্তন। 'ভক্তি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল √ভজ্+ক্তি। 'ভজ্' ধাতুর অর্থ ভজনা অথবা সেবা। সাধারণ ভাবে 'ভক্তি' বলতে বোঝায় পূজ্য ব্যক্তির ভজন। তবে ভক্তি শব্দটির অর্থ বিশ্বাস, ভালোবাসা, অনুরক্তি ইত্যাদিও হতে পারে। *শব্দকল্পদ্রুম* মতে—

> শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবং।
> অর্চ্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্মনিবেদনং।।[২]

অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্যভাব, সখ্যভাব, আত্মনিবেদন — এসবই ভক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যদিও আভিধানিক ভাবে 'ভক্তি' শব্দটি বিভাগ, অংশ, রচনা, গ্রন্থন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সামবেদের পাঁচটি ভাগের মধ্যে একটির নাম ভক্তি। ধর্মের ক্ষেত্রে 'ভক্তি' শব্দটি আত্মনিবেদন অর্থেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। আভিধানিক অর্থগুলিকে পর্যালোচনা করলে আমরা ভক্তির কয়েকটি প্রবণতাকে বুঝতে পারি। প্রথমত, ভক্তি করার জন্য একটি উপাস্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজন, যাকে ভক্তি করা হবে। দ্বিতীয়ত, ভক্তি ভক্ত ব্যতীত হতে পারে না। প্রসঙ্গত একটি কথা বলে নেওয়া দরকার, ভয়ের সঙ্গে ভক্তি করার একধরনের সম্পর্ক সহজেই আমাদের মনে আসতে পারে। কোনো একটি বিষয়ে অথবা কাউকে ভয় পাওয়ার সূত্রে সেই ভীতি মনে একধরনের আনুগত্য তৈরি করতে পারে, বাধ্যত সমর্পণের দরকার হতে পারে। কিন্তু

---

[২] দেব, রাধাকান্ত. *শব্দকল্পদ্রুম* (৪র্থ কাণ্ড). কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. ১৩৪৩. পৃ. ২৮৬১

এই প্রায়োজনিক সমঝোতা আর ধর্মসংস্কৃতিতে ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক। ভক্তির মধ্যে কোনো বাধ্যতা নেই, বিষয়টি এমন নয় যে প্রয়োজন মিটে গেলে ভক্তির আর প্রয়োজন হবে না। নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্ত সমর্পণকেই ভক্তি বলে। শরণাগতি ভক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারো শরণ গ্রহণ করা, নির্দ্বিধায় তাঁকে বিশ্বাস করা, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন'— এজাতীয় বাক্যে যাবতীয় পরিস্থিতিতে অবিচল থাকাকেই তথাকথিত বিশ্বাসে ভক্তি বলে। আর ভক্তির একটি তাত্ত্বিক কাঠামো রয়েছে। আপাতভাবে সকল প্রকার ভক্তিতেই যেহেতু সমর্পণ থাকে তাই যাবতীয় ক্ষেত্রে ভক্তির অর্থ একই বলে আমাদের মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কার প্রতি ভক্তি, 'ভক্তি' শব্দটা ঠিক কী অর্থে ব্যবহৃত হল, ভক্তির পথ কেমন এবং এক্ষেত্রে ভক্তির জন্য কী কী করণীয় এই দিকগুলি নিয়েই ভক্তি দর্শনের সূচনা। ভারতবর্ষে 'দর্শন' শব্দটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ করা; কীভাবে মানুষ তার জীবনের সত্যকে বুঝতে পারে, জন্ম এবং মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে সেই বিষয়ে উপদেশ দান করা। একারণেই ভারতীয় দর্শনে 'মত' এবং 'দর্শন' শব্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মত' বলতে বোঝায় কোনও বিষয়ের সত্যতা-অসত্যতা নিয়ে আলোচনা, অথচ দর্শনে অসত্য-সত্যের আলোচনা পাশাপাশি পরিত্রাণ লাভের কথা থাকবে।[৩] একারণেই 'ভক্তি' কেবল সাধনার পথ নয়, 'ভক্তি'-কে কেন্দ্র করে দর্শন প্রস্থানের জন্ম, ভক্তি মানুষের পরিত্রাণের পথ, ভক্তি একধরনের অধ্যাত্মবিদ্যা অথবা মোক্ষশাস্ত্র। 'ভক্তি' ধারণাটির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস খোঁজার জন্য আমরা আলোচনায় কয়েকটি উপবিভাগ করে নেব। এই উপবিভাগ মূলত সময়ের কথা মাথায় রেখেই করা হবে। ঐতিহাসিক ভাবে ভক্তি ধারণার বিবর্তন থেকে বোঝা যাবে 'ভক্তি' শব্দটির অর্থের ক্ষেত্রে সময়ের

---

[৩] দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ. *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. ১৩৪৩. পৃ. ৩-৪

সঙ্গে সঙ্গে একাধিক স্তর এসে যুক্ত হচ্ছে, শব্দটির অর্থ ব্যাপৃত হচ্ছে। এই আলোচনায় উপবিভাগগুলি হল—

১. বৈদিক এবং উপনিষদ্ সাহিত্যে ভক্তি

২. ভাগবত ধর্ম এবং ভক্তি

৩. ভাগবত তথা পৌরাণিক সংস্কৃতিতে ভক্তি

৪. অদ্বৈত এবং বৈষ্ণব বেদান্ত: প্রসঙ্গ ভক্তি

৫. গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভক্তি

বৈদিক এবং উপনিষদ্ সাহিত্যে ভক্তি

বৈদিক সাহিত্যকে দেওয়া এবং নেওয়ার ধর্ম বলে মনে করা হয়। বৈদিক ঋষিরা ইন্দ্র-বরুণ প্রমুখ বৈদিক দেবতার কাছে বৃষ্টি, শস্য, সুরক্ষা প্রভৃতি নানারকমের পার্থিব বিষয় চাইতেন, এছাড়াও পুত্র কামনায় ব্যয় সাপেক্ষ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হত। বিপুল আয়োজন এবং বিলাসবাহুল্যের কারণেই বৈদিক ধর্মকে চাওয়া-পাওয়া কেন্দ্রিক ধর্ম বলে মনে করার সুযোগ থাকে। কিন্তু *ঋগ্বেদ*-এর 'সংহিতা' অংশে আমরা ভক্তি ধারণার বীজ পাচ্ছি। আগেই বলা হয়েছে চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক নেই। বেদের ভাষায় 'ভক্তি' শব্দটির অর্থ হল— দেবতা আধারের (এক্ষেত্রে ভক্তের) সমস্ত জড় বাধা ভেঙে অন্তরে প্রবেশ করেন। এরই নাম হল ভক্তি। আর দেবতা প্রবেশ করেন বলেই ভক্তের মধ্যে একধরনের দিব্যভাব সৃষ্টি হয়।[৪] একারণেই ঋষি বশিষ্ঠ অথবা মহর্ষি দীর্ঘতপার আকুতি ভগের অনুরোধে ভগবান হওয়ার। 'ভগ' অর্থাৎ যা ভেঙে দেয়; দেবতা জড়

[৪] বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল. *ঋগ্বেদে ভক্তিসাধনা.* কলকাতা: সোমলতা. ২০১৬. পৃ. ১৯

বাধা ভেঙে দেবেন এবং প্রবেশ করবেন ভক্তের শরীরে, এই দিব্য আবেশে ভক্ত হবেন 'ভগবান'। দেখা যাচ্ছে বর্তমানে আমরা যে অর্থে ভগবান শব্দটিকে ব্যবহার করি বৈদিক সাহিত্যে 'ভগবান' বলতে সেই অর্থটি প্রাধান্য পায়নি, বরং 'ভগবান' বলতে ভক্তকেই বোঝানো হয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এর নবম মণ্ডলটিকে সোম মণ্ডল বলা হয়। এই সোম মণ্ডলে ভক্তিমার্গের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। এছাড়াও সপ্তম মণ্ডলের ৮৬, ৮৮, ৮৯ এবং দশম মণ্ডলের ২২-২৪ সংখ্যক সূক্তগুলিতে ভক্তি সাধনার উৎস পাওয়া যায়। সপ্তম মণ্ডলের ৮৬ সংখ্যক শ্লোকে ঋষি মৈত্রাবরুণি বিশিষ্ট দেবতা বরুণের কাছে প্রার্থনা করেছেন। এতে ভক্তের আকুতি, আত্মনিবেদন, দৈন্য, আকুলতা, শরণাগতির কথা রয়েছে। এছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরা যে পাঁচ প্রকার ভক্তির কথা বলে তার সব কটির পূর্বসূত্রই ঋগ্বেদে পাওয়া সম্ভব।[৫] যেমন—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে রস	বৈদিক পূর্বসূত্র
শান্ত	সপ্তম মণ্ডলে ঋষি বশিষ্ঠের ইষ্টদেবতা বরুণের নিকট প্রার্থনা।
দাস্য	সপ্তম মণ্ডলেই ভক্ত ঋষি বশিষ্ঠ নিজের পাপের কথা স্বীকার করেছেন। এখানে শরণাগতি এবং দেবতার প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাসের কথা পাওয়া যাচ্ছে।
সখ্য	ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৮৮ নং সূক্তে ঋষি বশিষ্ঠের সঙ্গে দেবতা বরুণের মধুর সখ্যলীলার ইঙ্গিত

[৫] তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬

	রয়েছে। সকল সিদ্ধ ঋষিকেই ইন্দ্রসূক্তে সখা বলা হয়েছে।
বাৎসল্য	ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে ইন্দ্রের প্রতি বাৎসল্য পূর্ণ সম্ভাষণ দেখা যাচ্ছে।
মধুর	ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ইন্দ্রসূক্তে শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ স্পষ্ট। এছাড়াও নবম মণ্ডলের 'পবমান সোম' সূক্তে রাগানুগা ভক্তির পরিচয় পাই।

ঋগ্বৈদিক উৎস থেকে বোঝা যাচ্ছে ভক্তি ধারণাটি ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন। তবে যেহেতু ভক্তি-ধর্মের উৎস *ঋগ্বেদ*-এর তৃতীয়, সপ্তম এবং নবম মণ্ডলে রয়েছে তাই বিষয়টি আর-এক ভাবে বিবেচিত হতে পারে। ঋগ্বেদের সব কয়টি মণ্ডল একই সময়ে লেখা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন না।[৬] তাঁদের মতে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ হল দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল। বাকি মণ্ডলগুলি উপনিষদ্ রচনার সমসময়ে অথবা কিঞ্চিৎ পূর্বে রচিত হয় এবং *ঋগ্বেদ*-এ প্রক্ষিপ্ত হয়। ভক্তি ধর্মের কথা আমরা তৃতীয় এবং সপ্তম মণ্ডলে বিস্তারিত ভাবে পাচ্ছি। অতএব ঐতিহাসিক বিচারেও ভক্তি ধারণাটি *ঋগ্বেদ*-এ প্রক্ষিপ্ত বলা সম্ভব হবে না। তবে *ঋগ্বেদ*-এর সূক্তে ভক্তি সাধনার বীজ ছিল, এমনকি *ঋগ্বেদ*-এর আচার-অনুষ্ঠানের রূপকে অধ্যাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বৈদিক সাহিত্যে যথেষ্ট। উপনিষদ্ থেকেই পারিভাষিক অর্থে দর্শনের সূচনা বলে দার্শনিকরা মনে করেন। ভক্তি প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বিবেচিত হবে— শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, কৃষ্ণযর্জুবেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। এর মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

[৬] Chakrabarti, Ranabir. *Exploring Early India*. Delhi: Primus Book. 2007. p. 193

ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে— ব্রহ্মলোক-ই জীবের পরম গতি।[৭] অবিদ্যার কারণে জীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে মনে করে। অথচ ব্রহ্মের ব্রহ্মলোকই জীবের পরম গতি। আবার *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*-এর ব্রহ্মানন্দ বল্লীর সপ্তম অনুবাকে ব্রহ্ম থেকে জগৎ সৃষ্টির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।[৮] ব্রহ্ম পূর্বে 'অসদ্' রূপে ছিলেন, তিনি নিজে থেকে নিজেকে সদ্ ব্রহ্ম রূপে তৈরি করলেন। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*-এ আমরা সরাসরি 'ভক্তি' শব্দটি পাচ্ছি। তবে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*-কে প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। *শ্বেতাশ্বতর* অবশ্যই পাণিনির পরবর্তী। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-তে বাসুদেব এবং অর্জুনের উপাসক অর্থে ভক্তি এবং ভক্তের উল্লেখ রয়েছে। *অষ্টাধ্যায়ী*-র সময়কাল খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক। এরপরে রচিত *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* পাচ্ছি—

যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্য এতে কথিতাঃ হি অর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।[৯]

যাঁর পরমেশ্বরের প্রতি পরমা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, আর গুরুর প্রতিও ভক্তি আছে তেমন মহাত্মাদের নিকটই উপনিষদে কথিত এই সমস্ত বিদ্যা প্রকাশ পায়, অনুভবগম্য হয়। উপনিষদের এই তিনটি প্রসঙ্গ থেকে ভক্তি ধারণার একটি বিবর্তন চোখে পড়ে। ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতার কথা বলছে *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* । জীব অবিদ্যার পাশ থেকে মুক্ত হলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝতে পারে। ব্রহ্মাস্বাদ থেকেই জীব আনন্দ লাভ করে। এখানে ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে উপাস্য-ভক্তের সম্পর্ক থাকলেও ব্রহ্ম এতই ব্যাপক একটি অস্তিত্ব, যে তাঁর প্রতি আকর্ষণ, আনুগত্য, নিবেদন থাকবে। ওই সুবিশাল ঐশ্বর্যকে শ্রদ্ধা করা সম্ভব, একারণে বৈদিক সাহিত্যে আমরা ভক্তির যে স্বরূপ পাই

---

৭ গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পা.). *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* (৩). কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ২০০৯. পৃ. ৩১৭

৮ অনির্বাণ, শ্রীমৎ. *উপনিষদ প্রসঙ্গ* (৬). বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৭. পৃ. ১০৩

৯ অনির্বাণ, শ্রীমৎ. *উপনিষদ প্রসঙ্গ* (৭). বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৭. পৃ. ১৫৫

তাকে ‘শ্রদ্ধাভক্তি’ বলা প্রয়োজন। তবে *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*-এ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় গুণাত্মক হয়েছেন। ফলত গুণাতীত *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এর ব্রহ্মের থেকে সদ্-গুণাত্মক ব্রহ্ম ভক্তের আয়ত্তের অধীন। সুতরাং উপনিষদের ধারণাতে আমরা সর্ব ব্যাপক ব্রহ্মের পাশাপাশি ভক্তের ব্যক্তিগত দেবতার কথাও পাচ্ছি। *শ্বেতাশ্বতর*-র মতে পরমেশ্বর এবং গুরুর প্রতি ভক্তি ব্যতীত পরাবিদ্যা অনুভবগম্য হয় না। খেয়াল করার মতো পরা বিদ্যা জ্ঞানের বিষয়, অনুশীলনের বিষয় কিন্তু অপরাপর শাস্ত্রের মত কেবল অভ্যাসে পরাবিদ্যাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। পরাবিদ্যা আয়ত্তের নয়, অনুভবের বিষয়রূপে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ভক্তি-ই হল ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায়। এক্ষেত্রে ‘ভক্তি’ একটি মার্গ যার বৈশিষ্ট্য পরমেশ্বর এবং গুরুর প্রতি অনুগত হওয়া, শরণাপন্ন হওয়া।

পাণিনির সমকালেই ভারতবর্ষে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব। গৌতম বুদ্ধ প্রণীত বৌদ্ধধর্ম মুখ্যত শীল-চর্যা, অনুশাসনকেন্দ্রিক হলেও ভক্তির কিছু উৎস বৌদ্ধ ধর্মেও পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অর্থ ত্রিশরণ গ্রহণ করা। বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ এবং সঙ্ঘের শরণ। শরণাগতি ভক্তি সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও বৌদ্ধ সাহিত্যে বারংবার বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই শ্রদ্ধা সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তির-ই নামান্তর। পরবর্তী মহাযানী পরম্পরায় গৌতম বুদ্ধ এক আরাধ্য রূপেই বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং মহাযানী পরম্পরায় বুদ্ধের স্মরণ, অর্চন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তির বৈশিষ্ট্য সরাসরি দেখা যায়।

ভাগবত ধর্ম এবং ভক্তি

বর্তমানে আমরা কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু একই দেবতার একাধিক নাম বলে মনে করি। ঐতিহাসিক ভাবে কৃষ্ণ ধারণাটি একটি ক্রমবিবর্তনের ফলাফল। সহজে বললে বেদে সূর্যের সমার্থক বিষ্ণু (বারো মাসে সূর্যের বারোটি নাম কল্পিত হয়েছে, এর মধ্যে পৌষমাসের সূর্যকে বিষ্ণু নামে

অভিহিত করা হয়)[১০]। পাঞ্চরাত্র মতের বাসুদেব, *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বর্ণিত অনন্ত সলিলে শয়ান নারায়ণ, আভীর গোষ্ঠীর আরাধ্য প্রেমময় দেবতার ধারণার সমবায়ে বর্তমান বিষ্ণু-কৃষ্ণের ধারণাটি নির্মিত হয়েছে। মোট কথা আমরা আজকে বিষ্ণু-কৃষ্ণকে একই দেবতা মনে করলেও এরা পৃথক উৎস, পৃথক ধারণার সংযোগে তৈরি। বৈদিক এবং উপনিষদের ধারণার পাশাপাশি উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় নেতা কৃষ্ণের ধারণাও যুক্ত হয়েছে বিষ্ণুর সঙ্গে। যাই হোক না কেন বর্তমানে আমরা তিনটি প্রশ্নের উত্তর বোঝার চেষ্টা করব—

প্রথমত, ভাগবত ধর্ম কী এবং তার উৎপত্তির বিভিন্ন পূর্বসূত্র

দ্বিতীয়ত, ভাগবত ধর্ম এবং ভক্তির সম্পর্ক

তৃতীয়ত, ভাগবত ধর্মের উৎস প্রসঙ্গে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের সম্পর্ক কোথায়?

বেদ এবং উপনিষদে ভক্তি ধারণার বীজ থাকলেও তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ভাগবত ধর্মে। মধ্য তথা প্রাচীন সময়ে দর্শন এবং ধর্ম প্রস্থানের উদ্ভবের প্রক্রিয়া ছিল বেশ জটিল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রাথমিক ভাবে একাধিক দার্শনিক মতের উদ্ভব ঘটে, পরে অনেকগুলি পৃথক ধারণা কোনও একটি দর্শন প্রস্থানে স্থান পায়। যেমন ভাগবত ধর্ম বলতে আমরা মূলত বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের কথা বুঝলেও প্রাথমিক ভাবে শিব এবং বিষ্ণু উভয় দেবতার সম্প্রদায়কেই ভাগবত বলা হত। এমনকি প্রাথমিক সময়ে ভাগবত মতাবলম্বীদের খুব উচ্চস্থান ছিল না। *অত্রি সংহিতা*-য় বলা হয়েছে যারা বেদ পাঠ করে না, তর্ক-ব্যাকরণ প্রভৃতির অভ্যাস করে না, এমনকি যারা কৃষিকাজ থেকেও চ্যুত— শিব এবং বিষ্ণুর উপাসক তাঁদেরই ভাগবত বলা হয়। ভাগবত ধর্মে

[১০] বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র রায়. *বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ২০০৩. পৃ. ১২০

নারায়ণীয়, সাত্বত, একান্ত অথবা পাঞ্চরাত্র ধর্ম বলেও অভিহিত করা হয়। ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে এবিষয়ে নানা মতপার্থক্য রয়েছে। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, একান্ত এবং সাত্বত ধর্ম-এ পৃথক গুরু-শিষ্য পরম্পরার কথা পাওয়া যায়।[১১]

এই পরম্পরায় প্রবর্তক হিসাবে যে নারায়ণের নাম পাওয়া যাচ্ছে তিনি কোনও সূত্রে দেবতা আবার কোনও সূত্রে ঋষি বলে কল্পিত। এরপাশে বৈখানস সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী তন্ত্রোক্ত নারায়ণ উপাসনার প্রবর্তক মহর্ষি বৈখানস। তিনি অত্রি, ভৃগু, কাশ্যপ ও মরীচিকে এমতের শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভাগবত মতের প্রধান উপদেষ্টা ভগবান পাঞ্চরাত্র এবং বৈখানস মতে নারায়ণ। ভাগবত ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলির মধ্যে বিবেচিত হয় — বেদব্যাসের *মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, ভাগবতপুরাণ, নারদ ভক্তিসূত্র* এবং *শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র, নারদ পাঞ্চরাত্র* ও *অহির্বুধ্ন্য সংহিতা* ।[১২] তবে আধুনিক সময়ে বৈদিক সূত্র থেকে ভাগবত ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক ঐতিহাসিকেরা মত দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ক্ষত্রিয় বংশ থেকে একাধিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছিলেন— শাক্যপুত্র গৌতম, জ্ঞাতৃক জাতির থেকে মহাবীর। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে ধর্মোপদেষ্টা বুদ্ধকে 'ভগবৎ' নামেই অভিহিত করা হত। এই ধারাতেই সাত্বত নামক জাতির রাজা বাসুদেব পরবর্তী সময়ে ভাগবত নামে পরিচিত হন এবং তাঁর উপাসনা ভারতের নানা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা পায়। এক্ষেত্রে মনে করা হয় প্রথম দিকে ভাগবত ধর্ম অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ছিল। পরে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র পরম্পরায় তা জটিল রূপ নেয়। রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর-এর উক্ত মতে পরবর্তী সময়ে একাধিক ত্রুটি দেখা যায়। তবে একথা স্পষ্ট ভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক প্রসার ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই হয়েছিল।

---

[১১] বিদ্যারণ্য, স্বামী. *ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস* (১ম খণ্ড). কলকাতা: প্রাচ্যবাণী. ১৯৬৩. পৃ. ১১৬

[১২] তদেব, পৃ. ১১৯

ভাগবত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে ভক্তি মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব, ভক্তির বিবিধ উপায়, ভক্তের করণীয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে। এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি একাধিক স্থানে, পৃথক সময়ে রচিত হয়েছিল। তবে ভাগবত ধর্মের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেরই উল্লেখ আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষ ধর্ম নামক অধ্যায়ে ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। রাজা যুধিষ্ঠিরকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম ভক্তি পথের বিভিন্ন উদাহরণ প্রসঙ্গে একাধিক কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এর পূর্বে *মহাভারত*-এর ভীষ্ম পর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে অবহিত করেছেন ভক্তিমার্গ প্রসঙ্গে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-র সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ নামক অংশে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী— এই চার প্রকার ভক্তের কথা পাচ্ছি। ষষ্ঠ অধ্যায় অভ্যাস যোগ-এ কৃষ্ণ বলছেন ভক্তিমান যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ। নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগে বলা হয়েছে শরণাগতি ঐকান্তিক ধর্ম। ভক্তিবর্জিত সাধক গীতা-মতে 'পাষণ্ডী' বলে পরিচিত। দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ-এ কৃষ্ণ সকল কর্ম সমর্পণ করা ভক্তের সংসার সমুদ্র থেকে মুক্তিলাভের প্রসঙ্গ রয়েছে। কৃষ্ণ বলছেন—দেহাভিমানী জীবের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা করা কঠিন। একারণে সাকার এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই কাঙ্ক্ষিত। অতএব ভক্তিমার্গ-ই সাধারণ মানুষের মোক্ষলাভের অন্যতম উপায়। জ্ঞান এবং কর্মমার্গ ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ, তাই ভক্তির পথ আচরণীয়। শান্তি পর্বেও যোগ এবং সাংখ্যমার্গের তুলনায় ভক্তির পথ শ্রেয় বলে ভীষ্ম উপদেশ প্রদান করেছেন। দেখা যাচ্ছে শরণাগতি নির্ভর ভক্তিমার্গের প্রতিষ্ঠা বেদব্যাসের *মহাভারত*-এ সম্পূর্ণ হয়েছিল। এরপর আমরা শাণ্ডিল্য এবং নারদভক্তিসূত্রের আলোচনা করব। নারদ এবং শাণ্ডিল্য ঋষির নামাঙ্কিত সূত্রগুলি ভক্তিদর্শনের প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করে। কোনও কোনও মতে শাণ্ডিল্য ঋষিকে ভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়েছে। তবে *জয়াখ্যসংহিতা* নামক পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের আগে কোনও প্রাচীন উৎসের আচার্য পরম্পরায় শাণ্ডিল্য ঋষির নাম পাওয়া যায়নি। নারদ এবং শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রকেন্দ্রিক

দর্শন *ভগবদ্গীতা*-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আচার্য শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বাবধি আচরণীয় বলে বিবেচিত হয়।[১৩] *নারদীয় ভক্তিসূত্রে* চুরাশিটি শ্লোক রয়েছে।[১৪] ভগবৎ ভক্তির বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হল— "সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা" অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসাই হল ভক্তি। ভক্তি অমৃত স্বরূপ, যে ভক্তি লাভ করে তার সব মনস্কামনা পূর্ণ হয়, সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তিনি অমরত্ব লাভ করে দিব্য হন, চির পরিতৃপ্ত থাকেন। ভক্ত যখন ভক্তি লাভ করেন সে সময়ে তাঁর আনন্দ বাইরের বস্তুর নির্ভর করে না। তিনি নিজেই মগ্ন থাকেন। ভক্তিসূত্রে ভক্তের এই দশাকে বলা হয়েছে 'আত্মারাম'। ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি একমুখী অনুরাগ কাজ করে, বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা তৈরি হয়, তবে যতক্ষণ ইষ্টভক্তি দৃঢ় না হচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্রবাক্য মেনে চলা প্রয়োজন। ভক্তি অর্জিত হলে বৈধী জপধ্যানেরও দরকার পড়ে না। ঈশ্বরের প্রতি একাদশ প্রকার পরাভক্তির কথা নারদীয় ভক্তিসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন — ১) ঈশ্বরের মাহাত্ম্য সূচক গুণ বর্ণনা— স্মরণ, মনন ও আলোচনা, ২) তাঁর অসামান্য রূপলাবণ্যের প্রতি অনুরাগ, ৩) তাঁর সেবা ও পূজায় আসক্তি, ৪) নিরন্তর স্মরণ, ৫) ভৃত্যভাবে সেবা করার আগ্রহ, ৬) সখারূপে অনুরাগ, ৭) সন্তান স্নেহ, ৮) কান্তার ন্যায় আসক্তি, ৯) আত্মনিবেদনের আকুতি, ১০) তাতেই তন্ময় থাকার অভিলাষ, ১১) না পাওয়া দুঃখ জাগ্রত রাখা বাসনা। শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রে একশোটি সূত্র রয়েছে। দুটি সূত্রে ভক্তি সম্পর্কে প্রায় সম মনোভাব পোষিত হয়েছে। শাণ্ডল্য ভক্তিসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন প্রকারের ভক্তের প্রসঙ্গ পাচ্ছি। জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ভক্ত, ধনাকাঙ্ক্ষী ভক্ত এবং আত্মনিবেদনকারী ভক্ত।[১৫] ভক্তি

---

[১৩] De, Sushil Kumar. *Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal (From Sanskrit and Bengali Sources)*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd. 1986. p.85

[১৪] ভূতেশানন্দ, স্বামী. *নারদীয় ভক্তিসূত্র.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. পৃ. ১৫

[১৫] Harshananda, Swami. *Sandilya Bhakti Sutras with Svapneśvara Bhāsya*. Bangalore: Ramkrishna Math. 2002. pp. 137-139

সূত্রগুলির থেকে ভক্তি শব্দটির দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথমত, ভক্তি হল সাধনার পথ, যে পথে গিয়ে ভক্ত ইষ্ট লাভ করবেন, দ্বিতীয়ত, ভক্তি হল সাধনার বস্তু অর্থাৎ ভক্ত 'ভক্তি' লাভ করারই চেষ্টা করবেন। শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর মনে করেন ভক্তি সাধন পথ আবার নারদ ভক্তিসূত্রের টীকাকার তিলক মনে করেন ভক্তি-ই ভক্তের সাধ্য।[১৬] দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যে *ভগবদ্গীতা* এবং *ভক্তিসূত্রের* মাধ্যমে ভক্তিদর্শন সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ভক্তির উৎস আমরা এখনও অবধি যতগুলি গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচনা করেছি তার সব কটির ভাষা সংস্কৃত, গ্রন্থগুলি রচনা এবং সংকলন উত্তর ভারতে। কিন্তু পরবর্তী কালে ভক্তিধর্ম সম্পর্কে একটি শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে মনে হয় ভক্তিধর্মের উৎস দক্ষিণ ভারতে — "উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা..."। শ্লোকটির বক্তব্য হল —

আমি ভক্তি, আমার জন্ম দ্রাবিড় দেশে, বড়ো হয়ে ওঠা কর্ণাটকে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে আমি ছিলাম এবং গুজরাতে গিয়ে আমি বৃদ্ধ হই।

এই শ্লোকটি *ভাগবত মাহাত্ম্য* নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে এছাড়া *পদ্মপুরাণ* এবং *স্কন্দপুরাণ*-এও এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণে এই শ্লোকটির সঙ্গে নারদের একটি যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকটির কারণে অনেকেই মনে করেন ভক্তিধর্মের উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতে। প্রসঙ্গত বলা দরকার অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের পরে হিন্দু ধর্মের একটি পুনরভ্যুদয়ের প্রয়োজন হয়। একারণে ভক্তি ধর্মের মত অপেক্ষাকৃত উদার, একেশ্বরবাদী এবং জাতপাতের বিরোধী মত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে (মূলত সুফি মতাদর্শ) ভক্তি ধর্মের উৎপত্তি এহেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই; কিন্তু পারস্পরিক আদান-প্রদান নিশ্চয়ই

[১৬] Kane, P.V.. *History of Dharmasastra* (Vol. IV, Part II). Pune: Bhandarkar Oriental Research Institution. p. 958

এই ধর্মগুলির মধ্যে ছিল। এবার দক্ষিণ ভারতের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক কৃষ্ণা শর্মা দেখিয়েছেন— সম্ভবত শ্লোকটি মূলত আচার্য রামানুজের সময় অর্থাৎ খ্রিস্টীয় একাদশ শতক থেকে চৈতন্য সমসময় (খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক)-এ ভক্তি আন্দোলনের সাপেক্ষে তৈরি হয়েছিল।[১৭] এই শ্লোকে ভক্তি শব্দটি একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তিকেই বোঝায়, অথচ ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ভক্তি সাধনার আরও প্রকারান্তর রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে আচার্য রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বল্লভাচার্য-র হাতে বৈষ্ণব বেদান্তের যে পরম্পরা নির্মিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গেই ভাগবত মাহাত্ম্যে উদ্ধৃত শ্লোকটির গুরুত্ব। এবার আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রমাণের মাধ্যমে দেখব কীভাবে ভাগবত এবং ভক্তি ধর্মের উৎসরূপে উত্তর ভারতীয় ধারাকেই প্রাচীনতম মনে করা যথাযথ হবে—খ্রি.পূ. প্রথম শতকে নানাঘাট পর্বতমালার অনুশাসনে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮] ব্যাক্ট্রীয় গ্রিকদের মধ্যে ভাগবতধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত রাজবংশের কাছে ভাগবত ধর্ম পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, রাজা স্কন্দগুপ্ত নিজেকে 'ভাগবত' বলে পরিচয় দিতেন। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় খ্রি. ৪৩৮-এ রাজা মাতৃবিষ্ণু ধ্বজ, স্তম্ভ তৈরি করেন। ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে মনে হয় উত্তর ভারতে ভক্তিধর্ম উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে মহারাষ্ট্র হয়ে প্রসার লাভ করে তামিল দেশে। গুপ্ত রাজবংশের অবসানের পরে উত্তর ভারতে ভাগবত ধর্ম নিষ্প্রভ হয়। তবে দক্ষিণ ভারতে ভক্তি ধর্মের ধারা বজায় থাকে। আচার্য রামানুজের হাতে ভক্তিধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ঐতিহাসিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত প্রাচীন তামিল সাহিত্যে ভক্তি প্রসঙ্গের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার একটিও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ইন্দো-আর্য সভ্যতার সংস্পর্শের আগে রচিত হয়নি। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের

[১৭] Sharma, Krishna. *Bhakti and Bhakti Movement A New Perspective*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. 2015. pp. 296-314

[১৮] দাস, পরিতোষ. *সহজিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. ১৯৭৮. পৃ. ১৩-১৫

মত— "অর্থাৎ ভক্তিবাদ উত্তর ভারতকে তামিলী দান নয় বরং উত্তর ভারতীয় শিবভক্তির আদর্শই তামিলীয় ভক্তিবাদকে প্রভাবিত করে।"[১৯]

ভাগবত তথা পৌরাণিক সংস্কৃতিতে ভক্তি—

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে বেদের পরেই প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত হয় পুরাণ। *অথর্ববেদ* এবং *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এ পুরাণ বেদের মতোই পবিত্র বলে স্বীকৃত। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এ পুরাণ পঞ্চম বেদরূপেও স্বীকৃত। তবে পুরাণ কখনওই 'শ্রুতি' নয়, পুরাণ 'স্মৃতি'। 'স্মৃতি' বলতে ব্রাহ্মণ্যমতে সামাজিক নিয়ম-কানুনের বইকে বোঝায়। পুরাণের মধ্যে দেখা যায় নানা সময়ের গল্পের সমবায়। পুরাণের সময় কাল নিয়ে নানা রকম মতপার্থক্য রয়েছে। তবে পুরাণগুলির রচনা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।[২০] কৃষ্ণদ্বৈপায়নের *মহাভারত* এবং *হরিবংশ পুরাণ*-এ আমরা অষ্টাদশ মহাপুরাণের কথা পাই। এছাড়াও বেশ কিছু উপপুরাণও রয়েছে। কোনটি মহাপুরাণ এবং কোনটি উপপুরাণ এবিষয়েও মতপার্থক্য কম নয়। পুরাণগুলির মধ্যে একাধিক উপাসক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ রয়েছে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে সাতটি মুখ্য পুরাণ রূপে বিবেচিত হয়—মার্কণ্ডেয়, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য, ভাগবত এবং কূর্মপুরাণ। এগারোটি পুরাণ গৌণ মহাপুরাণের তালিকায় রয়েছে—বামন, লিঙ্গ, বরাহ, পদ্ম, বৃহন্নারদীয়, অগ্নি, গরুড়, ব্রহ্ম, স্কন্দ, ব্রহ্মবৈবর্ত এবং ভবিষ্য। এছাড়াও প্রায় চল্লিশটির বেশি উপপুরাণের কথা পাওয়া যায় যার মধ্যে বেশ কয়েকটি পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। এতগুলি পুরাণের সবকটি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামে প্রচলিত। পুরাণের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় পুরাণ রচনা ভারতবর্ষের ধর্মের

---

[১৯] সান্যাল, অবন্তীকুমার. *চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান.* কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী. ২০০২. পৃ. ১১৩

[২০] Hazra, R.C. *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites & Customs*. Delhi: Motilal Banarsidass. 1975. pp. 52-56

ইতিহাসে বিশেষভাবে চালু ছিল। বিখ্যাত দেবতাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা পুরাণের অন্যতম কাজ। পাশাপাশি ধর্ম এবং সামাজিক কর্তব্যের নির্দেশও পৌরাণিক সাহিত্য দিয়ে থাকে। কোনও একজন দেবতাকে কেন্দ্র করে পুরাণ রচনার অর্থ উক্ত দেবতার সমাজে প্রতিষ্ঠা। পুরাণে সেই দেবতা সংক্রান্ত বিভিন্ন আখ্যান পাওয়া যায়। অতএব ঐতিহাসিকভাবে কোনও একটি ধর্ম সম্প্রদায় কতটা প্রতিষ্ঠিত তা পুরাণের রচনা থেকে বোঝা সম্ভব। আমাদের বর্তমান আলোচ্য *ভাগবতপুরাণ*। এটি বৈষ্ণবীয় পুরাণ এবং অষ্টদশ মহাপুরাণের মধ্যে বিবেচিত। যদিও শাক্ত সম্প্রদায় *ভাগবতপুরাণ*-কে মহাপুরাণের অন্তর্গত বলে বিবেচনা করতে অরাজি। তাঁরা এস্থানে *দেবীভাগবত* অথবা *কালিকা পুরাণ*-কে রাখতে আগ্রহী। *ভাগবতপুরাণ* রচনা তথা সংকলনের শেষ সময়সীমা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী। *ভাগবতপুরাণ*-এ মোট বারোটি স্কন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে দশম স্কন্ধের বিষয় কৃষ্ণ অবতার এবং কৃষ্ণ ভক্তির বিস্তারিত বর্ণনা। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলি এবং চরিতসাহিত্যে কৃষ্ণকেন্দ্রিক অধিকাংশ আখ্যানের উৎসই হল *ভাগবতপুরাণ*-এর দশম স্কন্ধ। এখানে কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, অসুর বধ, গোপীদের সঙ্গে বিলাসের আখ্যানগুলি রয়েছে। তবে *ভাগবতপুরাণ*-এ কৃষ্ণের গোপীজনবল্লভ রূপের বর্ণনা থাকলেও (অধ্যায় ২১, ২২, ২৯-৩৩) প্রধান গোপীরূপে শ্রীরাধা-র কথা নেই। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ *ভাগবতপুরাণ*-এর 'অনয়ারাধিতনূনং' শ্লোক থেকেই *ভাগবতপুরাণ*-এ রাধার উৎস প্রমাণে আগ্রহী। প্রথা অনুযায়ী *ভাগবতপুরাণ*-এর সূচনা হয় শৌনকাদি ঋষিগণ এবং ঋষি রোমহর্ষণপুত্র সূত-এর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। সূচনায় বলা হল বেদকল্প বৃক্ষ এবং *ভাগবতপুরাণ* সেই কল্পবৃক্ষের ফল। আম ইত্যাদি ফলের রস পান করতে হলে ফলের ত্বক পরিত্যাগ করে খেতে হয়। কিন্তু *ভাগবতপুরাণ*-এ পরিত্যাগের যোগ্য কিছুই নেই। *ভাগবতপুরাণ*-এর প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় থেকেই দেখা যাচ্ছে এখানে জ্ঞানের পথে, তত্ত্বের পথে বিচার করার কথা বলা হচ্ছে না। প্রথম থেকেই ভাগবত পাঠ এবং

শ্রবণের প্রসঙ্গে মিষ্টি-মধুর প্রভৃতি রূপকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রদ্ধা সহকারে শুনলে গোবিন্দের পদে ভক্তের মতি অবিচলিত থাকবে। অতএব *ভাগবতপুরাণ* প্রথম থেকেই ভক্তিদর্শনের ভিত্তিকে স্বীকার করে নিচ্ছে, একমাত্র আচরণীয় পথ হিসাবে ভক্তিকেই মনে করছে। কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয়েছে দশম স্কন্ধে। এবার দশম স্কন্ধের থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ভাগবত মতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য বোঝার চেষ্টা করা যাক।

দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে শিশু কৃষ্ণের পূতনা বধের কথা রয়েছে। পূতনা নরশিশুঘাতিনী, মাংসলোলুপা। তিনি কৃষ্ণকে বধকল্পে হলেও মায়ের মতোই দুধ পান করাতে চেয়েছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণকে স্তন্যপান করানোর জন্য রাক্ষসী পূতনার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এমনকি পূতনার চিতার ধূমের সুগন্ধ ব্রজগোপ-গোপীদের মুগ্ধ করেছিল।[২১] সুতরাং পূতনার আখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ভক্তিমার্গে কেবল আনুগত্যেই মুক্তি নেই, প্রতিকূল বা বিরোধী অবস্থানে থেকেও মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। ভক্তি তথা ভাগবত ধর্মের আখ্যান পরিসরের এই অন্তর্ভুক্তির প্রবণতাই পরবর্তী সময়ে ভাগবত মতের গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম কারণ। ঊনত্রিশ এবং ত্রিশ নং অধ্যায়ে ব্রজগোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা এবং রাসত্যাগের পর কৃষ্ণবিরহে গোপীদের দুর্দশার কথা বর্ণিত হয়েছে। পুরাণের আখ্যান অনুযায়ী পূর্বজন্মে প্রভূত সাধনার ফলেই গোপীজন্ম লাভ সম্ভব হয়েছিল। গোপীদের কৃষ্ণ অদর্শনে বিরহের প্রসঙ্গে একই সঙ্গে ভক্তিমার্গে ভক্ত এবং ভগবানের দূরত্বের ফলে ভক্তের কষ্টকে বুঝিয়ে দেয়। *ভাগবতপুরাণ*-এ কৃষ্ণের প্রতি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর— যাবতীয় ভাবে সাধনার কথাই বিশদে বর্ণিত। বঙ্গদেশে *ভাগবতপুরাণ* কবে থেকে গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবিষয়ে একাধিক মতের উল্লেখ রয়েছে। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা

[২১] কাব্যতীর্থ, তারাকান্ত. *শ্রীমদ্ভগবত.* কলকাতা: পি এম বাগচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ. ২০০৬. পৃ. ৫২৭-৫২৮

তাঁদের ভক্তি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে *ভাগবতপুরাণ*-এ প্রভূত ঋণ স্বীকার করেছেন। *ভাগবতপুরাণ* ব্যতীত *বিষ্ণুপুরাণ* এবং *হরিবংশ পুরাণ*-এও ভক্তি তত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাবে। খ্রিস্টীয় ১০০ থেকে ৩৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে *বিষ্ণুপুরাণ* রচিত হয়েছিল। এই পুরাণ সম্ভবত পাঞ্চরাত্র শাখার সাধকদের রচনা। মহর্ষি পরাশর *বিষ্ণুপুরাণ*-এর প্রথম বক্তা। পরে বেদব্যাস বিষ্ণুপুরাণকে লিপিবদ্ধ রূপ দান করেন। এই পুরাণের পঞ্চমাংশে কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যানগুলি রয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ* মতে কৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণুর অবতার। *বিষ্ণুপুরাণ* এবং *ভাগবতপুরাণ*-এ একই আখ্যান থাকলেও উপস্থাপনগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন *বিষ্ণুপুরাণ*-এর পঞ্চমাংশের পঞ্চম অধ্যায়ে পূতনা বধের আখ্যানটি থাকলেও *ভাগবতপুরাণ*-এর মতো পূতনার স্বর্গলাভের প্রসঙ্গ অথবা চিতা-ধূমে সুগন্ধের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত।[২২] ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রাসলীলার বর্ণনায় কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও কৃষ্ণের রাসমণ্ডপ ত্যাগ এবং গোপীগণের শোক—এই আখ্যানটি নেই। সুতরাং কাহিনি এক হলেও পুরাণের মধ্যেই ভক্তিধর্মের একটি ক্রমবিবর্তন বোঝা সম্ভব। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের *বিষ্ণুপুরাণ*-এ মুখ্যত শান্ত তথা ঐশ্বর্যভাবের দেবতার বন্দনাই বেশি। পাঁচশো বছর পরে রচিত *ভাগবতপুরাণ*-এ ভক্তির প্রাবল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং ভক্তিদর্শনের যে বীজ *বিষ্ণুপুরাণ*-এ ছিল তারই পরিপূর্ণতর বিকাশ এবং ভক্তিমার্গের বিবিধ বৈচিত্র্য *ভাগবতপুরাণ*-এ দেখা সম্ভব। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে সম্ভবত *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* প্রথম রচিত হয়। এখানে আমরা রাধার কথা পাচ্ছি। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের সাতাশ সংখ্যক অধ্যায়ে রাধা এবং অন্যান্য গোপীদের কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য গৌরীব্রত এবং পার্বতী স্তোত্র পাঠ করতে দেখা যায়।[২৩] সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া প্রেমিকারূপে বর্ণিত হয়েছেন। রাধা কৃষ্ণের প্রেমিকা,

---

[২২] তর্করত্ন, পঞ্চানন (অনু). *বিষ্ণুপুরাণম্.* কলকাতা: নবভারত. ১৪১৭. পৃ. ৩৭৪

[২৩] তর্করত্ন, পঞ্চানন (অনু.). *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাম্.* কলকাতা: নবভারত. [ ]. পৃ. ৪১১

তাঁদের মধ্যে কাম সম্পর্ক থাকলেও রাধা কৃষ্ণের ভক্ত। অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্ত শিরোমণি রূপে যে রাধাকে স্বীকার করেন তার পূর্বসূত্র পৌরাণিক সাহিত্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আমরা পুরাণে কৃষ্ণভক্তির বর্ণনা থেকে এটুকু সহজেই বুঝতে পারছি যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি পুরাণেই ভক্তি সাধনপথের একটি আদর্শ পথরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

অদ্বৈত এবং বৈষ্ণব বেদান্ত: প্রসঙ্গ ভক্তি

বেদস্বীকৃতি লাভ না করলে ভারতবর্ষে কোনও মতেরই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই যে কোনো দর্শন সম্প্রদায়কে তদের মত যে অবশ্যই বেদানুগ তা প্রমাণ করতে হয়। মহর্ষি বাদরায়ণ-এর ব্রহ্মসূত্র-র উপরে টীকা রচনার মাধ্যমে বেদানুগ প্রমাণ করার রীতি সুপ্রাচীন। 'সূত্র' বলতে বোঝাচ্ছে কয়েকটি শ্লোক যেখানে বীজাকারে কয়েকটি তত্ত্ব বলা হয়। টীকা এবং ভাষ্য উক্ত বীজরূপী ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। ভক্তি দর্শনের আলোচনায় ব্রহ্মসূত্রকেন্দ্রিক টীকা ভাষ্য অবশ্যম্ভাবী। কারণ আচার্য শংকর রচিত শারীরিক ভাষ্যকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব বেদান্তের প্রতিষ্ঠা। আচার্য শংকর তাঁর আলোচনায় অদ্বৈতবাদ নামক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও আচার্য শংকরের পূর্বে প্রখ্যাত বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি-র *বাক্যপদীয়ম্* এবং আচার্য গৌড়পাদের *মাণ্ডুক্যকারিকা* নামক মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ আলোচিত হয়েছিল। তবে আচার্য শংকর বিস্তারিত ভাবে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন যা ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি শাখায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য — 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এবং জগতে একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব রয়েছে। বাকি আর যা কিছু আমরা দেখতে পাই সবই আমাদের অবিদ্যার কারণে হয়ে থাকে। 'দুই'-এর অস্তিত্ব নেই — অস্তিত্ব রয়েছে একমাত্র ব্রহ্মেরই। দুই অর্থাৎ দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন না বলেই আচার্য শংকরের মত অদ্বৈতবাদ রূপে পরিচিত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে সকলেই অনুভব করেন তাঁরা ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম উপলব্ধি দুই প্রকারের হতে পারে বলে *বৃহদারণ্যক*

বার্ত্তিকসার-এ বিদ্যারণ্য স্বামী দ্বিবিধ ব্রহ্ম উপলব্ধির কথা বলেন। সোপাধিকদশা অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মার দর্শন। সহজে বললে হয়— সাধক সকল প্রাণীর মধ্যেই আত্মাকে দেখতে পান, অর্থাৎ তার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে তা সকলের মধ্যে থাকা আত্মার সঙ্গে একই। এক্ষেত্রে সাধক বুঝতে পারেন সকল জীব-ই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। তার মধ্যে আমি-তুমির বোধটি লুপ্ত হয়। পরের স্তর হল নিরুপাধিক— অর্থাৎ সমস্ত বস্তু আত্মাতেই বিলীন। সোপাধিক স্তরের সঙ্গে ফারাক হলে এখানে আমার আত্মা ও জীবগণের আত্মা এই পৃথক উপলব্ধিটি বিলুপ্ত হয়। সমস্ত জগৎ তথা ব্রহ্মকেই অখণ্ড রূপে উপলব্ধি করা যায়। অদ্বৈত দর্শন মুখ্যত জ্ঞানমার্গে চলে, অবিদ্যা দূর না হলে ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভবকর নয় বলেই তাঁরা মনে করেন। আচার্য শংকরের দর্শন অতি ব্যাপক, সূত্রাকারে তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। তবে অদ্বৈতবাদ যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মের-ই অখণ্ড অস্তিত্বকে স্বীকার করে তাই এখানে ভক্তের কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। আমরা আগেই বলেছি ভক্তির মূল উপাদান ভক্ত এবং উপাস্য। অদ্বৈত বেদান্ত উপাসনার বিরোধিতা করে না, সাধনায় প্রবেশের জন্য ভগবৎ সাধনার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নেয়। তা সত্ত্বেও ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তরে ভক্তির কোনো পৃথক কার্যকারিত থাকা সম্ভব নয় অদ্বৈত মতে। ব্রহ্ম এবং জীবের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই আচার্য শংকরের পরে চারজন ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাতার আবির্ভাব হয়। এই চারজন ব্যাখ্যাতাই নিজস্ব সম্প্রদায় এবং গুরু পরম্পরা তৈরি করেন। এঁরা হলেন—

আচার্য	**সময়কাল**	**দর্শন ও সম্প্রদায়ের নাম**
আচার্য রামানুজ	১০১৬-১১৩৭	বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শ্রী সম্প্রদায়
আচার্য নিম্বার্ক	অনিশ্চিত	দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, সনকাদি সম্প্রদায়
আচার্য মধ্ব	১১৯৯	দ্বৈতবাদ

মতপার্থক্য থাকলেও উক্ত চারটি সম্প্রদায়ই আচার্য শংকর এবং অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে। বিরুদ্ধ পথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমনকি উক্ত চারটি দ্বৈতবাদী মতের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এঁদের প্রত্যেকেরই সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।[২৪] অদ্বৈতবাদের বিরোধিতা করে দক্ষিণভারতে উক্ত চারটি ভক্তিকেন্দ্রিক বৈষ্ণব বেদান্তের শাখা নির্মিত হলেও মনে রাখতে হবে আচার্য শংকরের নামে প্রচলিত একাধিক রচনায় আমরা আরাধ্য এবং ভক্তের সম্পর্ক পেয়েছি। প্রসঙ্গত আচার্য শংকর প্রণীত *গঙ্গাস্তোত্র, যমুনাষ্টক, নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্র, গণেশভুজঙ্গপ্রয়াত স্তোত্র, শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্র, দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র, নারায়ণ-গীতি স্তোত্রম্* প্রভৃতি রচনার কথা পাব। অতএব স্মার্ত পঞ্চোপাসনার (সূর্য, গণেশ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি— এই পাঁচ আরাধ্যকে কেন্দ্র করে পঞ্চোপাসক গোষ্ঠীর নির্মাণ) সকল আরাধ্যকে কেন্দ্র করেই আচার্য শংকরের রচনা পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত শংকরাচার্য রচিত *শ্রীবিষ্ণুভুজঙ্গপ্রয়াত স্তোত্রম্*-এর একটি শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধার করা যেতে পারে —

আমি ভক্তিপূতভাবে 'হে অজুত, হে অন্ত, হে গোবিন্দ, হে বিষ্ণু, হে মুরারি, হে নাথ, হে নারায়ণ' এই সকল বাক্য উচ্চারণ সহকারে যাতে তোমাকে স্মরণ করতে সমর্থ হই, হে কৃপাশীল দেব! তুমি সেইরূপ প্রসন্নতা অবলম্বন করো।[২৫]

সুতরাং অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা হলেও আচার্য শংকরকে একবাক্যে ভক্তিপথের বিরোধী বলে প্রমাণ করা কঠিন।

---

[২৪] বাগ্‌চী, যোগেন্দ্রনাথ. *ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. ১৯৬১. পৃ. ৯৫

[২৫] তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.). *শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা.* কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড. ২০১৭. পৃ. ৮১

আচার্য শংকর পরবর্তী বৈষ্ণব বেদান্তশাখার আলোচনার পূর্বে আমাদের দক্ষিণ ভারতের আড়্বার কবি গোষ্ঠী প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তামিলনাড়ু খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভক্তিসাহিত্যের দুটি ধারা বিকশিত হয়। প্রথমটি হল— শৈবভক্তির ধারা, শিবভক্তদের বলা হত নায়নার্।[২৬] প্রথম রাজরাজ চোলেরর রাজত্বকালে (৯৮৫ খ্রি.) শৈবভক্তি সাহিত্যের সংকলন গ্রন্থ 'তেবারম্' প্রস্তুত করেন প্রসিদ্ধি শৈব কবি নম্বিয়াণ্ডার-নম্বি। খ্রিস্টীয় দশম শতকে তামিল শৈব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মাণিক্কবাচকর-এর আবির্ভাব হয়। শৈব সাহিত্যের অব্যবহিত পরে তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। তবে শৈবদের রচনার সঙ্গে আড়্বার-দের রচনার অন্যতম পার্থক্য হল শৈব কবিরা তাঁদের প্রতিপক্ষরূপে অনেক সময়েই বৌদ্ধ এবং জৈন মতাবলম্বীদের আক্রমণ করতেন, বৈষ্ণবদের রচনায় এধরনের আক্রমণ প্রায় দেখাই যায় না। দশম শতাব্দীতে রঙ্গনাথ মুনি অথবা নাথ মুনি আড়্বার কবিদের একটি পদসংকলন প্রস্তুত করেন যার নাম 'নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্'। এই সংকলনে বারোজন বৈষ্ণব কবির চার হাজার পদ পাওয়া যাচ্ছে। এই পদগুলির মূল বিষয় হল কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের আত্মনিবেদন এবং আকুতি। এদের মধ্যে কবি আণ্ডাল-এর কথা বিশেষভাবে বলা যায়। কবি আণ্ডাল ছিলেন দ্বাদশ আড়্বারদের মধ্যে অন্যতম পেরিয়ালোয়ারের পালিতা কন্যা। কৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনের পদরচনায় আণ্ডালের অন্যতম কৃতিত্ব নিজেকে কৃষ্ণের নায়িকা বলে কল্পনা করা। তিনি 'তিরুপ্পাবৈ' নামক অংশে অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় গোপকুমারীদের কৃষ্ণের জন্য ব্রতপালনের একটি বর্ণনা দিয়েছেন যা *ভাগবতপুরাণ*-এ কৃষ্ণের রাস উৎসবের সঙ্গে তুলনীয়। বর্তমান আলোচনায় এটুকু স্পষ্ট যে বৈষ্ণব বেদান্তের তত্ত্বকাঠামো নির্মাণের পূর্বেই তামিল ভাষায় কৃষ্ণভক্তির একটি ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। 'নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্'-এর সংকলক নাথমুনি-কে শ্রী সম্প্রদায়ের আদি প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। খ্রিস্টীয়

---

[২৬] ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ. *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য.* কলকাতা: লেখাপড়া. ১৯৬৪. পৃ. ৪৭-১৩৩

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর জন্ম। *নালায়িরি দিব্য প্রবন্ধম্* সংকলনের পাশাপাশি তিনি *ন্যায়তত্ত্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা শ্রী সম্প্রদায়ের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি।[২৭] নাথমুনির পরে আচার্য পরম্পরাটি যথাক্রমে— পুণ্ডরীকাক্ষ, রামমিশ্র, যামুনাচার্য এবং শ্রীরামানুজাচার্য। আচার্য রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হলেন বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী। *নালায়িরি দিব্য প্রবন্ধম্*-এর পাশাপাশি শঠকোপ আড়্বারের চারটি দিব্য প্রবন্ধের সংকলন— **১.** *তিরুবিরুত্তম্*, ২. *তিরুবাসিরিয়ম্*, ৩. *পেরিয়তিরুবন্দাদি*, ৪. *তিরুবায়মোড়ি* 'দ্রাবিড় বেদ' নামে পরিচিত। রামানুজ প্রথম উক্ত দিব্যপ্রবন্ধগুলি শ্রী সম্প্রদায়ের নিত্যপাঠ্য বলে মনে করেন এবং তাঁর নির্দেশে কুরুকাথিনাথ স্বামী দিব্য প্রবন্ধের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রচনা করেন।[২৮] রামানুজের বৈষ্ণবধর্মে পূর্বতন পঞ্চরাত্র ভক্তিধারার পাশাপাশি নারায়ণকেন্দ্রিক উপাসনারও সংযোগ ঘটে। শ্রী সম্প্রদায় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়—বড়কলই এবং টেনকলই। বড়কলই শাখা প্রাচীন মতাবলম্বী—এঁরা মনে করেন ভক্তিমার্গে ভক্তের সক্রিয় যোগদানের দরকার। ভক্তের একান্ত আগ্রহের মাধ্যমেই মুক্তি সম্ভব। অন্যদিকে টেনকলই শাখা মনে করে প্রপত্তি হল শ্রেষ্ঠ উপায় যেখানে ভক্ত নিজেকে আরাধ্যের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেবে। আরাধ্য-ই নিজ বলে ভক্তকে উদ্ধার করবে। এই শ্রেণিবিভাগের পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে শ্রী সম্প্রদায় যেহেতু বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর উপাসক তাই তাঁরা বৈধী ভক্তিমার্গ মেনে চলতেন।

আচার্য রামানুজের পরে নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য এবং মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে না। তবে এঁরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের শক্তিরূপে স্বকীয় শক্তির কল্পনা করেছেন।

---

[২৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ. *পঞ্চোপাসনা.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম পাবলিশার্স. ১৯৯৪. পৃ. ৯৬-১১৯

[২৮] স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য. *শ্রী বৈষ্ণব-দর্শন ও ধর্ম* (প্রথম খণ্ড). খড়দহ: শ্রী বলরাম ধর্ম সোপান. ১৩৭৬. পৃ. ভূমিকাংশ।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে মধুর রসের উপাসনাও প্রচলিত। কর্ম এবং জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করে একমাত্র ভক্তিমার্গেই মুক্তি সম্ভব বলে নিম্বার্ক সম্প্রদায় মনে করে। নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব ধ্রুবদাসজীর রচনায় পাচ্ছি "সেবা হূ তেঁ দূর কিয় বিধিনিষেধ জংজার"।[২৯] বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সংসার ধর্মে অবিচল থেকে কৃষ্ণসেবায় জীবন উৎসর্গের কথা পাচ্ছি। সুতরাং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষিতে ভক্তিদর্শন কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল।[৩০] প্রাথমিকভাবে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায় উক্ত সম্প্রদায়গুলির থেকে স্বতন্ত্র। পূর্বের মত স্বাভাবিক ভাবে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি মতাদর্শে কিছু প্রভাব ফেলেছে। এক সময়ে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মধ্বাচার্যের শাখার অনুগামী মনে করা হত। চৈতন্য পরবর্তী একটি শাখা নির্ণয় গ্রন্থ *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*-তে চৈতন্য সম্প্রদায়কে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে দেখা হয়েছে। কিন্তু মধ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতন্য সম্প্রদায়ের এই যোগ উনিশ শতকের পূর্ববর্তী নয়।

চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি-আদর্শ বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেন আচার্য মাধবেন্দ্র পুরী। মাধবেন্দ্র পুরী-র শিষ্য ঈশ্বর পুরী চৈতন্যদেবকে গয়ায় দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের দীক্ষাদান করেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কান্তা ভাবের উপাসনা এবং প্রেমভক্তির যে আদর্শ দেখা যায় তা মাধবেন্দ্র পুরীর সূত্রেই প্রাপ্ত।[৩১] প্রসঙ্গত মাধবেন্দ্র পুরীর একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে—

> হে দীনদয়াল, হে নাথ, হে মথুরাপতি, কবে তোমার দর্শন পাইব? হে দয়িত তোমার অদর্শনে কাতর হৃদয় আমার অস্থির হইয়া উঠিতেছে, আমি কী করিব?[৩২]

---

[২৯] ভট্টাচার্য, অমরপ্রসাদ. *শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন.* খড়গপুর: শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস প্রকাশিত. ১৯৬৬. পৃ. ৫০৭

[৩০] ঘোষ, সতী. *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ১৯৮৪. পৃ. ৭৫

[৩১] চট্টোপাধ্যায়, গীতা. *ভাগবত ও বাঙ্‌লা সাহিত্য.* কলকাতা: কবি ও কবিতা. ১৩৭৯. পৃ. ১৫৯-১৭০

[৩২] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ. *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা. ১৯৭০. পৃ. ৩৪-৩৫

এছাড়াও মাধবেন্দ্র পুরী বিরচিত বর্ষাভিসারের একটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩৩] মাধবেন্দ্র পুরীর সূত্রে চৈতন্যদেব যে প্রেমভক্তির বীজ পেয়েছিলেন তা-ই পরবর্তী সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা ভক্তিকেন্দ্রিক কৃষ্ণ সাধনার যে কাঠামো তৈরি করেছেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হবে।

রূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের 'পূর্ব্ববিভাগ'-এ ভক্তিকে প্রাথমিক ভাবে চার ভাগে ভাগ বিভক্ত করেছেন—সামান্য ভক্তি, সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি এবং প্রেম ভক্তি। এই চারটি স্তর ক্রমোচ্চ ভাবে বিন্যস্ত। জীব গোস্বামীর *ভক্তিসন্দর্ভ*এ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, ভক্তির গুণাবলি, ভক্তের শ্রেণিবিভাগ, ভক্তির অধিকারী, ভক্তির মাধ্যম এবং ভক্তির সিদ্ধিক্রম বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভক্তিতত্ত্বের দুটি দিক পূর্ববর্তী ভক্তিমার্গের থেকে পৃথক। প্রথমত, শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে রাধার প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়ত, মঞ্জরীভাবের সাধনা। রূপ গোস্বামী প্রেম-ভক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় বলছেন[৩৪] যে ভাব ভক্তিতে দেহগেহাদি অন্য বিষয়ে মমতা দূরীভূত হয় অর্থাৎ নিজের দেহ, গৃহ— নিজস্ব ভালো মন্দের ধারণা থাকে না, সমস্ত মমতা বিষ্ণু বিষয়েই প্রযুক্ত হয়। অন্য সকল বিষয় থেকে আগ্রহ যখন কেবল বিষ্ণুতেই সংহত হয় তাকেই প্রেম-ভক্তি বলা হবে। এই প্রেম দুই প্রকার—ভাবোত্থ অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে মন যখন পরিশীলন প্রাপ্ত তাকেই বলা হবে ভাবোত্থ ভক্তি। ভাবোত্থভক্তির আবার দুটি প্রকার—বৈধভাবোত্থত ভক্তি—যখন ভক্ত নাম-কীর্তনে মত্ত, উচ্চ স্বরে কান্না, চিৎকার, গান, নাচ করছেন, কাউকেই পরোয়া করছেন না তাকে বলা হবে বৈধভাবোত্থতভক্তি। আবার কৃষ্ণমূর্তির ধ্যান করতে করতে ভক্ত যখন কৃষ্ণে মগ্ন হবে, চিত্তে বিশেষ প্রসন্নভাবে আসবে তাকে বলা হবে রাগানুগীয় ভাবোত্থ প্রেম-ভক্তি। ভাবোত্থ ভক্তির

---

[৩৩] মজুমদার, বিমানবিহারী. *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা. ১৩৬৮. পৃ. ৩৪-৩৬

[৩৪] দাস, শ্রীলহরিদাস (সম্পা.). *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০০৭. পৃ. ১৬৫-১৬২

পরের স্তর হল শ্রীহরির আর্তপ্রসাদোত্থ প্রেম-ভক্তি—যখন ভক্ত বেদাধ্যয়ন করেননি, মহাজন সঙ্গ করেননি, ব্রত-তপস্যার অনুষ্ঠান করেননি—কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাকে অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমভক্তি বলা হয়। অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম-ভক্তিও দুই প্রকার—মাহাত্ম্য জ্ঞান যুক্ত ও কেবল (মাধুর্যমাত্র) জ্ঞানযুক্ত। মাহাত্ম্যজ্ঞান বলতে বোঝায় ভক্তের মধ্যে যখন 'ইনিই ঈশ্বর'—এই বোধটি থাকে অর্থাৎ এক ধরনের দূরত্বের বোধ কাজ করে। অন্যদিকে কেবল জ্ঞানযুক্ত বলতে বোঝাচ্ছে যেখানে কোনও ফলাভিসন্ধান অর্থাৎ কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর ইচ্ছা থাকে না। বৈধী অর্থাৎ সাধন-ভজন ইত্যাদির মাধ্যমে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তি লাভ হয়। আর রাগানুগা ভক্তির মাধ্যমে লাভ হয় কেবল জ্ঞানযুক্ত ভক্তি। রূপ গোস্বামী বলছেন অজস্র শাস্ত্র অনুশীলন সত্ত্বেও ভক্তি রহস্যের উন্মোচন ঘটে না যা হয়ত প্রেম-ভক্তি নিমেষেই করে দিতে পারে। রূপ গোস্বামী প্রেম-ভক্তির যে পর্যায়ক্রমিক স্তর কল্পনা করেছেন তা নিম্নরূপ—

১. সাধুসঙ্গ এবং শ্রবণ থেকে শ্রদ্ধা
২. শ্রদ্ধা থেকে ভজনায় আগ্রহ
৩. ভজনা থেকে অনর্থ নিবৃত্তি
৪. নিষ্ঠা
৫. ভগবত বিষয়ে রুচি
৬. রুচি থেকে আসক্তি
৭. আসক্তি থেকে ভাব
৮. ভাব থেকে প্রেম

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পূর্ববর্তী ভারতবর্ষীয় ভক্তি সাধনায় প্রেমভক্তির উৎস থাকলেও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেমে উপনীত হওয়ার এই তাত্ত্বিক বিচার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশেষে অবদান। জীব গোস্বামী *ভক্তিসন্দর্ভ*-এ ভক্তির পাশাপাশি ভক্তেরও শ্রেণিবিভাগ করেছেন— প্রকৃত ভক্ত,

মধ্যম ভাগবত, উত্তম ভাগবত।[৩৫] ভক্তিমার্গে আরাধ্য, আরাধনার মাধ্যমের পাশাপাশি যিনি আরাধনা করছেন তারও গুরুত্ব জীব গোস্বামীর করা শ্রেণিবিভাগ থেকে স্পষ্ট হয়। ভক্তিমার্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে কেবল তত্ত্ব হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়নি, ভক্তিদর্শনের প্রয়োগের কথাও আমরা চৈতন্যকেন্দ্রিক ধর্ম দর্শনে পাচ্ছি। তত্ত্বগতভাবে, আপামর সকল জাতি এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে ভক্তিতে অধিকার রয়েছে। একারণে দেখা যাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরকে বৈষ্ণব ধর্মে গ্রহণ করেছে।[৩৬] এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে চৈতন্যদেব জাতপাতের সকল বাধা অতিক্রম করে সকলের মধ্যে সাধনার সমানাধিকার প্রবর্তন করেছিলেন অথবা চৈতন্যদেব জাতপাত মানতেন না এজাতীয় সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং ভাবপ্রবণ। তবে সামগ্রিকভাবে ভক্তিমার্গ জ্ঞান তথা কর্মমার্গের তুলনায় কিছুদূর নমনীয় হওয়ার কারণে ভক্তিসাধনা সাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পাশাপাশি ভক্তি নিম্নবর্ণ, মন্ত্রবর্জিত জাতি এবং নারীর কাছে সাধনার ক্রমোচ্চ বিন্যাসে কিছুদূর প্রবেশের অধিকার দিয়েছিল যা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

৬.২ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গুরু

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে প্রেমভক্তি হল মূল উপজীব্য। ভক্তিসূত্রের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছিলাম। প্রথম থেকেই তাত্ত্বিক ভাবে ভক্তি একই সঙ্গে সাধ্য তত্ত্ব এবং সাধন পথ। ভারতবর্ষের সাধনার ধারায় ভক্তির বিবিধ অভিব্যক্তির কথাও আমাদের আলোচনায় এসেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি হল প্রেমভক্তি। আগেই উল্লেখ করেছিলাম চৈতন্যদেবের পূর্বে

---

[৩৫] ভক্তিসিদ্ধান্ত, সরস্বতী (সম্পা.). *শ্রীভক্তিসন্দর্ভ.* কলকাতা: গৌড়ীয় মিশন. ১৪১২ বঙ্গাব্দ. পৃ. ১৮৮-১৯০

[৩৬] সুহৃদ পরিব্রাজক, মহারাজ. *শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর.* কলকাতা: গৌড়ীয় মিশন. ২০০৪. পৃ. ৩৪২

প্রেমভক্তির কথা স্পষ্টত পাওয়া যায় মাধবেন্দ্র পুরীর পদে এবং তাঁর সাধনায়। ‘পুরী’ উপাধি থেকে বোঝা যায় মাধবেন্দ্র পুরী শংকরাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের সাধনার সঙ্গে সরাসরি ভাগবতীয় বৈষ্ণব সাধনার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল শ্রীধরস্বামী-র *শ্রীমদ্ভাগববত*- এর উপর রচিত টীকা থেকে।[৩৭] শ্রীধর স্বামী শংকর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হয়েও নৃসিংহের উপাসক ছিলেন। তাঁর মতে ভক্তি হল অদ্বৈত বোধ তথা মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই টীকার সূত্রেই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি ভক্তিবাদী শাখার জন্ম হয়। মাধবেন্দ্রপুরী এই ভক্তিবাদী শাখারই উপাসক ছিলেন। তাঁর দীক্ষা হয়েছিল দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে। এই দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রেই চৈতন্যদেব-কে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরী গয়ায় দীক্ষা দান করেন। দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—এই মন্ত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য জ্ঞানের স্থান নেই এবং এই মন্ত্র হল কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার মন্ত্র।[৩৮] সুতরাং দীক্ষার দিক থেকে চৈতন্যদেবের মধ্যে প্রেমভক্তির উত্তরাধিকারই এসেছিল। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে চৈতন্যদেবের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের ব্রহ্মসূত্র নিয়ে যে তর্কটি ছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাসুদেব সার্বভৌমকে চৈতন্যদেব বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের জন্য ভগবদুপাসনা প্রয়োজন একথা আচার্য শঙ্কর নিজে বললেও মূল সমস্যা হয় শঙ্করাচার্যের সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যা যখন বেদান্তীরা করেন তখন। শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম চৈতন্যদেবের মতকে স্বীকার করেন।[৩৯] সুতরাং বেদান্তের সঙ্গে সরাসরি বিরোধের সম্পর্ক চৈতন্য সম্প্রদায়ে ছিল না। প্রসঙ্গত বলা দরকার মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

---

[৩৭] De, S.K. *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal.* Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1986. Reprint. pp. 17-18

[৩৮] চট্টোপাধ্যায়, গীতা. *ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য.* কলকাতা: কবি ও কবিতা. ১৩৭৯. প্রথম সং. পৃ. ১৬৩

[৩৯] স্বামী, সারদেশানন্দ. *শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ১৯৮৬. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৭৯-৮১

চৈতন্যদেব মাধবেন্দ্র পুরীর প্রবর্তিত সম্প্রদায়েরই উত্তরাধিকারী এবং অনেক পরে জয়পুরের কুলদেবতায় পূজার অধিকার বজায় রাখতেই মাধ্ব শাখার সঙ্গে চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের অনিবার্য তাত্ত্বিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল[৪০]—এই মতটিকেই আমরা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকার্য বলে মনে করি। চৈতন্যদেব নিজে প্রথাগত অর্থে তত্ত্ব প্রণেতা ছিলেন না, নিজে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে কাউকে মন্ত্র দীক্ষা দানও করেননি। চৈতন্যদেবের মন্ত্র শিষ্য হিসাবে একজন শিষ্যের কথা জানা যায়, শ্রীহট্টে ভ্রমণকালে তিনি গৌরীকান্তকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।[৪১] গৌরীকান্ত শ্রীচৈতন্যের জ্ঞাতিভাই। যদিও পরবর্তী সময়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার বা প্রসারে গৌরীকান্তের বিশেষ অবদানের কথা শোনা যায় না। চৈতন্যদেবের 'নির্দেশে' বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের হাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিস্তার হয়েছিল। ষড়গোস্বামীকে মন্ত্রদীক্ষা দান না করলেও কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপ গোস্বামীর প্রতি শক্তিপাতের মাধ্যমেই ভগবৎ-জ্ঞান সঞ্চারিত হয়েছিল—

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত।।
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপের উপর কৃপা করি সব সঞ্চারিল।।
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
সব তত্ত্ব সঞ্চারণে প্রবীণ করিল।।[৪২]

চৈতন্যদেব সাধারণভাবে বৈষ্ণবের সমষ্টি গুরু হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন, ব্যষ্টি-গুরু হিসাবে নন।[৪৩] প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের মধ্যে রূপ, সনাতন এবং শ্রীজীব দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের উত্তরাধিকার বহন করতেন। তবে গোপাল ভট্ট-কে দক্ষিণ ভারতীয় বলা যাবে কি না এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। গোপাল ভট্ট-এর নামে একাধিক গ্রন্থের সন্ধান

---

[৪০] চট্টোপাধ্যায়, সুবীররঞ্জন. *ভারতীয় দর্শন প্রস্থানে বৈষ্ণব সাধনার ধারা.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮২. পৃ. ১২২-২৩

[৪১] চৌধুরী তত্ত্বনিধি, অচ্যুতচরণ. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা: কথা. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৯

[৪২] মাখনলাল ভাগবতভূষণ. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (মধ্যলীলা). কলকাতা: চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স. [ ]. প্রথম সং. পৃ. ৭৩৯

[৪৩] O'Connell, Joseph T. *Caitanya Vaisnavism in Bengal Social impact and Historical Implications.* London & New York: Routledge. 2019. pp. 30-31

পাওয়া যাচ্ছে, তবে সম্ভবত *কৃষ্ণকর্ণামৃত*-এর উপর রচিত 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকার রচয়িতা এবং *হরিভক্তিবিলাস* রচয়িতা গোপাল ভট্ট এক মানুষ ছিলেন না। *হরিভক্তিবিলাস*-এ গোপাল ভট্টের গুরু হিসাবে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কথা পাওয়া যাচ্ছে, ফলে গোপাল ভট্টের একটি বঙ্গদেশীয় উৎসের সম্ভাবনাকে ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকার করতে হবে।[88] রঘুনাথ দাস এবং রঘুনাথ গোস্বামীও বঙ্গদেশের মানুষ ছিলেন। সুতরাং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভাবনার মধ্যে বঙ্গদেশের যথেষ্ট যোগদান ছিল বলে মনে করাই যুক্তিযিক্ত হবে। তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব তত্ত্ব সব সময়েই সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে রচিত হয়েছিল।

আমাদের ইতিপূর্বে আলোচিত ধর্ম-দর্শনগুলি থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন চরিত্রের দিক থেকে পৃথক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গুরুর ভূমিকা বোঝার জন্য আমরা কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। প্রথমত, বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে অবতার তত্ত্ব এবং গুরু হিসাবে চৈতন্যদেবের ভূমিকা আমরা বুঝতে চাইব এবং রসতত্ত্বের সঙ্গে গুরুতত্ত্বের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চাইব। দ্বিতীয়ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার প্রধান সাধন সিদ্ধান্তের সঙ্গে গুরু তত্ত্বের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হবে। তৃতীয়ত, আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার তিনটি প্রধান ভিত্তি—বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি এবং রাগাত্মিকা ভক্তিতে গুরুর অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের আলোচনায় মূলত বাংলা এবং সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সাহায্য নেওয়া হবে।

চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে তাঁর জীবনের যে সময়টি কাটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যেই সাধারণ ভক্তেরা তাঁর অবতারত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁকে উপাস্যের সম্মান দেওয়া হয়েছিল নবদ্বীপ লীলাতেই। বঙ্গদেশ এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভাবনায় পার্থক্য আদৌ করা যাবে কিনা এবিষয়ে সব-সময়েই তর্ক ছিল। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে সম্পাদিত *পদ্যাবলী*-তে বলা হয়েছে নবদ্বীপের

---

[88] দে, সুশীলকুমার. *নানা নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ.* কলকাতা: পারুল. ২০১১. প্রথম সং. পৃ. ৮০-৮১

সাধনা চৈতন্যদেব-কেন্দ্রিক অথচ বৃন্দাবনের সাধনা কৃষ্ণকেন্দ্রিক। কারণ নবদ্বীপে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে চরিত সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল তার পরিবর্তে ষড়গোস্বামীদের রচনায় চৈতন্যদেবের তুলনায় কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকেন্দ্রিক পুরাণের গল্পই উঠে এসেছিল মূল বিষয় হিসাবে। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার-ও এই মত সমর্থন করেছিলেন। পরে এই দুটি গবেষণার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত করেন বঙ্গদেশ এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সাধনার ফারাক পরিমাণগত মাত্র, গুণগত নয়।[৪৫] আমরা চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সাধনার দু'টি ভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে বিকশিত ভাবনাকে একটি ধর্ম-দর্শনের বিস্তারের স্তর হিসাবে দেখতে চাইব। বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের সমকালে চৈতন্যদেব ছাড়াও কয়েকটি বৈষ্ণব সাধনার অবস্থান লক্ষ করা যায়। যেমন অদ্বৈত আচার্য বা নরহরি সরকার প্রথম থেকেই বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কৃত্তিবাস ওঝার অনুবাদ এবং বঙ্গদেশে এই অনুবাদের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশের জনমানসে বৈষ্ণব ভাবনার একটি ভিত্তি তৈরি করে।[৪৬] শ্রীচৈতন্যের প্রতিষ্ঠার সূত্রে নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভাববিশ্বে কয়েকটি সংযোজন দেখা দেয়। প্রথমে উল্লেখ্য মুরারি গুপ্ত প্রণীত *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত*-র কথা। মুরারি গুপ্তের বর্ণনায় চৈতন্যদেব বরাহ অবতার দেখিয়েছিলেন শ্রীবাসকে।[৪৭] প্রবোধানন্দ সরস্বতী-র মতে কৃষ্ণ আরাধনার থেকে চৈতন্যদেবের আরাধনা বিশেষভাবে কাঙ্ক্ষিত।[৪৮] নবদ্বীপে যাঁরা গৌরাঙ্গকেই মূল আরাধ্য বলে মনে করতেন তাঁদের গৌরপারম্যবাদী বলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে শিষ্যদের দীক্ষাদানের সময়ে কিছু ক্ষেত্রে গোপালমন্ত্রের পরিবর্তে গৌরমন্ত্রে দীক্ষা দান করা হয়েছে।[৪৯] গৌরনাগরবাদের জন্ম হয় কুলিয়ার

---

[৪৫] চক্রবর্তী, জনার্দন. *আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক-গ্রন্থ.* কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী. ১৯৭৩. প্রথম প্রকাশ. পৃ.৫৬

[৪৬] Chakravarti, Janardan. *Bengal Vaishnavism and Sri Chaitanya*. Kolkata: The Asiatic Society. 2016. 2nd Reprint. p. 28

[৪৭] গোস্বামী, বিজন (অনু). *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত.* কলকাতা: মহেশ. ২০০০. প্রথম সং. পৃ. ৮০-৮৫

[৪৮] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন. *বাংলার ভক্তি আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারা.* নতুন দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস. ২০১৯. পৃ. ১৩

[৪৯] তদেব, পৃ. ১৫

বংশীবদন চট্টো-র পরম্পরায়, এই মতবাদের পরিপূরক হিসাবে গড়ে ওঠে নদিয়ানাগরী মতবাদ; চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই এই মতের মূল উপজীব্য।[৫০] আবার নরহরি সরকার এবং তাঁর শিষ্য লোচনদাসের রচনায় আমরা গৌরনাগরভাবের বিস্তার দেখতে পাচ্ছি। বাসুদেব ঘোষের পদে আমরা গৌরাঙ্গের প্রতি আক্ষেপানুরাগের পদ পাচ্ছি। যেমন—

কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে।
অনুখন গোরা প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে।।
গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম।
বসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম।।[৫১]

বাসু ঘোষের রচনায় আমরা গৌর-নাগরী ভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর রচনায় গৌরাঙ্গ হলেন প্রেমাস্পদ, কবি নিজে প্রেমিক।

বুক বিদরিয়া গোরা যতনে রাখব।
বিরলে বসিয়া গোরার মুখ নিরখিব।।
যতনে রাখিব গোরা নয়নে মেলিয়া।
যতনে বঞ্চিব গোরা-মুখখানি চাহিয়া।।
গোরা গোরা বলি ঘন ডাকে সব লোকে।
লুকায়ে রাখিব গোরা কেহ পাছে দেখে।।
বাসুদেব ঘোষ বলে হেন লয় মনে।
রাখিব যতন করি জীবন যৌবনে।।[৫২]

তবে এই প্রত্যেকটি মত পৃথক অস্তিত্বে খুব অল্পদিনই টিকে ছিল। খেতুরী মহোৎসব এবং বৃন্দাবনের সঙ্গে বঙ্গদেশের সমতা বিধানের পরে এই মতগুলির পৃথক অস্তিত্ব কিছু আচার অনুষ্ঠানেই হয়তো বেঁচে আছে মাত্র। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষাতেও এই মতবাদগুলির পৃথক অস্তিত্ব দেখতে পাইনি। বৃন্দাবন দাসের রচনায় পাচ্ছি চৈতন্যদেব কীর্তন শেষে বলছেন—

---

[৫০] তদেব, পৃ. ১৬

[৫১] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা). *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১০. পৃ. ১৭৫

[৫২] চাকী, মালবিকা (সম্পা.) *বসু ঘোষের পদাবলী.* কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৪১৭. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৭৭

কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।

মুঞি সেই ভগবান দেবকীনন্দন।।

অনন্ত ব্রহ্মান্ড কোটি মাঝে মুঞি নাথ।

যত গায় সেই মুঞি তোরা মোর দাস।[৫৩]

লোচন দাসের বর্ণনায়—

ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।

দীনভাব প্রকাশ করিব নিজ সুখে।।

ভক্ত জনের সঙ্গে ভকতি করিঞা।

নিজ প্রেম বিলাসিব ঈশ্বর হইঞা।।

নিজ গুণ সঙ্কীর্ত্তণ প্রকাশ করিব।

নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব।”[৫৪]

জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*-এ নারদ উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—

দ্বিজকুলে জন্মিব গৌর ভগবান।

অখিল জীবেরে করিবে প্রেমদান।[৫৫]

সুতরাং বঙ্গদেশের ভাবনায় মূলত ভক্তগণে প্রেমদান করার জন্যই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। মাধবেন্দ্র পুরী-র ভক্তিতেই কৃষ্ণ নিজে নিমাই রূপে জন্ম গ্রহণ করলেন, এই বর্ণনা দিয়েছেন চূড়ামণি দাস। চূড়ামণি দাসের বর্ণনা অনুযায়ী নদীয়ায় অদ্বৈত, শ্রীবাস মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ‘কৃষ্ণাবেশ’ প্রাপ্ত হন।[৫৬] নীলাচলে সার্বভৌমের ঘরে চৈতন্যদেবের দশাবতারের বিভিন্নরূপ এবং ষড়ভুজরূপ প্রদর্শনের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে—

---

[৫৩] সেন, সুকুমার (সম্পা.). *চৈতন্যভাগবত.* নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১৫. পঞ্চম মুদ্রণ. ১১৯

[৫৪] ঘোড়ই, বিশ্বরঞ্জন (সম্পা.). *লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. ১৪০৭. প্রথম সং. পৃ. ১৩

[৫৫] মজুমদার, বিমানবিহারী, সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা). *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০১৬. দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ০৬

[৫৬] সেন, সুকুমার (সম্পা.). *গৌরাঙ্গ বিজয়.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০০২. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ০৭

এ সব দেখিয়া তাঁর সন্দেহ ঘুচিল।

ষড়রূপে প্রভু উঠি দাণ্ডাইল।।[৫৭]

বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ভাবনায় চৈতন্যদেব মূলত কৃষ্ণের অবতার, এই অবতার তত্ত্বের অন্যতম মূর্ত রূপ হল ষড়ভুজ চৈতন্য, যেখানে রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্যের সমবায় একই দেহে দেখানো হয়েছে। বঙ্গদেশের ভাবনায় চৈতন্যদেবের মূল বৈশিষ্ট্য অবতারত্বে। গুরু হিসাবে চৈতন্যদেবের অবদান প্রেম শিক্ষা দানে, কখনও কখনও জগাই-মাধাই উদ্ধারের মত ঘটনায়। বৃন্দাবনের তত্ত্ব ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে মূলত প্রেমাবতারের ধারণা বঙ্গদেশের চরিত এবং পদাবলীতে এসেছিল। নবদ্বীপে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের অবতার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তত্ত্বালোচনার পরে এই অবতারতত্ত্বে চৈতন্যদেব রাধার অবতার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। রাধা এবং কৃষ্ণের যুগলাবতারের তত্ত্বটি মূলত বৃন্দাবন চালিত, মহাপ্রভুর রাধাভাবের বর্ণনা বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ স্বীকৃত হয়নি।[৫৮]

বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভাবনার বিস্তার প্রাথমিকভাবে ষড়গোস্বামীর হাতে হয়েছিল। এই ছয় গোস্বামীর পূর্বে ভূগর্ভ গোস্বামী এবং লোকনাথ গোস্বামী-কে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে প্রেরণ করেছিলেন। চৈতন্য-প্রবর্তিত কৃষ্ণকেন্দ্রিক বৈষ্ণব সাধনাকে সর্বভারতীয় রূপ দানের চেষ্টা ছিল এই গোস্বামীদের। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে গোস্বামীদের অজস্র তত্ত্বগ্রন্থ এবং সাহিত্যের মাধ্যমে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন তৈরি হয়। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* রচনার আগে পর্যন্ত বৃন্দাবনের তত্ত্ব-কাঠামোর মূল বক্তব্যগুলি নির্মিত হলেও তা সংহত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্জন করেনি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমকালে চৈতন্য সম্প্রদায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গুরু-কেন্দ্রিক সাধনা ছিল, যাঁরা কৃষ্ণ উপাসনা এবং চৈতন্যদেবকে

---

[৫৭] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা). *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১০. পৃ. ১৮২

[৫৮] রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর. *বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য.* কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৪৯. প্রথম সং. পৃ. ২৬১

স্বীকার করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাতেই সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম একটি সংহত রূপ অর্জনে সমর্থ হয়। বঙ্গদেশের সমকালীন বৈষ্ণব আরাধনায় রাধা তখনো মূলতত্ত্ব রূপে স্বীকৃত ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নরহরি সরকার বা লোচন দাসের নাম বারংবার উল্লেখ করলেও গৌরনাগর ভাবের সাধনাকে স্বীকার করেননি।[৫৯] কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাতে সংহতি প্রাপ্ত দর্শনই ক্রমে চৈতন্যকেন্দ্রিক সাধনার মূল স্রোতে পরিণত হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নির্মিত হয়েছিল সর্বভারতীয় সাধনার সঙ্গে পারম্পর্য রক্ষা করেই। ধর্ম-সাধনায় প্রতিগ্রহণের তত্ত্ব কীভাবে কাজ করে তা বোঝা যায় গোস্বামীদের প্রচেষ্টায়। আমরা দেখছি গোস্বামীরা কেবল ধর্ম-সাধনার নিয়মই তৈরি করেননি, পাশাপাশি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিজস্ব দার্শনিক সিদ্ধান্ত তৈরি করেছেন। দার্শনিক দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মূল অবদান অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। পাশাপাশি দীক্ষিত বৈষ্ণবদের কাব্য পাঠ এবং রচনার জন্য রসতত্ত্বের প্রবর্তন একই রকম গুরুত্বের সঙ্গে বিচার্য। আমরা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মধ্যে চৈতন্যদেব ও গুরু ধারণা কীভাবে কাজ করছে তা বোঝার চেষ্টা করব। আমরা ইতিপূর্বে পাঁচটি অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছিলাম যিনি একটি তত্ত্ব-দর্শন প্রবর্তন করেন তাঁকে ঘিরেই সম্প্রদায়টি গঠিত হয়। শংকরদেব বা কবীর প্রত্যেকেই তাঁদের সাধনায় গুরু হিসাবে স্বীকৃত। অথচ বঙ্গদেশ বা বৃন্দাবন উভয় স্থানের তত্ত্বেই চৈতন্যদেব হলেন স্বয়ং ভগবান। ভগবান এবং সাধকের মধ্যে একধরনের যোগাযোগ স্থাপন করাই যদি গুরুর প্রাথমিক লক্ষ্য হয় এবং গুরু যদি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত করেন তাহলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরু কে হবেন? স্মরণীয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চরম পুরুষার্থ মোক্ষ নয়, ভক্তিই তাঁদের মূল সাধ্য। সুতরাং এই সাধনায় ভক্তির চূড়ান্ত মূর্তি চৈতন্যদেব তো নিজেই ভক্তের সাধ্যবস্তু। এই প্রশ্নের সাপেক্ষেই আমরা গোস্বামীদের তত্ত্ব এবং

---

[৫৯] Stewart, Tony K. *The Final Word*. New York: Oxford University Press. 2010. 1st Edition. pp. 194-195

অন্যান্য সাহিত্যিক উৎস থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা কীভাবে গুরুতত্ত্ব, সাধ্যতত্ত্ব তথা গৌরাঙ্গ তত্ত্বের মধ্যে সমতা রক্ষা করলেন। তবে দার্শনিক সিদ্ধান্তে মনোনিবেশের আগে আমরা দেখতে চাইছি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে সমকালীন রাজশক্তির সম্পর্ক কেমন ছিল। কারণ নতুন একটি সাধনার ধারা যদি রাজশক্তির সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয় তবে কখনই ধর্মমত শক্তিশালী হতে পারে না। আমরা দেখছি বৃন্দাবনের চৈতন্য সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান মন্দির ছিল মানসিংহ নির্মিত গোবিন্দদেবজী-র মন্দির। এই মন্দিরের অর্চা বিগ্রহ হল গোবিন্দদেব এবং বৃন্দাদেবী। লক্ষণীয়, সংস্কৃত শাস্ত্রে গোবিন্দদেবের সঙ্গে অর্চিত দেবী বিগ্রহকে রাধা বলা হয়নি। একটি পার্সি রচনায় এই মূর্তির রাধা নাম পাওয়া যাচ্ছে। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেব রূপ গোস্বামীর জীবদ্দশাতে এই মূর্তিটি গোবিন্দদেবের মন্দিরে দান করেছিলেন।[৬০] রূপ গোস্বামীর পরে জীব গোস্বামী এই মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোবিন্দদেবজী-র মন্দির এবং চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের আরো একাধিক মন্দির মুঘল রাজশক্তির সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবরের রাজসভার তরফে মন্ত্রী টোডরমল জীব গোস্বামীর উদ্দেশে একটি ফরমান জারি করে এই মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৬১] আকবর বৃন্দাবনের মোট ৩৫টি মন্দিরের জন্য ১০০০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। এরমধ্যে গোবিন্দদেবজী-র মন্দিরে দান করা হয়েছিল ১৩৫ বিঘা জমি। পাশাপাশি আকবর বৃন্দাবনে পশুহত্যা নিষেধ করার ফরমানও জারি করেছিলেন।[৬২] জাহাঙ্গীরের সময়ে এই দান একই রকম ছিল, জাহাঙ্গীর এর সঙ্গে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন মন্দিরের সেবক গোপালদাসকে

---

[৬০] Horstmann, Monika. *In favour of Govinddevji*. New Delhi: Manohar. 1999. 1st publication. p. 04

[৬১] Mukherjee, Tarapada, Irfan Habib. 'Akbar and the temples of Mathura and its Environs'. Proceedings of the History Congress. 1987. Vol- 48. pp. 237

[৬২] দত্ত, পুলিনবিহারী. 'মুসলমানযুগে মথুরা'. মানসী ও মর্ম্মবাণী. চৈত্র, ১৩৩১. পৃ. ২১৫

১০০ বিঘা জমি দান করেছিলেন।[৬৩] আকবরের দানের পাশাপাশি জাহাঙ্গীর আরও দুটি মন্দিরেও দান করেছিলেন। শাহজাহানও মদনমোহন মন্দিরে ১৩৫ বিঘা জমি দান করেছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে।[৬৪] সুতরাং আকবরের পরেও পৃষ্ঠপোষকতার ধারা বজায় ছিল, তবে ঔরঙ্গজেবের সময়ে এই দান বন্ধ হয় এবং ক্ষতির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে স্থানান্তর করানো হয় গোবিন্দদেব এবং বৃন্দাদেবীর মূর্তি। মুঘলদের পরে রাজস্থানের কাছবার রাজবংশের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতাও এই মন্দির পেয়েছিল।[৬৫] কাছবার রাজবংশের রাজাই পরম্পরাক্রমে এই মন্দিরের মালিক রূপে স্বীকৃত হলেন। তবে মন্দির পরিচালনের দায়িত্ব ছিল 'অধিকারী'-দের (চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব গুরুদের)। রামসিংহ (খ্রি. ১৬৬৭-৮৯)-এর সময় গোবিন্দদেবজী-র মন্দিরে বিগ্রহ পুনরায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর সময় থেকে শুরু করে দ্বিতীয় রামসিংহ (খ্রি. ১৮৩৫-৫১) অবধি আমরা পরম্পরাক্রমে এই মন্দিরে কাছবার রাজপরিবারের দানের বিবরণ পাচ্ছি। বৃন্দাবনের একাধিক দেববিগ্রহ পরে রাজস্থানের বিভিন্ন রাজপরিবারে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেমন রূপ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত এবং জীব গোস্বামী-র আরাধ্য রাধা-দামোদরজী-র মূর্তিটি বর্তমানে জয়পুরে পূজিত হয়।[৬৬] আমাদের মনে হয় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মূল স্রোতে পরিণত হয়েছিল তাঁর অন্যতম কারণ ছিল এই রাজশক্তির আনুকূল্য এবং বৃন্দাবনের ভৌগোলিক অবস্থান। বৃন্দাবন কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরই কেন্দ্র ছিল না, বল্লভাচার্য সম্প্রদায় এবং অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও কেন্দ্র ছিল। ফলে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদের মধ্যেও বৃন্দাবনের প্রতি অনুরাগের জন্ম হয়। প্রসঙ্গত বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

---

[৬৩] Mukherjee, Tarapada, Irfan Habib. 'The Mughal administration and the temples of Vrindavan during the reigns of Jahangir and Shahjahan'. Proceedings of the History Congress. 1988. Vol- 49. pp. 288-289

[৬৪] তদেব, পৃ. ২৯০

[৬৫] Horstmann, Monika. *In favour of Govinddevji*. New Delhi: Manohar. 1999. 1st publication. p. 14-29

[৬৬] দত্ত, পুলিনবিহারী. *বৃন্দাবন কথা.* কলকাতা: [ ]. ১৯২০. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৭

ক্রমশ বৃন্দাবনের ঘরানাকে আত্তীকরণ করার চেষ্টার কথা উল্লেখ করা যায়। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটায় রাজস্থানী চিত্ররীতির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের ঘরানায় বৃন্দাবনের সঙ্গীতচর্চার প্রভাবের কথাও বলা হয়েছে।[৬৭] সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে গুরুত্ব অর্জন করার জন্য বৃন্দাবনের অনুকরণই ছিল প্রধান উপায়। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল—দু-একটি উদাহরণ বাদ দিলে বিষ্ণুপুরের মন্দির ভাস্কর্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।[৬৮] বোঝা যায় সর্বভারতীয় এবং 'সনাতন' ধর্মের অংশ হতে চৈতন্যদেবের প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক, মুঘল এবং রাজপুত পৃষ্ঠপোষকতা এবং উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্পর্শের সূত্রে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবধর্মই সর্বাধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং ক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি সর্বভারতীয় রূপ নির্মিত হয়। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সাধনার নিজস্বতা মিশে যায় এই স্রোতে।

বৃন্দাবনের তত্ত্ব-কাঠামোর অন্যতম সংযোজন ছিল অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের পূর্বসূত্র হিসাবে রাখতে হবে আচার্য শংকরের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের বিতর্ককে। সহজে বললে, জীব এবং ব্রহ্মের সম্পর্ক কীরকম—এই প্রশ্নের সূত্রেই যাবতীয় বিতর্কের সূচনা। রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক এবং মধ্বাচার্যের কথা আমরা আগের উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম। আচার্য নিম্বার্ক বাদে এঁরা সকলেই দ্বৈতবাদী শাখার অন্তর্গত। 'ভেদাভেদ' বলতে বোঝায় ভিন্নও বটে আবার অভিন্নও বটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পূর্বেও ভেদাভেদ দর্শনের অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়।[৬৯] *ব্রহ্মসূত্র*-এ আচার্য আশ্মরথ্য এবং ঔড়ুলোমি নামক দুই আচার্যের নাম পাওয়া যায় যাঁরা ভেদাভেদ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আশ্মরথ্যের ভেদাভেদ তত্ত্ব হল সমকালিক অর্থাৎ

---

[৬৭] দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন. *ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা.* বিষ্ণুপুর: সুষমা দাশগুপ্ত প্রকাশিত. ২০০০. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৯৮

[৬৮] তদেব. পৃ. ১৪৭

[৬৯] দাশগুপ্ত, শিবপ্রসাদ. 'অচিন্ত্যভেদাভেদদর্শনের বিকাশধারা'. *বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০০৯. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৪৪৭-৮৯০

একই সময়ে একই বস্তুতে ভেদ এবং অভেদ তত্ত্ব কাজ করে। এই তত্ত্বে ভেদ এবং অভেদ তত্ত্বের দুটিকেই স্বীকার করা হয়েছে। ঔডুলোমি-র তত্ত্ব-কে বলা হয় অসমকালিক ভেদাভেদ, সেখানে একই সঙ্গে দুটি বিপরীত বোধকে সত্য বলে মনে করা সম্ভব নয়। এই অসমকালিক ভেদাভেদের বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভেদ ভাবকে শেষ অবধি অস্বীকার করা হয়। প্রাচীন পাঞ্চরাত্রপন্থী বৈষ্ণবেরা এই অসমকালিক ভেদাভেদ তত্ত্বকে স্বীকার করতেন। এই দুটি মতবাদই *ব্রহ্মসূত্র* পূর্ববর্তী তত্ত্ব। পরবর্তী সময়ে ভাস্করের ঔপাধিক ভেদাভেদ তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তত্ত্বে তিনটি দশার উল্লেখ করা হয়—প্রথমে অভেদ, পরে ভেদাভেদ এবং পরিশেষে অভেদ দশা। এই তিনটি মতবাদই আচার্য রামানুজ খণ্ডন করেন। পরবর্তী সময়ে আচার্য নিম্বার্ক *বেদান্তপারিজাতসৌরভ*-এ জীব এবং ঈশ্বরে একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার সাপেক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভেদাভেদতত্ত্বে সংযোজন হল জীব এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধকে 'অচিন্ত্যতত্ত্ব'-এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা। জীব এবং ব্রহ্মের এই সম্পর্ক যেমন অচিন্ত্য তেমনই অচিন্ত্য হল রাধা এবং কৃষ্ণের সম্পর্ককে সাধারণ জীবের ভেদ বুদ্ধিতে বোঝার চেষ্টা করা। একইভাবে অচিন্ত্য তত্ত্বই হল রাধা এবং কৃষ্ণের যুগলাবতার হিসাবে চৈতন্যদেব-কে ব্যাখ্যা করার উপায়। কবিকর্ণপুরের *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত* মহাকাব্য অনুসারে দেখা যায় শ্রীবাস চৈতন্যদেবকে তার পূর্বলীলা অর্থাৎ ব্রজলীলার আখ্যান বর্ণনা করছেন, এবং চৈতন্যদেব তাতে পুলকিত হয়েছেন।[৭০] প্রকৃতপক্ষে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগ্মতার কারণেই চৈতন্যদেব পূর্ণ ভগবান এবং পূর্ণাবতার।[৭১] এখানেই বঙ্গীয় অবতার তত্ত্বের সঙ্গে বৃন্দাবনের অবতার তত্ত্বের মূল ফারাক। বঙ্গদেশের ভাবনায় চৈতন্যদেব প্রেম দানের জন্য আবির্ভূত। বৃন্দাবনের ভাবনায়—রাগমার্গে ভক্তি প্রচার গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন, একই দেহে থেকে এই আস্বাদন

---

[৭০] গোস্বামী, প্রাণকিশোর. *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত.* কলকাতা: শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির. ১৯৫৮. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৪৫

[৭১] ভাগবতভূষণ, মাখনলাল. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদি লীলা). কলিকাতা: রাখালদাস বরাট প্রকাশিত. [ ]. প্রথম সং. পৃ. ১৯১-৯২

প্রক্রিয়া চলেছে। কবিকর্ণপুর-এর *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক*-এ এই দুই স্রোতের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের প্রেমতত্ত্ব আস্বাদন এবং সেই সূত্রেই এই প্রেম রস সর্বজীবে সঞ্চারিত হয়েছে—

সর্ব্ব পুরুষার্থ আর, ব্যর্থ করে কথা যার;
সে রস করিতে আস্বাদন।
গৌরবর্ণ দেহ ধরি, শচী গৃহে অবতরি;
সদায় আস্বাদ সেই ধন।।
গণ্ডূষ করিয়া যেন, সুধা সার পিতেছেন;
রন্ধ্র দিয়া পড়ে তার কণা।
আমরাহ ভাগ্য বশে, পায়্যা প্রেম কণা রসে
কৃত্যকৃত্য করিব আপনা।।[৭২]

সুতরাং বৃন্দাবনের অবতারতত্ত্ব এবং গৌরাঙ্গতত্ত্ব ব্যাখার মূল পথ ছিল অচিন্ত্যভেদাভেদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেমভক্তির গুরু হিসাবে চৈতন্যদেবের ভূমিকা গৌণ।

এবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রসতত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। ধর্মতত্ত্ব, সাধনপদ্ধতি এবং রসতত্ত্ব—এই তিনটি দিক থেকে একই সিদ্ধান্তকে স্পর্শ করতে পারাই ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মূল উদ্দেশ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুযায়ী একমাত্র স্থায়িভাব হল কৃষ্ণরতি এবং ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু। মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিকে রস হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন এবং দেখান ভক্তির ক্ষেত্রে স্থায়িভাবের (ভক্ত) সঙ্গে আলম্বন বিভাব (ভগবান) কখনো রসত্ব প্রাপ্ত হয় না।[৭৩] *মুক্তাফল* গ্রন্থের হেমাদ্রির নামে প্রচলিত 'কৈবল্যদীপিকা' টীকায় ব্যোপদেব ভক্তিরসকে স্বীকার করেন।[৭৪] আচার্য ভরতের রসতত্ত্বে আমরা দেখেছি প্রত্যেকটি রসের সঙ্গে একজন দেবতার সম্পর্ক স্বীকার করা

---

[৭২] প্রেমদাস (পয়ারে অনুবাদিত). *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক.* কলকাতা: কমলাসন যন্ত্র. ১৭৭৫ শকাব্দ. পৃ. ৩৪-৩৫

[৭৩] সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দুর্গাচরণ. *ভক্তিরসায়ন*- মধুসূদন সরস্বতী. কলকাতা: সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশিত. ১৩৪০. প্রথম সং. পৃ. ৩৫

[৭৪] চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী. *ভক্তিরসের বিবর্তন.* কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ. ১৯৭২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৯

হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে রসতত্ত্বের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ হলেন রসের মূল অধিষ্ঠাতা। জ্ঞান নির্ভর সাধনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম স্বীকার করছে অন্যভাবে। এঁদের মতানুযায়ী ভক্তি হল প্রকৃতি, জ্ঞান হল বিকৃতি। ভক্তির বিকৃতি বা পরিণতি জ্ঞান। যেমন দুধের বিকৃতি দই, কিন্তু দই-র বিকৃতি দুধ নয়। একই ভাবে ভক্তি থেকে জ্ঞান হতে পারে কিন্তু জ্ঞানের থেকে ভক্তি হবে না।[৭৫] সুতরাং ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পুরুষার্থ অর্জনের মূল পথ। আবার নামকীর্তন এবং লীলা শ্রবণ ভক্তিমার্গে প্রবেশের মূল পথ। তাই সাধকের জন্য রসতত্ত্বের প্রয়োজন ছিল। আবার রসতত্ত্বের মূলতত্ত্ব হল শৃঙ্গার বা কাম তত্ত্ব। তন্ত্রতত্ত্বে কামকলা কুণ্ডলিনী সকল মন্ত্র তথা বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বীজরূপে স্বীকৃত হয়েছে এবং 'কাম' দুই প্রকারে অভিব্যক্ত হয়- বিমর্শ শক্তি এবং প্রকাশ শক্তি।[৭৬] *ললিতাসহস্রনাম*-এ দেবীর বিশেষণ সর্বেশ্বরী, সর্বময়ী, সর্বমন্ত্রস্বরূপিণী, বিজ্ঞানঘনরূপিণী, শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণা এবং কামকলারূপা।[৭৭] সুতরাং আরাধ্য দেবতাকে রসতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার প্রচেষ্টা গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম সাধনাতেও স্বীকৃত ছিল। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*- এর টীকায় পূজারী গোস্বামী দশাবতারের সঙ্গে রসের সম্পর্ক স্বীকার করেছিলেন। *রসিকপ্রিয়া* টীকায় রাণা কুম্ভ পূজারী গোস্বামীর মতকে স্বীকার না করলেও দুজনেই কৃষ্ণকে শান্ত এবং শৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেছিলেন।[৭৮] গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতানুযায়ী কৃষ্ণ হলেন মধুর রসের অধিষ্ঠাতা এবং রসিকশেখর বা রসিকশ্রেষ্ঠ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বে মধুর রসে শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যের গুণগুলি আত্তীকৃত হয়েছে। রূপ গোস্বামী-র *দানকেলিকৌমুদী* নামক ভাণিকায়

[৭৫] চক্রবর্তী, জনার্দন. *শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি.* কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৯৭. পৃ. ৬১

[৭৬] স্বামী, প্রজ্ঞানানন্দ. *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস* (প্রথম ভাগ). কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ. ১৯৭০. প্রথম সং. পৃ. ৬৯

[৭৭] [ ]. *সহস্রনামস্তোত্রাবলী.* হাওড়া: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৫. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪২

[৭৮] স্বামী, প্রজ্ঞানানন্দ. *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস* (প্রথম ভাগ). কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ. ১৯৭০. প্রথম সং. পৃ. ৭০

কৃষ্ণকে 'গান্ধর্ববিদ্যারসিকবৃন্দচূড়ামণি' বলা হয়েছে।[৭৯] প্রবোধানন্দ সরস্বতী-র *আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধঃ*-এ কেবলমাত্র কৃষ্ণের রসই যে পরমাশ্চর্য প্রেমবিকারের কারণ তা বলা হয়েছে।[৮০] রূপ গোস্বামী সংকলিত *পদ্যাবলী*-তে সংকলিত রঘুপতি উপাধ্যায়ের একটি পদের কথা বলা যেতে পারে- কণাদের মত, আন্বিক্ষিকীতর্ক, মীমাংসা, যোগ কোন মতেই কবির মন আকৃষ্ট হয়নি, মাধুর্যধারাময়ী নন্দনন্দনের প্রতিই কবির মন ধাবিত হয়েছে।[৮১] সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তত্ত্ব কাঠামো-তে রসিক শেখর কৃষ্ণই সকল তত্ত্ব, বিদ্যা তথা রসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। একারণেই কৃষ্ণ হলেন রস শিক্ষার শ্রেষ্ঠ গুরু। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*-র 'বিভাবলহরী'-তে বলা হয়েছে কৃষ্ণই গুরুরূপে গোপীদের রসের পাঠ দিয়েছিলেন।[৮২] আবার কৃষ্ণের যাবতীয় রসের উৎসার হয় তার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার থেকে। মাঞ্জিষ্ঠ রাগের অধিকারিণী রাধার রাগ ম্লান হয়না, তা অন্য নিরপেক্ষে। সুতরাং *উজ্জ্বলনীলমণি*-র মতানুযায়ী রাধা এবং কৃষ্ণের এই প্রেম এবং তাঁদের তত্ত্বগত সাম্য সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না এবং প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত সৃষ্টির সঙ্গে তার তুলনা করাও যায় না।[৮৩] সুতরাং কৃষ্ণ হলেন রসের অধিপতি এবং সেই রসতত্ত্বের কেন্দ্রে আছেন রাধা। কৃষ্ণ রসের শিক্ষাদাতা কিন্তু মহাভাবের অধিকারী বলে রাধা হলেন প্রেমরস শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। এই সূত্রটিকে মাথায় রাখলে আমরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্পর্কটি বুঝতে পারব কারণ চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের তত্ত্বানুযায়ী যুগলাবতার এবং সেই অবতারের মূল কারণ রাধার প্রেমের মহিমা বোঝার চেষ্টা। যেহেতু কৃষ্ণের রস মহিমা অপ্রাকৃত তাই সেই রসের শিক্ষা একমাত্র কৃষ্ণ থেকেই পাওয়া সম্ভব। আর চৈতন্যদেব হলেন এই রসতত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ, রাধাভাব স্বরূপ।

[৭৯] গোস্বামী, বিজন. *দানকেলিকৌমুদী.* কলকাতা: মহেশ. ১৪০৫. প্রথম সং. পৃ. ০৬

[৮০] দাস, হরিদাস. *শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা তথা আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১২. প্রথম সং. পৃ. ৪৫

[৮১] বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ. *পদ্যাবলী.* মুর্শিদাবাদ: রামদেব মিশ্র প্রকাশিত. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ৯৮

[৮২] দাস, হরিদাস. *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪১৪. প্রথম সং. পৃ. ২৫০

[৮৩] দাস, হরিদাস. *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪১৪. প্রথম সং. পৃ. ৪১৫

সুতরাং রসতত্ত্বের দিক থেকে চৈতন্যদেবের অবস্থান রস শিক্ষার গুরুরূপে নির্ণয় করাই যথোপযুক্ত বলে আমরা মনে করি। সাধারণ লোকের কাছে অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম একটি অমূর্ত ভাবনা মাত্র, কিন্তু এই সকল তত্ত্ব বিষয়ীভূত হয়েছিল চৈতন্যদেবের জীবনে। তাই চৈতন্যদেবের জীবন ভক্তের কাছে অপ্রাকৃত রাধাপ্রেমের ব্যাখ্যারূপে স্বীকৃত হয়েছে।[৮৪] প্রসঙ্গত নরহরি সরকারের একটি পদের কথা বলা যেতে পারে-

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা
জগতে জানাত কে।।[৮৫]

গৌরাঙ্গের মাধ্যমেই রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব, এই তত্ত্বে কবিকর্ণপুর বিশ্বাসী ছিলেন।[৮৬] গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের দিক থেকে তাহলে চৈতন্যদেবের অবস্থান রস শিক্ষাদানের গুরু হিসাবে স্বীকার করা যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন কিন্তু মূলত দীক্ষিত ভক্তদের কথা মাথায় রেখে রচিত হয়েছিল। সাধারণভাবে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের একটি প্রবণতা হল দেবাদি এবং গুরু বিষয়ক ভক্তিকে ভাবের পর্যায়েই সীমিত রাখা। যেমন, মম্মটভট্টের *কাব্যপ্রকাশ*-এর চতুর্থ উল্লাসে দেবতা, গুরু, নৃপ, পুত্রাদিবিষয়ক রতিতে রসের অপ্রাপ্যতার কথা বলা হয়েছে।[৮৭] আচার্য জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর*-এ বলা হয়েছে স্ত্রী-পুরুষের চিত্তবৃত্তিতে পরস্পরের আলম্বন রতি হবে, কিন্তু যদি আলম্বন হয় গুরু, দেবতা বা পুত্র হলে তা ব্যভিচারী ভাব হবে, সুতরাং রসত্ব হবে না।[৮৮] যেহেতু রূপ গোস্বামী কেবল দীক্ষিত ভক্তদের কথা স্মরণে রেখে

---

[৮৪] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— দর্শনে ও সাহিত্যে.* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং. ১৩৭০. তৃতীয় সং. পৃ. ২৬৪

[৮৫] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা). *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১০. পৃ. ১৫০-৫১

[৮৬] Lutjeharma, Rembert. *A Vaisnavva Poet in Early Modern Bengal*. New Delhi: Oxford University Press. 2018. First Edition. p. 320

[৮৭] মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত. *কাব্যপ্রকাশঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪২৪. দ্বিতীয় প্রকাশ. পৃ. ১৮২

[৮৮] Chatterjee, Chinmayi *Rasagangadhara*. Kolkata: The Asiatic Society. 2018. Reprint. p. 89

কাব্যতত্ত্ব তৈরি করেছিলেন তাই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রসতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা আমরা গোস্বামীদের রচনায় পাচ্ছি না। কৃষ্ণকেন্দ্রিক ভক্তিরসকে সামগ্রিক ভাবে সকল পাঠকের জন্য প্রযোজ্য রসের তত্ত্বে সুচিন্তিত রূপ দিয়েছেন কবিকর্ণপুর তাঁর *অলঙ্কারকৌস্তুভ*-এ। তাঁর মতে কবি কাব্য রচনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গীয় গুণাবলী এবং সৌন্দর্যের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয়। পাঠকের মনে যে প্রেমানুভূতি সুপ্ত থাকে তা দেবতার সাধনা করে বা দেবতার নাম-সংকীর্তন থেকে জেগে উঠতে পারে। ক্রমে সেই প্রেম যথাযথ বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শে রসত্ব প্রাপ্ত হয়।[৮৯] এই অনুভূতি বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলের হতে পারে। এভাবেই প্রেম ভক্তির তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব পাঠকের বাইরে গিয়ে একটি বিস্তার অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

চৈতন্যদেব নিজে দীক্ষা প্রদান না করলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধনতত্ত্বের মূল কার্যক্রম নির্ধারণ করেছিলেন। যেহেতু চৈতন্যদেব নিজেই এই সাধনার মার্গ তৈরি করেন তাই সম্প্রদায়গত ভাবে চৈতন্যদেবকেই গুরু হিসাবে স্বীকার করতে হবে। রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনায় আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণের উপাসনায় কামগায়ত্রী এবং কামবীজের প্রসঙ্গ এসেছে। কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করে রায় রামানন্দ বলছেন—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।।[৯০]

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তির মাধ্যমে যে নিত্য নবায়মান মত্ততা তাকেই বলে অপ্রাকৃত-নবীন-মদন। এই কামবীজ হল ‘ক্লীং’ যা প্রণবের সঙ্গে তুলনীয়। এই বীজটি *বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র* থেকে গৃহীত। বীজের ‘ক’-এর অর্থ হল কৃষ্ণ, ‘ঈ’-র অর্থ হল শ্রীরাধা, ‘ল’ হল রাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেম সুখ এবং নাদ বিন্দু অনুস্বরের অর্থ হল শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বন মাধুর্য।[৯১] এই কামবীজ হল প্রণব

---

[৮৯] Ghosal, S.N. *Studies in Divine Aesthetics*. Santiniketan: Visva-Bharati. 1974. 1st Edition. pp. 50-51

[৯০] নাথ, রাধাগোবিন্দ. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (মধ্য লীলা- প্রথম খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩০৮

[৯১] তদেব, পৃ. ৩০৯

(ওঁ)-এর রসাত্মক রূপ। একইভাবে কামগায়ত্রী হল বৈদিক গায়ত্রীর রসাত্মক রূপ। কাম গায়ত্রী সাড়ে ছাব্বিশ অক্ষরের মন্ত্র—"কামদেবায় বিদ্মহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি, তন্নোহঙ্গ প্রচোদয়াৎ।" মীমাংসা দর্শনের মতে মন্ত্র দেবতাস্বরূপ। এই মন্ত্রের প্রত্যেকটি অক্ষরকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৯২] তাই কামগায়ত্রী জপের সঙ্গে যদি তার অর্থ চিন্তা করা হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরূপটি ফুটে ওঠে। একারণেই কাম গায়ত্রী জপের বিধান দেওয়া হয়েছে ইষ্ট মন্ত্র জপের পূর্বে।[৯৩] প্রণব-ই যে ঈশ্বরের মূর্তি এবং জগৎ সৃষ্টির কারণ—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা চৈতন্যদেবের মাধ্যমেই হয়েছিল। সুতরাং সাধনার মূল গায়ত্রী কী হবে তা চৈতন্যদেবই ঠিক করেছিলেন, একারণেই সম্প্রদায়ের গুরু হিসাবে চৈতন্যদেবকে স্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি বৈষ্ণবের কোন মন্ত্রে মুক্তি, সেই তারক ব্রহ্ম হরি নাম সংকীর্তনের মূল মন্ত্রটিও চৈতন্যদেবেরই নির্দেশিত ছিল। তারকব্রহ্ম বত্রিশ অক্ষর নামের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

অল্পাক্ষরে হরিনামের অর্থ কহি শুন।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ এ সত্য বচন।।
অষ্টাভিসার অষ্ট হরের মাধুর্য্য লহরী।
চারি কৃষ্ণনাম বিপ্রলম্ভরসে মনহারী।।
চারি রাম চারি সম্ভোগ রসলীলা।
নামের অর্থ গোস্বামীরা অপার বর্ণিলা।।[৯৪]

সুতরাং বীজাকারে কৃষ্ণের ব্রজলীলা এই তারকব্রহ্মে সমবায়িত হয়েছে। সম্প্রদায়ের সাধ্য এবং সাধনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ চৈতন্যদেব নিজেই করেছিলেন।

এবারে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তির বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুর ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। সামগ্রিক ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৈধী, রাগানুগা এবং রাগাত্মিকা ভক্তি, এই তিন প্রকার

---

[৯২] বিদ্যাভূষণ, রসিকমোহন. *রায় রামানন্দ.* [ ]. বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রকাশিত. ১৯৮৪. [ ]. ১১৬

[৯৩] নাথ, রাধাগোবিন্দ. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (মধ্য লীলা- দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৯৭৯

[৯৪] কিশোরী দাস বাবাজী. *তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামজপ ও কীর্তন-বিধান.* চৈতন্যডোবা: ঈশ্বরপুরী শ্রীপাট. ১৩১৪. দ্বিতীয় সং. পৃ. ০৪

ভক্তিকে স্বীকার করে। ইষ্ট বস্তুতে গাঢ় তৃষ্ণাকে বলা হয় রাগ।[৯৫] রাগ মার্গের সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে রাগাত্মিকা সাধনার একমাত্র অধিকার শ্রীরাধা এবং গোপীদের। কোন পর্যায়েই রাগাত্মিকা সাধনার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই। চৈতন্যদেব সে ক্ষেত্রে নিজে রাগাত্মিকা সাধনা করলেও তা ভক্তদের কাছে কেবল দৃষ্টান্তই। সুতরাং রাগাত্মিকা সাধনা যেহেতু ভক্তের সীমার বাইরে তাই এখানে গুরুর ভূমিকা নেই, এখানে সাধন তত্ত্ব মূলত আরাধ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও মনে রাখতে হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা রাগাত্মিকা ভক্তিকে স্বীকার না করলেও মীরা বাঈ-এর সাধনার ধারা কিন্তু রাগাত্মিকা সাধনা, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাদে ভারতবর্ষের কৃষ্ণ উপাসনার ধারায় রাগাত্মিকা ভক্তিকে স্বীকারও করা হয়েছে।

এবার আমরা বৈধী ভক্তিতে গুরুর ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান হলেও তাঁকেও প্রথাগত ভাবে গুরুর থেকেই দীক্ষা নিতে হয়েছিল। তবে দীক্ষা মন্ত্র দানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লোকশিক্ষার জন্যই কেশব ভারতীর থেকে চৈতন্যদেব দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসদীক্ষা চৈতন্যদেব স্বপ্নেই পেয়েছিলেন, পরে সেই মন্ত্রই চৈতন্যদেব কেশব ভারতীকে শুনিয়েছিলেন, ফলে চৈতন্যদেবই একভাবে কেশব ভারতীকে দিলেন সন্ন্যাস দীক্ষার মন্ত্র—

প্রভু কহে স্বপ্নে মোর কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন।।
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।
এত বলি প্রভু তান কর্ণে মন্ত্র কহে।।
ছলে প্রভু কৃপা করি তানে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহাবিস্ময় জন্মিল।।[৯৬]

---

[৯৫] ভট্টাচার্য, কুমুদরঞ্জন. *সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৯৭৮. প্রথম সং. পৃ. ১৫৩

[৯৬] সেন, সুকুমার. *চৈতন্যভাগবত.* নিউ দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১৫. পঞ্চম মুদ্রণ. পৃ. ২১০

বৈধী ভক্তির স্তরে চৈতন্যদেব শিক্ষাগুরু হিসাবে সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথ দাসকে প্রথমে অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগের নির্দেশ দান করেছিলেন-

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া;
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।।[৯৭]

পরে এই রঘুনাথ দাস-কে চৈতন্যদেব শিক্ষাগুরু হিসাবে মাধুকরী-র শিক্ষা দিয়েছিলেন, বৈষ্ণবের আচরণের শিক্ষাও দিয়েছিলেন—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে;
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ নাম সদা লবে;
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।।[৯৮]

বৈষ্ণবের আচরণের শিক্ষা প্রসঙ্গেই চৈতন্যদেব কথিত আটটি শিক্ষামূলক শ্লোককে মনে রাখা প্রয়োজন। সুতরাং বৈধী ভক্তির ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবই শিক্ষাগুরুর করণীয় নিজের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু—এই দু'টি প্রকারকে স্বীকার করেছিলেন। দীক্ষাগুরু একজনই হবেন, শিক্ষাগুরু একাধিক হতে পারে। ভক্তকে গুরুই ভক্তি মন্দিরের দরজায় এনে দেন। শিক্ষাগুরুর একাধিক ভাগ হতে পারে—শ্রবণগুরু, বর্ত্মোদ্দেশগুরু, শ্রবণগুরু ইত্যাদি। যেমন, কৃষ্ণদাস কবিরাজের দীক্ষাগুরু হলেন নিত্যানন্দ, শিক্ষাগুরুরা হলেন ষড়গোস্বামী। গুরু প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস বলছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে।।

এই শ্লোকে গুরু বলতে মন্ত্রগুরুকে বুঝতে হবে।[৯৯] শ্রবণগুরু এবং ভজনশিক্ষাগুরু প্রায়ই একজন হন, শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয়জ্ঞান জন্মায়। গুরু হলেন ইষ্ট এবং ভক্তের মধ্যবর্তী মন্থনকাষ্ঠ।[১০০]

---

[৯৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচতিমৃত.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০০৮. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৪১০

[৯৮] তদেব, পৃ. ৭৩৯-৪০

[৯৯] গোস্বামী, প্রাণগোপাল. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত.* রাধাকুণ্ড: প্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী প্রকাশিত. ১৩২৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ৫৯

[১০০] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী. *শ্রীভক্তিসন্দর্ভ.* কলকাতা: গৌড়ীয় মিশন. ১৪১২ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৩৪

গুরুর লক্ষণে গোপাল ভট্ট বলছেন- যাঁর বংশ পাতিত্যাদি দোষ রহিত, যিনি নিজে পাতিত্য দোষরহিত, আচারনিষ্ঠ, ক্রোধহীন, বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধাবান, অসূয়াহীন, প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশধারী, যুবা, সর্বভূতে নিরত, স্থিরমতি, আকাঙ্ক্ষাহীন, অহিংসক, বিবেচক, বাৎসল্যযুক্ত, কৃতজ্ঞ ইত্যাদি গুণের অধিকারী তিনিই গুরু হবেন। ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের গুরু হতে পারেন, বাকিরা বর্ণের ক্রমিক অবস্থান অনুসারে গুরু হতে পারেন। প্রতিলোম দীক্ষা স্বীকৃত নয়, সকল প্রকার শিক্ষা থাকলেও একমাত্র বৈষ্ণব হলেই দীক্ষাদান করা যাবে।[১০১] বৈধী ভক্তি এবং রাগানুগা এই দুই ভক্তিতেই সাধন ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ স্বীকার করা হয়। এই চৌষট্টি অঙ্গের প্রথম দুটি অঙ্গ হল গুরুপদাশ্রয় এবং দীক্ষাগ্রহণ। গুরুর পদাশ্রয় এবং দীক্ষা থেকেই বাকি যাবতীয় ভক্তির অঙ্গ প্রকাশিত হয় এবং গুরুর থেকে প্রাপ্ত দীক্ষা মন্ত্রই ভজনের বীজ রূপে কাজ করে। গুরু নির্বাচনের সময়ে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে[১০২]—প্রথমত, গুরু অবশ্যই বৈষ্ণব হবেন, দ্বিতীয়ত, গুরুকে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হতে হবে, অর্থাৎ গুরুর প্রদত্ত উপদেশ অবশ্যই পরম্পরাগত হতে হবে। তৃতীয়ত, গুরু যেন ভাবানুকুল সম্প্রদায়ভুক্ত হন, অর্থাৎ ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই মতের কোন একটি সাধনার ধারাকে অনুসরণ করে চলতে হবে। চতুর্থত, গুরু এবং শিষ্যের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অন্তরঙ্গ সিদ্ধদেহের ক্ষেত্রে গুরু যদি কান্তাভাবের সাধক হন, সিদ্ধদেহে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কিঙ্করীত্বের ইচ্ছা থাকবে, আর বাৎসল্যের সাধনা করলে যশোদার পদসেবা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। একারণে গুরু এবং ভক্ত অন্য ভাবের সাধনা করলে এক-ভাবের পরিকরভুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না। পঞ্চমত, গুরু ভাগবতের সিদ্ধান্তে সুনিপুণ হবেন। কিন্তু বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা অনুযায়ী

---

[১০১] ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত (অনু). *শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ.* কলকাতা: গিরিজা. ২০০৬. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ১৩-১৫

[১০২] নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (মধ্য-লীলা, দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১০৭২-১০৭৫

গুরুকে শব্দব্রহ্মবেদ এবং বেদের তাৎপর্যের জ্ঞাপক অন্যান্য শাস্ত্রেও পারঙ্গম হতে হবে; তা না হলে তিনি শিষ্যের সংশয় দূর করতে পারবেন না।[১০৩] ষষ্ঠত, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তির উৎসার হতে হবে। সপ্তমত, গুরুর পদাশ্রয় থেকেই যাবতীয় অপরাধের ক্ষমা লাভ করা সম্ভব এবং শেষত, ভুলক্রমে অবৈষ্ণবের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা হলে আবার বৈষ্ণব গুরুর থেকে দীক্ষা নিতে হবে। শেষে বলা দরকার, গোপালভট্ট তথা অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে কেবল ব্রাহ্মণকেই গুরু বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এই বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। বিশেষত, রায় রামানন্দ নিজেই চৈতন্যদেবে কাছে শিক্ষাগুরুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। অনেকের মতানুযায়ী বৈষ্ণব একটি স্বতন্ত্র জাতি, এর মধ্যে কোন জাতিবুদ্ধি থাকার কথা নয়। ভগবানে ভক্তি থাকলেই সে বৈষ্ণব হতে পারেন, যে বর্ণেই হোক না কেন বৈষ্ণব কখনো শূদ্র হতে পারেন না।[১০৪] তবে এই মতামত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মূল স্রোতে স্বীকৃত হয়নি।

এবার রাগানুগা সাধনায় গুরুর ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রাগানুগা ভক্তির মূল তাত্ত্বিক কাঠামো মঞ্জরী ভাবের সাধনা কেন্দ্রিক। বৃন্দাবনের তত্ত্বে মঞ্জরীভাবের সাধনার ভাবনা বীজ ছিল, পরে তা বঙ্গদেশের বৈষ্ণব গুরুদের মধ্যে আরও বিকশিত হয়েছিল। আপাতত আমরা গোস্বামীদের রচনায় মঞ্জরীভাবের সাধনার যে প্রসঙ্গ এসেছিল তা নিয়েই আলোচনা করব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বানুযায়ী মঞ্জরীরা হলেন গোপীদের কিঙ্কর। ভক্তের যেহেতু রাগাত্মিকা মার্গে প্রবেশের অধিকার নেই তাই সে মঞ্জরীর ভাবের সাধনাই করবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বানুযায়ী ষড় গোস্বামীরাও মঞ্জরী এবং নির্দিষ্ট কিছু সেবার অধিকারী। ষড়গোস্বামী সিদ্ধদেহে মঞ্জরীরই হতে পারবেন, গোপী হবেন না।[১০৫] তালিকার মাধ্যমে গোস্বামীদের মঞ্জরীর অবস্থান দেখা যেতে পারে—

[১০৩] বিদ্যাবিনোদ. সুন্দরানন্দদাস. *বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ.* কলকাতা: করুণা দাস প্রকাশিত. ১৯৬৪. প্রথম সং. পৃ. ১৩-১৪

[১০৪] তত্ত্ববাচস্পতি, মধুসূদন. *গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ইতিহাস বৈষ্ণব-বিবৃতি.* হুগলী: সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবনোদ. ১৩৩৩. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৯৮

[১০৫] দাস, গোবর্দ্ধন. *শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ* (২). বৃন্দাবন: দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১৯৬১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ঠ

গোস্বামীদের নাম	সিদ্ধনাম	দিক	গাত্রবর্ণ	ইষ্টকে যে উপাদানে সেবা করেন
রূপ গোস্বামী	শ্রীরূপমঞ্জরী	উত্তর	গোরোচনা	তাম্বুল
সনাতন গোস্বামী	শ্রীরতিমঞ্জরী/ শ্রীরাগমঞ্জরী/ শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী	অগ্নি/ পশ্চিম	বিদ্যুৎ	চরণ সেবার উপাদান/ মালা
শ্রীজীব গোস্বামী	বিলাসমঞ্জরী	নৈঋত	স্বর্ণকেতকী	অঞ্জনসিন্দুরা
রঘুনাথ দাস	রতিমঞ্জরী	অগ্নি	বিদ্যুৎ	চরণ সেবার উপাদান
রঘুনাথ ভট্ট	রাগমঞ্জরী	পূর্ব	ফুল্লচম্পক	চিত্র
গোপাল ভট্ট	অনঙ্গমঞ্জরী	--	বসন্তকেতকী[১০৬]	--

যেহেতু গোস্বামীরা রাগানুগা মার্গের সাধনা করতেন তাই তাঁরা মঞ্জরী অবধিই যেতে পারবেন, রাগাত্মিকা পর্যায়ে প্রবেশের অধিকার গোস্বামীদের নেই। অথচ চৈতন্যদেবের পার্ষদরা কিন্তু সিদ্ধদেহে গোপী নামের অধিকারী। যেমন—

পার্ষদের নাম	সিদ্ধদেহে গোপী নাম	দিক	বর্ণ	সেবা
স্বরূপ দামোদর	ললিতা	উত্তর	গোরোচনা	তাম্বুল
রায় রামানন্দ	বিশাখা	ঈশান	তড়িৎ	বস্ত্রাদি
গোবিন্দানন্দ ঠাকুর	শ্রীচিত্রা	পূর্ব	কাশ্মীর	চিত্র
বসু রামানন্দ	ইন্দুরেখা	অগ্নি	হরিতাল	অমৃতাসন
সেন শিবানন্দ	চম্পকলতা	দক্ষিণ	ফুল্লচম্পক	চামর
গোবিন্দ ঘোষ	শ্রীরঙ্গদেবী	নৈঋত	পদ্মকিঞ্জল্ক	চন্দন
বক্রেশর মতান্তরে শ্রীমাধব ঘোষ	তুঙ্গবিদ্যা	পশ্চিম	কাশ্মীর	গান-বাদ্য
বাসুদেব ঘোষ	সুদেবী	বায়ু	পদ্মকিঞ্জল্ক	জল

[১০৬] দাস, হরিদাস. *শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান* (১). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২১ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৩৬

রঘুনাথ গোস্বামীর *স্তবাবলী* অনুযায়ী রসিকশেখর কৃষ্ণ যিনি সত্যভামা, রুক্মিণী, সকল সখী বা শ্রীরাধাকে জয় করেছেন তাঁকে মঞ্জরীদের দেওয়ার মত কিছু থাকতে পারেনা।[১০৭] মঞ্জরীদের সাধনার সীমা থেকে বোঝা যায়, মঞ্জরীদের ভাবের শিক্ষা প্রদান করাই রাগাত্মিকা মার্গে গুরুদের করণীয়। *পদ্মপুরাণ*-এর পাতালখন্ডে মঞ্জরী ভাবের সাধনার কথা ছিল বলে বিমানবিহারী মজুমদার মনে করতেন, যদিও এই তত্ত্বকে অনেকেই স্বীকার করেননি। এই মঞ্জরী ভাবের সাধনার উদ্ভাবক হিসাবে রূপ গোস্বামীকেই স্বীকার করেছিলেন পরবর্তী সময়ের কবিরা।[১০৮] শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরুর মাধ্যমে ভক্তের সাধন দেহ নির্মল হবে, এবং সেই সাধন দেহ মঞ্জরী সাধনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে গুরুর মূল কাজ হল সংস্কারের মাধ্যমে শিষ্যের সাধন দেহের সংস্কার। কিন্তু এই সংস্কারের পথ গুরু নির্দেশ করলেও মূল সাধনতত্ত্ব কিন্তু কৃষ্ণ নাম নির্ভর। প্রসঙ্গত, আমরা *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-এ উদ্ধৃত 'শিক্ষাষ্টক'-এর প্রথম শ্লোকের কথা বলতে পারি—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপন্নগ পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্।।

এই শ্লোকের প্রথম পদবন্ধটি নিয়েই আমরা বর্তমানে আলোচনা করব। কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হল তা ভক্তের চিত্তকে মার্জিত করে। অর্থাৎ ভক্ত চিত্তের যাবতীয় মল কৃষ্ণনামের মাধ্যমে দূর হয়। যদি ভক্তের মন নির্মল হয় তবেই কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব ভক্তের সমগ্র চিত্তকে জুড়ে থাকে, প্রাকৃত বস্তুর ছায়া আর থাকে না।[১০৯] কৃষ্ণনামের মাধ্যমেই ভক্তের চিত্ত মার্জিত হয়।

---

[১০৭] বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ (অনু.). *স্তবাবলী*-রঘুনাথ গোস্বামী. রাধাকুণ্ড: শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী গ্রন্থালয়. ১৪২৭ বঙ্গাব্দ. তৃতীয় সং. পৃ. ৩২০

[১০৮] সিংহ, শুকদেব. *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ১৯৯২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ০৯

[১০৯] নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (অন্ত্য-লীলা). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭১৮-৭১৯

সুতরাং কৃষ্ণই ভক্তের সাধ্য আবার কৃষ্ণের নাম গ্রহণ করাই সাধ্য। ভক্তি দর্শনে ভক্তি একই সঙ্গে সাধ্য এবং সাধন এই সূত্রটি এখানেও কার্যকর হয়েছে। সুতরাং দীক্ষা যাঁর থেকেই হোক না কেন কৃষ্ণ নিজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে প্রধান গুরু। গুরু তত্ত্বে চৈতন্যদেবের গুরুত্ব হল তাঁর মাধ্যমেই ভক্তের কাছে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা প্রাকৃত মূর্তি লাভ করেছিল। ঘনশ্যাম দাসের *শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী* গ্রন্থের প্রথম স্তবক 'গোবিন্দরত্যঙ্কুর'। এই স্তবকের মূল বিষয় হল গুরু তথা গৌর-নিত্যানন্দ বন্দনা। স্তবকের নামটি লক্ষণীয়, গোবিন্দ রতির অঙ্কুর যাঁর মাধ্যমে ভক্তের মনে রোপিত হয় সেই গৌরাঙ্গকেই এই স্তবকে বন্দনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে গৌরচন্দ্র উপমার অতীত, তাঁর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ কৃষ্ণলীলার স্বাদ পেয়েছে।[১১০] সুতরাং প্রেমভক্তির গুরু হিসাবে চৈতন্যদেবের অবস্থান তত্ত্বত গৌণ হলেও পরবর্তী বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়নি।

৬.৩ বঙ্গদেশ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন: চৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতন্য পরবর্তী ধর্ম-সংগঠনে গুরু

চৈতন্যদেবের সমসময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্ম সংগঠনে গুরুদের অবদান কেমন ছিল এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই বর্তমান উপ-অধ্যায়ের মূল আলোচ্য। আমরা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক তিনজন গুরু এবং চৈতন্যদেবের পরবর্তী তিনজন গুরুকে নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের নির্বাচিত চৈতন্যদেবের সমসাময়িক তিনজন গুরু হলেন— অদ্বৈত আচার্য, নরহরি সরকার এবং নিত্যানন্দ। চৈতন্য পরবর্তী গুরুদের মধ্যে আমরা নির্বাচন করেছি শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস এবং শ্যামানন্দ-কে। চৈতন্যদেবের পরবর্তী এই তিনজন গুরুই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার করলেও প্রত্যেকেই বৃন্দাবনের থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্র শিক্ষা করে

---

[১১০] হরিদাস, দাস. *শ্রীশ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী.* ঢাকা: মদনমোহন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ৪৬৯ গৌরাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭-৮

এসেছিলেন। বঙ্গদেশে চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গুরু অনুযায়ী সাধন পদ্ধতির ভিন্নতা, ক্রমে বৃন্দাবনের প্রভাবে এই ভিন্ন ধর্ম সাধনায় এক ধরনের সামঞ্জস্য তৈরি হয়েছিল। এই গুরুদের হাতেই বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে পাটবাড়ি তৈরি হয়েছিল এবং তা ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। অধিকাংশ গুরু পরম্পরাই বঙ্গদেশে বংশানুক্রমিক রূপ লাভ করে এবং তা আজও কার্যকর। বৈষ্ণব ধর্মের এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে, নানা সামাজিক ঘটনায় এই সাংগঠনিক রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র এই ধর্ম সংগঠনের প্রাথমিক ইতিহাসটুকুই আলোচনা করব। উনিশ এবং বিশ শতকে এই সম্প্রদায়গুলির বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাস আমাদের আলোচনায় আসবে না। তবে প্রসঙ্গক্রমে এটুকু উল্লেখ করে রাখা দরকার যে প্রায় প্রত্যেকটি গুরু পরম্পরাই প্রভূত পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে টিঁকে আছে, প্রায় কোন ধারাকেই অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ অবস্থায় এখন আর পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট গুরু প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণব গুরু পরম্পরার শাখা সম্বন্ধে কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চারটি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন[১১১]—

১. মুখ্য শাখা- চৈতন্যদেব এবং তার ১৫৯ জন অনুগামী এই শাখার অন্তর্গত। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই শাখার ভিতরেই পরিগণিত হয়েছেন।

২. নিত্যানন্দ এবং তার ৮৩ জন অনুগামী নিয়ে শাখা। এঁদের মধ্যেই আছেন গোপাল এবং উপগোপালেরা।

৩. অদ্বৈত আচার্য এবং তার ৪৪ জন অনুগামী নিয়ে শাখা।

৪. গদাধর পণ্ডিত এবং তার ৩২ জন অনুগামী-কেন্দ্রিক শাখা।

---

[১১১] Chakrabarty, *Ramakanta. Vaisnavism in Bengal*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1985. First Publication. pp. 184-185

কবিকর্ণপুরের *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা* অনুসারে বৈষ্ণব মহান্তরা চারটি শাখায় বিভক্ত[১১২]—

১. নবদ্বীপ লীলায় যুক্ত চৈতন্য পরিকরেরা হলেন মহত্তম বৈষ্ণব।

২. নীলাচলে লীলায় মহাপ্রভুর সঙ্গীরা হলেন মহত্তর মহান্ত।

৩. মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে যাঁরা চৈতন্যদেবের সহকারী ছিলেন তারা হলেন মহান্ত।

৪. যারা মেধাবী বৈষ্ণব তারাও মহান্ত নামে পরিচিত।

এই শাখাগুলিতে মহান্তের সংখ্যা অজস্র। সাধারণভাবে দেবকীনন্দন-এর *বৈষ্ণব বন্দনা*-য় এবং নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর*-এ ৬৪ জন মহান্তের বন্দনা করা হলেও এই সংখ্যাটি নির্দিষ্ট নয়। তবে বোঝা যায় ষোড়শ শতকের শেষার্ধে এবং সপ্তদশ শতকের সূচনায় ক্রমে ক্রমে নতুন মহান্তদের নাম বিভিন্ন চরিতে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।[১১৩] বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের ক্রম প্রসার এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য মহান্তপদ অবশ্যই লাভজনক পেশাতেও পরিণত হয়েছিল বলে আশা করা যায়। তবে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ-নরহরি সরকার বা গদাধরের গুরুপদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পৃথক গুরুত্ব লাভ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পঞ্চতত্ত্বের মাধ্যমে। গুরু এবং চৈতন্যদেব বাদে ঈশ্বরের অবতার হিসাবে অদ্বৈত আচার্য, ঈশ্বরের প্রকাশ রূপে নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রথম সারির পার্ষদ এবং ঈশ্বরের শক্তি রূপে গদাধরকে স্বীকার করা হয়েছে।[১১৪] চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব মতের মূল প্রসার কিন্তু বঙ্গদেশে অদ্বৈত আচার্য, নরহরি সরকার, নিত্যানন্দ এবং গদাধরের মাধ্যমেই হয়েছিল। তাই পঞ্চতত্ত্বে এঁদের স্বীকার করার মাধ্যমে এই গুরুদেরও সরাসরি ইষ্টতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

---

[১১২] বন্দ্যোপাধায়, অশোককুমার (সম্পা.). *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা.* কলকাতা: সদেশ. ২০০৭. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪-৫

[১১৩] Chakrabarty, *Ramakanta. Vaisnavism in Bengal*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1985. First Publication. p. 187

[১১৪] নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদি লীলা). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ০২

চৈতন্যদেবকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠাদানের ক্ষেত্রে অদ্বৈত আচার্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিভিন্ন চরিতের সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবের পূর্বেই শান্তিপুর তথা নবদ্বীপে বৈষ্ণবমতের প্রসার শুরু করেছিলেন। লাউড়ীয় কৃষ্ণদাসের *বাল্য-লীলা-সূত্র* অনুযায়ী অদ্বৈতের জন্ম হয় ১৩৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে।[১১৫] অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরীর যোগাযোগ ছিল। অদ্বৈত আচার্যের আদি বাসস্থান ছিল শ্রীহট্টে। অদ্বৈত আচার্যের দুই স্ত্রীর কথা পাওয়া যায়, শ্রী দেবী এবং সীতা দেবী। অদ্বৈতের ছয় পুত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে- অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, বলরাম, স্বরূপ এবং জগদীশ। অদ্বৈত আচার্যের থেকেই যবন হরিদাস ভাগবতের শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে ঘোষণা করেন অদ্বৈত আচার্যই। তাঁর বৈষ্ণব সাধনায় নামকীর্তনের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও তিনি জ্ঞান মার্গের সাধনারই প্রসার করেছিলেন। অদ্বৈত শাখা বৃন্দাবনের ভাবাদর্শের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখেনি। তাঁর মৃত্যুর পরে তিনটি শাখার জন্ম হয়—প্রথম শাখার কেন্দ্রে ছিলেন সীতা দেবী, দ্বিতীয় শাখার অচ্যুতানন্দ এবং তৃতীয় শাখার কেন্দ্রে ছিলেন অদ্বৈতের বাকি পুত্রেরা, এই শাখাকে নেতৃত্ব দিতেন কামদেব নাগর। কামদেব নাগরের নেতৃত্বাধীন শাখা চৈতন্যদেবকে অবতার রূপে স্বীকার করেননি।[১১৬] বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় ২৫টি স্থানে অদ্বৈত আচার্যের বিভিন্ন শিষ্যরা ধর্মপ্রচারে এবং প্রচার কেন্দ্র নির্মাণে সমর্থ হয়েছিলেন।[১১৭] শান্তিপুরে রাস উৎসবের প্রচলন করেছিলেন অদ্বৈত আচার্যের প্রপৌত্র মথুরেশ গোস্বামী। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ঘনশ্যাম থেকে

---

[১১৫] Manring, Rebecca J. *The Fading Light of Advaita Acarya The Hagiographies*. New York: Oxford University Press. 2011. p. 142

[১১৬] Chakrabarty, *Ramakanta. Vaisnavism in Bengal*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1985. First Publication. p. 129

[১১৭] তদেব, পৃ. ১২৯-১৩০

হাট খোলা শাখার উৎপত্তি হয়।[১১৮] সুতরাং অদ্বৈত শাখা পুরুষানুক্রমে নানা ভাগে বিভাজিত হয়ে বিভিন্ন উপশাখার জন্ম দিয়েছিল।

এই শাখাগুলির নিজস্ব কিছু সাধনার বৈশিষ্ট্য থাকলেও এগুলি ক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার বৃত্তেই প্রবেশ করেছিল বলে অনুমান করা যায়। যেমন— অদ্বৈত আচার্যের সাধনায় জ্ঞানের বিশেষ স্বীকৃতি ছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ঈশান নাগরের *অদ্বৈত প্রকাশ*-এর বিংশ অধ্যায়ে আমরা দেখব চৈতন্যদেবের বিরহে উন্মত্ত হয়ে অদ্বৈত আচার্য তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞানমার্গে শিক্ষা প্রদান করা শুরু করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার কথা চৈতন্যদেব জানতে পারলে হঠাৎই পুরী থেকে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপনীত হন। অদ্বৈতকে জ্ঞান মার্গ ত্যাগ করে পুনরায় ভক্তি মার্গে প্রবেশের উপদেশ দেন চৈতন্যদেব—

মোরে দেখিবারে দিলা জ্ঞান-যোগে শিক্ষা।
জীবের ভাবী ক্লেশে তুহুঁ না কৈলা অপেক্ষা।।
মোরে দেখিবারে যদি তব মন হয়।
চিন্তামাত্র তাঁহা মুঞি হইমু উদয়।।
আর কভু জ্ঞান-যোগে মুখে না আনিবা।
শুদ্ধ-ভক্তি শিক্ষাইয়া জীব নিস্তারিবা।।[১১৯]

সুতরাং অদ্বৈত শাখার ধর্ম প্রচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জ্ঞানমূলকতা হলেও ক্রমে তার মধ্যেও পরিবর্তন এসেছিল। হরিচরণ দাসের *অদ্বৈতমঙ্গল*-এ অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ চৈতন্যদেবের অবতার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন—

অচ্যুতানন্দ আমি একই শরীর।
ভেদ বুদ্ধি কদাচিৎ না করিও ধীর।।[১২০]

---

[১১৮] কিশোরী দাস বাবাজী. *প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব.* চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন. ১৪২২. প্রথম সং. পৃ. ১৯

[১১৯] মিত্র, সতীশচন্দ্র (সম্পা.). *ঈশান নাগর প্রণীত শ্রীশ্রী অদ্বৈত-প্রকাশ.* কলকাতা: মানসী. ১৪২১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৭৩

[১২০] মাইতি, রবীন্দ্রনাথ. *হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ১৩৭৩. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২০৫

সুতরাং চরিত গ্রন্থের অন্যতম প্রবণতা দেখা যাচ্ছে চৈতন্যদেবের সঙ্গে অদ্বৈত পরম্পরার সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। সীতাদেবীকে নিয়ে রচিত চরিতের মধ্যেও এই প্রবণতাই দেখতে পাচ্ছি। সীতাদেবী তাঁর কাছে দীক্ষাকাঙ্ক্ষী দুই পুরুষ ভক্তকে পুরুষভাবের গর্ব ত্যাগ করার আদেশ দিচ্ছেন এবং একমাত্র ব্রজগোপীর অনুসরণেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব বলে জানাচ্ছেন—

মোর স্থানে কভু অন্য মন্ত্র নাহি রয়।
সবে এক সিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র হয়।।
পুংস্ত তেজিয়া সিদ্ধ প্রকৃতি হইয়া।
ব্রজগোপীর অনুগত স্বীকার করিয়া।।
রাধা কৃষ্ণের সেবা পাই যে মহিত।
তাহার আশ্রিত আমি শো মোর আশ্রিত।।[১২১]

দেবকীনন্দন দাসের *অদ্বৈতদ্দেশ দীপিকা* নাম সাধনতত্ত্বের বইটি দেখলে অদ্বৈত আচার্য কীভাবে মঞ্জরী ভাবের সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তা বোঝা যায়। আমরা আগেই দেখেছিলাম বৃন্দাবনের ভাবনার সূত্রেই মঞ্জরী কল্পনার জন্ম হয়েছিল এবং তা পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করে। অদ্বৈত আচার্য এবং সীতা দেবী-কে যখন এই মঞ্জরী কল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তা থেকেই বোঝা যায় অদ্বৈত আচার্যের সাধনাও ক্রমে গৌড়ীয় ভাবাদর্শের মধ্যেই চলে এসেছিল। দেবকীনন্দনের রচনা অনুযায়ী, অদ্বৈত আচার্য মূলত দাস্য এবং সখ্য ভাবের সাধনা করতেন। অদ্বৈত সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করতেন সখী বিশাখা বা সখী সম্পূর্ণার ভাব। আবার ব্রজলীলার উদ্ধবের ভূমিকাতেও অদ্বৈতকে চিত্রিত করেছেন দেবকীনন্দন।[১২২] সীতা দেবী আদি শক্তি যোগমায়া এবং অদ্বৈত আচার্য সদাশিব হিসাবেও চিহ্নিত হয়েছেন।[১২৩] বোঝাই যাচ্ছে অদ্বৈত

---

[১২১] কিশোরীদাস বাবাজী (সম্পা.). *শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়.* চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন. ১৪১৭. প্রথম সং. পৃ. ৪৯

[১২২] Manring, R. J. *Reconstructing Tradition Advaita Acharya and Gaudiya Vaishnavism at the Cusp of the Twentieth Century*. New York: Columbia University Press. 2005. 1st Edition. pp. 79-83

[১২৩] তদেব, পৃ. ৮৩-৪৮

আচার্যের সাধনায় জ্ঞানের প্রভাব প্রাথমিক ভাবে থাকলেও ক্রমানুসারে এই ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মূল ধারাতেই মিশে যায়।

তবে মঞ্জরী ভাবের সাধনাকে মূলত বৃন্দাবনের প্রভাব হিসাবে দেখার কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা রয়েছে। বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সার্বিক স্বীকৃতির অন্যতম কারণ ছিল এই বৈষ্ণব সাধনা বঙ্গদেশে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কিছু সাধনার ধারাকে আত্তীকৃত করেছে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা দান করেছে। এই প্রবণতা আমরা বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও দেখেছিলাম। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম যেমন বন্ ধর্মকে স্বীকার করেছে, তার আগে চিনে বৌদ্ধধর্ম কনফুসিয়াসের মতামতকেও স্বীকৃতি দিয়েছিল। সুতরাং আমরা ধরে নিতেই পারি যে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সাধনার সঙ্গে সমতা রেখে এবং তাকে স্বীকার করেই নতুন ধর্মসাধনার পথ শক্ত হয়। নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের নেড়া-নেড়ি উদ্ধার, নরহরি সকারের শ্রীপাটে বাউলদের স্বীকৃতি দান বা মুকুন্দ দাসের সহজিয়া মত গ্রহণ করা থেকেও আমাদের ধারণাটি প্রমাণিত হয়। এবার মঞ্জরী ভাবের প্রসঙ্গে আসা যাক। সীতা দেবীর হাত ধরে বঙ্গদেশের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত একটি সাধনার ধারার বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়। এই ধারার নাম সখী ভেকী। এখানে পুরুষরা স্ত্রী-বেশ ধারণ করে সাধনা করতেন। সীতা দেবীর শিষ্য যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী ওরফে জাঙ্গলী চক্রবর্তী এই সখী ভেকী সাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী-র অপর শিষ্য নন্দরাম, সাধক জীবনে তাঁর নাম ছিল হরিপ্রিয়া।[১২৪] সুতরাং সখী-ভেকী সাধনাকে আমরা মঞ্জরী সাধনার বঙ্গদেশীয় পূর্বসূত্র হিসাবে দেখতে পারি। প্রসঙ্গত বলা দরকার উড়িষ্যার পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের অন্যতম চৈতন্যদেবের শিষ্য জগন্নাথ দাস ছিলেন সখী ভাবে ভাবিত, তিনি নারীবেশে সধনা করতেন এবং নারীবেশে গুন্ডিচা মার্জন করতেন।[১২৫] উনিশ শতকের জয়পুর, কাশী এবং

[১২৪] বিশ্বাস,অচিন্ত্য. 'লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, পদাবলী (বিশ্লেষণ ও আলোচনা)'. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ. ১৯৯০. পৃ. ১৬-১৭

[১২৫] তদেব, পৃ. ১১

কলকাতাতে এই সখী-ভাবুক শাখার সাধকদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। কলকাতার বিভিন্ন সম্পন্ন পরিবারে এই শাখার সাধকেরা কীর্তন করতেন, বিগ্রহ সেবা করতেন। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সোনার বেনে এবং অন্যান্য জাতের বাড়িতে এই সাধকদের বিশেষ তিথিতে বিগ্রহ সেবা করতে দেখা যাচ্ছে।[১২৬]

চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব নেতাদের মধ্যে আরেকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন শ্রীখন্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর। কিছু চৈতন্যচরিতে নরহরি সরকারের প্রতি কটাক্ষ দেখা গেলেও কোন চরিতকারই নরহরি সরকারকে অস্বীকার করতে পারেননি। সম্ভবত ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে নরহরি সরকারের জন্ম এবং ১৫৪১ সালে তাঁর তিরোধান হয়।[১২৭] নরহরি সরকারের পিতার নাম নারায়ণদেব সরকার এবং ভ্রাতা মুকুন্দদাস। এঁরা দুজনেই গৌড়ের রাজ দরবারে চিকিৎসার কাজে যুক্ত ছিলেন। শ্রীখন্ডে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের আগে এই অঞ্চলে মূলত শাক্তধর্মের প্রসার ছিল। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবতায় নরহরি সরকারের অন্যতম অবদান ছিল তিনিই প্রথম গৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন। পাশাপাশি নরহরির বৈশিষ্ট্য ছিল যুগল মন্ত্রে দীক্ষাদান করা, যেখানে সমসাময়িক বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সাধনায় মূলত দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষাদান করার প্রবণতাই প্রধান ছিল।[১২৮] গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করেই নরহরির সাধনা পদ্ধতি চালিত হত এবং নরহরিই প্রথম গৌরলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। নরহরি দক্ষিণে, বামে গদাধর ও মধ্যে মহাপ্রভুর মূর্তি রেখে নরহরি পরম্পরায় সাধনার প্রচলন ছিল বলে জানা যাচ্ছে। *গৌরাঙ্গাষ্টকালিক* নামে নরহরির রচনায় গৌরাঙ্গপূজা বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

---

[১২৬] দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়.* কলকাতা: বসুমতী কার্যালয়. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. [ ]. পৃ. ২৪৫-২৪৭

[১২৭] সেন, সুকুমার. 'নরহরি সরকার ও শ্রীখন্ডের সম্প্রদায়'. সজনীকান্ত দাস (সম্পা.). বঙ্গশ্রী. জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০. প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা. পৃ. ৫৭৩

[১২৮] তদেব, পৃ. ৫৭৮

নরহরি সরকারের গৌর-নাগরবাদের পদ লিখেছিলেন, আমরা আগেই তার উল্লেখ করেছিলাম। নরহরি সরকার এবং তাঁর শিষ্য লোচন দাস বেশ বেশ কিছু পদ রচনা করেছিলেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গৌরাঙ্গের প্রতি সরাসরি প্রেমের নিবেদন। সুকুমার সেন-এর মতানুযায়ী নরহরি সরকারই প্রথম 'পিরীতি' শব্দটিকে প্রেম অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন।[১২৯] প্রসঙ্গত, লোচন দাসের একটি ধামালি উদ্ধার করা যেতে পারে, যার মূলতম উদ্দেশ্য হল নবদ্বীপের অসাধারণত্ব এবং গৌরাঙ্গের প্রতি প্রেমের প্রকাশ—

চলগো সজনি পিরীতি নগরে বসতি করিগে মোরা।
মরম না জানে ধরম বাখানে চৌরাশী ভ্রমিবে তারা।
সদর দুয়ারে কপাট হানিয়া খিড়কী দরজা খোলা।
চলগো সজনি নিশ্চিন্ত হইয়ে আঁধার দেখিবি আলা।
আলোর ভিতরে গোরেরে দেখিবি চৌকি রাখিবি তথা।
সেদেশের কথা এদেশে কহিলে মরমে পাইবে ব্যাথা।
সে দেশ এ দেশে মিশা মিশি আছে
একথা না কহ কাকে।
সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর জানয়ে সকল লোকে।
পিরীতি নগরে মানুষ রতন বিরাজে সহজ ঘরে।
ধরম করম কুলের আচার সেখানে যাইতে না পারে।
সেখানে কিসের ধরম করম যেখানে বিরাজে গোরা।
এ দাস লোচন কহয়ে বচন দশদিক তার আলা।।[১৩০]

নদীয়া নাগর ভাবের পদ আমরা রায়শেখরের রচনাতেও পাই—

কঞ্জ অরুণিম নয়ন সন্ধান।
জনু মেনে হাসি মদন মুরছান।।
কি কহবরে সখি তোহারি সমাজ।
গুরুজন গৌরব না রহে লাজ।।
কহ কবিশেখর বচন নিরাস।
দূরে কর তাকর পরশ কি আশ।।[১৩১]

---

[১২৯] তদেব, পৃ. ৫৭৭

[১৩০] কিশোরী দাস বাবাজী (সম্পা.). *লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী.* চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউশন. ১৪২২. প্রথম সং. পৃ. ১০-১১

[১৩১] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ. *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. ১৪১৭. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ৩১৬

উক্ত পদগুলি পড়লেই বোঝা যায় এই পদের মূল সুর কখনোই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে স্বীকৃত হতে পারে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার নরহরি সরকারের সাধনায় মূলত ভক্তি ধর্মের প্রভাব থাকলেও নরহরি পরম্পরার শিষ্যদের মধ্যে বাহ্য পরকীয়া নিয়ে সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখরের দুর্গাদাস নামে একজন সাধন সঙ্গিনীর উল্লেখ কাটোয়ার যদুনন্দনদাসের লেখা *সংগ্রহতোষণী* নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১৩২] নরহরি সরকারের *শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত* অনুসারে চৈতন্যদেব রসরাজ রূপে স্বীকৃত হয়েছেন এবং এই গ্রন্থে চৈতন্য দেবের প্রধান সহকারী ছিলেন গদাধর পন্ডিত।[১৩৩] এই গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্যের কোন উল্লেখ নেই। সাধারণভাবে গৌর-নিতাই বিগ্রহের যে প্রসার বঙ্গদেশে ছিল, নরহরি পরম্পরায় তা গৌর-গদাধর মূর্তি হিসাবে প্রচলিত ছিল। নরহরি সরকার এই যুগল বিগ্রহের পাশে ব্রজের সখী মধুমতী-র রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন।[১৩৪] নরহরির স্বভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল 'প্রেমময়ী রমণীস্বভাবসম্পন্ন'[১৩৫]। সুতরাং নরহরি সরকারের সাধনার ধারা প্রথম থেকেই পৃথক তত্ত্ব দ্বারা চালিত হয়েছিল। জাতিতে বৈদ্য হলেও নরহরি সরকারের কাছে একাধিক ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। নরহরি সরকারের শিষ্য লোচন দাসের *ব্রজমঙ্গল*- পুথির সাক্ষ্যে বোঝা যায় পর্তুগিজ বণিকদের সঙ্গে নরহরির সরাসরি যোগাযোগ ছিল। লোচন দাস সম্ভবত কোন কারণে নিজেকে একবার পর্তুগিজদের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন, পরে গুরু কৃপায় তিনি মুক্তি লাভ করেন।[১৩৬] লোচন দাস প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তিনি নিজে তাঁর মাতামহ পুরুষোত্তম গুরুকে শিক্ষা গুরু রূপে

---

[১৩২] সেন, সুকুমার. *প্রবন্ধ সংকলন* (১). কলকাতা: আনন্দ. ২০১৪. প্রথম সং. পৃ. ৩২৪

[১৩৩] Chakrabarty, *Ramakanta. Vaisnavism in Bengal*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1985. First Publication. p. 193

[১৩৪] সেন, সুকুমার. 'নরহরি সরকার ও শ্রীখন্ডের সম্প্রদায়'. সজনীকান্ত দাস (সম্পা.). বঙ্গশ্রী. জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০. প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা. পৃ. ৫৭৬

[১৩৫] ঠাকুর, গৌরগুণানন্দ. *শ্রীখন্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব*. শ্রীখন্ড: মধুমতী সমিতি. ১৪২৩. ষষ্ঠ সং. পৃ. ৩৯

[১৩৬] বিশ্বাস,অচিন্ত্য. 'লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, পদাবলী (বিশ্লেষণ ও আলোচনা)'. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ. ১৯৯০. পৃ. ৭১

পেয়েছিলেন এবং নিজেও নিজের দৌহিত্র কামদেব গুপ্ত-কে সাধন-শিক্ষা দান করেন। সুতরাং লোচনের পরম্পরায় মাতৃবংশের মত অনুসরণের একটি রীতি দেখা যাচ্ছে।[১৩৭] নরহরির ভ্রাতা মুকুন্দ শ্রীখন্ডে বৈষ্ণব মতের প্রসার করেন। পরবর্তীকালে মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনের নিজস্ব শিষ্য পরম্পরা ক্রমে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। নরহরি সরকারের ভ্রাতা মুকুন্দ দাস সম্ভবত সহজিয়া বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। *পরতত্ত্ব, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং, নিত্যলীলা* নামক সহজিয়া গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন মুকুন্দ দাস।[১৩৮] মুকুন্দ দাস সহজিয়া বৈষ্ণবমত অবলম্বন করার জন্য চৈতন্যদেব তাঁকে কিছুটা শ্লেষ করেছিলেন—একথা আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-এ পাচ্ছি।[১৩৯] এথেকে আবারও স্পষ্ট হয় বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন স্রোত চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের সূত্রে একত্রিত হয়েছিল। শ্রীখন্ডের বৈষ্ণবেরা মূলত পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিল—মুকুন্দ সরকার, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, সুলোচন সেন এবং চিরঞ্জীব সেন।[১৪০] শ্রীখন্ডের সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘদিন বজায় রেখেছিল। রঘুনন্দন খেতুরী মহোৎসবে যোগদান করলেও স্বাভাবিক কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাননি। পরবর্তী সময়ে চিরঞ্জীব সেনের পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের তত্ত্ব ভাবনাকে স্বীকার করে নেন।[১৪১] সুতরাং সাধনার ধারার নিজস্বতা দীর্ঘদিন বজায় রাখলেও ক্রমে তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়ে। তবে বর্ধমানে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে শ্রীখন্ডের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। স্থানীয় বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্ণের মানুষেরা অনেকেই শ্রীখন্ড শাখার আশ্রয় লাভ করেন এবং মহান্ত রঘুনন্দন

---

[১৩৭] তদেব, পৃ. ৮৪

[১৩৮] শীল, শিবচন্দ্র. 'সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা). ১৩২৬ বঙ্গাব্দ. পৃ. ১৪২

[১৩৯] তদেব, পৃ. ১৪৬

[১৪০] Chakrabarty, *Ramakanta. Vaisnavism in Bengal*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1985. First Publication. পৃ. ১৯৫

[১৪১] তদেব, পৃ. ১৯৮

আয়োজিত বৈষ্ণব উৎসবে চণ্ডালেরা অবাধে অংশ গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়।[১৪২] সপ্তদশ শতকের প্রথমে রঘুনন্দনের পুত্র কানাই এর সমসময়ে নরহরি সরকারের পাটে অর্চাবিগ্রহ রূপে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪৩] বৈষ্ণব সমাজ সংগঠনে শ্রীখন্ড শাখা নিজেদের অস্তিত্ব নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় ৩১.৬২ শতাংশ মানুষ ছিল বৈষ্ণব।[১৪৪] সুতরাং নরহরি সরকারের শাখা বেশ জনপ্রিয় এবং স্বতন্ত্র ছিল বলেই দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত গদাধর পণ্ডিতের শাখা সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। গদাধর পণ্ডিতের শ্রীপাট মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে অবস্থিত। ১৪৫৬ শকাব্দে ৪৭ বছর বয়সে গদাধর তিরোহিত হন।[১৪৫] গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গদাধর নিজে অবিবাহিত ছিলেন, তবে তাঁর ভ্রাতা বাণীনাথের দুই ছেলে নয়নানন্দ এবং হৃদয়ানন্দ পরবর্তী সময়ে এই শাখার উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। গদাধরের সাধনায় চৈতন্যদেবই ছিলেন মূল আরাধ্য। গদাধরের থেকে বল্লভ ভট্ট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গদাধর তাঁকে কিশোর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দান করেন।[১৪৬] রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী-র *সাধন দীপিকা*-য় এই শাখার পূজা পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। *সাধন-দীপিকা*-র একটি শ্লোকে রাধাকে 'বিপরীত-রতিপ্রিয়া' বলা হয়েছে।[১৪৭] অর্থাৎ, ভারতীয় সংস্কৃতির যৌনতার প্রথাগত ধারণা থেকে সরে আসার একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তবে রাধার অবতার হিসাবে পঞ্চতত্ত্বে গদাধরকে স্বীকার এবং গৌরাঙ্গের শক্তি হিসাবে গদাধরের

---

[১৪২] তদেব, পৃ. ১৯৯

[১৪৩] বিশ্বাস,অচিন্ত্য. 'লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, পদাবলী (বিশ্লেষণ ও আলোচনা)'. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ. ১৯৯০. পৃ. ১৫

[১৪৪] তদেব, পৃ. ২০০

[১৪৫] হরিদাস দাস. *শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৭৪

[১৪৬] গোস্বামী, রাধু. *শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগদাধর.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৪১৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১২৬

[১৪৭] হরিদাস দাস (সম্পা.). *সাধন দীপিকা.* ঢাকা: হরিদাস দাস প্রকাশিত. ৪৬০ চৈতন্যাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ২৬০

প্রতিষ্ঠা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধার প্রকাশ দেখা যায় এবং গৌর-গদাধর তত্ত্বকে ‘বিপথগামিতা’ আখ্যাই দেওয়া হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।[১৪৮] মনে পড়বে আমাদের আলোচনার ভূমিকাংশে শ্রীখন্ডের *রসরাজ গৌরাঙ্গ-স্বভাব* গ্রন্থের কথা, যা পুড়িয়ে দেওয়া হয় সমলৈঙ্গিক ঈপ্সা প্রকাশের অপরাধে। আসলে সামগ্রিকভাবে সমাজে যে সমলৈঙ্গিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ভীতি এবং বিরাগ আছে তারই প্রমাণ মেলে এই জাতীয় উক্তি থেকে। কিন্তু ‘রমণী’ স্বভাবের নরহরি বা রাধার অবতার গদাধর সম্পর্কিত ‘মধ্যযুগের’ শাস্ত্র বা চরিত থেকেই অনুমান করা যায় সমকালীন সমাজে এই মতের বিরোধিতা থাকলেও এই মতামতগুলির সসম্মান উপস্থিতি ছিল, তথাকথিত মূল স্রোতের ধারা ভিন্নমতের কণ্ঠ রোধ করতে চাইত না।

বঙ্গদেশের চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণব আন্দোলনে নিত্যানন্দ কখনো কখনো চৈতন্যদেবের থেকেও বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হন। নিত্যানন্দ- জাহ্নবা দেবী-বীরভদ্র পরম্পরার অবদান বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সাধনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিত্যানন্দ বংশের শ্রীপাট খড়দহ এবং নবদ্বীপে আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ভাবনায় বলরামের অবতার হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং সরাসরি চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সূক্ষ্মভাবে তাত্ত্বিক বিতর্কের অবকাশ অবশ্যই গৌর তত্ত্ব এবং নিত্যানন্দ তত্ত্বের মধ্যে থেকে গেছে। যেমন বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ বলা হল—

চারি বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব সর্ব পুরাণে বিদিত।।
মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখি পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ।।
এক ঠাঞি দুই ভাই গোপিকা সমাজে।
করিলেন রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে।।[১৪৯]

[১৪৮] ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ. *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: পুনশ্চ. ২০০১. প্রথম সং. ২৪৬

[১৪৯] সেন, সুকুমার (সম্পা.). *চৈতন্যভাগবত.* কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি. পঞ্চম মুদ্রণ. ২০১৫. পৃ. ০১

আক্ষরিক অর্থে দেখলে এখানে বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ তথা বলরামের রাসের কথা বলছেন। পাশাপাশি যাঁরা বলরামের রাসকে স্বীকার করবেন না তাঁদের 'নপুংসক' বলতেও দেখা যাবে *চৈতন্যভাগবত*-এ—

ইবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে নাচে।
বোলে বলরাম-রাস কোন শাস্ত্রে আছে।।[১৫০]

সুতরাং গৌর তত্ত্ব এবং নিত্যানন্দ তত্ত্বের মধ্যে একটা ফারাক চৈতন্যদেবের সমসময়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নিত্যানন্দের রাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রেক্ষিতে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ 'রাস' শব্দের অর্থ হল যত রকম রস আছে তার সমষ্টি। এবারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে যে লীলাতে সব রকম ভক্তি রসের উৎসারণ হয় তাকেই রাস বলা হবে। কিন্তু তত্ত্বত রাসেশ্বরী রাধা ব্যতীত কখনো রাস হতে পারে না। এই সমস্যার সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে রাধাগোবিন্দ নাথের 'নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী' টীকা অনুসারে। উক্ত টীকার ব্যাখ্যানুযায়ী এখানে রাস বলতে হোলিকে বুঝতে হবে যা বলরাম এবং তৎ-পার্ষদদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এই শ্লোকে রাস শব্দটিকে গৌণ অর্থে ব্যাখ্যা করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অভিপ্রেত বলে মনে করতেন।[১৫১] গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন সবচেয়ে বড় ধর্ম তাত্ত্বিক সমস্যা হল নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত। কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস দশা অতিক্রম করে যে সন্ন্যাসীরা অদ্বৈত নিষ্ঠায় প্রণত হন এবং ক্রমে প্রণবাত্মকত্ব দ্বারা দেহ ত্যাগ করেন তিনিই অবধূত নামে পরিচিত হন। নিত্যানন্দের সঙ্গে অবধূত পরম্পরার এই যোগাযোগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা ব্যাখ্যা করবেন অদ্বৈত নিষ্ঠার বদলে ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমের মাধ্যমে। বলা হয়েছে নিত্যানন্দের মধ্যে অবধূত দশায় কৃষ্ণ প্রেমের বিকার দেখা যেত।[১৫২] এছাড়াও নিত্যানন্দের বিবাহ,

---

[১৫০] তদেব

[১৫১] নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). *চৈতন্যভাগবত* (আদি খন্ড). কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী. ১৯৬৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২১-২৪

[১৫২] তদেব, পৃ. ২৩৬

আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন সব কিছু নিয়েই নানা প্রশ্ন ছিল। বৃন্দাবন দাসের রচনা থেকে সেকথার উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। তবে চৈতন্যদেব নিজে পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত-কে নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার গুহ্য উপদেশ দিয়েছিলেন বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছিলেন।[১৫৩] বিতর্ক যাই থাকুক না কেন নিত্যানন্দের অন্যতম ভূমিকা ছিল বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন সংগঠনে। নিত্যানন্দের আদি বাসভূমি ছিল বীরভূমের একচক্রা গ্রামে। এই বাসভূমি পরবর্তী সময়ে নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের শ্রীপাটে পরিণত হয়। নিত্যানন্দের পরবর্তী সময়ে জাহ্নবা দেবী এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একচক্রা ভ্রমণ করেন। বলা হয় বীরভদ্রই একচক্রা গ্রামে বাঁকা রায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে একচক্রা গ্রাম তথা বীরচন্দ্রপুরের শ্রীপাটে দুটি স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সাধনার উপস্থিতি দেখা যায়। একচক্রা গর্ভাবাস ররানগর পাটবাড়ি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাঁকা রায়ের মন্দির নিত্যানন্দ বংশের গোস্বামীদের দ্বারা পরিচালিত।[১৫৪] নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ না হলেও ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের যোগাযোগ ছিল। নিত্যানন্দ বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সারা ভারতের নানা তীর্থ পর্যটন করেন। অনুমান করা হয় নিত্যানন্দ সম্ভবত ভারত-তিব্বত সীমান্তে মানা গ্রামে যান এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেন।[১৫৫] পরবর্তী সময়েও আমরা দেখব নিত্যানন্দের সঙ্গে বৌদ্ধদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। বৌদ্ধদের সঙ্গে এই সুসম্পর্কের উত্তরাধিকার বীরভদ্রের মধ্যেও দেখা যায়। নিত্যানন্দ পরবর্তী সময়ে নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ এবং বীরভদ্রের মাধ্যমে বঙ্গদেশের সীমার বাইরে উড়িষ্যাতেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।[১৫৬] বোঝাই যায় রীতিমত সাংগঠনিক

---

[১৫৩] বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা. *বাংলা চরিতসাহিত্যে নিত্যানন্দ.* সোদপুর: এষা মুখার্জ্জী প্রকাশিত. ১৪১০ বঙ্গাব্দ. পৃ.১৫৩

[১৫৪] ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ. *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি.* কলকাতা: পুনশ্চ. ২০০১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৪৬

[১৫৫] মুখোপাধ্যায়, তুহিন. *লোকায়ত শ্রীচৈতন্য.* কলকাতা: গাঙচিল. ২০১৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩৫০

[১৫৬] মজুমদার, বিমানবিহারী. 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ'. কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা. ৩১ ভাগ. ৩য় সংখ্যা. ১৩৩১. পৃ. ১১৯

শক্তি না থাকলে এই ধর্ম প্রচার সম্ভব ছিল না। নিত্যানন্দের মাধ্যমেই প্রথম এই ধর্মীয় সংগঠনের সূত্রপাত হয়। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে পানিহাটিতে দণ্ডমহোৎসবের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে গতি প্রাপ্ত হয়েছিল। মধ্য এবং রাঢ় বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে নিত্যানন্দই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শুধু তাই না নিত্যানন্দ পরবর্তী বঙ্গদেশের তিনজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস এবং শ্যামানন্দকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে চিহ্নিত করার কাজও নিত্যানন্দ পরিবারের তরফেই হয়েছিল। *প্রেমবিলাস*-এর পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের মনে অভিরামের জয়মঙ্গল চাবুকের তিন আঘাতে ভক্তি উৎসার ঘটানোর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় কীভাবে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করেছিলেন নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের গুরুরা।[১৫৭] খড়দহ শ্রীপাটে বেশ্যাদের দীক্ষাদান করতে দেখা যায়। এই গণিকাদের দানের মাধ্যমে এই শ্রীপাটের যথেষ্ট আয় হয়েছে তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[১৫৮] এখানেও নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা প্রমাণিত হয়। নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। জাহ্নবা দেবী নিত্যানন্দের পরে বৈষ্ণব সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব নেতা। অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতা দেবী এবং জাহ্নবা দেবীর দীক্ষা দান থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে গুরু হিসাবে মেয়েদের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সমাজে অনেক আগেই হয়েছিল। বীরভদ্র অদ্বৈত আচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে গেলেও শেষ অবধি জাহ্নবা দেবীর কাছেই বীরভদ্রের দীক্ষা হয়, জাহ্নবা দেবীর ষড়ভুজ রূপ দেখে বীরভদ্র চমৎকৃত হন।[১৫৯] জাহ্নবা দেবীর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত খেতুরী মহোৎসবে নেতৃত্ব দান করা এবং খেতুরীর সূত্রে বঙ্গদেশের সঙ্গে বৃন্দাবনের যোগসূত্রকে

---

[১৫৭] [ ]. *প্রেমবিলাস*- শ্রীনিত্যানন্দ দাস বিরচিত. কলকাতা: ১৩২০ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ২৬-২৮

[১৫৮] ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ. *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি.* কলকাতা: পুনশ্চ. ২০০১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩০৯

[১৫৯] দাস, কিশোরীদাস (সম্পা.) *শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার.* চৈতন্য ডোবা: শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং. পৃ. ১৯-২০

দৃঢ় করে তোলা। সীতা দেবীর মতই জাহ্নবা দেবী-কে নিয়ে চরিত রচিত হয়েছিল। এরমধ্যে সুভদ্রাদেবীর *অনঙ্গকদম্বাবলী* এবং *জাহ্নবা-তত্ত্ব-মর্মার্থ* উল্লেখযোগ্য।[১৬০] জাহ্নবা দেবীর পরে বীরভদ্র বৈষ্ণব সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নানা অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। বীরভদ্রের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল নেড়া অর্থাৎ বৌদ্ধদের গৃহস্থ করা এবং বৈষ্ণবধর্মে নেড়াদের গ্রহণ করা।[১৬১] নেড়া-নেড়ীদের মধ্যে আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ এই চারটি শ্রেণির অবস্থান দেখা যায়। ধর্মসাধনায় ভিন্নতা থাকলেও এঁরা কঠিনতম তত্ত্বকে সহজে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ ছিলেন।[১৬২] জাহ্নবা দেবী এবং উদ্ধারণ দত্ত অন্যান্য নিত্যানন্দ পার্ষদদের সঙ্গে বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গেলে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং জীব গোস্বামী এবং বাকি গোস্বামীদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। বৃন্দাবনের গোবিন্দদেবজী-র মন্দিরে সকলে যান এনং সকলকে জাহ্নবা দেবী নিজে হাতে রান্না করে প্রসাদ বিতরণ করেন।[১৬৩] সম্ভবত **১৫৮৩** খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় মাসে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে তীর্থে গিয়েছিলেন।[১৬৪] এই বর্ণনাগুলি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে জাহ্নবা দেবী এবং বীরভদ্রকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা স্বীকার করছেন এবং বঙ্গদেশের সঙ্গে বৃন্দাবনের যোগাযোগ স্পষ্ট হচ্ছে। তবে নিত্যানন্দ এবং বীরভদ্রের সাধনায় সখ্যভাবের প্রাবল্য থাকলেও জাহ্নবা দেবীর সাধনা কিন্তু এদের থেকে পৃথক ছিল।[১৬৫] জাহ্নবা দেবীর উদ্যোগেই খেতুরী মহোৎসবে গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চা বিগ্রহপ্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[১৬০] রায়, অপর্ণা. *পুরাতনী নারী ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ. ২০১৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪১

[১৬১] তদেব, পৃ. ২৪-২৫

[১৬২] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ. *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা. ১৯৭০. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ১৩৩

[১৬৩] গোস্বামী, নীলকান্ত এবং বিনোদ বিহারী গোস্বামী (সম্পা.). *শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস.* মথুরা: শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থান. ১৯৮৭. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১২৫-১২৮

[১৬৪]অধিকারী মুরারি লাল. *বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী.* কলকাতা: [ ]. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ. পৃ. ১০৯

[১৬৫] ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ. *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি.* কলকাতা: পুনশ্চ. ২০০১. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৬০

সখ্যভাবের সাধনা প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ প্রবর্তিত দ্বাদশ গোপালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রজস্থ দ্বাদশ গোপালের বন্দনা আমরা পাই জ্ঞানদাসের পদে। জ্ঞানদাসের বন্দিত দ্বাদশ গোপালেরা হলেন—শ্রীদাম, সুদাম, স্তোককৃষ্ণ, সুবল, অংশুমান, বসুদাম, কিঙ্কিণী, অর্জুন, দেবদত্ত, সুনন্দ, বরুথপ এবং নন্দক।[১৬৬] প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশ গোপালের মাধ্যমেই নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। ধর্মতত্ত্বের বাইরে এই দ্বাদশ গোপালের পরিকল্পনা নিত্যানন্দের অত্যন্ত সফল সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। সংক্ষেপের জন্য আমরা দ্বাদশ গোপালের বিবরণ একটি তালিকার মাধ্যমে উপস্থিত করছি—

গোপালের নাম	ব্রজ অবতার	পাট/ এলাকা	বিশেষত্ব
অভিরাম	শ্রীদাম	হুগলি—কৃষ্ণনগর, খানাকুল এলাকা	যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পাষণ্ড দলন এবং মালিনী উদ্ধার প্রসঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। অভিরাম ঠাকুরের স্ত্রীর নাম মালিনী, রামদাসের মতানুযায়ী তিনি যবন ছিলেন।[১৬৭] অভিরাম ঠাকুর শক্তির উপাসক অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারীকে পরাজিত করে বৈষ্ণব মতে দীক্ষা দান করেন।[১৬৮]
সুন্দরানন্দ ঠাকুর	সুদাম	হলদা মহেশপুর	বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মনে করা হয় খেতুরী মহোৎসবের আগে দেহ রেখেছিলেন। বলা হয় তাঁর এতই বিক্রম ছিল যে তাঁর শিষ্যরা বনের বাঘ ধরে এনে হরিনাম দিতেন।[১৬৯]
ধনঞ্জয় পণ্ডিত	বসুদাম	শীতলগ্রাম/ কাঁচড়াপাড়া/ জলঙ্গী	প্রচুর পাষণ্ডকে দীক্ষা দান করেন এবং নানা স্থানে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন।
গৌরীদাস পণ্ডিত	সুবল	অম্বিকা	অম্বিকা কালনায় শ্রীপাট এবং চৈতন্যদেবের সঙ্গে বিশেষ সুসম্পর্কের প্রমাণ পাচ্ছি নানা চরিতে।

[১৬৬] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ. *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. ১৪১৭. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃ. ৩৯৮-৪০০

[১৬৭] তর্কবাগীশ, নটবর. *শ্রীঅভিরামলীলামৃত.* কলকাতা: অতুলচন্দ্র গোস্বামী প্রকাশিত. ৪০৯ গৌরাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪৫-৫৬

[১৬৮] দাস, কিশোরীদাস (সং.). *শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলারহস্য.* হুগলি: প্রাণগোপাল গোস্বামী প্রকাশিত. ২০১৮. ষষ্ঠ সং. পৃ. ৩০-৩১

[১৬৯] রায় ভট্ট,অমূল্যধন. *শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা: মানসী প্রেস. ১৩৩১ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ২৮

কমলাকর পিপলাই	মহাবল	মাহেশ	মাহেশে জগন্নাথের সেবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। গদাধর শাখার শিষ্য ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর নির্দেশে তিনি মাহেশে আসেন।[170]
উদ্ধারণ দত্ত	সুবাহু	সপ্তগ্রাম	১৪৮১ সালে উদ্ধারণ দত্তের জন্ম।[171] সপ্তগ্রামের বণিক সমাজ সুবর্ণ বণিকদের নেতৃস্থানীয় উদ্ধারণ দত্তের মাধ্যমেই বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্গত হয়েছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রাম ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[172] আবার নিত্যানন্দের পাচক হিসাবে উদ্ধারণ দত্ত বিশেষভাবে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত ছিলেন। কালনার সূর্যদাস পণ্ডিতের মেয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহের সূত্র হিসাবে উদ্ধারণের বিশেষ ভূমিকা ছিল।[173]
মহেশ পণ্ডিত	মহাবাহু	সাগুনা সরডাঙ্গা/ বরাহনগর	নিত্যানন্দের থেকেই দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দায়িত্বে এই বিগ্রহের সেবা হত।
পুরুষোত্তম দাস	স্তোককৃষ্ণ	সুখসাগর বোধখানা	অব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং যোগের মাধ্যমে বিশেষ স্থান অর্জনে সমর্থ হন।
পরমেশ্বর দাস	অর্জুন	বিরাটপুর/ সাঁচড়া	এই গোপালেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় পাট প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন। একমাত্র খোলা বেচা শ্রীধর বাদে প্রত্যেকেই নিত্যানন্দ পরম্পরারই অংশ। যদিও দ্বাদশ গোপালের নাম, স্থান এবং কার্যক্রম বিষয়ে *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা* বা *চৈতন্যসঙ্গীতা* প্রভৃতি রচিত গ্রন্থের মত পার্থক্য রয়েছে। তবে বঙ্গদেশে চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব মত প্রসারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই গোপালদেরই।
কালীকৃষ্ণ দাস	লবঙ্গ	জাগুলি/ আকাই হাট	
পুরুষোত্তম দাস	দাম	হালদা	
হলায়ুধ ঠাকুর/ খোলা বেচা শ্রীধর	প্রবল/ মধুমঙ্গল	নবদ্বীপ	

নিত্যানন্দ পরম্পরার ধর্ম প্রচারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের গুরু ভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করে। প্রথমত, নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ে স্ত্রী গুরুকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ গোপালের মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত-কে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কীভাবে ধর্ম

[170] মাইতি, রবীন্দ্রনাথ. *চৈতন্য-পরিকর.* কলকাতা: বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৬০. প্রথম সং. পৃ. ৪৫৪

[171] দত্ত, নারায়ণ. 'উদ্ধারণ দত্ত ও শ্রীপাট সপ্তগ্রাম'. সমকালীন পত্রিকা. ১৩৭১ বঙ্গাব্দ. পৃ. ২০১

[172] সান্যাল, মনস্বিতা. 'সপ্তগ্রাম (আঃ ১৩০০-১৬৩২)'. কলকাতা: ঐতিহাসিক. সংখ্যা ৪. মাঘ. ১৩৮৩ পৃ. ১৭-১৮

[173] দাস, কিশোরী দাস. *সপ্তগ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ.* চৈতন্যডোবা: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪১৩ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৩১

সংগঠনে জাতের পাশাপাশি অর্থের প্রতিপত্তি কাজ করে। তৃতীয়ত, নেড়ানেড়িকে বৈষ্ণব মতে গ্রহণ করার মাধ্যমে বোঝা যায় নিত্যানন্দ সম্প্রদায় সব-সময়ে জাতি-বর্ণের কঠোরতাকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি। চতুর্থত, বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মানুষকে দীক্ষা দান বা অন্য ধর্মসাধনার মানুষকে বৈষ্ণব ধর্মে গ্রহণের মাধ্যমে নিত্যানন্দ এবং দ্বাদশ গোপালেরা বঙ্গদেশে চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব মতের প্রচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিল। এখানেই অদ্বৈত আচার্য এবং নরহরি পরম্পরার সঙ্গে নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের পার্থক্য। নিত্যানন্দ সম্প্রদায় দ্বাদশ গোপাল এবং দ্বাদশ উপ-গোপালের মাধ্যমে যে মাত্রায় বৈষ্ণব মতের প্রসার করতে সমর্থ হয়েছিল তা বঙ্গদেশের অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ পরবর্তী সময়ে বাঁকুড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন শ্রীনিবাস আচার্য। *প্রেমবিলাস* অনুযায়ী শ্রীনিবাস চৈতন্যদেবের, নরোত্তম নিত্যানন্দের এবং শ্যামানন্দ অদ্বৈত আচার্যের অংশকলা রূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। অভিরাম ঠাকুরের মাধ্যমে প্রেমভক্তি লাভের পরে শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে যাত্রা করেন এবং জীব গোস্বামীর থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্র বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য নিয়ে আসেন। গোপাল ভট্টের থেকে তিনি বৃন্দাবনের রাধারমণ বিগ্রহের সামনে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। জীব গোস্বামীর কাছে তিনি আচার্য উপাধি পান। নরহরি সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রীনিবাস গোপাল দাসের কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের জন্য গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসকে রাধারমণ বিগ্রহের সেবাইত পদ থেকে চ্যুত করেন।[১৭৪] তবে একারণে বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের সম্মান হানি হয়নি। বৃন্দাবনের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্র মারফত যোগাযোগের কথা পাওয়া যাচ্ছে। খেতুরী মহোৎসবে শ্রীনিবাসই ছিলেন প্রধান আচার্য। শ্রীনিবাস আচার্যের লেখা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা বিষয়ক পদের কথা পাওয়া যাচ্ছে।[১৭৫] ভাগবতের প্রেক্ষাপটে শ্রীনিবাস আচার্য

---

[১৭৪] মাইতি, রবীন্দ্রনাথ. *চৈতন্য-পরিকর.* কলকাতা: বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৬০. প্রথম সং. পৃ. ৫৬১

[175] বাবাজী, কিশোরী দাস. *শ্রীশ্রী নিবাস আচার্য বিষয়ক রচনাবলী.* হালিশহর: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪১৭ বঙ্গাব্দ. পৃ. ২১-২২

চারটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। এই *চতুঃশ্লোকী*-কে শ্রীনিবাসাচার্য গুরু তত্ত্বকে ভগবত ভক্তি লাভের অন্যতম প্রধান পথ বলে স্বীকার করেছিলেন।[১৭৬] শ্রীনিবাস আচার্যের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল মল্লভূমের রাজা বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দান করা। মল্ল রাজবংশ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার ফলে বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম রাজ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনে সমর্থ হয়, যার ফলশ্রুতিতে মল্ল রাজবংশের দানে অজস্র বৈষ্ণব মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত হয়। *কর্ণানন্দ*-এর বর্ণনা অনুসারে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, এদের মধ্যে অষ্ট কবিরাজ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বিভিন্ন সূত্র মিলিয়ে শ্রীনিবাসের একশ-চেতাল্লিশ জন শিষ্যের কথা পাওয়া গেলেও বিমানবিহারী মজুমদার মাত্র সাতাশ জনকে শ্রীনিবাসের সরাসরি শিষ্য বলে স্বীকার করেছিলেন।[১৭৭] পদাবলী সাহিত্যে শ্রীনিবাস আচার্যের বন্দনামূলক পদের সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে শ্রীনিবাসের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল মল্ল রাজবংশে বৈষ্ণব দীক্ষার সূচনা। প্রসঙ্গত বলা দরকার মল্লরা নিচুজাতের মানুষ ছিলেন, সম্ভবত বাগদি সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং, নিত্যানন্দ এবং বীরভদ্রের হাতে যেভাবে নিম্ন বর্ণের মানুষদের দীক্ষা দানের কথা আমরা পেয়েছিলাম শ্রীনিবাসের মধ্যেও সেই ধারাটি কার্যকর ছিল।

এবারে নরোত্তম দাসকে নিয়ে কিছু কথা বলার প্রয়োজন। বৃন্দাবনের থেকে বৈষ্ণব শিক্ষা অর্জন করে বঙ্গদেশে ফিরে নরোত্তম দাসের অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-পারম্যবাদ এবং বঙ্গদেশের গৌর-পারম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। প্রসঙ্গত বলা দরকার নরোত্তম দাস নিজে কায়স্থ্ পরিবারের সন্তান। তবে বৈষ্ণবগুরু হিসাবে নরোত্তমের প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নরোত্তমের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্যের কথাও পাওয়া যাচ্ছে। জাত নিয়ে এই দ্বিধার উত্তরে নরোত্তমকে

---

[১৭৬] রায়, জীমূতবাহন. *শ্রীনিবাস আচার্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ.* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা. ১৯৮৪. প্রথম সং. পৃ. ২৩৬

[১৭৭] তদেব, পৃ. ২৪৮

নিয়ে প্রচলিত একটি কাহিনির উল্লেখ করা যায়। এই আখ্যান অনুসারে নরোত্তমের প্রথমে গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গের আশীর্বাদে পদ্মায় স্নান করে তাঁর বিষয় বাসনা দূর হয়, তাঁর মনে কৃষ্ণপ্রেমের উৎসার ঘটে। তিনি গৌরবর্ণ প্রাপ্ত হলেন, এই দেহকে অপ্রাকৃত দেহ বলে বর্ণনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলবেন—

সে অবস্থায় তিনি ব্রাহ্মণ কেন, দেবতারও গুরু হইতে পারেন।[১৭৮]

ফলে নরোত্তম দাসের জাতি পরিচয় নিয়ে একধরণের দ্বিধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় আজও আছে। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নরোত্তম দাসের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। নরোত্তম দাসের মাধ্যমেই বঙ্গদেশে মঞ্জরীভাবের সাধনা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নরোত্তম দাসের গুরু ছিলেন লোকনাথ গোস্বামী। আমরা *অনুরাগবল্লী*-তে নরোত্তম দাসের দীক্ষা প্রসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি—

হরিনাম রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র পঞ্চ-নাম।
দিয়া কহে সেবা সাধ্য সাধন বিধান।।
মহাপ্রভু শচীপুত্র ব্রজেন্দ্র-কুমার।
নির্যাস কহিল সব সিদ্ধান্তের সার।।
সিদ্ধ নাম থুইলেন বিলাস-মঞ্জরী।
আপনার নাম কহিলেন মঞ্জুনালী।।
এতেক সংক্ষেপে কহি কহিল তাঁহারে।
ক্রমে ক্রমে পাবা তুমি ইহার বিস্তারে।।[১৭৯]

এই বর্ণনা থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দীক্ষাদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষত, গুরুর শিষ্যকে সিদ্ধ দশার মঞ্জরী নাম বলে দেওয়া থেকে অনুমান করা যাচ্ছে নরোত্তমের দীক্ষা হয়েছিল মঞ্জরী সাধন-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পরে। নরোত্তমের মাধ্যমে এই মঞ্জরী সাধনা বঙ্গদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। *রাগমালা* নামক গ্রন্থে নরোত্তম দাস বৃন্দাবনের ষড়

---

[১৭৮] গোস্বামী, রাধাবিনোদ. *বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৬. দ্বিতীয় সং. পৃ. ১৩

[১৭৯] দাস, মনোহর. *অনুরাগ-বল্লী.* কলকাতা: তড়িৎকান্ত বিশ্বাস প্রকাশিত. ৪২৪ গৌরাব্দ. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৬৬-৬৭

গোস্বামীকে ব্রজলীলার মঞ্জরীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১৮০] এই মঞ্জরী সাধনার সঙ্গে আমরা নরোত্তম দাসের জাতিগত অবস্থানের একটি সম্পর্কের অস্তিত্বের কথা বলতে চাইছি। যেহেতু মঞ্জরী সাধনায় সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের উপরেই মূল জোর থাকে তাই সেখানে মঞ্জরীর প্রাকৃত দেহ এবং তৎ-সংলগ্ন যাবতীয় পরিচয়ই অর্থহীন হয়ে যায়। যেহেতু নরোত্তম দাসের নিজের জাতিগত অবস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত সমাজ পরম্পরার একটি সরাসরি বিরোধ রয়েছে তাই এক্ষেত্রে অপ্রাকৃত সাধন দেহের তত্ত্বই নরোত্তম দাসকে যাবতীয় প্রশ্নের ঊর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের ইতিপূর্বে উল্লিখিত পদ্মায় স্নানের কাহিনি বা নরত্তম দাসের দীক্ষার বর্ণনা থেকেও আমাদের প্রতিপাদ্যই প্রমাণিত হবে, উভয়ক্ষেত্রেই জাতিগত অবস্থানের প্রশ্নকে অপ্রাকৃত সিদ্ধ দেহের তত্ত্বের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তী-র *নরোত্তম বিলাস*-এর নবম বিলাসে নরোত্তমকে শূদ্র মনে করার অপরাধে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ রোগ লাভ এবং পরে নরোত্তম দাসের কৃপায় নাম-কীর্তনের মাধ্যমে কুষ্ঠ থেকে মুক্তি লাভের বর্ণনা পাচ্ছি।[১৮১] ফলে জাতিগত অবস্থানের প্রশ্ন সকলকেই ভাবিয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুবাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বৈধী সাধনা এবং রাগানুগা সাধনার দ্বন্দ্ব। সুকুমার সেন বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে বৈষ্ণব অধ্যাত্মভাবনার দুটি পথের কথা উল্লেখ করেছেন— সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামীর ঝোঁক ছিল বৈধী সাধনায়, অন্য দিকে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাগানুগা সাধনার সমর্থক। এই বিবাদের সূত্রে বৈধী-মার্গীদের স্বকীয়াবাদী (এঁরা কৃষ্ণ এবং রাধার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ককে স্বীকার করেন) এবং রাগানুগামার্গীদের পরকীয়াবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৮২] জীব গোস্বামী এবং পরে জাহ্নবা দেবী-র মাধ্যমে স্বকীয়াবাদকেই বৈষ্ণবের আচরণীয়

---

[১৮০] নাথ, নীররদপ্রসাদ. 'শ্রীচৈতন্যমতবাদ প্রচারক নরোত্তম এবং তাঁহার রচনাবলীর সামগ্রিক বিচার'. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল উপাধির জন্য প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ. পৃ. ৪৭৭-৪৭৮

[১৮১] দাস, কিশোরী দাস. *শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস*. চৈতন্যডোবা: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪২৩ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং. পৃ. ৮৮-৮৯

[১৮২] সেন, সুকুমার. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২). কলকাতা: আনন্দ.১৪১৮ বঙ্গাব্দ. দশম মুদ্রণ. পৃ. ৪৮-৪৯

বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ বৈধী সাধনায় জাতি-বর্ণের প্রশ্নটি সব-সময়ে থাকবে। রাগানুগা সাধনায় প্রাকৃত দেহের গুরুত্ব নেই, শিষ্যের সিদ্ধদেহ জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ পরিচয়ের উর্দ্ধে। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিভিন্ন গুরুদের মাধ্যমে রাগানুগা সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত রঘুনাথ দাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ রাগানুগা মার্গের সাধনাকে সমর্থন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য এবং হেমলতাও রাগানুগা মার্গের সমর্থক ছিলেন বলেই জানা যায়।[১৮৩] কিন্তু সকলের জন্য রাগানুগা মার্গ যথাযথ নয়, এই পথ অত্যন্ত কঠিন এবং পিচ্ছিল। তবে মঞ্জরী সাধনায় বৈধী এবং রাগানুগা মার্গের বিবাদ মেটানোর চেষ্টা দেখা যাবে। যতদিন ভক্তের চিত্ত মঞ্জরীভাবের জন্য প্রস্তুত নয় ততদিন ভক্ত বৈধী সাধনা করবে। গুরু উপযুক্ত মনে করলে ভক্তকে এরপরে রাগানুগা মার্গের নির্দেশ দেবেন। সুতরাং গুরুদের জাতি এবং লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সরাসরি সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

লিঙ্গ-রাজনীতির দিক থেকে মঞ্জরী ভাবের সাধনার দিকটি নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। মঞ্জরী ভাবের সাধনা নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা সব সময়েই ছিল, আজও আছে। উনিশ শতকের চিন্তা চেতনায় নারী বেশের পুরুষ সাধককের কার্যবিধি কিছু ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালির কাছে একটি হাসির উপাদান হয়েছিল।[১৮৪] বারবার করেই যৌন 'ব্যভিচার'-এর সঙ্গে মঞ্জরী সাধনাকে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে। আমরা এই প্রসঙ্গে অনেক পরবর্তী সময়ে রচিত একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুলতে চাইছি। সরাসরি সপ্তদশ শতকের বিষয় না হলেও মঞ্জরী ভাব নিয়ে জিজ্ঞাসা বিশ শতকেও জারি ছিল। আর এই সাধনার ধারা আজও চলে আসছে। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশ ভবন থেকে সতীনাথ ভাদুড়ি-র *দিগ্‌ভ্রান্ত* গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে

---

[১৮৩] তদেব, পৃ. ৫১

[১৮৪] দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়.* কলকাতা: বসুমতী কার্যালয়. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. [ ]. পৃ. ২৪৫

রয়েছেন একজন মঞ্জরী যাঁর সাধন নাম চিত্রা সখী। তিনি একটি গুরুবাড়ির সাধনার মূল আকর্ষণ ছিলেন। তাঁকে নিয়ে লোকের কৌতুহলের শেষ ছিল না। তবে চিত্রাসখীর কীর্তন বা ধর্ম ব্যাখ্যা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি রাসপূর্ণিমার উৎসবে নির্বাচিত ভক্তদের সামনে কিছু অলৌকিকতার প্রদর্শনও করতেন। শুধু তাই নয় চিত্রাসখীর বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতাকেও গুরুবাড়ি অলৌকিকতার চাদরে ভক্তদের সামনে পরিবেশন করতেন। শেষে ঔপন্যাসিক দেখাচ্ছেন চিত্রা সখী হলেন মণিপুর থেকে বিয়ের রাত্রে পালিয়ে আসা একজন 'মেয়েলি' পুরুষ যিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন এবং তখন একজন বৈষ্ণব গুরুর সান্নিধ্যে আসেন এবং মঠের মূল আকর্ষণে পরিণত হন।[১৮৫] শেষ জীবনে বিবিধ তিক্ততার কারণে তিনি মঠ ত্যাগ করেন। সতীনাথের বর্ণনাতে আমরা মঞ্জরী ভাবের সাধনা কেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের আগ্রহ বা জিজ্ঞাসার কথা যেমন পাচ্ছি, তেমনই সামগ্রিক ভাবে একজন পুরুষের নারী হবার আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সংক্রান্ত জীবনভর যন্ত্রণাকে সমানুভূতির চোখে দেখার চেষ্টাও বোঝা যাচ্ছে। গুরুবাদের সমালোচনা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ উপার্জনের কৌশলকে সমালোচনা করলেও সতীনাথ কিন্তু এই লিঙ্গ-রাজনীতির ক্ষেত্রে যথাযথ অবস্থান নিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মঞ্জরী সাধনার পাশাপাশি নরোত্তম দাসের আরেকটি কৃতিত্ব খেতুরী মহোৎসবের মাধ্যমে বৃন্দাবন এবং বঙ্গদেশের তাত্ত্বিক বিবাদের সমাধান। নরোত্তম দাস খেতুরী-তে পাঁচটি রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ এবং একটি গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি স্থাপন করে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করেছিলেন। নরোত্তমের উদ্যোগেই এই সমাবেশ হয়েছিল। বোঝা যায় বৈষ্ণব ধর্মকে সাংগঠনিক রূপদানের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য দুইই নরোত্তম দাসের ছিল। নরোত্তম দাস এই উৎসবে মার্গ সঙ্গীতের আদলে বাংলা কীর্তনগানকে শাস্ত্রীয় রূপ দানের চেষ্টা করেন। এই উৎসবে মার্গ সঙ্গীতের আদর্শে তাল-

[১৮৫] ঘোষ, শঙ্খ এবং নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.). *সতীনাথ গ্রন্থাবলী* (৪). কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. ১৪২৪ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১৭৫

বাদ্য এবং আলাপের বিস্তারের পরে নরোত্তম প্রথমে চৈতন্য বন্দনা করে পরে রাধাকৃষ্ণের লীলাসূচক কীর্তন পরিবেশন করেন।[১৮৬] নরোত্তম দাসের প্রবর্তিত এই রীতির কীর্তনকে গরাণহাটি রীতির কীর্তন বলা হয়। আগে গৌরাঙ্গের কথা বর্ণনা করে কীর্তন শুরুর এই ধ্রা থেকেই গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার পদ্ধতি ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরে নরহরি চক্রবর্তী কীর্তনকে শাস্ত্রীয় মর্যাদা দানের চেষ্টা করেছিলেন। কেবল সুর এবং তালের শাস্ত্রীয় রূপদানের মধ্যেই নরহরি চক্রবর্তী সীমাবদ্ধ ছিলেন না। কীর্তনের সঙ্গে নাদোৎপত্তির সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন নরহরি চক্রবর্তী তাঁর *গীতচন্দ্রোদয়* নামক গ্রন্থে।[১৮৭] বৃন্দাবনের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে নজরে রেখে নরোত্তম দাসের লেখা *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, হাটপত্তন, প্রার্থনা, চমৎকারচন্দ্রিকা* বৈষ্ণব সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত গ্রন্থ। বিশেষত নরোত্তম দাসের *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা* 'লক্ষ গ্রন্থের টীকা' বলে বৈষ্ণব সমাজে পঠিত হয়।[১৮৮] পরবর্তী সময়ে, ১৫৮৫ শকাব্দে রামগোপাল দাস রচিত *রসকল্পবল্লী*-র মূল উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস তত্ত্বের সারসংক্ষেপ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা।[১৮৯] এই প্রচেষ্টা বৃন্দাবনের সংস্কৃত শাস্ত্র বঙ্গদেশের বৈষ্ণব সমাজে অন্তর্ভুক্তির প্রমাণ।

শ্যামানন্দের মাধ্যমে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে, সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটেছিল।[১৯০] শ্যামানন্দ নিজে সদ্‌গোপ পরিবারের সন্তান; শ্যামানন্দের পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল ধারেন্দা অঞ্চলে বেশ প্রতিপত্তিশালী মানুষ ছিলেন। সদ্‌গোপদের মধ্যেও শ্যামানন্দ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। এই সদ্‌গোপদের একাংশ শ্যামানন্দ পরম্পরায় দীক্ষিত । পশুপালন ত্যাগ করে যে গোপেরা কৃষিতে প্রবেশ করেন তাঁরা নিজেদের সদ্‌গোপ বলে পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনৈতিক

[১৮৬] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন. *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস.* কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী. ১৯৮৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৮২

[১৮৭] চৌধুরী, বাসন্তী. *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য (অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে).* কলকাতা: বুক ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৬৮. প্রথম সং. পৃ. ৪৬-৪৮

[১৮৮] মিত্র, খগেন্দ্রনাথ. 'উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব'. ভারতবর্ষ. বৈশাখ ১৩৫৭. পৃ. ৬৫৫

[১৮৯] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ এবং অন্যান্য. *রসকল্পবল্লী.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ০৪

[১৯০] Sanyal, Hiteshranjan. *Social Mobility in Bengal*. Kolkata: Papyrus. 1981. 1st Edition. p. 93

সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি শ্যামানন্দের মাধ্যমে সদ্গোপদের মধ্যে একধরনের সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয়েছিল। নাড়াজোলের সদ্গোপ রাজপরিবারের বৈষ্ণব ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্যামানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখার অন্তর্গত হৃদয়চৈতন্যের থেকে দীক্ষা লাভ করেন।[১৯১] এরপরে বৃন্দাবনে গিয়ে জীব গোস্বামীর থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করে বঙ্গদেশে ধর্ম প্রচার করা শুরু করেন। শ্যামানন্দকে জাতের কারণে প্রথমে ব্রাহ্মণরা গুরুর মর্যাদা দিতে চাননি। একটি আখ্যানে দেখছি শ্যামানন্দের শিষ্য রামচন্দ্র বোসের ঐশ্বর্য প্রকাশ দেখে ব্রাহ্মণরা শ্যামানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হন।[১৯২] ফলে প্রাথমিক বাধা থাকলেও সাংগঠনিক শক্তি এবং নিজের পাণ্ডিত্যের প্রভাবে শ্যামানন্দ নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বৃন্দাবনে শাস্ত্র শিক্ষার পাশাপাশি শ্যামানন্দের সরাসরি দৈব কৃপা প্রাপ্তি হয়েছিল। মুরারী আচার্য্যের *শ্রীবিন্দুপ্রকাশ*-এ বৃন্দাবনে শ্যামানন্দের শ্রীরাধার স্বর্ণ-নূপুর প্রাপ্তি এবং শ্রীরাধার স্বয়ং কপালে 'শ্যামমোহন' নামক তিলক প্রকটিত করে মঞ্জরী হিসাবে শ্যামানন্দকে গ্রহণ করার আখ্যান পাচ্ছি।[১৯৩] শ্যামানন্দের সিদ্ধদেহে মঞ্জরী নাম হল কনকমঞ্জরী।[১৯৪] এই আখ্যানটিকেও আমরা শ্যামানন্দের জাতিবর্ণ গত অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে পারি। শ্যামানন্দের প্রথম দীক্ষা হয়েছিল নবদ্বীপের হৃদয়চৈতন্যের কাছে। নবদ্বীপে তখনো মঞ্জরী সাধনা প্রচলিত হয়নি। মঞ্জরী সাধনায় যেহেতু অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের উপরেই মূল ঝোঁক, প্রাকৃত দেহের জাতিবর্ণ তাই মঞ্জরীভাবে গৌণ। ফলে শ্যামানন্দের ভক্ত হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় ছিল তাঁকে মঞ্জরী সাধনার অন্তর্ভুক্ত করা। অথচ একবার দীক্ষা হয়ে গেলে আর দীক্ষার সুযোগ সাধারণত

---

[১৯১] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (সম্পা.) *শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর*- নরহরি চক্রবর্তী বিরচিত. কলকাতা: গৌড়ীয় মিশন. ২০০৪. পৃ. ১৬

[১৯২] দাস, কিশোরী দাস (সম্পা.). *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ*- কৃষ্ণচরণ দাস বিরচিত. চৈতন্যডোবা: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪২০ বঙ্গাব্দ. তৃতীয় সং. পৃ. ৭৯

[১৯৩] দেব গোস্বামী, গৌরকিশোরানন্দ. *শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশ*. মথুরা: শ্রীশ্রীরাধাশ্যামমন্দির. ২০১৮. তৃতীয় সং. পৃ. ১৭

[১৯৪] তদেব, পৃ. ৭৯

থাকে না। সেকারণেই স্বয়ং শ্রীরাধা নিজে শ্যামানন্দের কপালে তিলক এঁকে এই বিতর্কের সমাধান করলেন। এই আখ্যান একই সঙ্গে শ্যামানন্দের জাতিবর্ণের ঊর্দ্ধে মঞ্জরী অবস্থা এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্*-এ 'শ্যামানন্দ' নামের ব্যাখ্যায় বলা হল—

শ্যাম অর্থাৎ উজ্জ্বল রসের দ্বারা যিনি উল্লসিত হইয়া ত্রিভুবনের আনন্দ সম্পাদন করিতেছেন, এই হেতু যে কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠকে সূরিগণ শ্যামানন্দ নামে অভিহিত করেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনবরের রমণীগণের অতীব গূঢ়ভাব প্রকাশ বিষয়ে যিনি উজ্জ্বলমূর্তি হইয়াছেন, সেই কৃপাবান্ জগতগুরু দূরিকানন্দকে বন্দনা করি।[১৯৫]

শ্যামানন্দের থেকে মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ছেষট্টি জন শিষ্যের কথা পাওয়া যাচ্ছে।[১৯৬] শ্যামানন্দের মেদিনীপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সহকারী ছিলেন রসিকানন্দ। বর্তমানে গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দের শ্রীপাট রসিকানন্দের উত্তর-পুরুষেরাই সামলে আসছেন। রসিকানন্দের জন্ম হয় ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। রসিকানন্দ জাতিতে করণ; ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্যামানন্দের কাছে সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে রসিকানন্দ বৃন্দাবন ভ্রমণে যান। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে নিজের পৈতৃক জমিদারি ত্যাগ করে রসিকানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে মনোনিবেশ করেন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ধারেন্দার জমিদার ভীম এবং শ্রীকরকে দীক্ষা দান করেন রসিকানন্দ। এরপর ১৬১৭ সালে ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জকে মন্ত্রোপদেশ দান করে ভঞ্জ পরিবারকে ব্রহ্মশাপ থেকে তিনি মুক্তি দেন। পরে বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্তি দান ছাড়াও বন্য হাতিকে কৃষ্ণ মন্ত্র দান (১৬২৩ খ্রি.), বাঘকে হরিনাম মহামন্ত্র দান, ইন্দ্রের মাধ্যমে শিখরভূমে বৃষ্টি করানো এবং শিখরভূমের রাজা ও সকল

[১৯৫]রসিকানন্দ মুরারি রচিত. *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্.* মেদিনীপুর: গোপালগোবিন্দানন্দ দেবসোস্বামী প্রকাশিত. ৫০০ গৌরাব্দ. [ ]. পৃ. ০৪

[১৯৬] Mandal, Rabindranath. Vaishnavism and Vaishnavite Culture in Midnapur (16th Century to present day). unpublished Ph.D thesis. Vidyasagar University. 2001. pp. 54-55

প্রজাকে দীক্ষা দান করা, বসন্তিয়া নিবাসী মছন্দ্র নামে ফকিরকে যথোচিত শিক্ষা দিয়ে বৈষ্ণব করা ইত্যাদির মাধমে রসিকানন্দই বঙ্গদেশে শ্যামানন্দ সম্প্রদায় তথা গোপীবল্লভপুর শ্রীপাটের মহত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে শ্যামানন্দ রসিকানন্দের কপালে তিলক রচনা করে এবং মাথায় পাগড়ি বেঁধে তাঁকে সাড়ে তিন হাজার মঠ এবং মন্দিরের একমাত্র সেবাইত পদে অভিষিক্ত করেন।[১৯৭] গোপীবল্লভপুর শ্রীপাট একাধিক স্থানীয় রাজবংশকে যেমন বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দান করেছিল, একই ভাবে কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেও এই পাটের সুসম্পর্ক ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে গোপীবল্লভপুর শ্রীপাটের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় যাওয়া যায় অধিকারী, পাট্টাদার এবং ছড়িদার প্রথার মাধ্যমে।[১৯৮] এই পাটে সদ্‌গোপদের অধিকারীদের কাজ করতে দেখা যায়।[১৯৯] সুতরাং গোপীবল্লভপুর শ্রীপাট দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি এই শ্রীপাটের সঙ্গে সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সমাজের যোগাযোগ বরাবরই ছিল। রসিকানন্দের সমকালে রাজস্থান প্রভৃতি স্থান থেকে গোপীবল্লভপুর দর্শনে আসার কথাও আমরা পাব। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণের কথা। তিনি শ্যামানন্দ পরম্পরার বৈষ্ণব ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছিলাম বলদেব বিদ্যাভূষণই *ব্রহ্মসূত্র*-এর ‘গোবিন্দভাষ্য’ রচনা করেছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণবমতের প্রসারে শ্রীনিবাস, নরোত্তম পরম্পরায় আমরা দেখেছি মেয়েদের গুরু হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রসঙ্গ। এর আগে অবশ্যই সীতা দেবী, জাহ্নবা দেবী বা বিষ্ণুপ্রিয়া

---

[১৯৭] দেবগোস্বামী, কৃষ্ণগোপালানন্দ. *শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু.* মথুরা: শ্রীশ্রী রাধাশ্যামসুন্দর জীউ মন্দির. ২০১৫. প্রথম সং. পৃ. ৭-১৪

[১৯৮] Das, Bishnupada. *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western frontier Bengal Since Introduction of Neo-Vaishnavism*. Kolkata: Firma KLM Private Limited. 1996.1st Edition. pp. 59-60

[১৯৯] তদেব, পৃ. ১৬৬-১৬৭

গুরুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপরেও আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে স্ত্রী গুরুদের যোগদান দেখতে পাব। নিত্যানন্দের কন্যা পদ্মা, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী, নরোত্তম দাসের প্রধান শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর দুই কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়া, পুরীতে গঙ্গামাতা গোস্বামী সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের স্ত্রীগুরু হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরও পরে পিসিমা গোস্বামী, মা যশোদা সিদ্ধেশ্বরী দেবী, শ্রীমতী দেবী, গিরিজা দেবীকেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।[২০০] হেমলতা ঠাকুরাণী ও তাঁর বংশের মেয়েরা মল্ল রাজবংশের মেয়েদের পড়াশোনা শেখাতেন। হেমলতা ঠাকুরাণীর নেতৃত্বে বিষ্ণুপুরের অবন্তিকা, মেরালা, দ্বারিকা, কেঠো, লয়ারে এবং মুর্শিদাবাদের নিয়াল্লিশপাড়া, কুমারপুর, মহুলা রায়পুরে শ্রীপাট গড়ে উঠেছিল। জাহ্নবাদেবীর আখড়া ছিল বোরাকুলি, চুনাখালি, বাজিৎপুর প্রভৃতি স্থানে। আখড়াগুলি গোস্বামিনীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, ধর্মচর্চার পাশাপাশি আখড়াগুলিতে শিক্ষাদানের কাজও চলত।[২০১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক অবধি বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে একাধিক রাণী বা জমিদার পরিবারের স্ত্রী বা মেয়েদের সরাসরি অর্থদানের কথা পাওয়া যাচ্ছে।[২০২] সুতরাং বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে কেবল গুরু হিসাবে নয়, পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও মেয়েদের কথা মনে রাখার মত। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে মেয়েদের পড়াশোনার প্রসঙ্গে বৈষ্ণবীদের অবদান ছিল সব থেকে বেশি। ১৮৩৫ এবং ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে অ্যাডামের প্রতিবেদনে নাটোরের শিক্ষিত বৈষ্ণবীদের কথা পাওয়া যাচ্ছে।[২০৩] ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন স্মৃতিকথাতেও এই ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে ‘ভদ্রলোক’

---

[২০০] Rosen, Steven J. *Vaishnavi Women and the worship of Krishna*. Delhi: MLBD. 1999. Reprint. pp. 72-81

[২০১] সাহা, প্রভাতকুমার. *মধ্যযুগের ইতিহাসের সন্ধানে.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ১৯৯৮. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৩১

[২০২] Chatterjee, Indrani. ‘Women, Monastic Commerce, and Coverture in Eastern India cira 1600-1800 CE.’. Modern Asian Studies 50, 1. 2016. pp. 194-195

[২০৩] রায়, অপর্ণা. *পুরাতনী নারী ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ. ২০১৬. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ৪৪-৪৫

বাঙালি সমাজ বৈষ্ণবীদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সরাসরি সমালোচনা শুরু করেন। উনিশ শতকে আমরা বৈষ্ণবীদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি নানারকম যাত্রাপালায় গান করতেও দেখতে পাচ্ছি। রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক এই সব যাত্রাগানের মূল বিষয় অনেক সময়েই ছিল রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক আদিরসাত্মক গান। স্বভাবতই উনিশ শতকের নতুন রুচির সঙ্গে এই গান বা বৈষ্ণবীদের স্বাধীন জীবন-যাপন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। সুতরাং 'ভদ্রলোক' সমাজের আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠল বাংলার বৈষ্ণবী এবং তাঁদের পড়াশোনার ধারা। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ) ঢাকার সরকারি বিদ্যালয়ে বৈষ্ণবী শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করে খবর প্রকাশিত হয়েছিল।[২০৪]

সামগ্রিক ভাবে গুরুরাই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের মূল দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট। অনেকের মতেই স্মৃতিশাস্ত্র চালিত সমাজ ব্যবস্থার বাইরে নতুন ধর্মাদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন চৈতন্যদেব।[২০৫] ঐতিহাসিক তথ্যে এই মত সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু, ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, গুরুদের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হয়েছিল যা চৈতন্যদেবের সমসময়ে হয়নি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে গুরুপদ বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে। পরে সহজিয়া বৈষ্ণবদের মাধ্যমেই বৈষ্ণব ধর্মে প্রসার ঘটে সব থেকে বেশি। ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সিলেটে ৫,৬০,৩৭৯ জন বৈষ্ণব ছিলেন যার অধিকাংশই ছিল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।[২০৬] ১৯০৪ সালে সিলেটে কায়স্থ বংশের সন্তান দুর্গাপ্রসাদ কর নামে একজন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুর মৃত্যু হয় যিনি সিলেটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

---

[২০৪] Sangari, Kumkum & Sudesh Vaid (Ed.). *Recasting Women Essays in Colonial History*. New Delhi: Zubaan. 1989. 1st Edition. pp. 153-54

[২০৫] Pal, Bipinchandra. *Bengal Vaishnavism*. Calcutta: Yugayatri Prakashak Ltd. 1962. Second Edition. p. 93

[২০৬] Chakrabarty, *Ramakanta. Vaisnavism in Bengal*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1985. First Publication. p. 328

ধর্মীয় চরিত্র ছিলেন।[২০৭] একথা মানতে কোন অসুবিধা নেই সহজিয়াদের হাতে গুরু ধারণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। জাতিগত অবস্থান সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজে কোন বাধা হিসাবে গ্রাহ্য হয়নি। অবশ্য এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পূর্ববর্তী ইতিহাসকেও রাখতে চাইব।

আমাদের গবেষণার মূল ঝোঁক ছিল ভারতবর্ষীয় প্রবণতা বঙ্গদেশের ধর্ম-সাধনাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা। আমরা আলোচনা শেষ করব ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে চৈতন্য-অনুসারী বৈষ্ণব সাধনার প্রতিগ্রহণের প্রসঙ্গে। তা থেকে আমরা বুঝতে পারব এই যোগাযোগ সর্বদাই উভমুখী ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত শাস্ত্রের অনেকগুলি বঙ্গদেশে সংস্কৃত থেকে বাংলায় পয়ারে অনুবাদিত হয়েছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে। এই অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি পাঠকের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্রের পরিচয় প্রদান করা। এর উল্টো উদাহরণ আমরা পাচ্ছি যেখানে বাংলায় রচিত চৈতন্য চরিতের সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল অবাঙালি পাঠকের কাছে চৈতন্য জীবন মাহাত্ম্য প্রচার। এই প্রসঙ্গে আমরা কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর **১৬৯১** সংখ্যক পুথির কথা বলতে চাইব। এই পুথিটি বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*-এর সংস্কৃত অনুবাদ।[২০৮] পুথিটি খন্ডিত হওয়ায় অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। তবে অনুবাদের প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্ট হয় যে সংস্কৃতে অন্যান্য চৈতন্য চরিত থাকলেও মূলত অবাঙালি পাঠকের কাছে বৃন্দাবন দাসের লেখা প্রচারের জন্যই অনুবাদটি করা হয়েছিল। গোপাল ভট্ট, নিত্যানন্দ শাখার কাছে দীক্ষিত বৈষ্ণব ভক্তদের মাধমে চৈতন্যদেবের প্রভাব হিন্দি ভাষায় (মূলত ব্রজবুলি) আমরা স্পষ্টত দেখতে পাব। হিন্দিতে *চৈতন্যভাগবত*-এর আদি খণ্ড অনুবাদ করেন রাধাচরণ গোস্বামী, নরোত্তম দাসের প্রার্থনার অনুবাদ করেন বালকৃষ্ণদাস। এছাড়া হিন্দিতে

---

[২০৭] তদেব, পৃ. ৩২৯

[২০৮] চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ. 'চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নূতন পুথি'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ১৩৪২ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৮৪-৮৫

চৈতন্য চরিত রচনা করেছিলেন গৌরচরণ দাস, লালমণি, যজ্ঞদত্ত, মনোহর দাস, গৌরগণ দাস প্রমুখ। অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-এর হিন্দি অনুবাদ করেন সুফল শ্যাম।[২০৯] সুতরাং বৃন্দাবন সূত্রে হিন্দি সাহিত্যে চৈতন্যদেব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিলেন। আসামের শংকর দেবের ভক্তি আন্দোলনের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। শংকর দেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব মত ছাড়াও আসামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দামোদরী, মহাপুরুষীয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্যপন্থী শাখার কথা পাচ্ছি। অতএব আসামে চৈতন্যদেবের মতানুসারী বৈষ্ণবের অস্তিত্ব ছিল। লঘুরাম চৌধুরীর লেখা *সৎসম্প্রদায় কথা* অনুসারে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও একবার আসামে আসেন (প্রথম জীবনে একবার শ্রীহট্ট এসেছিলেন) এবং পরশুরামকুণ্ড দর্শন করেন।[২১০] এই বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে চৈতন্যদেবের অনুসারী শাখা শুধু মাত্র নয়, চৈতন্যদেব-কে নিয়ে কিংবদন্তীও আসামে প্রতিষ্ঠিত। আমরা এর আগে পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছিলাম। এই পঞ্চসখাদের মধ্যে জগন্নাথ দাসের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পঞ্চসখাদের রচনায় চৈতন্যদেব-কে জগন্নাথের এবং পরে বুদ্ধের অবতার বলা হয়েছে, যেমন অচ্যুতানন্দ এবং ঈশ্বরদাসের রচনায় এই প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে। অচ্যুতানন্দ রচিত *ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান* নামক গ্রন্থে চৈতন্যদেব-কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে।[২১১] মণিপুরে সরাসরি চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি অষ্টাদশ শতকে রাজা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহের চৈতন্যদেবের

---

[২০৯] তেওয়ারী, রামবহাল. 'চৈতন্যদেব ও হিন্দী সাহিত্য'. কলকাতা: উদ্বোধন (৮৮ তম বর্ষ, নবম সংখ্যা). আশ্বিন, ১৩৯৩. পৃ. ৫৯৭-৫৯৮

[২১০] দেবগোস্বামী, হেমচন্দ্র. 'আসামে শ্রীচৈতন্য'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ১৩২২ বঙ্গাব্দ. পৃ. ২৪১- ২৪৮

[২১১] মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার. 'উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ১৪৩ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৭৪-৮১

মাতামহ বংশীয় রামনারায়ণ শিরোমণি-র দীক্ষাগ্রহণের থেকে।[২১২] অবশ্য এর আগে রাজা গোপাল সিংহের সময়ে শ্রীহট্টের পথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত মণিপুরে প্রবেশ করেছিল। মণিপুরের নৃত্য-গীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। বিশেষত জয়সিংহের কন্যা বিম্বাবতী (১৭৮০ খ্রি.) মণিপুরে বিখ্যাত রাস উৎসবের সূচনা করেন। রাস উৎসবে মণিপুরে প্রচলিত চালি নৃত্য আসামের বৈষ্ণব মতেও গৃহীত হয়েছে। তবে আসামের রাস উৎসবে রাধার অস্তিত্ব নেই।[২১৩] কেবল উত্তর তথা পূর্ব ভারতেই নয় চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির প্রভাব গুজরাতি সাহিত্যে পাওয়া যায় নরসিংহ মেহতা (১৫০০-১৫৮০ খ্রি.) রচিত রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলা বিষয়ক পদে।[২১৪] মহারাষ্ট্রের অভঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম কবি তুকারাম (জন্ম সম্ভবত ১৬০৮ খ্রি.) চৈতন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তুকারামের সাহিত্যে এই প্রভাবের পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়।[২১৫] দক্ষিণ ভারতের মহীশূর-কুর্গ অঞ্চলের সাতানি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চৈতন্যমতের দীক্ষিত ছিলেন বলে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গেজেটিয়ারে জানানো হয়েছিল, পরে এই সাতানিরা শ্রী সম্প্রদায়ের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[২১৬] মাদ্রাজের কীর্তনের ধারায় আমরা বিশ শতক থেকে এস. ভি. আইয়ারের প্রভাবে চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তনের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি।[২১৭] এস. ভি আইয়ার ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কর্মসূত্রে কলকাতায় আসেন এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। মাদ্রাজের কীর্তনে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদের প্রতিষ্ঠা হলেও মাদ্রাজে মহিলা ভক্তদের মধ্যে নিজেকে গোপী

---

[২১২] সিংহ, বিদ্যাচন্দ্র. 'মণিপুরী ও বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পর্ক: সমন্বয় ভাবনার সূত্র সন্ধান'. অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ. আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর. ২০০১. পৃ. ৪৯

[২১৩] বন্দ্যোপাধ্যায়,অনুরাধা. *পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য.* কলকাতা: জে. ই. ই. পাবলিশার্স. ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ. ৪৩-৪৪

[২১৪] গুপ্ত, নির্মলনারায়ণ. *ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য.* কলকাতা: রত্নাবলী. ১৯৬৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৮০-৮১

[২১৫] তদেব,পৃ. ২৬০-২৬১

[২১৬] তদেব, পৃ. ২৪৩

[২১৭] Singer, Milton. *Krishna Myths, Rites and Attitudes*. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1966. 1st Edition. p. 111

মনে করে ভজনা করার বা সামগ্রিক ভাবে মঞ্জরী ভাবের সাধনার প্রচলন দেখা যায় না।[২১৮] আমরা দেখতে পেলাম ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশেই চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট। সাহিত্যিক অভিব্যক্তি, কিংবদন্তী, কীর্তন এসব থেকে অনুমান করা যায় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস কেবল বঙ্গদেশ বা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সামগ্রিক এই প্রসারের মূলসূত্র ছিল অবশ্যই দীক্ষার প্রসার। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গুরু ধারণার যে নির্মিতি আমরা দেখার চেষ্টা করেছি তা সারা ভারতবর্ষেই নিজের প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

[২১৮] তদেব, পৃ. ১৩২-১৩৩

সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত

একটি বিস্তৃত কালপর্বে ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতি পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম গুরুরা ভারতবর্ষের ধর্ম সাধনায় প্রথম থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি সময়, স্থান এবং ধর্ম-দর্শনের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের গুরু ধারণায় ক্রমাগত পরিবর্তন এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে একথা মানতেই হয় এই ধারণাগত পরিবর্তনের কারণ কেবল ধর্মদর্শনকেন্দ্রিক ছিল না। সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক পটভূমি এই ধারণাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করেছে। প্রায় সবকটি ধর্ম সম্প্রদায় সমঝোতা করেছে রাজশক্তির সঙ্গে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দরকারি সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে শিষ্য সমাজের কথা মাথায় রেখেই। বঙ্গদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির আলোচনায় আমরা দেখলাম অনিবার্যত ভারতবর্ষীয় প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই অঞ্চলের রীতি-নীতি চালিত হয়েছে। বজ্রযান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় গুরুকেন্দ্রিক ধারণা তাই ভারতবর্ষের ধর্ম সাধনার এই প্রবহমানতার সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল। সমগ্র আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরু সংক্রান্ত বিশ্বাসে এবং গুরুকেন্দ্রিক তত্ত্ব ভাবনায় যে বিবর্তনের ইতিহাস আমরা দেখেছি তাকে সূত্রাকারে সংক্ষেপিত করলে একটি প্রবণতা বোঝা সম্ভব হয়।

প্রথম, মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বহির্মুখীনতা। ইন্দ্রিয় মানুষকে বাইরের পৃথিবীকে বুঝতে সাহায্য করে। ফলত মন সব সময়েই ছুটে চলে। অথচ সত্য উপলব্ধির জন্য মনকে উল্টো পথে চালিত করতে হয়। বাইরে নয়, মনকে আনতে হয় নিয়ন্ত্রণে। একেই বলা হয়েছে উল্টা-সাধন। ভারতবর্ষের প্রায় সব ক'টি মতই এই উল্টা-সাধনের কথা বলেছে। সাধনার পথ আলাদা হলেও এখানে একটি মূলগত ঐক্য কাজ করে।[১] আমরা বর্তমান গবেষণায় যে-কটি ধর্ম-দর্শনের কথা

[১] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *ভারতীয় সাধনার ঐক্য.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৮০৭ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৬-১০

আলোচনা করেছি প্রত্যেকের মধ্যেই এই উল্টা-সাধনের কথাই বলা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা দেখেছি এই সাধনায় মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন গুরুরা। সুতরাং ভারতীয় সাধনার ঐক্য বোঝার একটি জরুরি উপায় আমাদের কাছে গুরুবাদ। প্রত্যেকেই গুরুকেই স্বীকার করেছেন; গুরুর মাধ্যমেই বহির্মুখী মন সত্যোপলব্ধির জন্য অন্তর্মুখী হয়েছে।

দ্বিতীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গুরুবাদ সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টাও আমরা প্রায় সবক'টি সঙ্ঘকেন্দ্রিক ধর্ম সম্প্রদায়ে দেখতে পাচ্ছি।

তৃতীয়, আমাদের আলোচনায় গুরুবাদের যে যে দিক গুলি উঠে এসেছে তাকে সূত্রাকারে দেখলে আমরা গুরু ধারণাতেও একটি বিবর্তন দেখতে পাব। বিষয়টি একটি সারণির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়-

ধর্ম-দর্শনের নাম	**সাধ্য-সাধনে গুরু/ গুরুস্থানীয় ব্যক্তির মূল প্রয়োজন**	**বিবর্তনের সূত্র বিষয়ক মতামত**
সিন্ধু সভ্যতা	দৈবী শক্তি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থাতাকারী পুরোহিতের ধারণা ছিল।	সিন্ধু সভ্যতার পুরোহিত সংক্রান্ত মতের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন জনজাতির পুরোহিত বিষয়ক মতের সাদৃশ্য পাচ্ছি। ধর্ম ও রাজশক্তির সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি।
আবেস্তার ধর্ম	জরথুস্ত্র মূলত নৈতিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই মতে পুরোহিতেরা অগ্নি রক্ষা করেন।	সামাজিক অনুষ্ঠান করা ছাড়া পুরোহিতের বিশেষ ভূমিকা নেই।
বৈদিক ধর্ম (মূলত প্রথম দিক)	দুটি ধারা পাচ্ছি। ঋষি ধারা মূলত যজ্ঞানুষ্ঠানকেন্দ্রিক, মুনি ধারা ধ্যান-যোগ কেন্দ্রিক।	মুনি ধারা থেকে পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ এবং অন্যান্য শ্রামণ্য ধর্মের সূচনা হবে। মুনি ধারাকে আমরা ভারতবর্ষীয় গুরুবাদের সূচনা বিন্দু হিসাবে দেখতে পারি। ঋষি ধারা রাজশক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করত।
বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী শ্রামণ্য মত	মূলত ধ্যান বা যোগ সাধনাকেন্দ্রিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুদের কথা পাচ্ছি।	শ্রামণ্য মত থেকে গুরুকেন্দ্রিক সাধনা যে আলাদা আলাদা ভাবে ভারতবর্ষে কার্যকর ছিল তা বুঝতে পারি। সুতরাং শ্রামণ্য সম্প্রদায়ের মূল অবদান হল

		একজনকে কেন্দ্র করে একাধিক মুমুক্ষুর সঙ্ঘ নির্ভর সাধনাকে প্রতিষ্ঠা দান।
থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম	এখানে গুরুর কাজ করে শাস্ত্র (বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম)। আচার্য বা উপাধ্যায়ের মূল কাজ শাস্ত্রের পথে শিষ্যকে চালনা করা। এখানে গুরু হিসাবে মার্গ প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধকে রাখতে হবে। আচার্য বা উপাধ্যায় বুদ্ধদেব কথিত মতেই শিষ্যদের দিক্নির্দেশ দিতেন। পরে অবশ্য অভিধর্মের ব্যাখ্যা করাও গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের কাজের অংশ হয়ে ওঠে।	সঙ্ঘকেন্দ্রিক সাধনার ধারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়। আবার সঙ্ঘের সঙ্গে রাজশক্তির সম্পর্ক বজায় রাখার দিকেও বুদ্ধদেবের মনোযোগ ছিল। সুতরাং গুরুবাদের ইতিহাসে গুরুকেন্দ্রিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজশক্তির সম্পর্ক রক্ষার দিকটি থেরবাদে বিশেষ লক্ষণীয়।
মহাযানী বৌদ্ধধর্ম	গৌতম বুদ্ধের কথিত শাস্ত্রের বাইরে নতুন শাস্ত্রীয় পরিসর তৈরি হয়েছিল আচার্য নাগার্জুনের হাতে। এখানে গৌতম বুদ্ধ দেবতা স্থানীয়। ব্যক্তি নির্ভর গুরুর ধারণা এই পর্যায়ে শুরু হয়।	মহাযানে গুরুর ভূমিকা স্পষ্ট হয়। নতুন শাস্ত্র রচনা, নতুন সাধ্যের ধারণা তৈরি হয়েছে গুরুর হাতে। প্রথমে বোধিসত্ত্বের ধারণা তৈরি হচ্ছে, ক্রমে তা ব্যক্তি গুরুর দিকে এগোচ্ছে।
প্রারম্ভিক পৌরাণিক ধর্ম	বৈদিক যজ্ঞকারী পুরোহিতের যাবতীয় দায়িত্ব গুরুকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পুরাণে।	গুরু বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি সেই ধারণা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন পুরাণের সূত্রে। এই সূত্রে গুরুর ধারণায় জনজাতি সমাজের প্রভাব ও ক্রমে তন্ত্রের ব্রাহ্মণ্যকরণের প্রেক্ষিতটি মনে রাখতে হবে।
বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্ম	গুরু উৎপত্তি এবং উৎপন্নক্রমে শিষ্যকে সেক প্রদান করবেন। গুরু বজ্রযানী সাধনায় অপরিহার্য।	দীক্ষানুষ্ঠানের কথা পাচ্ছি। গুরুরা জাতি-বর্ণ, সামাজিক লিঙ্গরূপ, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সমালোচনা করছেন। সুতরাং বিবর্তনের ধারায় থেরবাদে গুরু ছিলেন কেবল শাস্ত্রীয় নির্দেশ দাতা, মহাযানে গুরু ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছেন, তিনি সাধ্য-সাধনের নতুন ছক তৈরি করেছেন। বজ্রযানে গুরুই প্রধান তত্ত্ব। শিষ্যের সহজ লাভ সরাসরি গুরুর উপরেই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।
লিঙ্গায়েৎ মত	গুরুর অবস্থান মন্দিরের বিপ্রতীপে। এটিই লিঙ্গায়েৎ মতের মূল বৈশিষ্ট্য।	ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করে বলে সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ে গুরুরা করে থাকেন। গুরু একই সঙ্গে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন ও সমাজ জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নাথ সাধনা	গুরুরা শিষ্যকে মৃত্যু অতিক্রম করার শিক্ষা দেন।	মূলত শরীরকেন্দ্রিক সাধনা বলে গুরুর মূল কাজ শিষ্যকে শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের এবং যোগের শিক্ষা দান। নারী বিদ্বেষ নাথ সাধকদের একটি অংশে দেখা যায়।
সুফি ও নির্গুণ সাধনা	গুরুরা অনেকেই জাতি-বর্ণ প্রথার বিরোধিতা করে সকল সামাজিক স্তরের মধ্যেই দীক্ষা দান করেছেন। সাধনার ধারায় এঁদের সঙ্গে নাথপন্থীদের সাদৃশ্য আছে।	এই মতগুলিতেও গুরুদের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়।
শংকরদেব ও পঞ্চসখাদের সাধনা	শংকর দেবের প্রচেষ্টায় সঙ্ঘকেন্দ্রিক বৈষ্ণব মত তৈরির চেষ্টা দেখা যায়। পঞ্চসখাদের মধ্যে দেখা যায় নির্গুণ ভক্তি প্রচারের প্রবণতা।	শংকর দেবের সাধনায় গুরুর মূল কাজ ছিল সঙ্ঘের দ্বারা কেন্দ্রচালিত একশরণ ধর্মের প্রসার। ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি শংকর দেবের প্রচারিত ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা	মূলত প্রেমভক্তির প্রসার, শিষ্যকে মঞ্জরী ভাবের শিক্ষা দান।	গুরু ধারণায় বিবর্তনের মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুরা নানা ভূমিকা নিয়েছেন। ১. বৈষ্ণবকে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক পরিচিতি হিসাবে নির্মাণ। খাদ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি বা জীবন-যাত্রা সব দিকেই এই পরিচিতির নিজস্বতা দেখা যাচ্ছে। ২. মেয়েদের গুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান ৩. গুরুকেই সমাজ ও আধ্যাত্মিক জীবনের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রদান। ৪. গুরুদের মাধ্যমে নানা 'গৌণ' সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্গত হয়েছে। ৫. গুরুদের মাধ্যমে বাঙালি বৈষ্ণবের একটি সর্বভারতীয় যোগাযোগ নির্মিত হয়েছে। বৃন্দাবনে যাত্রা এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ৬. বঙ্গদেশের বাইরেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিভিন্ন গুরুদের হাতে।

চতুর্থ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা একথা স্পষ্ট বুঝেছি গুরুরা চাইলে সমাজের মূল স্রোতের বাইরে গিয়ে অনেক কিছু করেছেন। যেমন সীতা দেবীর মাধ্যমে সখী ভেকী সম্প্রদায় বৈষ্ণব সমাজে স্বীকার লাভ করেছিল। পাশাপাশি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গুরুর প্রাধান্য আবারও প্রমাণ করে তন্ত্রের প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বিশেষভাবে স্বীকার করেছিলেন।

পঞ্চমত, স্ত্রী গুরুকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি নিশ্চয়ই বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু প্রশ্নটি হল এই স্বীকৃতিকে আমরা কীভাবে দেখব? আমদের মনে হয় ধর্ম আসলে এখানে এই ক্ষমতায়নের কাজটি করছে। অবশ্যই ব্যক্তির নিজস্ব যোগ্যতাও থাকছে। পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ যে বাধা মেয়েদের কাছে নিয়ে আসে প্রতিনিয়ত, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সেই বাধা দূর হয় ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যে। মানুষ যে সমর্পণ স্ত্রী-গুরুকে দিচ্ছেন তার বেশিটাই ধর্মের প্রাপ্য। ফলে স্ত্রী গুরুদের প্রতিষ্ঠা থেকে আমরা সামাজিক সক্ষমতার কোন সাধারণ সূত্র তৈরি করতে পারি না। প্রসঙ্গত বলা দরকার বৌদ্ধ ধর্মেও আমরা মেয়েদের নেতৃত্ব দান করতে দেখেছি গৌতম বুদ্ধের সমকালেই। আজও নেপাল, মায়ানমার, কোরিয়াতে স্ত্রী গুরুদের অবস্থান দেখতে পাচ্ছি। যেমন নেপালের ভিক্ষুণী ধম্মবতী, মায়ানমারের Aung San Suu Kyi কোরিয়াতে ভিক্ষুণী Hyechun Sunim বৌদ্ধধর্মে নেতৃত্বদানে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।[২] ধর্ম কীভাবে সামাজিক লিঙ্গরূপের সঙ্গে মূল সমাজের সমঝোতা করতে পারে সেই প্রসঙ্গে থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ ধর্মে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ও 'বেশ্যা'-বৃত্তিতে যুক্ত মেয়েদের যোগদান নিয়ে কথা বলা যায়। থাইল্যান্ডে বৌদ্ধ ধর্মই রাষ্ট্রের প্রধান ধর্ম, এখানে আমরা বেশ কিছু মেয়েদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা পাব যাঁরা এক সময়ে বেশ্যা-বৃত্তিতে যুক্ত ছিলেন। ধর্মের সাহায্যে তাঁরা এই সামাজিক স্থান পেয়েছেন, সমাজ তাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখছে ইদানীং।[৩] সুতরাং ধর্ম ব্যবস্থা নানা দেশেই সামাজিক সীমার বাইরে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হয়েছে।

ষষ্ঠত, আমাদের গবেষণায় মূলত ধর্ম প্রতিষ্ঠান কীভাবে রাজশক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে অথবা রাজশক্তি কীভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তা দেখানো হয়েছে। তবে

---

[২] Tsomo, K. L. 'Women as Leaders in Buddhism' in *Gender and Women's leadership: A Reference Handbook*. CA: Sage Publication. 2010. 1st Edition. pp. 482-89

[৩] Avila, Sandra. 'Buddhism and its relation with Women and Prostitution in Thai Society'. M.A Dissertation. Florida International University. 2008. pp. 77-97

এই প্রক্রিয়া সব সময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। ধর্ম প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো প্রতিবাদীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছে। বঙ্গদেশে এই প্রতিক্রিয়ার একটি উদাহরণ হিসাবে আমরা অষ্টাদশ শতকের সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের কথা বলতে পারি। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মন্বন্তরের সূত্রে এই বিদ্রোহ পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।[৪] এই আন্দোলনে বেশ কিছু স্থানীয় জমিদারদের অংশগ্রহণের কথাও পাওয়া যাচ্ছে। মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব নীতির বিরোধিতাই ছিল এই বিদ্রোহের লক্ষ্য। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ফকির এবং সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় বিশ্বাসযোগ্যতাকে ব্যবহার করেই সাধারণ মানুষের সাহায্যে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং গুরুবাদের ইতিহাসে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করাকেও আমরা মনে রাখব।

সপ্তমত, বঙ্গদেশে আধুনিক সময়ে গুরুবাদের ইতিহাসে মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরু হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা আসবেই। আমরা নিত্যানন্দ বা শ্যামানন্দের মাধ্যমে কিছু ‘নিচুজাতের’ সামাজিক সচলতার দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম। ভারতবর্ষের আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে জাতিবর্ণ সংক্রান্ত বিশ্বাসে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে। তথাকথিত নিচুজাতের মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ভারতবর্ষের এই সমাজ প্রেক্ষিতে কীভাবে গুরুদের মাধ্যমে জাতিসত্ত্বা কেন্দ্রিক একটি আন্দোলন তৈরি হয়েছিল তার উদাহরণ হিসাবে গুরু হরিচাঁদ (১৮১২ খ্রি.-১৮৭৭ খ্রি.) এবং গুরু গুরুচাঁদ (১৮৪৬ খ্রি.- ১৯৩৭ খ্রি.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উদাহরণে আমরা বুঝতে পারি আধুনিক ভারতবর্ষের জাতি-রাজনীতি সঙ্গেও গুরুবাদের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গবেষণার সুযোগ আছে।

---

[৪] মুখোপাধ্যায়, অণিমা. *আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. ১৯৮৭. পৃ. ১০৮-১১২

আমরা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের গুরুতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিনি। কিন্তু গুরু ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে সহজিয়া বৈষ্ণব এবং পীরদের কথা সামান্য হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন বলেই আমরা মনে করি। ব্রাহ্মণ্য গুরু ভাবনার সঙ্গে এই সাধনার ধারার বিশেষ পার্থক্য দেখা যাবে। সহজিয়া সাধনায় গুরু খুবই গুরুত্বপূর্ণ । চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য বা জয়দেব-পদ্মাবতী সহজিয়া সাধনায় গুরু হিসাবে স্বীকৃত। বজ্রযানী বৌদ্ধদের মতই সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সহজিয়া মতে যদুকুলের কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এক নন। কৃষ্ণ তাঁদের তত্ত্বানুযায়ী আধার এবং রাধা হলেন শক্তি।[৫] সহজিয়া বৈষ্ণবরা বাহ্য-পরকীয়া স্বীকার করেছেন। একারণে গুরু নির্দেশিত পথে এই সাধনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁদের কাছে অত্যাবশ্যক ছিল। সহজিয়া মতে কৃষ্ণ হলেন দীক্ষাগুরু এবং রাধা হলেন শিক্ষাগুরু। কৃষ্ণ হলেন মন্ত্রদাতা অথচ রাধা শিক্ষাদাতা। অর্থাৎ সাধককে রাধার নির্দেশিত পথেই সাধনা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একারণেই সহজিয়া চণ্ডীদাস তাঁর পদে নিজেকে রামীর দাস বলে পরিচয় দিয়েছেন।[৬] এই সাধন পদ্ধতির সঙ্গে মঞ্জরী সাধনার সমন্বয় করে *বিবর্ত-বিলাস*-এ প্রমাণ করা হয় অটল বীর্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে রসের সাধনা থেকে ক্রমে রাগরতি, সেবাযোগ্য গোপী দেহ ও শ্রীরাধার দেহ প্রাপ্তি হয়।[৭] *অমৃতরসাবলী*-তে বলা হয়েছে আনন্দের সম্ভোগ হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, বিকারশীল ইন্দ্রিয় চিরানন্দ রস আস্বাদন করতে পারে না, তাই গুরু সব ইন্দ্রিয়কে এই রসের উপযুক্ত করে তোলার শিক্ষা দান করেন।[৮] এই যৌন সম্মিলনে নারীই প্রধান, পুরুষের কাজ নারীকে তুষ্ট করা। নারীর সম্মতিতে এবং নারীর নির্দেশেই এই সাধনা হতে পারে। *নিগূঢ়ার্থ*

[৫] Bose, Mamindra Mohan. *The Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal*. Delhi: Gian Publishing House. 1986. 1st Reprint. pp. 232-233

[৬] Dimock, Edward C JR. *The place of the Hidden Moon Erotic Mysticism in the Vaishnava-sahajiya Cult of Bengal*. Delhi: MLBD. 1992. 1st Edition. pp. 195-200

[৭] দাস, পরিতোষ. *সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম.* কলকাতা: ফার্মা কেএলম প্রাঃ লিঃ. ১৯৭৮. প্রথম সং. পৃ. ২৭১

[৮] দাস, পরিতোষ (সম্পা.). *চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি.* কলকাতা: ভারতী বুক স্টল. ১৯৮৮. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ১৭৩

প্রকাশাবলী অনুসারে এই মিলনে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা নেই। যোনি চুম্বন করে যে পুরুষের জন্ম হয়, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় নারীকে আবার সন্তান ধারণের দুঃখ সে দেবে না।[৯] দেহ সাধকের তত্ত্বে তাই নারীকে তৃপ্তি দান এবং নিজে অটল বীর্যে অবস্থান করাই মূল উদ্দেশ্য। গুরুই শিষ্যকে এই সহজ সাধনায় ক্রমে ক্রমে তুলে নিয়ে যাবেন। মুকুন্দ দাসের *অমৃতরত্নাবলী*-তে বলা হয়েছে—

ভাবাশ্রয় রসাশ্রয় আর প্রেমাশ্রয়।
প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তিনে তিন হয়।।
দীক্ষাকালে মন্ত্রগুরু হইবে আশ্রয়।
প্রবর্ত দেহেতে তাহা সাধিবে নিশ্চয়।।[১০]

সহজিয়া পদে পাচ্ছি— "টলে বীজ অটলে ঈশ্বর।/ মাঝে মাঝে খেলা করে রসিক শেখর।"[১১] কিন্তু এই সাধনা নাথ সাধকদের মত কেবল বিন্দু ধারণে সীমাবদ্ধ থাকে না। সহজিয়া শৃঙ্গার সাধনায় ধাতু মন্থন করে ধাতুকে সাধন পক্ক করতে হয়। তারপরে সেই সাধন পক্ক ধাতু কারুণ্যমৃত, তারুণ্যমৃত হয়ে লাবণ্যমৃতে পরিণতি লাভ করে। সহজ সাধনায় যোগের পথে ভোগের কথা বলা হয়।[১২] গুরু এই সাধনায় শিষ্যকে প্রাণায়ামের শিক্ষা দান করেন। তবে এই প্রাণায়াম যোগশাস্ত্রের প্রাণায়ামের থেকে পৃথক, এখানে প্রথমে রেচন, তারপরে পূরণ এবং শেষে কুম্ভক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৩] বিষটি সাধনার উপলব্ধি নির্ভর বলে আমরা আর আলোচনা করছি না। তবে একথা স্পষ্ট বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় গুরুর মূল ভূমিকার অন্যতম হল প্রাণায়ামের শিক্ষা দান। সহজিয়া সাহিত্যে একাধিক গুরুকেন্দ্রিক কড়চা বা নিবন্ধ জাতীয় গ্রন্থের

---

[৯] ঝা, শক্তিনাথ. *সহজ বলিব কায়.* কলকাতা: সহজপাঠ. ২০২০. প্রথম সং. পৃ. ১৪৪

[১০] তদেব, পৃ. ২০৭

[১১] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ. 'সহজিয়া'. বীরভূমি. [ ]. পৃ. ৪৪

[১২] নিগমানন্দ. *প্রেমিক গুরু.* হালিশহর: আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ. ১৪২০. পঞ্চদশ সং. পৃ. ১০৮-১০৯

[১৩] তদেব, পৃ. ১০৬

কথা পাচ্ছি। যেমন কৃষ্ণদাসের *গুরুতত্ত্ব* অথবা বলরাম দাসের *গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা* এবং *গুরুতত্ত্বসার*। কৃষ্ণদাসের রচনায় বলা হয়েছে—

এ কিছু কহিলাম যে সাধ্যের নির্ণয়
শিক্ষাগুরু বিনে গুরু প্রাপ্তি নাহি হয়।[১৪]

সহজিয়া গুরুবাদের ব্যাখ্যা সব সময়ে একমুখী ছিল না। প্রসঙ্গত আমারা বৈষ্ণবতন্ত্র গ্রন্থ *রাধাতন্ত্র*-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। *রাধাতন্ত্র*-এর সময়কাল নিয়ে কিছু মত পার্থক্য থাকলেও ধর্মীয় ইতিহাসে এই গ্রন্থের অবদানকে অবশ্যস্বীকার্য। আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি তন্ত্রের ক্ষেত্রে সময়সীমা বা আগে-পরের ঐতিহাসিক বিচার সব-সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যাই হোক *রাধাতন্ত্র*-এর দুটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বাসুদেবকে বলছেন শক্তি ব্যতিরেকে পূজা, জপ ও তপস্যা ব্যর্থ হয়।[১৫] দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বাসুদেবের কাছে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা এবং তারক ব্রহ্ম হরিনামের ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন। তাই বাসুদেবের উচিত দেবী লক্ষ্মীর মাধ্যমে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত, *রাধাতন্ত্র* কুলগুরু ব্যতীত অন্য কারোর থেকে দীক্ষাগ্রহণ করলে, বিশেষত শূদ্র বা শূদ্রাণীর থেকে দীক্ষা গ্রহণের পাপ নিয়ে আলোচনা করেছে।[১৬] সুতরাং তন্ত্রের ক্ষেত্রে এখানে বর্ণজাতিপ্রথা বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের সরাসরি প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। ফলে দেবী-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যাত এই সাধনতত্ত্বে গুরুবাদের আরেকটি ধারার ইতিহাস আমরা বুঝতে পারি। যেখানে দেবী নিজে কৃষ্ণের গুরু হিসাবে উপস্থিত। শাক্ত সাধনার ধারায় আমরা এই তত্ত্বের পূর্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। সহজিয়া বৈষ্ণব তন্ত্রে আমরা শরীরের মাধ্যমে নারীকে তুষ্ট করার যে আখ্যান পেলাম তা মূলত বীরাচারের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু শাক্ত সাধনায় এই বীরাচার এবং বামাচার কিন্তু সময়াচার পদ্ধতির তন্ত্রে সমালোচিত হয়েছে। বঙ্গদেশের শাক্ত সাধনায় গুরু অত্যন্ত

---

[১৪] ভট্টাচার্য, তারকেশ্বর. 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা. ১৩০৮ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৩২

[১৫] মুখোপাধ্যায়, কামাখ্যানাথ (সম্পা.). *রাধাতন্ত্র*. কলকাতা: কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১২৮৩ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং. পৃ.১৩

[১৬] তদেব, পৃ. ২৪

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মনে রাখা দরকার সাধনার দিক থেকে বৈষ্ণব এবং শাক্ত শব্দগুলি কেবল ইষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এই শব্দ দুটির অন্য পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। শাক্ত সাধনায় মায়াকে বশীভূত করার চেষ্টা করা হয়, আর যিনি মায়াকে বশীভূত করতে পারেন তিনিই হলেন বৈষ্ণব। পুরাণের আখ্যানে শিব যখন দাক্ষায়ণী বিবাহ করেন তিনি তখন বদ্ধ জীব, প্রকৃতির অধীন। সতী যখন শিবের কথা না শুনে দক্ষ যজ্ঞে অংশ নিতে গেলেন তখন শিব বুঝলেন শক্তি প্রয়োজনে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পারেন। এই শক্তিজ্ঞান লাভের পরে শিব মহাযোগে বসে শাক্ত হলেন। পরে যখন শিব মদনকে ভস্ম করে পার্বতীকে বিবাহ করেন তখন তিনি 'ব্রহ্মরস'-এ নিমগ্ন, কামনার, প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ নন তখন শিব বৈষ্ণব হলেন। একারণেই সাধক রামপ্রসাদ বা রামকৃষ্ণ পরমহংস ইষ্টের দিক থেকে শাক্ত হলেও সাধনার স্তরে বৈষ্ণব বলে বিবেচিত হন।[১৭] সাধারণ দৃষ্টিতে তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্বের প্রথমতত্ত্ব হল গুরুতত্ত্ব।[১৮] শাক্তত্রন্ত্রে জ্ঞানীগুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। *শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি*-তে গুরুর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যিনি শিষ্যের উদ্ধার ও অনিষ্টকারীর সংহার করতে সমর্থ, যিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন, যিনি মন্ত্র-যন্ত্রের মর্মজ্ঞ, রহস্য বিষয়ে অবগত, যিনি দানশীল সৌম্যমূর্তি, অধ্যাত্মবিদ ব্রহ্মচারী ও কুলীন সেরূপ ব্রাহ্মণই গুরু হতে পারেন।[১৯] পূর্ণানন্দ গিরি 'কুলীন' বলতে 'মহাকুলসম্ভূত' এবং 'কুলক্রিয়ারত' উভয় অর্থই ধরেছেন। শাক্ততন্ত্র সাধনায় দুটি কুলের কথা বলা হয়। কালীকুল এবং শ্রীকুল। বঙ্গদেশে মূলত কালীকুলের প্রচলন, দক্ষিণ ভারতে শ্রীকুলের প্রাধান্য। কালীকুল অদ্বৈতবাদী, শ্রীকুল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীকুলের সাধনায় প্রথমে গুরু এবং গুরুশক্তির আরাধনা হয়। শাক্ত-তন্ত্র মতে দীক্ষা তিন প্রকার— শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। শাম্ভবী ও শাক্তী দীক্ষার জন্য জ্ঞানী গুরুর প্রয়োজন হয়, এছাড়াও বাগ্‌দীক্ষা নামে কেবল মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য এক-প্রকার

---

[১৭] নিগমানন্দ. *প্রেমিক গুরু*. হালিশহর: আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ. ১৪২০. পঞ্চদশ সং. পৃ. ৯১-৯৩

[১৮] পাল, নিমাইচন্দ্র (সম্পা.). *প্রাণতোষিণী*. কলকাতা: বঙ্গীয় কলা বিদ্যালয়. ২০১৩. প্রথম সং. পৃ. ৯১-৯২

[১৯] গিরিশচন্দ্র, বেদান্ততীর্থ. 'তন্ত্রের ইতিহাস গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়'. সাহিত্য. ২৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা. [ ]. পৃ. ৪৬৯

দীক্ষার কথাও পাওয়া যায়।[২০] শৈব ত্রিকায়দর্শনে জীবের মুক্তির চারটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে যা গুরুর দর্শিত মার্গেই অতিক্রম করতে হয়— অনুপায়, শাম্ভবোপায়, শাক্তোপায়, আণবোপায়।[২১] শৈব সাধনায় গুরু শিবেরই স্বরূপ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। এই ধারণাটি শাক্তকারণতাবাদীরা স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে শক্তিবর্জিত শিব কর্তৃত্বহীন। তাই ভক্তের মোক্ষ বা মোচকত্ব শক্তির উপরেই নির্ভরশীল। সেকারণে শাক্ততন্ত্রে পাত্র-পরিবেশনের অনুষ্ঠানে 'শক্তি' হলেন গুরু বা আচার্য অন্যথায় ইষ্টদেবী।[২২] সুতরাং শাক্ততন্ত্রে গুরুতত্ত্ব এবং ইষ্টতত্ত্বের সম্বন্ধ দেখা যায়। আমাদের মনে পড়বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতেও গুরুকে কৃষ্ণের অর্থাৎ ইষ্টের স্বরূপ বলেই মনে করা হয়েছে। শাক্ত তত্ত্বের আরও প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরায় দেখতে পাই। যেমন, নিজের পরিবারের মধ্যে দীক্ষাদান নিষেধ হলেও সিদ্ধমন্ত্র গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া যায় পরিবারের মধ্যেও। *যোগিনীতন্ত্র*-এ বলা হল মা যদি সন্তানকে নিজের উপাসিত মন্ত্রে দীক্ষা দান করেন তবে তা আটগুণ ফলপ্রদ হয়।[২৩] আমরা দেখেছিলাম বীরভদ্র তাঁর মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় মেয়েদের গুরুপদে দায়িত্ব পালনের যে উদাহরণ আমরা আলোচনা করেছি তার প্রেক্ষাপটেও তান্ত্রিক সাধনার প্রেক্ষাপট কার্যকর। *রুদ্রযামলতন্ত্র*-এ আমরা স্ত্রী গুরুর লক্ষণের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের গুরু ধারণার বিবর্তনের ইতিহাসে শাক্তদর্শনের বিশিষ্ট অবদানকেও আমরা স্বীকার করছি।

সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার উচ্চাঙ্গের দর্শন খুব স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষের কাছে 'ব্যভিচার'-এর পথ খুলে দিয়েছিল। একারণে আমরা দেখেছি উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষিত

---

[২০] স্বামী, প্রজ্ঞানানন্দ. *তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা.* কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ. ২০১০. তৃতীয় সং. পৃ. ৩৮-৩৯

[২১] দাস, উপেন্দ্রনাথ. *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা* (১). কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার. ২০১০. তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ২৭১-৭২

[২২] স্বামী, প্রজ্ঞানানন্দ. *তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা.* কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ. ২০১০. তৃতীয় সং. পৃ. ৬১

[২৩] দাস, উপেন্দ্রনাথ. *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা* (২). কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার. ২০১১. তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ. পৃ. ৭৫৩

বাঙালির মধ্যে তন্ত্র সাধনার প্রতি এক ধরনের বিরাগ জন্মেছিল। বারবার করেই সহজিয়া সাধনাকে ব্যভিচার বলা হয়েছে। বৈষ্ণব সমাজের এই ‘কদাচার’ নিয়ে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শিশ্নোদর পরায়ণ, একাধিক নারী সংসর্গকারীরা নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়ে থাকে বলেই এই দুঃখ।[২৪] এই কদাচারের অপবাদ অবশ্যই গুরুবাদের ভাবমূর্তিতে প্রভাব ফেলেছিল। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন সহজিয়া সাধনায় দেহতত্ত্বকে সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী মনে করেছেন, তবে এই সাধনায় দেহাতীত অনুরাগের তীব্রতার দিককে স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি ছিল না।[২৫] এই সঙ্গে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পীরের মাহাত্ম্যমূলক কাহিনির কথা উল্লেখ করা উচিত হবে। মূলত পূর্ববঙ্গে এই সাহিত্যের বিশেষ প্রসার ছিল। পীরেরা অধিকাংশ কাল্পনিক চরিত্র হলেও পীরের আখ্যানে গুরুদের মতোই সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। অবশ্যই পীরেরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রসঙ্গত সত্য পীরের আখ্যানের কথা বলা যেতে পারে। সত্য পীর সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের সঙ্গী; তিনি সকল সমস্যার সমাধান।[২৬] তাই গুরু ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে পীর পূজার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলেই আমরা করি। তবে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পীর সাহিত্য ছাপার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গিয়েছে।

গুরুকেন্দ্রিক বিশ্বাসের বিবর্তনের ধারা উনিশ শতকের বাংলাতেও কার্যকর ছিল, সেকথা দিয়েই আমরা আলোচনার সূচনা করেছিলাম। গুরুবাদের সমালোচনার কথাও আমরা বলেছি, পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি অনেক সময়েই গুরুবাদের বিভিন্ন কুপ্রথার বিরোধিতা করেছেন। গুরুবাদের পাশাপশি মূলত তন্ত্র সাধনাকে হীন চোখে দেখার প্রবণতাও ছিল। অথচ তন্ত্র সাধনার বেদাচার

---

[২৪] রায়, মোহিত (সম্পা.). *নদীয়া-কাহিনী*- কুমুদনাথ মল্লিক বিরচিত. কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ১৯৮৬. তৃতীয় সং. পৃ. ১৮১

[২৫] সেন, দীনেশচন্দ্র. *হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম.* কলকাতা: পাতাবাহার. ১৪২২. তৃতীয় মুদ্রণ. পৃ. ১০৮-১২০

[২৬] Stewart, Tony K. *Fabulous Females and Peerless Pirs Tales of Mad Adventure in Old Bengal*. New York: Oxford University Press. 2004. 1st Edition. pp. 12

থেকে সিদ্ধান্তাচার পর্যন্ত সাতটি আচারের ক্রম আছে। তার মধ্যে বামাচার এবং দক্ষিণাচার নিয়েই আধুনিক সমালোচকদের আপত্তি ছিল। রামকৃষ্ণদেব নিজে সময়াচারের সাধক ছিলেন। যেহেতু সময়াচার বাহ্যপূজাকে স্বীকার করে না, আন্তরপূজাকে স্বীকার করে তাই তাতে বিশেষ আপত্তি রামকৃষ্ণদেবের ইংরাজি শিক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে ছিল না। আমাদের মনে হয় সহজিয়া মতাদর্শের সঙ্গে 'মূলস্রোত'-এর পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণেই উনিশ শতকে এই মন্তব্যগুলি উঠে এসেছিল। তবে পরকীয়া প্রেম বা সহজিয়া সাহিত্য সম্পর্কে কেবল নঞর্থক মনোভাবই যে উঠে এসেছে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে একথা একবাক্যে বলা যাবে না। সহজিয়া সমাজে জাত এবং ধর্ম বিষয়ে সহনশীলতা, সমাজ জীবনে মেয়েদের গুরুত্ব, সমাজে প্রেমের জয়গান করা বা সংস্কারের জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা-কে আধুনিকতা-র চিহ্ন বলেও মনে করা হয়েছে।[২৭]

একজন গুরু কীভাবে ব্যক্তিগত সাংগঠনিক প্রতিভার জোরে সারা পৃথিবীতে নিজের ধর্মমত প্রসার করতে পারেন এবং পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম কাঠামোকে রীতিমত প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারেন তা গুরুবাদের বিবর্তন প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[২৮] ISKCON (International Society for Krishna Consciousness)-এর কথা আমরা সকলেই জানি। ২০১৭ সালের ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি আমরা বর্ধমান এবং নদীয়ায় শ্রীপাটে ক্ষেত্র সমীক্ষায় যাই। সেই সময়ে আমরা যাজিগ্রামের শ্রীনিবাসের শ্রীপাটে দেখি ISKCON পাট সংস্কারকার্যের দায়িত্ব নিয়েছে। শ্রীখন্ডের নরহরি সরকারে শ্রীপাটের বর্তমান অবস্থা খুব ভালো নয়। আমরা জানতে পারি সেখানেও ISKCON- এর তরফে পাট সংস্কারের প্রস্তাব এসেছে এবং বর্তমানে পাটের সেবাইতরা সেই প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহী নন। ২০২০ সালের ৯ মার্চ মাসে আমরা বীরভূমের একচক্রায় আরেকটি ক্ষেত্র সমীক্ষায় যাই।

[২৭] রায়, কালিদাস. 'সহজিয়া সাহিত্য ও পরকীয়াবাদ'. বঙ্গশ্রী (১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা). ১৩৫২ বঙ্গাব্দ. পৃ. ৪৯-৫২

[২৮] চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর. *শ্রীচৈতন্যদেব এবং সমকালীন নবদ্বীপ.* নদীয়া: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ. ২০০৪. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ক-খ

সেখানেও আমরা দেখতে পাই ISKCON নির্মিত একাধিক বড় বড় নতুন মন্দির। বঙ্গদেশের প্রাচীন বৈষ্ণব পাটবাড়ি এবং সেই এলাকায় ISKCON-এর নজর থেকে অনুমান করা যায় এই জায়গাগুলিকে নিয়ে একধরণের ব্যবসায়িক প্রকল্প চলছে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে। এতে যে কেবল বিসদৃশ ও কদাকার মন্দির তৈরি হচ্ছে এমনটা শুধু নয় প্রত্যেকটি পাটবাড়ির স্থানীয় চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। আমরা ISKCON-এর কথা একারণেই বলতে চাই কারণ মায়াপুরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে। মায়াপুরের পূর্বতন নাম ছিল মিঞাপুর। ১৮৯৪ সালে কেদারনাথ দত্ত, সাধন নাম—আচার্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা স্থাপন করে মিঞাপুর-কে মায়াপুর এবং চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্ম স্থান বলে প্রচার করা শুরু করেন। ১৯১৪ সালে কেদারনাথ দত্তের পুত্র বিমলাপ্রসাদ দত্ত—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ সালে কলকাতার অভয়চরণ দে শীল তাঁর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁর সাধন নাম হয় এ. সি. ভক্তিবেদান্তস্বামী। ১৯৬৫-৭০ অবধি এ.সি. ভক্তিবেদান্তস্বামী আমেরিকায় কৃষ্ণ নাম প্রচার করেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ISKCON প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে তিনি মায়াপুরে চন্দ্রোদয় মঠের প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে ISKCON-এর প্রধান কার্যালয়। কেদারনাথ দত্তের পরিকল্পিত মায়াপুর আজ সারা পৃথিবীর বৈষ্ণবদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান, সারা পৃথিবীতে ISKCON -এর শাখার ছড়াছড়ি। এই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি গুরুর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিকল্প প্রতিষ্ঠান এবং বিকল্প ইতিহাস রচনার উদাহরণ।

আজও বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের ধর্ম ব্যবস্থা গুরুদের দ্বারাই চালিত হয়। গুরুদের ধর্মোপদেশ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষের গুরুরা বিদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আলোচনার শুরুতে আমরা বলেছিলাম ‘মধ্যযুগ’-এর গুরুভাবনার সঙ্গে বর্তমানের গুরুদের মূল ফারাক ছিল ভক্তদের জীবনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে। এখন ভক্তরা গুরুকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করছেন অবশ্যই কিন্তু গুরু অনিবার্যত ভক্তের ‘ব্যক্তিগত’ সীমানায় প্রবেশ করছেন না। এই প্রবণতার

সূচনা অবশ্যই উনিশ শতকে হলেও আজ এই ধারাটিত আরও বিবর্তিত হয়েছে। এখন গুরুরা রীতিমত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করছেন, গুরুদের নিয়ে আলাদাভাবে ব্যবসায়িক অঙ্ক কার্যকর হয়েছে। বাবা রামদেবের কথা মাথায় রাখলে দেখা যায় আজও গুরুরা সবসময়েই রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে গুরুরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করছেন সমাজের কাছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এখন অনেক গুরুদেরই আমরা দেখব যাঁরা বীজ দীক্ষা, ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। বরং গুরুরা নানা নৈতিক উপদেশ দিচ্ছেন বিভিন্ন চ্যানেলে, যা আপাতভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ। এই কাজে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের যোগদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্যই আজও গুরু হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দান করার জন্য বিভিন্ন অলৌকিকতাযুক্ত গল্প পরিবেশনের প্রয়োজন হয়। যেমন কেরালার অমৃতানন্দময়ী বা আম্মা (পূর্বনাম সুধামণি)। ১৯৫৩ সালে একটি নিম্ন বংশের পরিবারে তাঁর জন্ম, তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক কিংবদন্তী।[২৯] অমৃতানন্দময়ী বা আম্মা সামাজিক মাধ্যমে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ধর্মগুরু, যাঁর ধর্ম প্রচারের মূল পুঁজি হল শিষ্যদের স্বর্গীয় আলিঙ্গন প্রদান। পাশাপাশি আমরা ইন্দোরের ধর্মগুরু ভাইয়ুজি মহারাজের কথা বলতে পারি, যিনি ২০১৪ সালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গুরু ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর কথাও এপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ভাইয়ুজি নাথ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল।[৩০] সুতরাং আজও ভারতবর্ষের গুরুবাদের চরিত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক ক্রমবর্ধমান। অনেক সময়েই এই সব গুরুদের নানা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসে, নানা দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের মনে পড়বে আশারাম বাপু-র বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। বাবা

---

[২৯] কাং, ভবদীপ. *গুরু.* নিউ দিল্লি: ওয়েস্টল্যান্ড পাবলিশিং. ২০১৭. বঙ্গানুবাদের প্রথম সংস্করণ. পৃ. ৯১-৯২

[৩০] তদেব, পৃ. ২৪৬

রামরহিম সিংহের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে একাধিক ধর্ষণ, খুনের অভিযোগ ওঠে। *The Indian Express*-এর মতানুযায়ী বাবা রামরহিম ২০১৫ সালে ভারতের ১০০ জন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির তালিকাভুক্ত ছিলেন। আমরা এবিষয়ে বিশেষ মন্তব্য করতে চাইনা কিন্তু এটুকু কথা তাত্ত্বিকভাবে বলাই যায় ভারতের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতেও গুরু এমন একটি বিশ্বাসের উত্তরাধিকার বহন করেন যা আজও ভারতের সমাজ বা রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিন্দু বলে বিবেচনা করা দরকার। তথাকথিত আধুনিকতার উপকরণ এবং মূল্যবোধের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম-ভাবনার এই অভিযোজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুরুরা আজ অনেকেই ভক্তের মূল্যবোধের নিয়ন্ত্রক অথবা জীবন যাপন পদ্ধতির প্রশিক্ষক। ভক্তদের আজকাল দীক্ষা না নিলেও চলে, বিভিন্ন কার্যক্রমে নথিভুক্তির মাধ্যমে গুরুরা তাদের নানা কোর্স করিয়ে থাকেন, বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাগুলি চালিত হয়। এই বিষয়গুলি বিভিন্ন জনপ্রিয় চলচিত্রেও উঠে এসেছে। যেমন—২০১৪ সালে রাজকুমার হিরানি-র ‘পিকে’ বা ২০১৪ সালেই প্রকাশিত রোহিত শেট্টি-র ‘সিংঘম্ রিটার্নস’। তাই গুরুবাদ ভারতবর্ষের সমাজ পদ্ধতিতে আজও বিবর্তনের মাধ্যমে খুব জোরের সঙ্গেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। কলকাতা শহরের নানা বিজ্ঞাপনেও এই প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষে অমৃতানন্দময়ীর কথা বলে আমরা আলোচনা শেষ করব। অমৃতানন্দময়ী এখন কেবল ধর্মমত প্রসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীঠ রীতিমত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। অমৃতানন্দময়ীর অজস্র দেশি এবং বিদেশি শিষ্যের মাধ্যমে হিন্দুত্বের একটি ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণার জন্ম হয়েছে যা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে বিশেষ মানানসই।[৩১] একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ভারতের সাধারণ পরম্পরায় মন্ত্র দীক্ষা গুরু একজনই হতে পারে। বিশেষ কারণ ছাড়া গুরুকে ত্যাগ করাই

[৩১] Warrier, Maya. *Hindu Selves in Modern World Guru faith in the Mata Aritanandamayi Mission*. USA: Routledge Curzon. 2005. 1st Edition. p. 142

অপরাধ। অমৃতানন্দময়ীর ধর্ম ব্যবস্থায় যেকোন ভক্তের যেকোন সময়ে ধর্ম মত গ্রহণ এবং ত্যাগ করার স্বাধীনতা রয়েছে, একই সময়ে একাধিক গুরুর বাক্য শুনে চলার স্বাধীনতা রয়েছে।[৩২] সুতরাং এতদিন ধরে চলে আসা গুরুকেন্দ্রিক বিশ্বাসের বয়ানের থেকে সরে অমৃতানন্দময়ী এমন একটি স্বাধীনতা তাঁর শিষ্যদের জন্য উন্মুক্ত করছেন যা বিশেষভাবে 'আধুনিকতা'-র প্রবণতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এভাবেই গুরু ভাবনায় বিবর্তন আজও চলছে, নতুন নতুন অর্থে গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা হয়ে চলেছে।

[৩২] তদেব, পৃ. ১১৮

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

অভিধান, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি

ঠাকুর, অমরেশ্বর. *নিরুক্তম্* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৬. পুনর্মুদ্রণ

দত্ত, মিলন. *চলিত ইসলামি শব্দকোষ.* কলকাতা: দে'জ. ২০১১. প্রথম সং.

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১ম). এলাহাবাদ: ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড. ১৯৩৭. পুনর্মুদ্রণ

দেব, রাধাকান্ত. *শব্দকল্পদ্রুম* (৪র্থ কাণ্ড). কলকাতা: [ ]. ১৩৪৩. [ ]

বড়ুয়া, হেমচন্দ্র. *হেমকোষ* (নতুন সংস্করণ). গৌহাটি: হেমকোষ প্রকাশন. ২০১১. পুনর্মুদ্রণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১). নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১. অষ্টম মুদ্রণ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. বঙ্গীয় শব্দকোষ (২). নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১১. অষ্টম মুদ্রণ.

বসু, নগেন্দ্রনাথ. *বিশ্বকোষ* (৫ম). কলিকাতা: ইউ.সি. বসু এণ্ড কোম্পানি. ১৩০৯ সাল. পুনর্মুদ্রণ

বসু, নগেন্দ্রনাথ. *বিশ্বকোষ* (৮). দিল্লি: বি আর পাবলিশিং. ১৯৮৮. পুনর্মুদ্রণ.

বসু, নগেন্দ্রনাথ. বিশ্বকোষ (খন্ড-১৯). কলকাতা: ইউ সি বসু এন্ড কোম্পানি. ১৩০১ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.

বসু, নগেন্দ্রনাথ. *বিশ্বকোষ* (ষষ্ঠদশ ভাগ). দিল্লি: বি.আর. পাবলিশিং. ১৯৮৮. পুনর্মুদ্রণ.

বসু, রাজশেখর. *চলন্তিকা.* কলকাতা: এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড. সপ্তম সং. [ ].

ভট্টাচার্য, কুমুদরঞ্জন. *সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৯৭৮. প্রথম সং.

মিত্র, সুবলচন্দ্র. *সরল বাঙ্গালা অভিধান.* কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ. ২০১১. পুনর্মুদ্রণ.

মুরশিদ, গোলাম. *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* (প্রথম খণ্ড). বাংলাদেশ: বাংলা একাডেমি. ২০১৩.

হরিদাস, দাস. *শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান* (১). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২১ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ.

হরিদাস, দাস. *শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ.

Bosworth, C.E. & Others Edited. *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill. 1986. Reprint

Buswell, Robert E. Jr. *Encyclopaedia of Buddhism* (Vol-I), USA : Thomson Gale. [ ]. [ ]

Hastings, James. *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (Vol-II). Edinburg: T & T Clark. 1910. 1st Edition. Reprint

Hedlund, Roger. *Oxford Encyclopaedia of South Asian Christianity* (Vol – II). Delhi: Oxford University Press. 2012.

Johnston, William M. *Encyclopedia of Monasticism.* London: Fitzroy Dearborn Publishers. 2000. Reprint

McAuliffe. Jane Dammen. *Encyclopaedia of the Quar'an* (Vol-III). Leiden: Brill. 2003. Reprint

Levillain, Philippe. *The Papacy An Encyclopedia* (Vol – II). London: Routledge. 2002. Reprint

Marthaler, Berard. L. *New Catholic Encyclopedia* (Vol – XI). USA: Thomson Gale. 2003. Reprint

Mcleod, W.H. *Historical Dictionary of Sikhism*. Maryland: The Scarecrow Press Inc. 2005. Reprint

Rao, K.S Seshagiri. *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (Vol. IV). California: Mandale Publishing. 2000. 1st Edition.

Stuckrad, Kocku von. *The Brill Dictionary of Religion* (Vol. II). Boston: Brill. 2006. 1st Edition

Williams, M. Monier. *A Sanskrit English Dictionary*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. 2002. Reprint

Wood, Earnest. *Yoga Dictionary*. New York: Philosophical Library. 1965. 1st Edition

আকর গ্রন্থ (বাংলা, পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ)

[ ].*সহস্রনামস্তোত্রাবলী.* হাওড়া: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৫. প্রথম প্রকাশ.

অধিকারী, তারকনাথ. *গোপথ ব্রাহ্মণ.* কলকাতা : বেদবিদ্যাকেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৯৯. প্রথম প্রকাশ.

অধিকারী, রামচন্দ্র. *শ্রীবিজ্ঞান-ভৈরব.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮০. প্রথম প্রকাশ.

অনির্বাণ. *উপনিষদ প্রসঙ্গ* (৬). বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৭. পুনর্মুদ্রণ

অনির্বাণ. *উপনিষদ প্রসঙ্গ* (৭). বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৭. পুনর্মুদ্রণ

অনির্বাণ. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১১. প্রথম প্রকাশ.

আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া. *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী. ১৯৭১. প্রথম প্রকাশ.

করিম, আবদুল. *জ্ঞানসাগর.* কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩২৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

কাব্যতীর্থ, তারাকান্ত. *শ্রীমদ্ভাগবত.* কলকাতা: পি এম বাগচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ. ২০০৬. পুনর্মুদ্রণ

কিশোরী দাস, বাবাজী (সম্পা.) *শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার.* চৈতন্য ডোবা: শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং.

কিশোরী দাস, বাবাজী (সম্পা.). *লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী.* চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন. ১৪২২. প্রথম সং.

কিশোরী দাস, বাবাজী (সম্পা.). *শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য বিষয়ক রচনাবলী.* হালিশহর: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪১৭ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

কিশোরী দাস, বাবাজী (সম্পা.). *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ-* কৃষ্ণচরণ দাস বিরচিত. চৈতন্যডোবা: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪২০ বঙ্গাব্দ. তৃতীয় সং.

কিশোরী দাস, বাবাজী. *শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস.* চৈতন্যডোবা: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪২৩ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং.

কিশোরীদাস বাবাজী (সম্পা.). *শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়.* চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন. ১৪১৭. প্রথম সং.

কৃষ্ণদাস, বাবাজী. *শ্রীশ্রীভক্তমাল.* কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড. ১৪০৫ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সংস্করণ.

গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, জয়দেব. *ললিতবিস্তার.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৯৯৯. প্রথম প্রকাশ.

গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পা.). *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* (৩). কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ২০০৯. পুনর্মুদ্রণ

গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র. *ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী.* কলকাতা: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. [ ]. [ ]. পুনর্মুদ্রণ

গোস্বামী, নীলকান্ত এবং বিনোদ বিহারী গোস্বামী (সম্পা.). *শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস.* মথুরা: শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থান. ১৯৮৭. প্রথম প্রকাশ.

গোস্বামী, প্রাণকিশোর (সম্পা.). *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত.* কলকাতা: শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির. ১৯৫৮. প্রথম প্রকাশ.

গোস্বামী, প্রাণগোপাল (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত.* রাধাকুণ্ড: প্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী প্রকাশিত. ১৩২৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

গোস্বামী, বিজন (অনু). *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত.* কলকাতা: মহেশ. ২০০০. প্রথম সং.

গোস্বামী, বিজন (সম্পা.). *দানকেলিকৌমুদী.* কলকাতা: মহেশ. ১৪০৫. প্রথম সং.

গোস্বামী, বিজনবিহারী. *অথর্ববেদ-সংহিতা.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. ১৩৮৫. প্রথম প্রকাশ.

ঘোড়ই, বিশ্বরঞ্জন (সম্পা.). *লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. ১৪০৭. প্রথম সং.

ঘোষ, ঈশান চন্দ্র. *জাতক* (৫). কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪১৪. পঞ্চম মুদ্রণ.

ঘোষ, ঈশান চন্দ্র. *জাতক* (৬). কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪১৯. ষষ্ঠ মুদ্রণ.

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনু.). *জাতক* (১). কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪১৯. ষষ্ঠ মুদ্রণ.

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনু.). জাতক (৩). কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪১৪. চতুর্থ মুদ্রণ.

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (অনু.). *জাতক* (৪). কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪২০. পঞ্চম মুদ্রণ.

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র. *গিরিশ-গ্রন্থাবলী* (অষ্টম ভাগ). কলকাতা: সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রকাশিত. ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার. *চর্যাগীতির ভূমিকা.* কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরি. ২০০৫. পুনর্মুদ্রণ

চট্টোপাধ্যায়, অলকা. *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী.* কলকাতা: অনুষ্টুপ. ২০১০. পরিবর্ধিত সং.

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বঙ্কিম রচনাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

চাকী, মালবিকা (সম্পা.) *বাসু ঘোষের পদাবলী.* কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৪১৭. পুনর্মুদ্রণ.

চৌধুরী, সরোজকুমার. *ত্রিখণ্ড পুণ্ডরীক সূত্র.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১৪. প্রথম সংস্করণ.

চৌধুরী, সাধনকমল. *চুল্লবগ্‌গ.* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

চৌধুরী, সুকোমল (অনু.). *সংযুক্ত নিকায়* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী. ২০১৪. প্রথম প্রকাশ.

ঝা, শক্তিনাথ. *সহজ বলিব কায়.* কলকাতা: সহজপাঠ. ২০২০. প্রথম সং.

ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ. *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ. ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম অখণ্ড সংখ্যা.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *চতুরঙ্গ.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩১০ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ

তালুকদার, যশোদালাল. *প্রেম-বিলাস-* শ্রীনিত্যানন্দ দাস বিরচিত. কলকাতা: ১৩২০ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

দাশ, আশা (অনু.). *দ্বীপবংশ.* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী. ১৪১০ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

দাশ, নির্মল. *চর্যাগীতি পরিক্রমা.* কলকাতা: দে'জ. ২০১৬. একাদশ সংস্করণ.

দাশ, শরৎচন্দ্র (অনু). *বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা.* কলিকাতা: লিপিকা. ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.

দাস, পরিতোষ (সম্পা.). *চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি.* কলকাতা: ভারতী বুক স্টল. ১৯৮৮. প্রথম প্রকাশ.

দাস, মনোহর. *অনুরাগ-বল্লী.* কলকাতা: তড়িৎকান্ত বিশ্বাস প্রকাশিত. ৪২৪ গৌরাব্দ. প্রথম প্রকাশ.

দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী. *পুরাতনী.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১৭. চতুর্থ মুদ্রণ.

ধর্মাধার, মহাস্থবির. *মিলিন্দ প্রশ্ন.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০১৩. পুনর্মুদ্রণ.

ধর্মাধার, মহাস্থবির. *শাসন বংশ.* কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী. ২০০৭. পুনঃপ্রকাশ.

নাগ, অরুণ. *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা.* কলকাতা: আনন্দ. ২০০৮. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). *চৈতন্যভাগবত* (আদি খন্ড). কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী. ১৯৬৬. প্রথম প্রকাশ.

নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (মধ্য লীলা- দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ.

নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (মধ্য লীলা- প্রথম খন্ড). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. প্রথম প্রকাশ.

পঞ্চানন, তর্করত্ন (অনু). *বিষ্ণুপুরাণম্.* কলকাতা: নবভারত. ১৪১৭. [ ].

পঞ্চানন, তর্করত্ন (অনু.). *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ.* কলকাতা: নবভারত. [ ].

পঞ্চানন, তর্করত্ন (সম্পা.). *মনুসংহিতা — কুল্লুকভট্ট-কৃত টীকা সম্বলিত.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৪. ষষ্ঠ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ.

পঞ্চানন, তর্করত্ন (সম্পা.). *শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড. ২০১৭. ডিজিটাল সংস্করণ.

পঞ্চানন, তর্করত্ন. *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ.* কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স. ১৪২০. দ্বিতীয় সং.

পাল, নিমাইচন্দ্র (সম্পা.). *প্রাণতোষিণী.* কলকাতা: বঙ্গীয় কলা বিদ্যালয়. ২০১৩. প্রথম সং.

প্রেমদাস (পয়ারে অনুবাদিত). *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক.* কলকাতা: কমলাসন যন্ত্র. ১৭৭৫ শকাব্দ.

বড়ুয়া, বেণীমাধব (অনু.). *মধ্যম-নিকায়* (প্রথম খণ্ড). ভিক্ষু সুমনপাল (সম্পা.). কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০১৮. প্রথম অখণ্ড সংস্করণ.

বড়ুয়া, শুভ্রা (অনু.). *মহাবংস.* কলকাতা: গোবিন্দপ্রসাদ বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত. ২০০৪. প্রথম সং.

বন্দ্যোপাধায়, অশোককুমার (সম্পা.). *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা.* কলকাতা: সদেশ. ২০০৭. প্রথম প্রকাশ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.). *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৪. ষষ্ঠ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০০৮. পুনর্মুদ্রণ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় (ভূমিকা সম্বলিত). *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (২য়). কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. ২০১৬. পুনর্মুদ্রণ.

বসু, চারুচন্দ্র (অনু.). *ধম্মপদ.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী. ২০১৫. তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ.

বসু, প্রীতম. *চৌথুপীর চর্যাপদ.* কলকাতা: প্রীতম বসু প্রকাশিত. ২০১৮. দ্বিতীয় প্রকাশ.

বসু, রাজনারায়ণ. *একমেবাদ্বিতীয়ম্.* কলকাতা: কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত. ১৭৯২ শকাব্দ. প্রথম প্রকাশ.

বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ (অনু.). *স্তবাবলী-* রঘুনাথ গোস্বামী. রাধাকুণ্ড: শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী গ্রন্থালয়. ১৪২৭ বঙ্গাব্দ. তৃতীয় সং.

বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ (সম্পা.). *পদ্যাবলী.* মুর্শিদাবাদ: রামদেব মিশ্র প্রকাশিত. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *কবীর পদাবলী.* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স. ২০০৮. প্রথম সংস্করণ.

ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত (অনু). *শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ.* কলকাতা: গিরিজা. ২০০৬. চতুর্থ মুদ্রণ.

ভক্তিসিদ্ধান্ত, সরস্বতী (সম্পা.) *শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর-* নরহরি চক্রবর্তী বিরচিত. কলকাতা: গৌড়ীয় মিশন. ২০০৪.

ভক্তিসিদ্ধান্ত, সরস্বতী (সম্পা.). *শ্রীভক্তিসন্দর্ভ.* কলকাতা: গৌড়ীয় মিশন. ১৪১২ বঙ্গাব্দ.

ভট্টাচার্য, বিধূশেখর. *মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ.* কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৮৬.

ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন. *বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮৪. প্রথম সং.

ভট্টাচার্য, সুখময়. *অভিনবগুপ্ত প্রণীত তন্ত্রালোক.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০১৫. পুনর্মুদ্রণ.

ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ. *গোপীচন্দ্রের গান.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৯. পুনর্মুদ্রণ.

ভাগবতভূষণ, মাখনলাল (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদি লীলা). কলিকাতা: রাখালদাস বরাট প্রকাশিত. [ ]. প্রথম সং.

ভাগবতভূষণ, মাখনলাল (সম্পা.). *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (মধ্যলীলা). কলকাতা: চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স. [ ]. প্রথম সং.

ভাদুড়ী, সতীনাথ. *সতীনাথ গ্রন্থাবলী* (৪). কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. ১৪২৪ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় মুদ্রণ
ভিক্ষু, করুণাবংশ (অনু.). *বিনয়পিটকে পাচিত্তিয়.* রাঙামাটি: অনোমদর্শী মহাথের-র শিষ্যবৃন্দ. ২০১৩. পরিমার্জিত সংস্করণ.
ভিক্ষু, শীলভদ্র (অনু.). *সুত্ত নিপাত.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী. ২০১৫. তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ.
ভিক্ষু, শীলভদ্র. *দীঘ নিকায়.* কলকাতা: মহাবোধ বুক এজেন্সী. ১৪১৪. দ্বিতীয় মুদ্রণ.
মজুমদার, বিমানবিহারী, সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা). *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০১৬. দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ.
মজুমদার, বিমানবিহারী. *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা. ১৩৬৮. পুনর্মুদ্রণ
মণ্ডল, পঞ্চানন. *গোর্খ-বিজয়.* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ. ১৪০৪. ২য় সংস্করণ.
মাইতি, রবীন্দ্রনাথ. *হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ১৩৭৩. প্রথম প্রকাশ.
মিত্র, সতীশচন্দ্র (সম্পা.). *ঈশান নাগর প্রণীত শ্রীশ্রী অদ্বৈত-প্রকাশ.* কলকাতা: মানসী. ১৪২১. প্রথম প্রকাশ.
মিশ্র, সুবিমল (সম্পা.). *নেপালে বঙ্গনারী ও তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর-* হেমলতা সরকার. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.
মুখোপাধ্যায়, কামাখ্যানাথ (সম্পা.). *রাধাতন্ত্র.* কলকাতা: কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১২৮৩ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.
মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত (সম্পা.). *কাব্যপ্রকাশঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪২৪. দ্বিতীয় প্রকাশ.
মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার. *শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার.* কলকাতা : বিশ্বভারতী. ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা). *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. ২০১০. চতুর্থ মুদ্রণ.
মুৎসুদ্দি, বীরেন্দ্রলাল. *অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ.* চট্টগ্রাম : ইউ.আর. মুৎসুদ্দি এণ্ড সন্স. ১৯৪০. প্রথম প্রকাশ.
মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার. *গৌড়লেখমালা (প্রথম স্তবক).* রাজশাহী : বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি. ১৩১৯ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.
মোহম্মদ আবদুল, কাইউম. *আলাওল রচনাবলী.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী. ২০০৭. প্রথম প্রকাশ.
মোহান্ত, দিলীপকুমার. *নাগার্জুনকৃত সবৃত্তিশূন্যতাসপ্ততি.* কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১১. প্রথম প্রকাশ.
মোহান্ত, দিলীপকুমার. *মধ্যমকদর্শনের রূপরেখা ও নাগার্জুনকৃত সবৃত্তিবিগ্রহব্যাবর্তনী.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০০৬. প্রথম প্রকাশ.
রসিকানন্দ মুরারি রচিত. *শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্.* মেদিনীপুর: গোপালগোবিন্দানন্দ দেবসোস্বামী প্রকাশিত. ৫০০ গৌরাব্দ. [ ].
রাণা, সুমঙ্গল. *চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৮১ প্রথম প্রকাশ.
রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন এবং অটলবিহারী ঘোষ. *সাধক-রঞ্জন.* কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.
রায়, অন্নদাশঙ্কর. *জীবন যৌবন.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১৭. চতুর্থ মুদ্রণ.
রায়, অলোক (সম্পাদিত). *প্যারীচাঁদ মিত্র রচনাবলী.* কলকাতা: সোপান. ২০১৮. দ্বিতীয় মুদ্রণ.
রায়, রামমোহন. *রামমোহন গ্রন্থাবলী.* কলকাতা: উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ.
রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ (সংশোধিত). *ভক্তিরত্নাকর.* মুর্শিদাবাদ: রামদেব মিশ্র প্রকাশিত. ৪২৬ চৈতন্যাব্দ.
লালমোহন, ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি. *সম্বন্ধনির্ণয়.* কলকাতা: শশিভূষণ ভট্টাচার্য প্রকাশিত. ১৩৩০ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং.
শরীফ, আহমদ. *বাঙলার সূফী সাহিত্য.* ঢাকা: সময় প্রকাশন. ১৯৬৯.
শাসমল, সুভাষ. *নামঘোষা.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০১২. প্রথম প্রকাশ.

শাস্ত্রী, বিধুশেখর (অনু.). *মহাযান বিংশক.* হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা. নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.). [ ]. [ ].

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা.* কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৪১৬ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ.

শিবচন্দ্র, বিদ্যার্ণব. *তন্ত্রতত্ত্ব.* কলকাতা: নবভারত পাবলিকেশন. ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সংস্করণ.

শীলভদ্র, ভিক্ষু. *দীঘ নিকায়.* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০০৬. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

শ্রীধর্ম্ম তিলক স্থবির. *বুদ্ধ-বংশ.* রেঙ্গুন: রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস. ১৯৩৪. প্রথম সংস্করণ.

শ্রীম. *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত.* কলকাতা: রিফ্লেক্ট. ১৯৯৩. অষ্টাদশ মুদ্রণ.

সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ (অনু.). *বৌদ্ধযুগের ভারত হিউএন সাঙ.* কলকাতা: পত্রলেখা. ২০১৭. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

সরকার, দীনেশচন্দ্র. *অশোকের বাণী.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. ২০০১. পরিবর্তিত দ্বিতীয় সং.

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দুর্গাচরণ (সম্পা.). *ভক্তিরসায়ন-* মধুসূদন সরস্বতী. কলকাতা: সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশিত. ১৩৪০. প্রথম সং.

সান্যাল, মনস্বিতা (সম্পাদিত). *প্রবন্ধ সমগ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়.* কলকাতা: চর্চাপদ. ২০১০. প্রথম প্রকাশ

সেন, কেশবচন্দ্র. *জীবনবেদ.* কলকাতা: নববিধান পাবলিকেশন্ কমিটি. [ ]. [ ].

সেন, কেশবচন্দ্র. *সাধু-সমাগম.* কলিকাতা: ব্রাহ্ম ট্রাস্ট সোসাইটি. ১৮০৯ শকাব্দ. প্রথম সংস্করণ.

সেন, জ্যোতির্ময় (সম্পা.) *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী.* কলকাতা: অলকানন্দা পাবলিশার্স. ২০১২. প্রথম সং.

সেন, নীলরতন. *চর্যাগীতিকোষ.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. ২০১০. সংশোধিত দ্বিতীয় সং.

সেন, রণব্রত. *ধম্মপদ.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. ১৯৯৬. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

সেন, সুকুমার (সম্পা.). *গৌরাঙ্গ বিজয়.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি. ২০০২. পুনর্মুদ্রণ.

সেন, সুকুমার (সম্পা.). *চৈতন্যভাগবত.* নিউ দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ২০১৫. পঞ্চম মুদ্রণ.

সেন, সুকুমার. *চর্যাগীতি পদাবলী.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১২. ষষ্ঠ মুদ্রণ.

সৈয়দ মহম্মদ. শাহেদ. *নতুন চর্যাপদ.* পাঠ ও পাঠান্তর. ঢাকা: কথাপ্রকাশ. ২০১৭. প্রথম প্রকাশ.

স্থবির, প্রজ্ঞানানন্দ (অনু.). *মহাবর্গ.* কলকাতা: যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট. ১৯৩৭. প্রথম প্রকাশ.

স্বামী, ভূতেশানন্দ (সম্পা.). *নারদীয় ভক্তিসূত্র.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.

হরিদাস দাস (সম্পা.). *শ্রীশ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী.* ঢাকা: মদনমোহন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ৪৬৯ গৌরাব্দ. প্রথম প্রকাশ.

হরিদাস দাস (সম্পা.). *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪১৪. প্রথম সং.

হরিদাস দাস (সম্পা.). *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০০৭.

হরিদাস দাস. *শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা তথা আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১২. প্রথম সং.

Chatterjee, Chinmayi (Ed.). *Rasagangadhara*. Kolkata: The Asiatic Society. 2018. Reprint.

আকর গ্রন্থ (সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ)

Bagchi, Prabodh Chandra & Santi Bhiksu Sastri. *Caryagitikosa of Buddhist Siddhas*. Santiniketan : Visva-Bharti. 1956. 1st Edition.

Bagchi, Prabodh Chandra. *Dohakosa with Notes and Translations*. Calcutta : University of Calcutta. 1933. 1st Edition.

Bagchi, Prabodh Chandra. *Kaulajnana-Nirnaya*. Calcutta: Métropolitain Printing and Publishing House. 1934. 1st Edition

Basak, Radhagobinda (Ed.). *Mahavastu Avadāna.* Calcutta: Sanskrit College. 1963. 1st Edition.

Bhattacharya, Vidhushekhara. *The Catuhsataka of Aryadeva* (Part-II). Santiniketan: Visva- Bharati. 1931. 1st Edition.

Bhattacharyhya, Benoytosh. *Two Vajrayana Works*. Baroda : Oriental Institute, Baroda. 1929. 1st Edition.

Bhattacharyya, Benoytosh. *Nispannayogavali of Mahapandita Abhaya Karagupta*. Baroda: Oriental Institute, Baroda. 1949.

Bhattacharyya, Benoytosh. *Sadhanamala* (Vol. II), Baroda: Oriental Institute, Broda. 1928. 1st Edition.

Bhattacharyya. Benoytosh. *Sadhanmala* (Vol-I). Baroda: Oriental Institute, Broda. 1928. 1st Edition.

Bhayani. H.C. *Dohakosagiti of Krishnapada, Tellopada*. Varanasi: Central Institute of Higher Tibetan Studies. 1998. First Edition. Bhattacharyya, Benoytosh. Guhyasamaja Tantra. Baroda: Oriental Institute, Baroda. 1331. 1st Edition.

Chatterji, Suniti Kumar & Babua Misra (Edited). *Varna-Rtnakara of Jyotirisvwara Kavisekharacharya*. Calcutta: The Royal Asiatic Society of Bengal. 1940. 1st Edition.

Croslay, Kate & Andrew Skilton, *Santideva the Bodhicaryavatar*. New York: Oxford University Press. 2008. Reissued.

Dawa-Samdup, Kazi. *Shrichakrasambhara-Tantra*. Calcutta: Thacker, Spink & Co. 1919. 1st Edition.

De, Bhakti. Carya Samgrana. Varanasi : Central Univeristy of Tibetan Studies. 2012. 1st Edition.

Dutt, Nalinaksha. *The Panchavimsatisahasrika Prajnaparamita*. London: Luzac & Co. 1934. 1st Edition.

Fremantle, Francesca. *A Critical Study of the Guhyasamaja Tantra*. London : University of London Library. 1971.

Guenther, Herbert V. *The Life and Teaching of Naropa*. Oxford : The Clarendon Press. 1963. 1st Edition.

Guenther, Herbert V. *The Royal Song of Saraha A Study in the History of Buddhist Thought.* California : Shambala Publications, Inc. 1973. 1st Paperback Edition.

Harshananda, Swami. *Sandilya Bhakti Sutras with Svapneśvara Bhāsya*. Bangalore: Ramkrishna Math. 2002.

Harshananda, Swami. *Sandilya Bhakti Sutras with Svapneśvara Bhāsya*. Bangalore: Ramkrishna Math. 2002.

Ingalls, Daniel H H. *An Anthology of Sanskrit Court Poetry Vidyakara's Subhshitaratnakosa*, Massachusetts: Havard University Press. 1965. 1st Edition.

Kaviraj, Gopinath. *The Gorakshasidhantasangraha*. Benaras: Published by Jaikrishna Dasgupta. 1925. 1st Edition.

Kvaerne, Per. *An Anthology of Buddhist Tantraic Songs A Study of the Caryagiti*. Thailand : Orchid Press. 2010. Third Edition.

Lama, Chimpa & Alaka Chattopadhyaya (Trans.), *Tarnath's History of Buddhism in India*. Calcutta : K.P. Bagchi & Company. 1980. Reprint.

Manring, Rebecca J. *The Fading Light of Advaita Acarya The Hagiographies*. New York: Oxford University Press. 2011.

Max Muller, F. *The Sacred Books of the East* (Vol-XIV). Delhi: MLBD. 1965. 1st Edition.

Muhammad, Shahidullah. *Buddhist Mystic Songs*. Dhaka : Mowla Brothers. 2013. 2nd Edition.

Mukhopadhyay, Satkari. *The Kaulajnananirnaya*. New Delhi: Aditya Prakashan. 2012. 1st

Publication.
Nerragora, Stefania. *The Sekoddesatika by Naropa*. Roma : Intituto Italiano Per L' Africa E L' Oriente. 2006. 1st Edition.
Olivelle, Patrick. *Dharmasutras The Law Codes of Apastamba, Gautama, Baudhayana and Vasistha*. New York: Oxford University Press. 1999. 1st Edition. p.24.

Pathak, Suniti Kumar. Sahaja Sidhi of Sri Dombi Heruka: A Hermeneutic Exposition. in *Sahaja* Edited by Andrea Loseries. Delhi : Buddhist World Press. 2015. 1st Edition
Rinpoche, Khenchen Tharangu. *The Life of Tilopa & The Ganges Mahamudra*. USA: Namo Buddha Publications. 2002. 1st Edition.

Roerich, George. *Biography of Dharmasvamin*. Patna: K.P. Jayswal Research Institute. 1959. 1st Edition.

Sastri, Haraprasad. *Advayavajrasamgraha*. Baroda : Oriental Institute, Broda. 1927. 1st Edition.
Sen, Sukumar. *Sekasubhodaya of Halayudha Misra*. Kolkata : The Asiatic Society. 2002. Reprint
Sensharma, Debabrata. *Matsyendra Samhita*. Calcuuta: The Asiatic Society. 1994. 1st Edition.
Shastri, Lobsang Norbu. *Bodhipathaprasipah of Acharya Dipankar Srijnana*. Sarnath: Central University of Tibetan Studies. 2014. 3rd Revised Edition.

Sircar, Dines Chandra. *Select Inscription Bearing on Indian History and Civilization*. Calcutta: University of Calcutta. 1942. 1st Edition.

Stewart, Tony K. *Fabulous Females and Peerless Pirs Tales of Mad Adventure in Old Bengal*. New York: Oxford University Press. 2004. 1st Edition.
Stewart, Tony K. *The Final Word*. New York: Oxford University Press. 2010. 1st Edition.
Suzuki, D.T. *Studies in the Lankavatara Sutra.* New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1998 [ ].
Vira, Raghu & Chandra, Lokesh. *Kalachakra-Tantra and Other Texts*. New Delhi : International Academy of Indian Culture. 1966. 1st Edition.

আকর গ্রন্থ (অহমিয়া, হিন্দি, তিব্বতী, কন্নড় এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা এবং বিদেশী ভাষার গ্রন্থের বাংলা বা ইংরাজি অনুবাদ)

ঘোষ, বিনয়. *বাদশাহী আমল.* কলকাতা: প্রকাশ ভবন. ২০১৮. ষষ্ঠ মুদ্রণ.

দেবসেন, নবনীতা. *শতেক বচন.* কলকাতা: প্যাপিরাস. ১৯৮৭. প্রথম প্রকাশ.

ভিক্ষুশাস্ত্রী, শান্তি. *বোধিচর্যাবতার.* লখনউ : বুদ্ধবিহার. ১৯৫৫. প্রথম সং.

মোহাম্মদ, জামান. *গিলগামেশ কাব্য.* ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ. ২০১৬. প্রথম সংস্করণ.

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *দোহা-কোশ.* পাটনা : বিহার-রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ. ১৯৫৮. প্রথম সং.

সেন, গিরীশচন্দ্র. *জ্ঞানেশ্বরী.* নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি. ১৯৯৯. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

স্বামী, নারায়ণদাস. *শ্রী দাদূচরিতামৃত.* জয়পুর: মন্ত্রী, স্বামী জয়রাম দাস স্মৃতিগ্রন্থমালা. ১৯৭৫.
Bhaghat, K. C. *Jivan Charitar of Sant Kabir*. Jammu: Mr. and Mrs. H.R. Bhagat. 2003. 1st Publication. pp. 105-106
Brownislaw, Malinowski. *The Foundation of Faith and Morals*. New York : Richard West
Chitre, Dilip. *Anubhavamrita*. New Delhi: Sahitya Akademi. 1996. 1st Edition.
Dorje, Shempa. *The Biography of Eighty Four Saints* By Acharya Abhayadatta Sri. Varanasi : Central Institute of Higher Tibetan Studies. 1998. 2nd Edition.
Ete, Tumpak. *Nyibu Agom* (Vol-I). Shilong: Singhania Printing Press. 1997

Freud, Sigmund. *Moses and Monotheism*. Great Britain: The Hogarts Press and the Institute of Psycho-Analysis. 1939. pp. 173-74
Lama. Chimpa & Alaka Chattopadhayaya (Trans.). *Taranath's History of Buddhism in India*. Calcutta: K.P. Bagchi & Company. 1980. Reprint.
Neog, M. *The Bhakti-Ratakara of Sankardeva*. Punjab: Punjabi University Patiala. 1982. 1st Edition.
Ramanujan, A.K. *Speaking of Siva*. Haryana: Penguin Books India. 1993. 1st Edition. Roerich, George N. *The Blue Annals*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. 1976. 2nd Edition.
Shackle, Chrisopher. *Bulleh Shah Sufi Lyrics*. England: Harvard University Press. 2015.
Tagore, Rabindranath. *The Religion of Man.* London: George Allen & Unwin Ltd. 1922. 1st Edition
Takakusu, J (Translated). *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago by I-Tsing*. London: Oxford, The Clarendon Press. 196. 1st Edition.

সরকারি নথি

Haryana Government Gazette Extraordinary, published on 05.07.2019, published by Principal Secretary to Government, Haryana, Welfare of Schedule Castes and Backward Classes Department.

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা, অন্য ভাষার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

[]. *দর্শন.* কলকাতা : বিশ্বভারতী. চৈত্র ১৪২২: প্রথম প্রকাশ.
অধিকারী মুরারি লাল. *বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী.* কলকাতা: [ ]. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ.
অনির্বাণ. *বেদ-মীমাংসা* (১ম). কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ. ১৯৯১. প্রথম সংস্করণ.
অনির্বাণ. *বেদ-মীমাংসা* (৩). কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ. ১৯৭০. প্রথম সংস্করণ.
আহমদ, ওয়াকিল. *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান.* ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি. ২০১২. নবম সংস্করণ.
কবিরাজ, গোপীনাথ. *তত্ত্ব ও সাধনা.* কলকাতা : প্রাচী পাবলিকেশন্‌স. ২০১৩. দ্বিতীয় সংস্করণ.
কবিরাজ, গোপীনাথ. *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত.* বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৯. চতুর্থ মুদ্রণ.
কবিরাজ, গোপীনাথ. *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৯. চতুর্থ মুদ্রণ.
কবিরাজ, গোপীনাথ. *ভারতীয় সাধনার ধারা.* কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ. ১৯৭৫. দ্বিতীয় মুদ্রণ.
কাং, ভবদীপ. *গুরু.* নিউ দিল্লি: ওয়েস্টল্যান্ড পাবলিশিং. ২০১৭. বঙ্গানুবাদের প্রথম সংস্করণ.
কিশোরী দাস বাবাজী. *তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামজপ ও কীর্ত্তন-বিধান.* চৈতন্যডোবা: ঈশ্বরপুরী শ্রীপাট. ১৩১৪. দ্বিতীয় সং.
কিশোরী দাস বাবাজী. *প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব.* চৈতন্যডোবা: বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউশন. ১৪২২. প্রথম সং.
কুলদানন্দ, ব্রহ্মচারী. *শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ.* পুরী: বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ. তৃতীয় সংস্করণ.
গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত. *প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ ও দর্শন.* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৩. প্রথম প্রকাশ.
গিরি, সত্যবতী. *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ.* কলকাতা: দে'জ. ২০০৭. প্রথম সং.
গুপ্ত, নির্মলনারায়ণ. *ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য.* কলকাতা: রত্নাবলী. ১৯৬৪. প্রথম সং.
গুহ, রণজিৎ. *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত.* কলকাতা: তালপাতা. ২০১৯. তৃতীয় মুদ্রণ.

গোস্বামী, কাননবিহারী. *বাঘনাপাড়া- সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য.* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০৮. দ্বিতীয় সং.

গোস্বামী, রাধাবিনোদ. *বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৬. দ্বিতীয় সং.

গোস্বামী, রাধু. *শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগদাধর.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৪১৪. প্রথম প্রকাশ.

ঘোষ, সতী. *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ১৯৮৪. প্রথম প্রকাশ.

চক্রবর্তী, জনার্দন (সম্পা.). *আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক-গ্রন্থ.* কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী. ১৯৭৩. প্রথম প্রকাশ.

চক্রবর্তী, জনার্দন. *শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি.* কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৯৭.

চক্রবর্তী, রণবীর. *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে.* কলকাতা: আনন্দ. ১৪১৭. দ্বিতীয় সংস্করণ. পঞ্চম মুদ্রণ.

চক্রবর্তী, রমাকান্ত ও শক্তিনাথ ঝা. *গুরু: তত্ত্ব, পূজা, পরম্পরা.* কলকাতা: অবভাস.২০০৮. প্রথম প্রকাশ.

চক্রবর্তী, রমাকান্ত. *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম.* কলকাতা: আনন্দ. ২০০৯. তৃতীয় মুদ্রণ.

চট্টোপাধায়, গীতা. *ভাগবত ও বাঙ্লা সাহিত্য.* কলকাতা: কবি ও কবিতা. ১৩৭৯. প্রথম সং.

চট্টোপাধায়, সুবীররঞ্জন. *ভারতীয় দর্শন প্রস্থানে বৈষ্ণব সাধনার ধারা.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮২.

চট্টোপাধ্যায়, অলকা. *অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান.* কলকাতা : অনুষ্টুপ. ২০১৮. প্রথম সংস্করণ.

চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী. *ভক্তিরসের বিবর্তন.* কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ. ১৯৭২. প্রথম প্রকাশ.

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. *মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ সে-যুগে মায়েরা বড়ো.* ঢাকা: নালন্দা. ২০০৯. প্রথম প্রকাশ.

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. *লোকায়ত দর্শন.* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. ২০১৯. পুনর্মুদ্রণ.

চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা. *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা.* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৫. প্রথম সং.

চিদানন্দ মূর্তি, এম. *বসবন্না.* নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট. ১৯৯৮. প্রথম সংস্করণ.

চৌধুরী তত্ত্বনিধি, অচ্যুতচরণ. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা: কথা. প্রথম প্রকাশ. ২০১০

চৌধুরী, বাসন্তী. *বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য (অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে).* কলকাতা: বুক ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৬৮. প্রথম সং.

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর. *শ্রীচৈতন্যদেব এবং সমকালীন নবদ্বীপ.* নদীয়া: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ. ২০০৪. প্রথম প্রকাশ.

চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পা.), *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* (তৃতীয় খণ্ড). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০০১. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০১২. তৃতীয় প্রকাশ.

চৌধুরী, সুজিৎ. *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার.* কলকাতা: প্যাপিরাস. ২০১৬. তৃতীয় সংস্করণ.

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ. *বাংলার ব্রত.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৪০২ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ

ঠাকুর, গৌরগুণানন্দ. *শ্রীখন্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব.* শ্রীখন্ড: মধুমতী সমিতি. ১৪২৩. ষষ্ঠ সং.

তত্ত্ববাচস্পতি, মধুসূদন. *গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ইতিহাস বৈষ্ণব-বিবৃতি.* হুগলী: সুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবনোদ. ১৩৩৩. প্রথম প্রকাশ.

ত্রিপাঠী, অমলেশ. *ইতালীর র‍্যানেশাঁস, বাঙালির সংস্কৃতি.* কলকাতা: আনন্দ. ২০০৯. চতুর্থ মুদ্রণ.

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর. *যজ্ঞ-কথা.* কলকাতা: প্রাচী পাবলিকেশনস্. ২০০৯. নতুন সং.

দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দ্বিতীয় খন্ড).* কলিকাতা: নুতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত. ১২৮৯ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ.

দত্ত, অক্ষয়কুমার. *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: বসুমতী কার্যালয়. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

দত্ত, পুলিনবিহারী. *বৃন্দাবন-কথা.* কলকাতা: [ ]. ১৯২০. প্রথম সং.

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ. *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব.* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৭ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

দত্ত, মহেন্দ্রনাথ. *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা.* কলকাতা: মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি. ১৩৮২ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সং.

দত্ত, রামচন্দ্র. *মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ১৪২১ বঙ্গাব্দ. প্রথম পুনর্মুদ্রণ. পৃ

দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র.* কলকাতা: কনকেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশিত. ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.

দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন. *ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা.* বিষ্ণুপুর: সুষমা দাশগুপ্ত প্রকাশিত. ২০০০.

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ. *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম.* কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ. ১৪০৭ বঙ্গাব্দ. দ্বিতীয় সংস্করণ.

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *নব চর্যাপদ.* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮৯. প্রথম সং.

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা.* কলকাতা: ভারবি. ১৯৯৬. প্রথম প্রকাশ.

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি.* কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি. ১৪১৯. তৃতীয় মুদ্রণ.

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *ভারতীয় সাধনার ঐক্য.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৮০৭ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ. *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে.* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং. ১৩৭০. তৃতীয় সং.

দাশগুপ্ত, শিবপ্রসাদ. 'অচিন্ত্যভেদাভেদদর্শনের বিকাশধারা'. *বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০০৯. পুর্নমুদ্রণ.

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ. *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ. ১৩৪৩. প্রথম সং

দাস, অজিত. *জাতবৈষ্ণব কথা.* কলকাতা: সময়. ২০০৬. দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ.

দাস, উপেন্দ্রকুমার. *ভক্ত কবীর.* কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি. ১৯৫৫. প্রথম প্রকাশ.

দাস, উপেন্দ্রনাথ. *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা* (১). কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার. ২০১০. তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ.

দাস, উপেন্দ্রনাথ. *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা* (২). কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার. ২০১১. তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ.

দাস, গিরীন্দ্রনাথ. *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা.* কলকাতা: সুবর্ণরেখা. ১৯৯৮. দ্বিতীয় সংস্করণ.

দাস, গোবর্দ্ধন. *শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ* (২). বৃন্দাবন: দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১৯৬১. প্রথম প্রকাশ.

দাস, পরিতোষ. *সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম.* কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ. ১৯৭৮. প্রথম সং.

দে, সুশীলকুমার. *নানা নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ.* কলকাতা: পারুল. ২০১১. প্রথম সং.

দেব, রণজিৎ. *সাহিত্যের ইতিহাসে কোচ-রাজদরবার.* কলকাতা: তুহিনা প্রকাশনী. ২০১৮. চতুর্থ প্রকাশ.

দেবগোস্বামী, কৃষ্ণগোপালানন্দ. *শ্রীশ্রী নবচৈতন্য শ্রীশ্রী রসিকানন্দ প্রভু.* মথুরা: শ্রীশ্রী রাধাশ্যামসুন্দর জীউ মন্দির. ২০১৫.

নাথ, রাজমোহন. *কদলী-রাজ্য.* গৌহাটি: ট্রায়ো স্টোর. ১৯৪১. প্রথম সং.

নাথ, রাজমোহন. *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন-পুঁথি.* কলিকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলিনী. ১৯৬৮ খ্রি. প্রথম সং.

নিগমানন্দ. *জ্ঞানী গুরু.* হালিশহর: আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ. ১৪২০. পঞ্চদশ সং.

নিগমানন্দ. *তান্ত্রিক গুরু.* হালিশহর: আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ. ১৪২০. ষোড়শ সং.

নিগমানন্দ. *প্রেমিক গুরু.* হালিশহর: আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ. ১৪২০. পঞ্চদশ সং.

নিগমানন্দ. *যোগী গুরু.* হালিশহর: আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ. ১৪২১. দ্বাবিংশ সং.

পাঠক, সুনীতিকুমার. তিব্বতী স্রোতে প্রাচীনবঙ্গের বৌদ্ধমত. *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম.* ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া সম্পাদিত. কলকাতা : নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন. ২০১৩. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

পাল, রামেশ্বর. *দার্শনিক শূন্যবাদ ও বাংলা সাহিত্য.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৯৭৬. প্রথম প্রকাশ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা. *পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য.* কলকাতা: জে. ই. ই. পাবলিশার্স. ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা. *বাংলা চরিতসাহিত্যে নিত্যানন্দ.* সোদপুর: এষা মুখার্জ্জী প্রকাশিত. ১৪১০ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ. *পঞ্চোপাসনা.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৯৬০. প্রথম প্রকাশ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল. *ঋগ্বেদে ভক্তিসাধনা.* কলকাতা: সোমলতা. ২০১৬. প্রথম সং

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন. *অসমীয়া সাহিত্য.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩৫৯. প্রথম প্রকাশ. পৃ. ২৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.). *বিজ্ঞানবাদ-বটকৃষ্ণ ঘোষ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ২০১৪. নূতন সংস্করণ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. *রাজযোগ ও হঠযোগ.* কলকাতা: আনন্দ. ১৯৯৪. প্রথম সং.

বসু, যোগীরাজ. *বেদের পরিচয়.* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম. ১৯৫৭. প্রথম প্রকাশ.

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র. *প্রবন্ধ সংগ্রহ.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. ২০০১. প্রথম সং.

বাগ্‌চী, যোগেন্দ্রনাথ. *ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে অদ্বৈতবাদ.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. ১৯৬১.

বাবাজী, কিশোরী দাস. *সপ্তগ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ.* চৈতন্যডোবা: শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম. ১৪১৩ বঙ্গাব্দ.

বাবাজী, কিশোরীদাস (সং.). *শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলারহস্য.* হুগলি: প্রাণগোপাল গোস্বামী প্রকাশিত. ২০১৮. ষষ্ঠ সং.

বাসাম, এ. এল. *অতীতের উজ্জ্বল ভারত.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. ২০১১. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র রায়. *বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ২০০৩.

বিদ্যাবিনোদ. সুন্দরানন্দদাস. *বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ.* কলকাতা: করুণা দাস প্রকাশিত. ১৯৬৪. প্রথম সং.

বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ. *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী* (২). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ১৯৮৪. প্রথম সং.

বিদ্যাভূষণ, রসিকমোহন. *রায় রামানন্দ.* [ ]. বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রকাশিত. ১৯৮৪. [ ].

বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র. *কৌলমার্গ সাধনরহস্য.* কলকাতা: প্রাচী পাবলিকেশন্‌স্‌. ২০১৮.

বিদ্যারণ্য, স্বামী. *ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস* (১ম খণ্ড). কলকাতা: প্রাচ্যবাণী. ১৯৬৩. প্রথম সং.

ভট্টাচার্য, অনন্তকুমার. *বৈভাষিক দর্শন.* কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি. ১৯৫৫. প্রথম প্রকাশ.

ভট্টাচার্য, অনন্তকুমার. হিস্ত্রীর ভাবধারা. *J.N. Banerjee Volume.* Calcutta: The Alumni Association. Department of Ancient Indian History and Culture, University of Calcutta. 1960. 1st Edition.

ভট্টাচার্য, অমরপ্রসাদ. *শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন.* খড়গপুর: শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস প্রকাশিত. ১৯৬৬. প্রথম সং.

ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র. *ভারতদর্শনসার.* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ. ১৪১১ বঙ্গাব্দ. পুনর্মুদ্রণ.

ভট্টাচার্য, গুরুদাস. *বাংলা কাব্যে শিব.* কলকাতা: ইন্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং. ১৯৬১. প্রথম প্রকাশ.

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ. *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস.* কলকাতা : জেনারেল. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.

ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ. *সূফী মতের উৎস সন্ধানে.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা. [ ]. [ ].

ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ. *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০০৮. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ. *বৌদ্ধদের দেবদেবী.* কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৬. দ্বিতীয় সংস্করণ.

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ. *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য.* কলকাতা: লেখাপড়া. ১৯৬৪. প্রথম সং.

ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ. *সাংখ্যদর্শন.* কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ. ১৯৮৫. পুনর্মুদ্রণ.

ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ. *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি.* কলকাতা: পুনশ্চ. ২০০১. প্রথম প্রকাশ.

ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *প্রবন্ধসংগ্রহ* (৩). কলকাতা : গাঙচিল. ২০১৩. প্রথম প্রকাশ.

ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. ২০০৯. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশার্স. ১৪১৮ (ব.). ষষ্ঠ সংস্করণ.

মজুমদার, বিমানবিহারী. *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ২০০৬. প্রথম প্রকাশ.

মণ্ডল, পঞ্চানন. *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র* (দ্বিতীয় খন্ড). শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী. ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ.

মাইতি, রবীন্দ্রনাথ. *চৈতন্য-পরিকর.* কলকাতা: বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড. ১৯৬০. প্রথম সং.

মুখোপাধ্যায়, অণিমা. *আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ.* কলকাতা: সাহিত্যলোক. ১৯৮৭. প্রথম প্রকাশ

মুখোপাধ্যায়, তুহিন. *লোকায়ত শ্রীচৈতন্য.* কলকাতা: গাঙচিল. ২০১৪. প্রথম প্রকাশ.

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ. *বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ভারতে এবং বহির্বিশ্বে.* কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. ২০০৯. পুনর্মুদ্রণ.

মুখোপাধ্যায়, সুখময়. *বাংলার নাথসাহিত্য- সাহিত্যপ্রকাশিকা* (১). শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী. [ ]. [ ].

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা). *বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. চতুর্থ মুদ্রণ. ২০১০.

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ. *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা. ১৯৭০. প্রথম সং.

যোগেন্দ্রনাথ, তর্ক সাংখ্য বেদান্ততীর্থ. *ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়.* কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ২০১৩. পুনর্মুদ্রণ.

রায় ভট্ট,অমূল্যধন. *শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা: মানসী প্রেস. ১৩৩১ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

রায়, জীমূতবাহন. *শ্রীনিবাস আচার্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ.* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা. ১৯৮৪. প্রথম সং.

রায়, অপর্ণা. *পুরাতনী নারী ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ. ২০১৬. প্রথম প্রকাশ.

রায়, নীহাররঞ্জন. *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব).* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং. ১৪২০ বঙ্গাব্দ. অষ্টম সং.

রায়, মঞ্জুশ্রী. *ওড়িয়া লিপিতে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী.* কলকাতা: প্যাপিরাস. ২০০৪. প্রথম প্রকাশ.

রায়, মোহিত (সম্পা.). *নদীয়া-কাহিনী-* কুমুদনাথ মল্লিক বিরচিত. কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ১৯৮৬. তৃতীয় সং.

রায়, যোগেশচন্দ্র. *ধনুর্বেদ.* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়. ১৩৬১ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.

রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর. *বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য.* কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৪৯. প্রথম সং.

শর্মা, রামশরণ. *ভারতের প্রাচীন অতীত.* কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান. ২০১১. প্রথম প্রকাশ.

শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন. *চার্বাক দর্শন.* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০১৩. চতুর্থ সং.

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ. *প্রাচীন বাংলার গৌরব.* কলকাতা : বিশ্বভারতী. ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.

শ্রীপান্থ. *বটতলা.* কলকাতা: আনন্দ. ২০১০. দ্বিতীয় মুদ্রণ.

সরকার, দীনেশচন্দ্র. *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত.* কলকাতা : সাহিত্যলোক. ২০০৯. সংশোধিত ও সংযোজিত নতুন সংস্করণ.

সরস্বতী, সচ্চিদানন্দ. *গুরু-প্রদীপ.* কলকাতা: নবভারত. ১৪২২. দ্বিতীয় সংস্করণ.

সাংকৃত্যায়ন, রহুল. *তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম.* অনুবাদ- সুমন পাল ভিক্ষু. কলকাতা : বোধি-নিধি. ২০১৬. প্রথম প্রকাশ.

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *ইসলামধর্মের রূপরেখা.* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৫ বঙ্গাব্দ. চতুর্থ মুদ্রণ.

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *বৌদ্ধদর্শন.* কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন. ১৪১৬. চতুর্থ মুদ্রণ.

সান্যাল, অবন্তীকুমার. *চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান.* কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী. ২০০২.

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন. *বাংলার ভক্তি আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারা.* নতুন দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস. ২০১৯. প্রথম প্রকাশ

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন. *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস.* কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী. ১৯৮৯. প্রথম প্রকাশ.

সাহা, প্রভাতকুমার. *মধ্যযুগের ইতিহাসের সন্ধানে.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ১৯৯৮. প্রথম প্রকাশ.
সিংহ, মাণিকলাল. *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি* (১). বাঁকুড়া: প্রদীপকুমার সিংহ প্রকাশিত. ১৯৮২. প্রথম সং.
সিংহ, শুকদেব. *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ১৯৯২. প্রথম প্রকাশ.
সুফী, মোতাহার হোসেন. *বাংলা সাহিত্যে রঙ্গপুরের অবদান.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী. ২০০১. প্রথম প্রকাশ.
সেন, ক্ষিতিমোহন. *দাদূ.* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন. ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ.
সেন, ক্ষিতিমোহন. *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা.* কলকাতা: বঙ্গীয় কলা কেন্দ্র. ২০১০. প্রথম সংস্করণ.
সেন, ক্ষিতিমোহন. *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-সাধনা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ. প্রথম সংস্করণ.
সেন, ক্ষিতিমোহন. *বাংলার সাধনা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী. ১৩৫২ বঙ্গাব্দ. প্রথম প্রকাশ.
সেন, দীনেশচন্দ্র. *বৃহৎ বঙ্গ* (দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: দে'জ. ২০০৬. তৃতীয় মুদ্রণ.
সেন, দীনেশচন্দ্র. *হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম.* কলকাতা: পাতাবাহার. ১৪২২. তৃতীয় মুদ্রণ.
সেন, প্রবোধচন্দ্র. বাঙ্‌লার আদি ধর্ম্ম. তপন কুমার ঘোষ (সম্পা.). *বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম চর্চা.* কলকাতা : প্যাপিরাস. ২০১৮. প্রথম প্রকাশ.
সেন, রামদাস. *ভারত-রহস্য.* বহরমপুর: নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত. ১২৯২ বঙ্গাব্দ. প্রথম সং.
সেন, সুকুমার. *প্রবন্ধ সংকলন* (১). কলকাতা: আনন্দ. ২০১৪. প্রথম সং.
সেন, সুকুমার. *প্রবন্ধ সংকলন* (৩). কলকাতা: আনন্দ. ২০১৭. প্রথম সং.
সেন, সুকুমার. *প্রবন্ধ সংকলন* (৪). কলকাতা: আনন্দ. ২০১৮. প্রথম সং.
সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১), কলকাতা: আনন্দ. ২০০৭. অষ্টম মুদ্রণ.
সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২), কলকাতা: আনন্দ. ২০০৭. অষ্টম মুদ্রণ.
স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য. *শ্রী বৈষ্ণব-দর্শন ও ধর্ম* (প্রথম খণ্ড). খড়দহ: শ্রী বলরাম ধর্ম সোপান. ১৩৭৬.
স্বামী, অপূর্বানন্দ. *আচার্য শঙ্কর.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ২০১১. ১৫তম পুনর্মুদ্রণ.
স্বামী, জগদীশ্বরানন্দ (অনুবাদ ও সম্পাদনা). *পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধায় গোপীনাথ কবিরাজ.* কলকাতা: স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রকাশিত. ২০০৩. প্রথম প্রকাশ.
স্বামী, প্রজ্ঞানানন্দ. *তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা.* কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ. ২০১০. তৃতীয় সং.
স্বামী, প্রজ্ঞানানন্দ. *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস* (প্রথম ভাগ). কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ. ১৯৭০. প্রথম সং.
স্বামী, মহাদেবানন্দ. *স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী* (২). কলকাতা: স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি. ১৯৭২. প্রথম সংস্করণ.
স্বামী, সারদেশানন্দ. *শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়. ১৯৮৬. পুনর্মুদ্রণ.
স্বামী, হরিহরানন্দ. *পাতঞ্জল যোগদর্শন.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ. ২০০২. সপ্তম সংস্করণ.
হক, মুহম্মদ এনামুল. *বঙ্গে স্বূফী প্রভাব.* কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক স্টোর. ২০১২. প্রথম সং.
হাজরা, কানাইলাল. *আদি-বুদ্ধ.* কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি. ২০১৪. পুনর্মুদ্রণ.
হাবিব, ইরফান. *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ.* নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট. ২০১০. প্রথম প্রকাশ.
হাবিব, ইরফান. *সিন্ধু সভ্যতা.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড. সেপ্টেম্বর ২০০৯. প্রথম প্রকাশ

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরাজি)

Aiyangar, Rangaswami K.V. *Some Aspects of Hindu View of Life According to Dharmasastra*. Baroda: Oriental Institute. 1952. 1st Edition.

Akira, Hirakawa. *A History of Buddhism From Sakyamuni to Early Mahayana*. Delhi: MLBD. 1998. Reprint
Alchin, Raymond & Bridget. *The Rise of Civilization in India and Pakistan*. New Delhi: Cambridge University Press. 2013. 6th Reprint.
Auboyer, Jeannie. *Daily Life in Ancient India. London: Asia Publishing House. 1961. 1st Edition.*
Bagchi, P.C. Religion. *The History of Bengal* (Vol-I, Chapter-XIII). R.C. Majumdar Edited. Dacca: The University of Dacca. 1943. 1st Edition.
Bagchi, Prabodh Chandra. *Indological Studies*. Santiniketan: Research Publication Committee, Visva-Bharati. 1982. 1st Edition.
Bahirat, B.P. *The Philosophy of Jnanadeva*. Delhi: MLBD. 1998. Reprint.
Bandyopadhyay, P.K. *Nath Cult and Mahanad: A Study in Syncretism*. Delhi: B. R Publishing. 1992. 1st Edition.
Banerjea, Akshaya Kumar. *Philosophy of Gorakhnath*. Delhi: MLBD. 2017. 6th Reprint.
Banerjee, Anukul Chandra. *Aspects of Buddhist Culture from Tibetan Sources*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd. 1984. 1st Edition.
Banerjee, Anukul Chandra. *Buddhism in India and Abroad*. Calcutta: The World Press Private Limited. 1973. 1st Edition.
Banerjee, Anukul Chandra. *Sarvastivada Literature*. Calcutta: Published by D. Banerjee.
Banerjee, J.N. *Pauranic and Tantric Religion (Early Phase)*. Calcutta: University of Calcutta.
Banerjee, Sumanta. *Logic in a Popular Form*. Calcutta: Seagull Books. 2019. Reprint.
Banerji, SC. *Tantra in Bengal A Study in its Origin, Development and Influence*. Calcutta: Naya Prakash. 1978. 1st Edition.
Barua, B.M. *The Ajivikas*. Calcutta : University of Calcutta. 1920. 1st Edition
Barua, Benimadhab. *A History of Pre-Buddhisitic Indian Philosophy*. New Delhi: MLBD. 2016. 2nd Reprint.
Basu, Jogiraj. *India of the Age of Brahmanas*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar. 1969. First Edition
Basu, Nagendranath. *The Modern Buddhism and Its Followers in Orissa*. Calcutta: Published by the author. 1911. 1st Edition
Bhandarkar, R. G. *Vaishnavism Saivism and Minor Religious Systems*. Varanasi: Indological Book House. 1965. 1st Edition.
Bharvaga, Purushottam Lal. *India in the Vedic Age.* Lucknow : The Upper India Publishing House Limited. 1956.1st Edition.
Bhattacharji, Sukumari. *Buddhist Hybrid Sanskrit Literature*. Kolkata: The Asiatic Society. 2000. 2nd Edition
Bhattacharya, Biswanath. *Asvaghosa: A Critical Study*. Santiniketan: Visva-Bharati Research Publication. 1976. 1st Edition.
Bhattacharya, Jogendranath. *Hindu Castes and Sects*. Delhi: Kalpaz Publications. 2017. Indian Reprint.
Bhattacharya, Kamaleswar. *The Ātman – Brahman in Ancient Buddhism*. Delhi:` MLBD. 2017. 1st Ed.
Bhattacharyya, Benoytosh. *An Introduction to Buddhist Esoterism*. Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office. 1964. Second Edition.
Bhattacharyya, N. N. *Medieval Bhakti Movements in India*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd. 1999. Reprint.
Bhattcharya, Vidhushekhar. *Bhota-Prakas*. Calcutta : University of Calcutta. 1939. 1st Edition.
Bhowmik, Dwijendra Lal. *Tribal Religion of Tripura*. Calcutta : Accuracy. 1997.
Blair, C.J. *Heat in the Rig Veda and Atharva Veda*. Anrocica: New Haven Connectient. 1961.
Bodding, P.O. *Traditions and Institutions of the Santals.* New Delhi: Gyan Publishing House.
Bose, Mamindra Mohan. *The Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal*. Delhi: Gian Publishing House. 1986. 1st Reprint.

Brings, George Weston. *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*. Delhi: MLBD. 2016. 8th Reprint.
Buck, Peter Henry. *Anthropology and Religion*. London: Yale University Press. 1939. pp. VI- 14
Bunee, Fadrick W. *Mudras*. New Delhi : D.K. Printers. 2009. 2nd Edition.
Calcutta : The Ramkrishna Mission Institute of Culture. 2005. Reprint.
Cekner, William. *A Tradition of Teachers*. Delhi: MLBD. 1983. First edition.
Chakrabarti, Ranabir. *Exploring Early India*. Delhi: Primus Book. 2007. 1st Edition
Chakrabarty, *Ramakanta. Vaisnavism in Bengal*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar. 1985. First Publication.
Chakraborti, Haripada. *Asceticism in Ancient India*. Calcutta: Punthi Pustak. 1973. 1st Edition.
Chakraborti, Kunal. *Religious Process The Puranas and The Making of a Regional Tradition*. 2001. 1st Edition
Chakravarti, Chintaharan. *Tantras Studies on Their Religion and Culture*. Calcutta: Punthi Pustak. 1972. Reprint.
Chakravarti, Janardan. *Bengal Vaishnavism and Sri Chaitanya*. Kolkata: The Asiatic Society. 2016. 2nd Reprint.
Chakravarti, Sipra. *Tibetan Thankas in the Indian Museum*. Calcutta: Indian Museum. 2000. 1st Edition
Chakrabarty, S (Ed.). *Collection from the Works of P.C. Bagchi* (Vol-I). Kolkata: Pritonia. 2014. 1st Edition.
Chakravarti, Uma. *The Social Dimensions of Early Buddhism*. New Delhi: Munshiram Manoharlal. 1987. 1st Edition
Chanda, Ramaprasad. Survival of Prehistoric Civilization of the Indus Valley in Lahiri, Nayanjit Edited. *The Decline and Fall of the Indus Civilization*. Delhi: Permanent Black. 2000. 1st Edition.
Chanda, Ramaprasad. *The Indus Valley in the Vedic Period.* Calcutta: Government of India Central Publication Branches. 1926. 1st Edition
Chatterjee, Indrani. *Forgotten Friends Monks, Marriages, and Memories in Northeast India*. New Delhi: Oxford University Press. 2015. 1st Edition.
Chatterjee, Rao, T. A. Gopinath. *Elements of Hindu Iconography (Vol-II, Part-I)*. Delhi: MLBD. 1965. 1st Edition.
Chatterji, Suniti Kumar. *Kirata Jana Kriti*. Kolkata: The Asiatic Society. 2018. 2nd Edition
Chatterji, Suniti Kumar. *The Origin and Development of the Bengali Language*. New Delhi: Rupa Publication. 2017. Fifth Impression.
Chattopadhyay, Alaka. *Atisa and Tibet*. Delhi: MLBD. 2011. Reprint.
Chattopadhyaya, Sudhakar. *The Evolution of Theistic Sects in Ancient India up to the time of Samkaracharya.* Calcutta: Progressive Publishers. 1962. 1st Ed.
Chaudhuri, Roma. *Asvaghosa*. Kolkata : Sahitya Akademi. 2017. Reprint.
Coomaraswamy, Ananda. K. *Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government*. Connecticut: American Oriental Society. 1942.
Copeman Jacob. *The Guru in South Asia New Interdisciplinary perspectives*. London: Routledge. 2012. 1st Edition.
Csoma De Koros, Alexander. *Grammar of the Tibetan Language*. Calcutta : The Asiatic Society of Bengal. 1834.
Das, Bishnupada. *Some Aspects of Socio-Economic Changes in South Western frontier Bengal Since Introduction of Neo-Vaishnavism*. Kolkata: Firma KLM Private Limited. 1996.1st Edition.
Das, Paritosh. *Sahajiya Cult of Bengal and Pancha Sakha Cult of Orissa*. Calcutta: Firma KLM. 1988. 1st Edition.
Das, Sarat Chandra. *Indian Pandits in the Land of Snow*. New Delhi: Asian Educational Services. 1992. Reprint.

Dasgupta, Shashibhushan. *An Introduction to Tantric Buddhism*. New Delhi : Cosmo Publications 2016. 1st Edition.
Davidson, Ronald M. *Indian Esoteric Buddhism A Social History of the Tantric Movement*.
Dayalan, D. *Early Temples of Tamilnadu*. New Delhi: Harman Publishing House. 1992.
De, S.K. *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal.* Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1986. Reprint.
Dei, Santilalta. *Vaishnavism in Orissa*. Calcutta: Punthi Pustak. 1988. 1st Edition.
Deshmukh, P.S. *The Origin and Development of Religion in Vedic Literature*. Bombay: Oxford University Press. 1st Edition. 1933.
Deva Goswami, B. K. *A Critical Study of the Ramayana Tradition of Assam*. Calcutta: Puthi Pustak.1994. 1st Edition.
Dharwadker, Vinay. *The Collected Essays of A.K. Ramanujan*. New Delhi: Oxford University Press. 2004. Reprint.
Dimock, Edward C JR. *The Place of the Hidden Moon Erotic Mysticism in the Vaishnava-sahajiya Cult of Bengal*. Delhi: MLBD. 1992. 1st Edition.
Dutt, N. K. *Origin and Growth of Caste in India*. Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1986. 1st Combined Reprint.
Dutt, Nalinaksha. *Buddhist Sects in India*. Calcutta: Firma KLM. 1976. 1st Edition.
Dutt, Nalinaksha. *Early Monastic Buddhism*. Calcutta: Calcutta Oriental Book Agency. 1960. 1st Edition.
Dutt, Nalinaksha. *Mahayana Buddhism*. Calcutta : Firma KLM Pvt. Ltd. 1976. Corrected Reprint.
Dutt, Sukumar. *Buddhist Monks and Monasteries of India Their History and Their Contribution to Indian Culture*. Delhi: MLBD. 2015. 3rd Reprint
Dutt, Sukumar. *Early Buddhist Monachism* (600 B.C.-100 B.C.). London: Kegan Paul Trench, Trubner & Co. Ltd. 1924. 1st Edition.
Fick, Richard. *The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time*. Kolkata: University of Calcutta. 1920
Findly, Ellison Banks. *Dana giving and Getting in the Pali Buddhism*. Delhi: MLBD. 2003. 1st Edition.
Frazer, James. *The Golden Bough A Study in Magic and Religion*. England: Penguin Books. 2003. Reprint
Gellner, David N. *Monk, Householder and Tantric Priest Newar Buddhism and Its Hierarchy of Ritual*. New Delhi: Cambridge University Press. 2009. Reprint.
Ghosal, S.N. *Studies in Divine Aesthetics*. Santiniketan: Visva-Bharati. 1974. 1st Edition.
Golden Weiser, Alexander. *Anthropology: An Introduction to Primitive*. Bombay: George G Harrap & Co. Ltd. 1917.
Gonda, J. N. *Change and Continuity in Indian Religion*. London: Mouton & Co. 1965. 1st Edition.
Gopinath, Kaviraj. *Aspects of Indian Thought*. Burdwan: The University of Burdwan. 1966. 1st Edition.
Gordon, D.H. *The Pre-Historic Background of Indian Culture*. Bombay: N.M. Tripathi Private Limited. 1958. First Edition.
Goswamy, B. N & J. S. Grewal. *The Mughals and the Jogis of Jakhbar*. Simla: IIAS. 1967. 1st Edition.
Goyal, S.R. *A Religious History of Ancient India*. Meerut: Kusumanjali Prakashan. 1984. 1st edition
Green, Natalie & Karen, O'Connor (Ed.). *Gender and Women's leadership: A Reference Handbook*. CA: Sage Publication. 2010. 1st Edition.
Gupta, Chitralekha. *The Brahmanas of India. A Study Based on Inscriptions.* Delhi: Sandeep Prakashan. 1983. 1st Publication.
Habib, Irfan. *Religion in Indian History.* New Delhi: Tulika Books. 2007. 1st Edition.

Hara, Minoru. 'Hindu Concepts of Teacher Sanskrit Guru and Āchārya' *in* Sanskrit *and Indian Studies: Essays in Honour of Daniel H. H. Ingalls*. Eds. Masatoshi Nagatomi. London: D Redidel Publishing Company. 1980.

Hazra, Kanailal. *Buddhism in India as Described by the Chinese Pilgrims AD 399-689*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2011. Second Reprint.

Hazra, R.C. *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites & Customs*. Delhi: Motilal Banarsidass. 1975.

Hazra. R.C. *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs*. Delhi: MLBD. 1975.

Heesterman, J.C. *The Ancient Indian Royal Consecration.* The Hague, Netherlands; Mouton & Co. Publishers. 1957. 1st Ed.

Herklots, G. A. *Islam in India*. Delhi: Orient Books Reprint Corporation. 1972. 1st Edition.

Hodson, T.C. *The Primitive Culture of India*. London: The Royal Asiatic Society. 1992.

Hoffman, Frank J & Deegalle Mahinda (Ed.). *Pali Buddhism*. New Youk : Routledge. 2016.

Horstmann, Monika. *In favour of Govinddevji*. New Delhi: Manohar. 1999. 1st Publication.

Islam, Kamrunnesa. *Aspects of Economic History of Bengal C. 400-1200 A.D.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 1984. 1st Edition.

Jaggi, O.P. *Religion, Practice and Science of Non-Violence*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishars Pvt. Ltd. 1974. 1st Edition.

James, Tod. *Annals and Antiquities of Rajas'than*. London: Routhledge & Kegan Paul Limited. 1960. Reprint.

Jash, Pranabananda. *Some Aspects of Jainism in Eastern India*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishes Pvt. Ltd. 1989.

Kane, P.V. *History of Dharmasastra* (Vol. IV, Part II). Pune: Bhandarkar Oriental Research Institution. 1991. 3rd Edition.

Karim, Abdul. *Social History of the Muslims in Bengal*. Dhaka: Jatiya Grantha Prakashan. 2001. 3rd Edition.

Keith, A.B. *A History of the Classical Samkhya Philosophy*. Delhi: Nag Publishers. 1975. 1st Edition

Kimura, Ryukan. *A Historical Study of the Terms Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana Buddhism*. Kolkata: University of Calcutta. 1927. 1st Edition

Kosambi, D. D. *The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline.* New Delhi: Vikas. 1997. 1st edition

Kujur, SR A.A. *The Oraon Habitat: A Study in Cultural Geography.* Ranchi: The Daughters of S.T. Anne. 1989.

Larson, G.J. *Classical Samkhya An Interpretation of its History and Meaning*. Delhi: MLBD. 1969. 1st Edition

Law, Narendra Nath. *Age of the Rig Veda.* Calcutta: Firma KLM. 1965. 1st Edition.

Lessing, F.D & Alex Wayman. *Introduction to the Buddhist Tantric System*. Delhi : MLBD. 2008. 1st Edition

Ling, Trevor. Buddhist Bengal, and After in *History and Society Essays in honour of Professor Niharranjan Roy*. Debiprasd Chattopadhyay Edited. Calcutta: K.P. Bagchi & Company. 1976. 1st Edition.

Lutjeharms, Rembert. *A Vaisnavva Poet in Early Modern Bengal*. New Delhi: Oxford University Press. 2018. First Edition.

Macky, Earnest. *Early Indus Civilizations*. London: Luzac & Company. 1948. 1st Edition.

Majumder, R.C. *The History of Bengal* (Vol-I). Dacca: The University of Dacca. 1943. 1st Edition.

Manring, R. J. *Reconstructing Tradition Advaita Acharya and Gaudiya Vaishnavism at the Cusp of the Twentieth Century*. New York: Columbia University Press. 2005. 1st Edition.

Mauss, Marcel. *The Gift the form and reason for Exchange in Archaic Society*. London: Routledge. 2002. Taylor and Francis e-Library ed.

Mitchell, John Murray. *The Great Religions of India*. London: Oliphant, Anderson & Ferrier. 1905. 1st Edition.
Mitra, N. B. *Methodist in Bengal*. Durgapur: Diocese of Durgapur. 2011. Second Edition.
Mitra, R.C. *The Decline of Buddhism in India*. Santiniketan: Research Publications Committee, Visva-Bharati. 1981.
Mitra, Rajendralal. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*. Calcutta: The Asiatic Society of Bengal. 1882. 1st Edition.
Mohan, Hari. *The Chero: A Study in Acculturation.* Ranchi: Bihar Tribal Welfare Research Institute. 1973. .
Mookerji, Radha Kumud. *Ancient Indian Education*. Delhi: MLBD. 1969. Fourth Edition.
Morrisom, Barrie M. *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*. USA: The Association for Asian Studies. 1970. 1st Edition.
Mukhopadhyay, Sankarananda. *The Ausras of India (Their Religion and Tradition).* Kolkata: Firma KLM. 1912. 1st Edition
Nandi, Ramendranath. *Social Roots of Religion in Ancient India*. Calcutta: KP Bagchi & Company. 1986. 1st Ed.
Narayanasvami Aiyar, K. *Thirty Minor Upanisads*. Delhi: Parimal Publications. 1997. 1st Edition.
Nath, D. *The Majuli Island Society, Economy and Culture*. Kolkata: Anshah Publishing House. 2003. 1st Edition.
Nath, Vijay. *Puranas and Acculturation A Historico-Anthropological Perspective*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publications. 2001. 1st Edition
Naumann, Erich. *The Greatest Mother An Analysis of the Archetype*. Princeton: Princeton University Press. 1983. Second Edition.
Neelis, Jason. *Early Buddhist Transmission and Trade Networks*. Boston: Brill. 2011. 1st Edition.
Neog, M. *Sankardeva and His Times Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Assam*. Gauhati: LBS Publications. 2018. 2nd Edition.
Neog, Maheswar. *Sankardeva*. New Delhi : National Book Trust. 2005. Reprint.
Neuman, Erich. *The Greatest Mother An Analysis of the Archetype*. Princeton: Princeton University Press. 1983. Second Edition.
Niyogi, Puspa. *Buddhism in Ancient Bengal*. Calcutta: Jijnasa. 1980. 1st Edition.
O'Connell, Joseph T. *Caitanya Vaisnavism in Bengal Social impact and Historical Implications.* London & New York: Routledge. 2019.
O'Connell, Joseph T. *Organizational and Institutional Aspects of Indian Religious Movements*. Shimla: IIAS. 1999. 1st Edition.
O'Malley, L.S.S. *Bengal District Gazetteers: Rajshahi*. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. 1916. 1st Edition.
O'Malley, L.S.S. *Santal Parganas*. Calcutta : West Bengal District Gazetters, Department of Higher Education, Govt. of West Bengal. 1999.
Pal, Bipinchandra. *Bengal Vaishnavism*. Calcutta: Yugayatri Prakashak Ltd. 1962. Second Edition.
Pande, G.C. *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization*. New Delhi: Centre for Studies in Civilization. 2004. Reprint.
Pande, Govind Chandra. *Studies in the Origins of Buddhism*. Allahabad: University of Allahabad. 1957. 1st Edition
Pandey, Kanti Chandra. *An Outline of Saiva Philosophy*. Kolkata: MLBD. 1999. Reprint.
Pandey, Raj Bali. *Hindu Samskaras*. Banaras : Vikram Publications. 1949. 1st Edition.
Parpola, Asko. *The Sky-Garment A Study of the Harappan Religion and its relation to the Mesopotamina and later Indian religions*. Helsinki : The finish Oriental Society. 1985. 1st Edition.
Piggott, Stuart. *Prehistoric India*. Harmonds Worth : Penguin Books. 1950. 3rd Reprint
Powers, John. *Introduction to Tibetan Buddhism*. New York: Snow Lion Publications. 2007.

Raj, Jaimal. *The Rural-Urban Economy and Social Changes in Ancient India* (300 B.C. to 600 A.D). Delhi: Bharatiya Vidya Prakashan. 1974. 1st Edition.
Chatterjee, Rama. *Religion of Bengal*. Calcutta: Punthi Pustak. 1985. 1st Edition.
Ramamurti, A. *Advaitie Mysticism of Sankara*. Santiniketan: The Centre of Advance Study in Philosophy, Visva-Bharati. 1974. 1st Ed.
Ramana, K. Venkata. *Nagarjuna's Philosophy as Presented in the Maha-Pajnaparamita- Sastra.* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2016. 8th Reprint.
Ramanathan, Indira. *Guru of Gurus*. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan. 2013. 1st Edition.
Ramaswamy, Vijaya. *Devotion and Dissent in Indian History*. New Delhi: Foundation Books. 2018. Reprint.
Ramaswamy, Vijaya. *Walking Naked Women, Society, Spirituality in South India*. Shimla: IIAS. 1997. 1st Edition.
Ray, Prafulla Chandra. *A History of Hindu Chemistry*. Calcutta : The Bengal Chemical & Pramaceutical Works Limited. 1909. 1st Edition. p. XIII.
Risley, H. H. *Tribes and Castes of Bengal Ethnographic Glossary* Vol-I. Calcutta: Bengal Secretariat Press. 1891.
Risley, Herbert. *The People of India*. Calcutta & Shimla: Thacker, Spink & Co. 1915.
Rizvi, S. R. R. *A History of Sufism in India*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. 1978.
Rosen, Steven J. *Vaishnavi Women and the worship of Krishna*. Delhi: MLBD. 1999. Reprint.
Roy, Kumkum. *The Emergence of Monarchy in North India Eighth-Fourth Centuries B.C. As Reflected in the Brahmanical Tradition.* Delhi: Oxford University Press. 1994. 1st Edition
Roy, Sarat Chandra. *The Oraons of Chotonagpur (Their History, Economic Life and Social Organisation)*, Ranchi: []. 1984.
Sangari, Kumkum & Sudesh Vaid (Ed.). *Recasting Women Essays in Colonial History*. New Delhi: Zubaan. 1989. 1st Edition.
Sanyal, Hiteshranjan. *Social Mobility in Bengal*. Kolkata: Papyrus. 1981. 1st Edition.
Sarkar, Sumit. *Writing Social History*. New Delhi: Oxford University Press. 1998. 1st Paper Back Edition.
Sarma, N. C. *The Vaisnavite Poets of North-Eastern India*. Calcutta: Puthi Pustak. 1991. 1st Edition.
Sastri, K.A Nilakanta. *A History of South India* New Delhi: Oxford University Press. 2008. 27th Impression.
Sastri, K.A. Nilakantha. *Gleanings on Social Life From the Avadanas*. Calcutta: The Indian Research Institute. 1945. 1st Ed.
Sen, Asis. *Animal Motifs in Ancient Indian Art*. Calcutta: Firma KLM. 1972. 1st Edition.
Sen, Tansen. Buddhism, *Diplomacy and Trade The Realignment of Sino-Indian Relations. 600- 1400*. Honolulu & USA: Association for Asian Studies. 2003. 1st Edition
Sharma, Krishna. *Bhakti and Bhakti Movement A New Perspective*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. 2015.
Sharma, Krishna. *Bhakti and the Bhakti Movement: New Perspective*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publications. 2015.
Sharma, Rajendra Nath. *Culture and Civilizations Revealed in the Srautasutras*. New Delhi: Nag Publishers. 1977. 1st Edition.
Shastri, Hirananda. *The Origin and Cult of Tara*. New Delhi: Archaeological Survey of India. 1998. Reprint
Shende, N.J. *The Religion and Philosophy of the Atharva Veda*. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute. 1952. 1st Edition.
Singer, Milton. *Krishna Myths, Rites and Attitudes*. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1966. 1st Edition
Sinha, A.P. *Religious Life in Tribal India.* New Delhi: Classical Publishing Company. 1989.

Sinha, Ratna & Shyamalkanti Chakravarti (Edited). *Forty Essays on Indological Studies A Collection of Works of P.C Bagchi* (Vol-I & Vol-II). Kolkata: Pritonia. 2014. 1st Edition

Sircar, D.C. *Epigraphic Discoveries in East Pakistan*. Calcutta: Sanskrit College. 1973. 1st Edition.

Sitanath, Tattvabhusan. *A Manual of the Brahma Rituals & Devotions*. Kolkata: Sadharan Brahmo Samaj. 2004. 3rd Edition.

Staal, Frits. *Agni The Vedic Ritual of the Fire Alter*. Delhi: MLBD. 1st Edition. 2001.

Taraporewala, I.J.S. *The Religion of Zarathustra.* Madras: Theosophical Publishing House. 1926. 1st Edition

Taylor, Kathleen. *Sir John Woodroffe, Tantra and Bengal 'An Indian Soul in a European Body'?* London: RoutledgeCurzon. 2006. Reprint.

Terry, Michael. *Reader's Guide to Judaism.* London: Fitzaroy Dearborn Publishers. 2000. 1st Publication

Thapar, Romila. *Ancient Indian Social History Some Interpretations*. New Delhi: Orient Longman Ltd. 1978. 1st Ed.

Thomas, Edward J. *The History of Buddhist Thought*. London: Rautledges & Kegan Paul Ltd. 1953. 2nd Edition Reprint

Tripathi, R.K. *Social and Religious Aspects in Bengal Inscriptions*. Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1987. 1st Edition.

Troisi, J. *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices among the Santals*. New Delhi: Monohar. 1978.

Tucci, G. *Some Aspects of the Doctrines of Mitreya (Natha) and Asanga*. Calcutta : University of Calcutta. 1st Edition. 1930.

Urban, Hugh B. *Tantra Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion.* London: University of California Press. 2003. 1st Edition.

Venkateswaran, C.S. *The Ethics of the Puranas. The Cultural Heritage of India* (Vol-II). 2003. 1st Edition

Warrier, Maya. *Hindu Selves in Modern World Guru faith in the Mata Aritanandamayi Mission*. USA: Routledge Curzon. 2005. 1st Edition.

Weiss, Richard S. *Recipes for Immortality Medicine, Religion and Community in South India.* New York: Oxford University Press. 2009. 1st Edition.

Weiss, Richard. *The Reformulation of a Holy Science: Siddha Medicine and Tradition in South India*. Chicago: The University of Chicago. 2003.

Wiltshire, Margin G. *Ascetic Figures Before and in Early Buddhism The Emergence of Gautama as the Buddha*. New York: Mouton de Gruyter. 1990. 1st Edition

Wiser, W. H. *The Hindu Jajmani System*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. 1988. 3rd Edition.

Zvelevill, Kamil V. *The Poets of the Powers Magic, Freedom and Renewal*. USA: Integral Publishing. 1993. 2nd Edition.

সহায়ক গ্রন্থ (হিন্দি)

নেগী, ঠাকুর সেইন. *বজ্রযানী অনুত্তরযোগ.* বারাণসী : কেন্দ্রীয় উচ্চ তিব্বতী শিক্ষা সংস্থান. ১৯৯৯. প্রথম সং.

দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ. *কবীর.* নয়া দিল্লি: রাজকমল প্রকাশন. ২০০৪. নতুন সংস্করণ.

ভারতী, ধর্মবীর. *সিদ্ধ সাহিত্য.* নিউ দিল্লি : লোকভারতী প্রকাশন. ২০১৫. প্রথম সং.

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল. *পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী.* এলাহাবাদ : কিতাব মহল. ১৯২৭. প্রথম সংস্করণ.

পত্র-পত্রিকা (বাংলা)

গিরিশচন্দ্র, বেদান্ততীর্থ. 'তন্ত্রের ইতিহাস গৌড়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়'. সাহিত্য. ২৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা.

চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ. 'চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নূতন পুথি'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ১৩৪২ বঙ্গাব্দ.

চট্টোপাধ্যায়, সুধাকর. 'কবীর ও পূর্ব্বভারতীয় সাধনা'. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (৬০ বর্ষ, ২ সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৯৬০.

চৌধুরী, বিজয় ভূষণ. 'শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৯০৭

তেওয়ারী, রামবহাল. 'চৈতন্যদেব ও হিন্দী সাহিত্য'. কলকাতা: উদ্বোধন (৮৮ তম বর্ষ, নবম সংখ্যা). আশ্বিন, ১৩৯৩.

দত্ত, নারায়ণ. 'উদ্ধারণ দত্ত ও শ্রীপাট সপ্তগ্রাম'. সমকালীন পত্রিকা. ১৩৭১ বঙ্গাব্দ.

দত্ত, পুলিনবিহারী. 'মুসলমান যুগে মথুরা'. কলকাতা: মানসী ও মর্মবাণী. চৈত্র ১৩৩১

দাসগুপ্ত, শশিভূষণ. 'মীননাথ'. শ্রীভারতী. ৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা. ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

দেবগোস্বামী, হেমচন্দ্র. 'আসামে শ্রীচৈতন্য'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ১৩২২ বঙ্গাব্দ.

নাথ, রাজমোহন. 'নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২য় সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৩১ বঙ্গাব্দ.

বড়ুয়া, বেণীমাধব. '"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২য় সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩৩১ বঙ্গাব্দ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ. 'ঊনবিংশ শতকের নব গৌরাঙ্গ আন্দোলন'. বিভাগীয় পত্রিকা (চতুর্থ সংখ্যা). বাংলা বিভাগ-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৮৯-৯০.

বিশ্বাস, অচিন্ত্য. 'উত্তরবঙ্গের অনক্ষর কৃষকের মৌখিক সাহিত্য- "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস"'. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (একাদশ সংখ্যা). কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. ২০০১.

ভট্টাচার্য, তারকেশ্বর. 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা. ১৩০৮ বঙ্গাব্দ.

ভট্টাচার্য, বিধুশেখর. 'বিজ্ঞানবাদ'. কলকাতা : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা- ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা. ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ.

মজুমদার, বিমানবিহারী. 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ'. কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা. ৩১ ভাগ. ৩য় সংখ্যা. ১৩৩১.

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ. 'উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব'. ভারতবর্ষ. বৈশাখ ১৩৫৭

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার. 'উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা. ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ.

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ. 'সহজিয়া'. বীরভূমি. [ ].

মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ. 'ভুসুকু'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৪৮ শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা). ১৯৪১.

মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ্. 'সিদ্ধ কানুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ'. কলকাতা: সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (৪৯শ বর্ষ, ১ সংখ্যা). ১৯৪২.

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. 'তন্ত্রের প্রাচীনতা'. প্রবাসী. কলকাতা. ৪৭শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড. ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ.

রায়, কালিদাস. 'সহজিয়া সাহিত্য ও পরকীয়াবাদ'. বঙ্গশ্রী (১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা). ১৩৫২ বঙ্গাব্দ.

রায়, বসন্ত. 'ময়নামতীর পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২য় সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩২৮ বঙ্গাব্দ.

শীল, শিবচন্দ্র. 'চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৪র্থ সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩২৭ বঙ্গাব্দ.

শীল, শিবচন্দ্র. 'সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম'. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা). কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ. ১৩২৬ বঙ্গাব্দ.

সান্যাল, মনস্বিতা. 'সপ্তগ্রাম (আঃ ১৩০০-১৬৩২)'. কলকাতা: ঐতিহাসিক. সংখ্যা ৪. মাঘ. ১৩৮৩

সেন, সুকুমার. 'নরহরি সরকার ও শ্রীখন্ডের সম্প্রদায়'. বঙ্গশ্রী (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা). জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০.

পত্র-পত্রিকা (ইংরাজি এবং হিন্দি)

উপাধ্যায়, জগন্নাথ. 'বজ্রযান : ধর্ম, দর্শন অউর জীবন-দর্শন'. ধী দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থ শোধ পত্রিকা. সংখ্যা ২৪. বারাণসী : কেন্দ্রীয় উচ্চ তিব্বতী শিক্ষা সংস্থান. ১৯৯৭.

Bagchi, P.C. 'Reviews of Sadhanaamala Vol-II by Dr. Benoytosh Bhattacharyya'. The Indian Historical Quarterly (Vol-VI). 1930.

Bagchi, P.C. 'The Beginnings of Buddhism in China'. Sino-Indian Studies Vol-I, Part-I. Santiniketan: Visva-Bharati. 1946.

Banerjea, J.N. 'Schools of Buddhism in Early Indian Inscriptions'. The Indian Historical Quarterly. December, 1948

Basu, Anath Nath. 'Tattvasvabha-dristigitika-doha'. Indian Historical Quaterly, Part III. 1927.

Bhargava, P.L. 'The Origin and Development of Puranans and their Relation with Vedic Literature'. Annals of the Bhandarkar Oriental research Institute. Vol. 58/59, Diamond Jubilee Volume.

Bhattacharya, Ananda. Madariya 'Sufi Silsila their distinctive characteristics and relations with the Indian Power'. *Proceedings of the History Congress*. Vol- 69 (2008).

Bhattacharya, Vidhushekhar. 'Is it Caryacaryaviniscaya or Ascaryacaryacaya?' Calcutta: The Indian Historical Quarterly (Vol-VI). Narendra Nath Law Edited. 1930.

Bhattacharyya, Benoytosh. 'Origin and Development of Vajrayana'. Indian Historical Quarterly (Part III). 1927.

Braistein, Lara E. 'Saraha's Adamantic Songs: Texts, Contexts, Translations and Traditions of the Great Seal'. Canada: Library & Archieves Canada. 2004. 1st Edition. Buddhist-Christian Studies (Vol-5). 1986.

Chatterjee, Indrani. 'Women, Monastic Commerce, and Coverture in Eastern India cira 1600-1800 CE.'. Modern Asian Studies 50, 1. 2016.

Csoma De Koros, Alexander. 'Note on the Origin of the Kala-chakra and Adi-Buddha System'. The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol-II. Kolkta: The Asiatic Society. 1983.

Das, Sarat Chandra. 'On the Kalachakra System of Buddhism Which Originated in Orissa'. Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol-III. Kolkata : The Asiatic Society. 1907.

De, S.K. 'The Buddhist Tantric Literature (Sanskrit) of Bengal'. New Indian Antiquary. Vol-I. 1938-39

Ghosh, B. 'Emergence of Kalachakratantra'. Bulletin of Tibetology. Edited by N.C. Sinha & J.K. Rechung. Gangtok : Sikkim Research Institute of Tibetology. 1985. No. 2.

Ghosh, Monomohan. 'Newly Discovered Gunaighar Grant'. Indian Historical Quarterly. Vol-06. 1930

Ghosh, Suchandra. 'Locating South Eastern Bengal in the Buddhist Network of Bay of Bengal' (C. 7th Centruy – ce 13th). Proceedings of the India History Congress. Vol. 74. 2013.

Hazra, R.C. 'Influence of Tantra on Smriti-Nibandhas'. Annals of the Bhankar Oriental Research Institute. Vol-15, No. ¾. Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute. 1933-34.

Kane, P.V. 'The Meaning of Acharya'. Pune: Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol-23. No-1/24. 1942.
Majumdar, N.J. 'Notes on Vajra'. Journal of the Departmental Letters, Vol. XI, Calcutta : Clcutta Univeristy Press. 1924.
Maulavi, Abdul Wali. 'Notes on the Fakirs of Baliya-Dighi in Dinajpur'. *Journal of the Asiatic Society Bengal*. 1903. Vol-2
Mukherjee, Tarapada, Irfan Habib. 'Akbar and the temples of Mathura and its Environs'. Proceedings of the History Congress. 1987. Vol- 48.
Mukherjee, Tarapada, Irfan Habib. 'The Mughal administration and the temples of Vrindavan during the reigns of Jahangir and Shahjahan'. Proceedings of the History Congress. 1988. Vol- 49.
Neog, M. 'The Bhakti Cycle of Assamese Lyrics: Bargits and After'. Journal of the Srimanta Sankardev Sangha (vol-II). 1999
Pradhan, Biswajit. 'Rise and Growth of Siddha Cult in Orissa'. Proceedings of the Indian History Congress. Vol. 64. 2003.
Ray, Niharranjan. 'Rural-Urban Dichotomy in Indian Tradition and History'. Annals of the Bhandar Oriental Research Institute (Vol : 58/59). Poona: BORI.
Ray, Raginald. 'Reading the Vajrayana in Context: A Reassessment of Bengal Blackie'. Buddhist-Christian Studies (Vol-I). 1981.
Rukmani, T.S. 'The Epics and the Puranas Supplement the Vedas'. Annals of the Bhandarkar oriental Institute. Vol-82, No. ¼. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute. 2001.
Siegel, Lee. 'Bengal Blackie and the Sacred Slut: A Sahajayana Buddhist Song'. Buddhist- Christian Studies (Vol-I). 1981.
Singh, Bireswar Prashad. 'Biography of Padmasambhava'. Patna: The Bihar Research Society.1988. 1st Edition.
Szanto, Peter Daniel. 'Minor Vajrayana Texts II A new manuscript of Gurupacasika'. www.academia.edel. Accessed on 10.06.2020.
Tiso, Fransis & Fabrizio Torricelli. 'The Tibetan Text of Tilopa's Mahamudropadesa'. East & West. Vol. 41. No. 1/4.December 1991.
White, David Gordon. 'Mountains of Wisdom: On the interface between Siddha and Vidyadhara Cults and the Siddha orders in Medieval India'. International Journal of Hindu Studies, Vol-I, No. 1. 1997.

অনলাইন তথ্য-উৎস

https://thewire.in/history/karnataka-lingayat-veerashaive-debate accessed on 01.09.2020 www.oxfordbibiography.com accessed on 20.04.19

অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম

নাথ, নীরদপ্রসাদ. 'শ্রীচৈতন্যমতবাদ প্রচারক নরোত্তম এবং তাঁহার রচনাবলীর সামগ্রিক বিচার'. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল উপাধির জন্য প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ. [ ]
বিশ্বাস, অচিন্ত্য. লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, পদাবলী (বিশ্লেষণ ও আলোচনা). বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৯০
মুখোপাধ্যায়, অণিমা. 'সপ্তদশ শতাব্দে রাঢ়-দেশের সমাজ ও সাহিত্য-সমীক্ষা'. অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ. বিশ্বভারতী. ১৯৭৪
সিংহ, বিদ্যাচন্দ্র. 'মণিপুরী ও বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পর্ক: সমন্বয় ভাবনার সূত্র সন্ধান'. অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ. আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর. ২০০১

Avila, Sandra. 'Buddhism and its relation with Women and Prostitution in Thai Society'. Unpublished M.A Dissertation. Florida International University. 2008.

Furui, Ryosuke. 'Rural Society and Social Networks in Early Bengal from the fifth to the Thirteenth Century'. Ph.D thesis submitted to Jawaharlal Nehuru University. 2007.

Joshi, Ritesh Umashankar. 'Exposition of Yoga Tenets in the Puranas — A Critical and comparative Study' (Unpublished Ph.D. Thesis). M.S. University of Baroda. 2011.

Mandal, Rabindranath. Vaishnavism and Vaishnavite Culture in Midnapur (16th Century to present day). unpublished Ph.D thesis. Vidyasagar University. 2001.